CUK-H06995-75-P8721

পরিচয়

বর্ষ ৪৪ । সংখ্যা ৬ । পৌষ ১৩৮১ । জানুয়ারি ১৯৭৫

756.3
017/8

75

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

কবিতাগুচ্ছ

গল্প

পুস্তক-পরিচয়

বিবিধ প্রসঙ্গ

756.3
017/8

প্রচ্ছদ: অজয় গুপ্ত

P 8271

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ
সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

নিজস্ব সংগ্রহে রাখার ও উপহার দেবার মতো বই

সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি বই

ন হন্যতে ২০.০০
ঃ মৈত্রেয়ী দেবী

স্মৃতি বিস্মৃতি ও দূরস্মৃতি ১.০০
ঃ পাবলো নেরুদা
অনুবাদক ঃ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

কমিউনিস্ট পরিবার ও অন্যান্য গল্প ১২.০০
ঃ সৌরি ঘটক

তরী হতে তীর ২০.০০
ঃ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মনীষা গ্রন্থালয়,
৪/৩-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশিত হোল

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

কবিতা, নিঃসংগতা ও মনোমোহন ঘোষ

অরবিন্দ-ভ্রাতা কবি-অধ্যাপক মনোমেহোন ঘোষের জীবনচর্যা ও কাব্যসাধনার বিষয়ে কোনো গবেষণাই অদ্যাবধি সর্বজনজ্ঞাতব্য বিষয় হয়ে ওঠেনি; অথচ তাঁর চমকপ্রদ আত্মপ্রগতিতে বাঙালী রনেসাঁসের এক পর্বের সম্যক উদ্ভাসন। এতাবৎ বিস্মৃত কবি-অধ্যাপকের বিষয়ে এই প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থে লেখক এক ঐতিহাসিক দায়িত্বই পালন করেছেন। লেখকের পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'ভাষাপথিক হরিনাথ দে'-র পাঠক মাত্রেই তাঁর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সংগে সুপরিচিত; বর্তমান গ্রন্থে তা অধিকতর পরিণত ও সমৃদ্ধ। সরকারী মহাফেজখানা এবং বহু অজানিত সূত্র থেকে আহরিত অনেক মূল্যবান তথ্যের সংগ্রহণে এ-গ্রন্থ ঐতিহাসিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। মূল্য: আট টাকা

বঙ্গীয় গবেষণা পরিষৎ

৩৮/৫ বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩

ল্যানোলিন ও ময়েশ্চারাইজার মেশানো

মুখ ও গা-হাত-পা ফাটা বন্ধ করে......

সারা শরীরে এনে দেয় স্নিগ্ধ কমনীয়তা।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী

বর্ষ ৪৪ । সংখ্যা-৬ । পৌষ ১৩৮১ । জানুয়ারি ১৯১৫
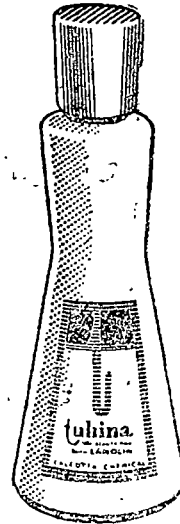
সংস্কৃত ও রুশ ভাষা ঃ তুলনা

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারী ভাষা রূপে এবং প্রায় ১০ কোটিরও বেশী লোকের মাতৃভাষা হিসাবে রুশ ভাষাকে সকলেই আজ পৃথিবীর একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষারূপে স্বীকার করে নিয়েছেন। জগতের অন্যান্য ভাষার তুলনায় এ ভাষার স্থান নির্দেশ করতে গেলে দাঁড়াবে চতুর্থ; প্রথম উত্তর-চীনা ভাষা (যে ভাষা-ভিত্তিতে চীনের জাতীয় ভাষা গড়ে উঠেছে), তারপর ইংরেজী, হিন্দী ও হিস্পানী—আর রুশ ভাষার পর স্থান হল যথাক্রমে জার্মান, জাপানী, ইন্দোনেশিয়, বাংলা, ফরাসী এবং আরবীর।

পূর্ব ইয়োরোপ এবং উত্তর, মধ্য ও উত্তরপূর্ব এশিয়ায় রুশ ভাষার স্থান সব সময়ই ছিল। তার কারণ রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা। সপ্তদশ-অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে এই জনসংখ্যাই একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, যার একদিকে বাল্টিক সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তার—আর অন্যদিকে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণে মধ্য এশিয়ার বালুকাময় মরু-সীমা অবধি তার সীমা। কিন্তু বাইরের পৃথিবীর কাছে একটি বিশ্ব-শক্তির ভাষার জন্যই যে রুশভাষীদের সম্মান তা নয়,—এর সাহিত্য, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাবলী এবং পদার্থ বিজ্ঞানাদিতে নতুন ও শক্তিশালী ভাবধারার প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে এর মূল্য ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ভাষাগুলির মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং চিন্তাশীলতার রাজ্যে রাশিয়ার বিখ্যাত মনীষীদের মধ্যে পুশকিন্, লিও তলস্তয়, দস্তয়ভস্কি, গগোল্, লিওনিদ্ আন্দোয়ভ্, আন্তন শেখভ্ এবং মেন্দেলিয়েভ্ প্রভৃতি গুটিকয়েক নাম মাত্র। জাতিসংঘ স্বীকৃত প্রধান পাঁচটি ভাষার মধ্যে চারটি, যেমন ইংরেজী, ফরাসী, স্পেনীয় ও রুশ—ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্গত। এবং হিন্দীও শেষ অবধি স্বীকৃতি পেয়েছে ও জাতিসংঘ কর্তৃক তার স্থান বিশ্বের তৃতীয় ভাষারূপে নির্দিষ্ট হয়েছে; এখন এই বিশেষ যে ছয়টি ভাষা জাতিসংঘে স্থান পেল, তার মধ্যে পাঁচটিই হচ্ছে ইন্দো-ইউরোপীয়

বংশগত। অপর ভাষাটি হল চীনা ভাষা ; এটি সিনো-তিবেটিও বা ভোট-চীনীয় বংশের মধ্যে পড়ে। এ ভাষার বৈশিষ্ট্য হল যে—গঠনে, শব্দ ধাতুরূপের ধারায় ও শব্দে তা ইন্দো-ইউরোপীয় থেকে আগাগোড়া ভিন্ন।

ভাষাগোষ্ঠী

আধুনিক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহকে আটটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এর এক-একটি গোষ্ঠীতে সে সব ভাষাই স্থান পেয়েছে যাদের মধ্যে অল্পবিস্তর মিল পাওয়া যায়। আসলে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর এইসব ভাষাগুলির মধ্যকার সম্পর্ক ঠিক ভাই-বোনে আর চাচাতো মামাতো কি দূরসম্পর্কীয় ভাইবোনের মতোই। এই আটটি শ্রেণীবদ্ধ ভাষাগুলি হলো : (১) কেলটিক (আইরিশ, ওয়েলশ, গেইলিক, ব্রেটস) (২) ইটালিক (লাতিন এবং তার আধুনিক প্রতিনিধি ভাষাসমূহ যথা ইতালীয়, ফরাসী, স্পেনীয়, পর্তুগীজ, কাতালনি, প্রোভেন্সীয় ও রুমানীয়) (৩) হেলেনীয় বা গ্রীক (৪) জার্মানী (ইংরাজী, জার্মান, ডাচ, নর্স, ডেনীয়, সুইডিস) (৫) আলবানীয় (৬) আর্মেনীয় (৭) বাল্টোশ্লাবিক (রুশীয়, পোলীয়, চেক, শ্লোভেজ, যুগোশ্লাভীয়, বুলগারীয় এবং লিথুয়ানীয় ও লেট) এবং (৮) ইন্দোইরাণীয় বা আসল অর্থে আর্যভাষা (সংস্কৃত ও প্রাচীন ভারতের প্রাকৃত এবং তার থেকে উত্তরকালে ছড়িয়ে পড়া উত্তর ভারতীয় ও দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলি—এসব ভাষা হচ্ছে হিন্দী, বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি এবং তদতিরিক্ত আছে ইরাণের ভাষা যেমন—আবেস্তান, প্রাচীন পারশী, পাহলবী, আধুনিক পারশী, পশতু, কুর্দিস্তানী প্রভৃতি)।

রুশভাষা সেদিক থেকে ভারতীয় আর্যভাষাগুলির দূর সম্পর্কের বোনের মতো ; ঠিক যেমন ইংরেজী আর ফরাসী বা গ্রীক আর পার্শী। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে শব্দগত ও গঠনগত সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের যাবতীয় সমস্ত দিক প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ব্যাখ্যা করে যে মতটি এখন সর্বজন গৃহীত হয়েছে, তা এই যে, প্রায় ৩,৫০০ বছর আগে এ সবের একটি মূল ভাষাতেই মানুষ কথা বলত ; এবং আধুনিক সর্বশেষ মতটি হল রাশিয়ায় উরাল পর্বতমালার দক্ষিণে কোনো এক শুষ্ক তৃণভূমিতে বসবাসকারী লম্বা, ফর্সা, স্বর্ণকেশ, নীলনয়ন, খাড়া নাক এবং লম্বা মাথাওয়ালা পূর্বপুরুষগণই,—নৃতত্ত্ববিদগণ যাকে বলেন নর্ডিক মানুষ—এরাই হচ্ছেন প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আদি জনক। এভাষা উপজাতীয়-গণের মুখে ছড়াতে থাকে এবং এরা ইতিহাসের বিভিন্নকালে পশ্চিমে, দক্ষিণে ও

দক্ষিণপূর্বে তা বহন করে নিয়ে আসে। এইভাবে নতুন দেশে এসে আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষীগণ স্থানীয় অধিবাসীগণের সাথে মিশে যায় মিশ্রিত হয়ে যায়, এতে সেই আদি ভাষার পরিবর্তন ঘটে ও ইন্দো-ইউরোপীয় নানা ভাষাদির সৃষ্টি হতে থাকে (এই ভাষার প্রাচীনতম হদিস যেগুলি আমরা পাচ্ছি তা খ্রীষ্টপূর্ব ২য় সহস্রাব্দের)। যেমন, উত্তর মেসোপটেমিয়ার মিতান্নি ভাষা, এশিয়া মাইনরের হিত্তী ভাষা, ভারতে ও ইরাণে বৈদিক সংস্কৃত ও আবেস্তা, গ্রীসে প্রাচীন গ্রীক, ইতালীতে প্রাচীন লাতিনসহ প্রত্ন-ইতালিক, এবং অন্যান্য ভাষার মধ্যে প্রাচীন জার্মানী, প্রাচীন কেলতিক, প্রাচীন বালটিক, প্রাচীন শ্লাবিক—এসব ভাষার চিহ্ন আধুনিক জীবিত ভাষাগুলির দেহে রক্ষিত থেকে গেছে। খৃষ্ট-জন্মের পর প্রাচীন ভাষার আদি নমুনা বলতে এটুকুই বুঝব।

প্রাচীনতম নমুনা.

কালের তুলনায় বাল্‌টোশ্লাবিক (শ্লাবিক ভাষায় প্রতিনিধিত্ব করছে রুশভাষা, রুশভাষাই এই ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ; বাল্‌টিকের প্রতিনিধি-সদস্য হচ্ছে লিথুয়ানিয়ান) নবীনা ভাষা : কিন্তু ইন্দো-ইরাণীয় ভাষাগোষ্ঠীর নমুনাদি যেমন ধরা যাক, বেদ, এর প্রাপ্ত বর্তমান আকারের বয়সই হবে গিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতক। তেমনি হেলেনীয় ভাষা, হোমরের গ্রীক যার সন্ধানসূত্র, তাও গিয়ে হবে নবম খ্রীঃপূর্ব শতকের। সেদিক থেকে শ্লাবিক ভাষার সর্বপ্রাচীন নমুনা মাত্র খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকের। তবু কিন্তু এই শ্লাবিক আর তার ঘনিষ্ঠ সংযোগসম্পন্ন ভাষা বাল্‌টিক, ভাষা হিসাবে অর্বাচীনই এবং প্রত্ন IE ভাষার এমন কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করে রেখেছে যা আবার অন্য ভাষাগুলিতে এখন আর পাওয়া যায় না, ক্ষয়ে গেছে। বিশেষভাবে ক্রিয়ার ব্যবহার সম্পর্কে এ কথা খুবই প্রযোজ্য।

আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা অর্থাৎ হিন্দী, বাংলা, মৈথিলী ও গুজরাটি এগুলি আজ যেমন উন্নত তেমনি অধিকভাবে পরিবর্তিত, অতএব তুলনার্থ গৃহীত হলে সংস্কৃতের প্রশ্নই বিবেচ্য হওয়া উচিত, শ্লাবিকের প্রত্ন বৈশিষ্ট্যাদি ধারণের জন্য রুশ ও অন্যান্য শ্লাবিক ভাষাগুলির সাথে সংস্কৃতের তুলনা আদপেই সহজতর; আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি নয়—কেননা হিন্দী, বাংলা, মৈথিলী বা গুজরাটি এগুলি আজ অনেক বেশী বিকশিত, রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবর্গের আটটি ভাষা, আবার পুনরাবৃত্তি করে বলা যাক—

দুটো প্রধান গুচ্ছে বিভক্ত। কেল্‌তিক, ইতালীয়, হেলেনীয়, জার্মান (অধুনা বিলুপ্ত তুখারীয়, প্রায় ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ কালে সিংকিয়াং বা চীন-তুর্কিস্তানে এর অস্তিত্বের কথা জানা যায়) পড়ছে একগুচ্ছে এবং আলবানীয়, আর্মেনীয়, বাল্‌টোশ্লাবিক ও ইন্দো-ইরাণীয় ভাষাগুলি অপরটিতে। প্রথম গুচ্ছে মূল IE ভাষার পুরঃ কণ্ঠমূলীয় স্পর্শ ধ্বনি (তথাকথিত 'তালব্য' ধ্বনি) কণ্ঠধ্বনিই থেকে গেছে, দ্বিতীয় গুচ্ছে তা উষ্মধ্বনি, তালব্য বা দন্ত্য ধ্বনিতে রূপান্তর পেয়েছে।

এভাবে [১০০] একশ-র জন্য প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ হবে—যেমনটি ভাষাতাত্ত্বিকগণ পুনর্গঠন করে নিয়েছেন,—*Kmto'm ; এর গ্রীক দেওয়া হয়েছে [হে] কতোন ('হে' হচ্ছে উপপ্রত্যয় ; মূলশব্দ √ কতোন্), লা. কেন্তুম [Centum] ওয়েলেশ. কন্ত, তোখারিয়. কত [Kant] এবং জার্মান. *খুন্দম বা *হান্দম, যেখান থেকে ইং. হান্দ্‌ (যেমন হাণ্ড্রেড)। কিন্তু প্রত্ন ইন্দো-ইউরোপীয়তে *Kmto'm. এর সংস্কৃতরূপ শতম্‌, আবেস্তায়. সতম্‌, লিথুয়ানিয়ায়. শিমতাস এবং প্রাচীন শ্লাবিক. স্যতো, রুশ. স্তো। যে গুচ্ছ কণ্ঠধ্বনিকে বজায় রেখেছে, তাকে বলা হয়ে থাকে 'কেন্তুম গুচ্ছ' এবং যে গুলিতে তা শিস্‌ ধ্বনি বা /শ/ কিংবা /স/ হয়ে গেছে, সেগুলিকে বলা হয় 'সতম গুচ্ছ'। মূল লাতিন বা আবেস্তীয় ভাষায় 'শত' (১০০) বাচক শব্দকে সুবিধাজনক নাম হিসেবে ধরে এই দুই গুচ্ছকে এভাবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। সংস্কৃত (এবং অপরাপর ভারতীয় আর্য এবং রুশ—উভয়ই শতম্‌-গুচ্ছের ভাষা হিসাবে পরস্পরের খুব সন্নিকট, ইংরেজী বা ফরাসী কিংবা আইরিশ ভাষার সাথে সংস্কৃতের এবং ওসব ভাষার সাথে রুশের যেমন সম্পর্ক, তার চেয়েও এ সম্পর্ক নিকটতর। এই যে মিল, তা নিঃসন্দেহে বিরাট মিল ; এখানে কণ্ঠধ্বনিতে উষ্মধ্বনির প্রয়োগই এ দুই ভাষার সাযুজ্য চিহ্ন লক্ষণীয়।

এ ছাড়া ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার বেশ কিছু শব্দাবলী বাল্‌টোশ্লাবিক (রুশ) এবং ইন্দো-ইরাণীয় এই উভয় ভাষাতেই পাওয়া যায়। এ সমস্ত শব্দ অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় বড় নেই। এবং প্রায়শঃ যেসব শব্দ মেলে, রুশ-সংস্কৃতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রমাণে সেগুলি খুবই সহায়ক বলে বিবেচিত হয়। যেমন, সংখ্যাবাচক শব্দ : ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ সংখ্যাসমূহের প্রতিশব্দ এরূপ :

রুশ	সংস্কৃত
[দ্‌বা = dva]	[দ্বৌ = দুই]
[ত্রি = tri]	[ত্রি = তিন]

রুশ	সংস্কৃত
[চিত্তরি = c´etyre]	[চতুর্ = চার]
[পিয়াৎ [চ,]=pyat]	[পঞ্চ = পাঁচ]
[শেস্ত্ = s´est]	[ষষ্ = ছয়]
[সিয়েম্ = svem]	[সপ্তম্ = সাত]

৮ এবং ৯ অবশ্য রুশ ভাষায় ভিন্ন। ১০, ১০০ **রুশ** : দ্যেসিয়াৎ = **সং** : দশ ; **রুশ** স্তো = **সং**. শতম। আমি আছি বা হই রুশে হবে 'ইয়া য়োস্‌ম্', সংস্কৃতে 'অহম অস্মি' ; তি য়োসি = ত্বমসি/ত্বম অসি (তুমি আছ) ওন্ এস্ত্ বা ইয়েস্ত্ = √অন (/আসন/রূপের চিহ্ন) : অস্তি (সে আছে) ; স্বি এস্‌মি = বয়াম (প্রাকৃত. মহ্ম্) স্মঃ, স্মসি (আমরা আছি) ; ভি য়েস্তে = যূয়ম্ (বা বঃ) স্থঃ (তুমি আছ) ; আনি স্থৎ/সন্তি [প্রাচীন ব্যবহার] = অন্ ('অমী' স্থলে) সন্তি ; বুদ্ = ভবতঃ (তোমরা দুজনে হও বা আছ) ; ওন্ লিয়ুবিৎ = সে ভালোবাসে (**সং**. লুভ্যতি); মি জ্নায়েম্ = বয়াম্ (মহ্ম) জানীমঃ (আমরা জানি)।

সাধারণ শব্দ

কতগুলি সাধারণ শব্দ, বিশেষ্য, ক্রিয়াপদ এবং প্রত্যয়াদি নিয়ে তাদের অন্তর্গত সাদৃশ্য দেখানো যেতে পারে। 'লেখে' অর্থে রু. পীশেৎ, সং. পিশতি ; 'ঘুমায়' = রু. স্পীৎ, সং. স্বপীতি ; 'গৌরব' বা 'সম্মান' = রু. স্লাবা সং. শ্রবঃ। ভাইবোন, পুত্রকন্যা, মা বা স্ত্রী এ শব্দগুলো যথাক্রমে :

রু.	সং.
[ব্রাৎ = brat]	[ভ্রাতৃ = ভাই]
[সেস্ত্রা = sestra]	[স্বসৃ = ভগিনী]
[স্বীন = syn]	[সূনু = পুত্র]
[দোচ্ = doc´]	[দুহিতৃ = কন্যা]
[মাৎ (চ) = mat´]	[মাতৃ = জননী]
[°° জেনা = zena]	[জানি = জায়া]

'পিতা' শব্দের রুশ প্রতিশব্দ/আতিয়েৎস্ / [otets], যার সাথে সংস্কৃতের একটি বাল-শব্দ [তাত] এর তুলনা হতে পারে। /আগো (ই)ন/ [ogon]=[অগ্নি] (আগুন) ; /জ্ীমা/ = [হিম্] (শীত) ; /(চ্) সিয়্যারনি গারা/ [cernii gora] [প্রাচীন * কিয়ের্সনি গারা / * kersni gora / থেকে] = [কৃষ্ণগিরি] (কাল পাহাড়, Monte Negro) ; / ভিদ্‌রা / = [বিধবা] ; / দাৎ (চ্) = √দা (দেওয়া) ; /ইদি॰য়াৎ/ [edyat] = [অদন্তি] (তারা খায়) ; /দি॰য়েন্/

[den]=[দিন্] ; / নোচ /=[নক্ত] (রাত) ; / দোলগয়ে / [dolgoe] (ইং. /লং/ বা লম্বা)=[দীর্ঘঃ] ; /বোগ/ (শ্রষ্টা)=[ভগ] (ভগবান, ভাগ্য প্রভৃতি শব্দে যেমন ; প্রাচীন পার্শীতে 'ভাগ্য' অর্থে / বগ / [Baga] হতো) ; / স্ভ্যেৎ / [syet] (আলো)=[শ্বেতঃ] (সাদা)।

শ্লাববর্গের বিভিন্ন ভাষা যেমন রুশ (বৃহৎ রুশীয় বা ভেলিকোরুসকী), শুভ্র রুশীয় (চিত্রলোরুসকী), রুথেনিয়ান অথবা লালরুশীয় (ম্যালোরুসকী), পোলীশ, চেক, শ্লোভাক, শ্লোভেন, যুগোশ্লাভ, মেসিডোনীয় শ্লাব ও বুলগারীয়—এরা সবাই পরস্পর পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। এদের সম্পর্ক বাংলা-অসমীয়া, ওড়িয়া, মাগধী, মৈথিলী ও ভোজপুরীদের মধ্যেকার সম্পর্কের মতোই প্রায় ; এ সবগুলি ভাষারই উৎপত্তিমূল এক—প্রত্ন-শ্লাব সেই সাধারণ উৎস (স্টারোশ্লাভস্কি য়িযিক্), একদা খ্রীষ্টজন্মের পর প্রথম সহস্রাব্দকালের প্রথম দিকে এ ভাষাই ছিল একমাত্র প্রকাশ মাধ্যম। নবম শতকে এসে দুজন বাইজেনটাইন মিশনারী কনস্টেনটাইন ও তাঁরই সহোদর মেথদিয়ুসের খ্রীষ্টধর্মানুশাসনের অনুবাদ পাওয়া যায়, এগুলি বুলগারিয়ার প্রাচীন শ্লাবে উৎকীর্ণ লিপি থেকে করা। শ্লাব ভাষার জন্য সমকালে প্রচলিত বাইজেনটাইন বা কনস্টানটিনোপলে প্রচলিত গ্রীক বর্ণমালা তাঁরা ব্যবহার করেন এবং সেই সাথে শ্লাবের যে সব স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন ধ্বনির কোনো গ্রীক প্রতিলিপি পাওয়া যায়নি, সে গুলোর জন্যে কিছু নতুন অক্ষর বা চিহ্ন জুড়ে দিয়ে তাঁরা এর কলেবর আরো বৃদ্ধি করেছিলেন। প্রথম শ্লাবিয় বাইবেলে রক্ষিত এই প্রাচীন বুলগারিয় ভাষা—যাকে আবার প্রাচীন গীর্জাসংশ্লিষ্ট শ্লাব ভাষা বলেও লোকে জানে,—সেখানেই আমরা রুশ ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন দেখি। স্বভাবতই এই প্রাচীন গীর্জায়শ্লাব ভাষা অর্বাচীনতা হেতু ও সম্যক রক্ষিত থাকায় আধুনিক রুশ ভাষা অপেক্ষা সংস্কৃতেরই নৈকট্য প্রকটিত করে।

বাংলার সমপর্যায়

প্রাচীন গীর্জায়শ্লাব অত্যন্ত প্রত্যয়-বিভক্তি সম্পন্ন ভাষা ছিল ; সংস্কৃতও তেমনি। রুশ ভাষায় বহুলাংশে এই বৈশিষ্ট্য থেকে গেছে। বিশেষ্যের—বিশেষতঃ ছয়টি কারকের যে চিহ্ন, এবং ব্যাকরণিক শ্রেণীবিভক্তি—এসব সংস্কৃতের মতোই রুশ ভাষায় বিস্তৃত লভ্য। প্রাচীন শ্লাবের ক্রিয়া ব্যবহার প্রণালী অবশ্য রুশ ভাষায় যথেষ্ট সহজ করে এনে তার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে—এতে প্রমাণিত হয়, এ

বিষয়ে আর্যভাষাগুলির সাথে লক্ষ্যযোগ্যভাবে এর সমান্তরাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে (বিশেষতঃ পূর্বভাষাগুলি বা বাংলা-অসমীয়া-ওড়িয়া ও মৈথিলী-মাগধী-ভোজপুরী এবং মারাঠিতে তা প্রযুক্ত)। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় অতীত কালের রূপ সবই বাদ গেছে (অসম্পন্ন ও সামান্য অতীত লুঙ্ ক্রিয়ারূপ সমূহ), পরিবর্তে অতীতকালের একটি নতুন রূপ; ভাববাচ্যের /-'ল'-/ যুক্ত হল (যেমন, রুশ/ব্বীল্/ [byl] (ছিল)=বিহারী ['ভইল']; /দাল্/ [dal] (দিয়েছিল)=বাংলা [দিল], বিহারী [দেল]; /ভীদেল্/ [videl] (দেখেছিল)=সং. √বিদ্+ /-ল- / (অতীত ক্রিয়াবাচক); / পিল্ / [pil] (পান করেছিল)=বাংলা [পি'ল]; /য্নাল্/ [znal] (জেনেছিল)=বাংলা [জানিল]।

মূল শব্দ বা ধাতুর সাথে বিভক্তি বা প্রত্যয়-উপপ্রত্যয়াদি যোগে নতুন শব্দ-সৃষ্টির ক্ষমতা সংস্কৃত এবং গ্রীক-জর্মন ভাষাদিতে বর্তমান; ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাহিসাবে রুশ ভাষাও সে ক্ষমতার অংশীদার। রুশ শব্দ কখনো কখনো দীর্ঘ মনে হতে পারে, তবে জর্মন, গ্রীক ও সংস্কৃতেও তেমন দীর্ঘশব্দাবলী কম নেই। রুশ ধ্বনি সকল সময় লেখরীতির সাথে সামঞ্জস্য রাখে না, ফলে নবিশীদের পক্ষে এ ভাষার আয়ত্তীকরণ খুব কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে, যেমন—সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি গুলো :

/ য্দ্ / [ź d]
/ শ্চ্ / [ś ć]

এ ছাড়া শব্দের আদিতে অবস্থিত যুগ্ম ব্যঞ্জন ক্ন্—[kn], দ্ন্ [dn], য্ন্ [zn], এবং এর তালব্যধ্বনি বা তালব্যীভবনের সূত্রসমূহ। তথাপি এ ভাষা খুবই নমনীয় সুখশ্রাব্য।

ধর্ম-সংস্কারের জন্য কনস্ট্যানটাইনকে সিদ্ধপুরুষ সিরিল্লস (কুরিল্লস) নামে আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। এ নাম থেকেই রুশ অক্ষরের নাম হয় সিরিলিক লিপি। অনেক ক্ষেত্রে লাতিন-রোমান লিপির মতোই গ্রীক বর্ণাদির আকারও একই রকমের হয়, কিন্তু তার ধ্বনি উচ্চারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যেমন /HEPY/শব্দটি নেহরু কথাটা রুশ অক্ষরের হবে [NE (H) RU]। এখানে / 'হ্' / ধ্বনির কোনো লিপি নেই; এবং['x'] অক্ষরটি (পার্শী ['খুদা'] র / 'খ' / এর মতো উচ্চারিত হয়) সেই ধ্বনির জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার [জ] ধ্বনির জন্য, যেমন ইং / j /, সম্মিলিত [dź/dzh] ব্যবহৃত হয় এবং ইংরেজী [ch], [sh], [zh] প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র এক একটি করেই ব্যঞ্জন রয়েছে। / 'জহরলাল' / কে এরা লিখবে [Dzavaxarlal] (এখানে [x]=/ 'খ' / বা / 'হ' /)।

নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে ; অধ্যাপক অশোকাঙ্কুর মুখার্জি, অধ্যাপক ভুবনমোহন অধিকারী, অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ (লেলিনগ্রাদের ছাত্র) এবং ডঃ শরিফ হায়দার চৌধুরী (মস্কো স্টেট-ইউনির্ভারসিটিতে এঁর থিসিস হয়)। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বন্দরে আগত রুশ নৌ-কর্মীদের সাথেও মাঝে মাঝে আলাপের সুযোগ হয়েছে।

অনুবাদে তবু আমার সংকোচ দূর হতে পারেনি। এবং ইতালীয় প্রবাদে আমারও আস্থা, অনুবাদক কখনো বিশ্বস্ত হয় না, বরং অধিক সত্য বলা হয় যদি বলা যায় প্রবঞ্চক—ট্রেটার : 'Traduttore—traditore'। অপর ভাষা সর্বদাই মানুষের কাছে গ্রীক থেকে যায় ; অর্থের হেরফের, উচ্চারণের ভেদ, বর্ণ বা অক্ষরের বৈষম্য প্রভৃতি সেই অবশ্য লঙ্ঘনীয় দুরতিক্রম্য গিরি। সম্ভবতঃ এ জন্যেই জাপানী প্রধানমন্ত্রীর মুখে 'Mokusatsu' উচ্চারণটি মিত্র শক্তির চরমপত্রের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছিল ; বেচারার সময় প্রার্থনা ও 'মূলতবী মন্তব্যের' অর্থ হয়ে দাঁড়ালো নিঃশব্দ মৃত্যুর কামনা। হিরোসিমা-নাগাসিকায় সে ইতিহাস চিরন্তন হয়ে রইল। এই দীর্ঘ ভূমিকার উদ্দেশ্য এ কথাটুকুই সবিনয়ে উল্লেখ করা যে, রুশ ধ্বনি ও ভাষার বাংলা লিপ্যন্তরে এবং অর্থান্তরে আমার শ্রমের বিনিময়েও মিত্র পাঠকের কাছে আমি এক হতভাগ্য সুজুকী। ইতালীয় প্রবাদকে আমি হয়ত বা চরম ভাবেই সত্য প্রমাণিত করলাম। উৎসাহী পাঠকের জন্যে পরিশেষে একটি ক্ষুদ্র নির্দেশপঞ্জী দেওয়া হল।

অনুবাদে ব্যবহৃত চিহ্নাবলীর দায় আমার এবং তার ভিত্তি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়েরই অপর একটি প্রবন্ধ ; আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যবহৃত চিহ্নাবলীর অনুসরণেও এ প্রবন্ধের সহায়তা গ্রহণ করেছি :

'Phonetic Transcriptions in the Historical and Comparative study of Indian Languages'—Suniti Kumar Chatterji.

(Indian Linguistics, Vol. 17 : June 1957, PP. 228-239).

এ ছাড়া সুনীতি বাবুর দেয়া বানানও বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে।

১. ১. ১.

রুশ ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে স্বরধ্বনি এবং ব্যঞ্জনধ্বনির দিক থেকে এ ভাষা অত্যন্ত ধনী। তালব্য ধ্বনির প্রায় সব কটিই এ ভাষায় পাওয়া যায় [Sh, zh, ch, shch, ty, dy, ly, my] এবং স্বরধ্বনি উচ্চারণ, বিশেষতঃ কণ্ঠ্য [i] প্রভৃতি যুক্ত ব্যঞ্জন [/Vstr/, /vstu/, /zdr/] যেমন [Zdravstvuy tye]

প্রভৃতি শব্দে, অঘোষ ব্যঞ্জনাদি (/v/→/f/), সাধারণ ধ্বনি /c/, /n/, /s/, /z/ এবং অর্ধস্বর ধ্বনি ([w]→/v/)-র উচ্চারণ বেশ দুরূহ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। তদুপরি ধ্বনির বিভিন্ন অবস্থানেও (distribution) অতিরিক্ত ধ্বনি ক্রিয়া ও বৈচিত্র্য উৎপাদিত হয়। [1] বা (t) ধ্বনির অন্ত্য অবস্থানিক উচ্চারণ লক্ষ্যণীয়। এ ছাড়া কতক ব্যঞ্জন ধ্বনির মাথায় থাকে নানা রকম ফুটকী বা টান বা অনুরূপ চিহ্ন (বিশেষতঃ c, d, n, r, s, t, z প্রভৃতি মূল বর্ণের ওপরই এ সব লক্ষ্য করা যাবে)। স্বরান্ত বা যুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে (r) উচ্চারণ (উল্লিখিত হুক বা ফুটকী সহ) অনভ্যস্ত ব্যক্তির পক্ষে কষ্টকর মনে হবে।

রুশ ভাষা সিরিলিক লিপিতে লেখা হয়। অবশ্য সব শ্লাব ভাষাই যে একই লিপিতে লেখা হয়, তা নয়। পোলিশ-চেক-শ্লোভাক-ওয়েনডিস প্রভৃতি ভাষার লিপি ভিন্ন। বাইজেন্টাইনের মাধ্যমে যারা খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল, তারাই এক লিপি অনুসরণ করে আসছে অদ্যাবধি। আবার একই লিপি হওয়া সত্ত্বেও শ্লোভানিয়া ও বুলগারিয়ায় সামান্য প্রভেদ দেখা যায়। এই লিপিভেদে নিম্ন উচ্চারণ পার্থক্য এসেছে।

[B]~/v/
[H]~/n/
[P]~/r/
[C]~/s/
[X]~/kh/

রুশ ভাষায় এমন আরো অক্ষর আছে (অঘোষ বা ঘোষ উষ্ম ধ্বনি, প্রশস্ত দন্ত্য ও মধ্য তালুজাত স্থানীয় ধ্বনি সমূহ) যেগুলির প্রতিবর্ণীকরণ বাংলায় অসম্ভব। নিম্নে রুশ স্বর ও ব্যঞ্জনের তালিকা [ধ্বনিতাত্ত্বিক নামকরণে] দেওয়া গেল :

১. ১. ২.

ক. রুশ স্বরধ্বনি :

সম্বৃত—সম্মুখ ; [কেন্দ্রিক] ; পশ্চাৎ।

[কেন্দ্রিক] ধ্বনিটির স্বনির্ভরতা শক্তি অল্প, অনাদ্য অবস্থানে ব্যবহৃত এবং তালব্য ধ্বনিঅন্তর কোনোও ধ্বনিসংযোগে বাক-প্রবাহিক উৎপাদনে লভ্য।

অর্ধবিবৃত—সম্মুখ ; পশ্চাৎ।

আনত, বিবৃত—মধ্য।

উচ্চারণে জিহ্বার স্থান মাত্রের পরিবর্তনেই কেবল এই ধ্বনি সমূহের উচ্চারণ পাওয়া যাবে—এমন ধারণা করলে ভুল হতে পারে, জিভ ও ঠোঁটের কারুকাজ, মুখগহ্বরের নিয়ন্ত্রণ ও স্বরগুণ উৎপাদনের কৌশলও আয়ত্ত করা আবশ্যক। নাসিক্য স্বরধ্বনি পুরোগত, সম্মুখ সংবৃত [ই] এবং অর্ধবিবৃত কেন্দ্রিক [অঁ] প্রাচীন কালে সংরক্ষিত ছিল। লক্ষ্যযোগ্য সংস্কৃতে আনত স্বর পশ্চাৎ স্থানীয়, কেন্দ্রিক স্বরগুলো অর্ধ বিবৃত অথবা অর্ধসংবৃত।

খ. ব্যঞ্জন ধ্বনি :

স্পৃষ্ট—পশ্চাত্তালুজাত ; দন্ত্য ; ওষ্ঠ। } (ঘোষ ও অঘোষ)
উষ্ম—প্রশস্ত দন্ত্য ; দন্ত্য ; দন্তৌষ্ঠ। }
+ পশ্চাত্তালুজাত। (ঘোষ)
+ মধ্য তালুজাত। (অঘোষ)
ঘৃষ্ট—প্রশস্ত দন্ত্য ; দন্ত্য।

চলতি রুশ ভাষায় ঘোষ পশ্চাত্তালুজাত ধ্বনি—১টি ও ঘোষ ধ্বনি—২টি ; মধ্যতালুজাত ঘোষ ধ্বনি—১টি ; প্রশস্ত তালুজাত ঘোষ ধ্বনি—৪টি ও অঘোষ ধ্বনি—২টি ; দন্ত্যঘোষ ধ্বনি—৬টি ও অঘোষ ধ্বনি—২টি ; দন্তৌষ্ঠ্য ঘোষ—১টি ও অঘোষ ধ্বনি—১টি ; ওষ্ঠ্যঘোষ ধ্বনি—২টি ; অঘোষ একটি। তালব্য ধ্বনি বলে যে ধ্বনির উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি মূলতঃ দ্ব্যর্থবোধক এবং 'Guttural' পর্যায়ে ধ্বনিগুলি আসলে বিবিধ ধ্বনি (Palatals, বা তালব্য ধ্বনি, Velars জিহ্বামূলীয়, Labiovelars বা জিহ্বৌষ্ঠ্য ধ্বনি)। এ ধ্বনিরই বিবিধ ব্যবহার ক্রমে শতম ও কেন্তুম গুচ্ছের সৃষ্টি। এ ভাষায় নমন ধ্বনি ও কঠিন ধ্বনির সংখ্যা প্রায় সমান সমান, এর মধ্যে ১২টি বা তার কিছু বেশী ধ্বনির উভপ্রক্রিয়ার উচ্চারণ সম্ভব। এসব ধ্বনির আগে পরে স্বরধ্বনির অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। অঘোষ ও ঘোষ ব্যঞ্জন সমূহের মধ্যে উপরুল্লেখিত ধ্বনির অতিরিক্ত সহধ্বনি বা অতিরিক্ত ধ্বনি মেলে। এ ছাড়া কঠিন ও নমন ধ্বনির সংমিশ্রণে বহুতর বৈচিত্র্যের সৃষ্টি সম্ভব।

গ. অর্ধ ব্যঞ্জন :

নাসিক্য— দন্ত্য (১টি)
+ ওষ্ঠ্য (১টি)
তরল— দন্ত্য (২টি)

১. ১. ৩

শ্লাভ ভাষা-(২৭ কোটি লোকের ভাষা) ভাষীদের মধ্যে ভাষাগত প্রভেদ মূলতঃ অল্প। ইউরোপে IE ভাষার অপর যে কোনো শাখার আন্তঃ ভাষাগুলির মধ্যে যত প্রভেদ, শ্লাভ শাখার ভাষাগুলির মধ্যে তত নয়। ইতালীয়, স্পেনিশ, বা পর্তুগীজ ভাষাভাষীগণ অথবা জার্মন, হল্যাণ্ডীয়, সুইডিশ ও ইংরেজী ভাষাভাষীগণ কিছুটা ভাষা জ্ঞান না থাকলে পরস্পরকে বুঝতেই পারবেন না। কিন্তু—রুশ, পোলিশ, চেক, যুগোশ্লাভিয় ভাষাভাষীদের সে সমস্যা নেই; এদের ভাষা ব্যবহারের প্রভেদ বড় জোর এই রকম :

জমি~রু. / জ্যিমিয়া
পো. / জেমি
চে. / জেমল্যা
সা-ক্রো / জেমীয়া

একটি বাক্যের বিভিন্ন ভাষার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যেতে পারে :

চেক্. Ano, matko, man tri.
পোল. Tak, matko, man trzy.
বুল. Da, maika, imom tri.
রুশ. Da, matji, u menja' tri.

কিন্তু—

ইতা. Si, madre, ce n'ho tre.
ফ্রা. Oui, me're, j'en ai trois.
স্পে. Si, madre, ('yo) tengo tres.
রুমা. Da, mama, mea, en am trei.

এবং—

ই. Yes, mother, I have three.
জর্ম. Ja, mutter, ich habe drei.
ডাচ. Ja, moeder, ik heb drie.
সুই. Ja, moder, jag har tri.

তবু রুশ ভাষা ও সোভিয়েৎস্কি এক ভাষা নয় এবং সরকারও সবাইকে রুশ বলতে বাধ্য করেন নি। মোটামুটি ১৪৫ বা তদধিক ভাষায় সোভিয়েৎ ইউনিয়নের ২৩০ মিলিয়ন লোক কথা বলে। সোভিয়েতে রুশ ভাষায় বহু বিদেশী

শব্দের ভিড় (এজেণ্ট, ব্যাঙ্ক, ডিপ্লোম্যাট, ট্যাঙ্ক, পাইলট, জেনারেল, মটর, অটোমবলি, পাসপোর্ট, টেলিফোন, জর্ণাল, সিগারা, ক্লাশ, প্রফেসর, ক্লাব—Klub, ক্যানেল—Kanal, যেন্ত ইত্যাদি। আর আছে, ইনঝেনিয়র (ইনজিনিয়র), গসপিতাল (হসপিটাল), বুউল্লেটেন (বুলেটিন) সখর (সুগার) প্রভৃতি জাতীয় শব্দ) লক্ষ্যযোগ্য।

১. ১.৪

রুশ প্রভৃতি ভাষার মূল যে বাল্‌টো-শ্লাব (শ্লাব ভাষার সাথে বাল্‌টিক ভাষাগুলিও এ সূত্রে একত্র করা হয়, যেমন আমাদের ক্ষেত্রে ইন্দো-ইরাণীয় হয়েছে) তার মধ্যে গ্রীক-লাতিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সাথে অধিক মেলে বাল্‌টিক ভাষার বিশেষতঃ সংস্কৃত প্রভৃতির সাথে লিথুয়ানিয়র মিল প্রায় আশ্চর্যজনক। পী বলেন (১৯৬৬):

> 'Lithuanian enjoys distinction of being described by linguists as a modern tongue which comes closest to the original Indo-European of all the modern languages of the group. It retains practically all of the Indo-European inflections, and a measure of the old Indo-European pitch accent.'
> (P. 350).

এবং ড. তারাপরওয়ালা উল্লেখ করেন,

> 'Lithuanian represents the most archaic type. Among other things it preserves the ancient pitch or musical accent, which was used in Vedic Sanskrit and in ancient Greek'.
> (P. 303)

বাল্‌টো-শ্লাব ভাষাগুলির মধ্যে একমাত্র বুলগারিয়ই এখন প্রায় গোত্রচ্যুত হবার পথে ; বাংলা-ইংরেজীর মতো এ ভাষায় অন্য ভাষার প্রভাব যথেষ্ট, এবং প্রকৃতিগত ভাবে তা Analytical 3। আসলে শ্লাব ভাষা সংশ্লেষণ মূলক ভাষা। পী তাই বলেন, The Process of transition from a synthetic to an analytical structure, so apparent in other two great western groups of Indo-European, is largely nonexistent in slavic.' (P. 339) বুলগারিয় তার ব্যতিক্রম মাত্র (তারাপরওয়ালা : ৩০৪)

১. ১. ৫

ব্যাকরণের দিক থেকে যে বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে পড়বে, সে হচ্ছে :

ক. রুশ ভাষার ইংরেজীর মতো বর্তমান কালে 'to be' ক্রিয়ার কোনো রূপ গ্রহণ করে না ; প্রায় বাংলাতে যেমন। অর্থাৎ 'আমি হই' (I am) না বলে শুধু 'আমি' বললেই চলে। সুনীতি বাবু অবশ্য দেখিয়েছেন [ya esm (I am] [ty esi (thou art)],—এ রকম ব্যবহার আধুনিক রুশে অবশ্য নেই, হয় না।

খ. রুশ ভাষায় দ্বি-বচন (পীঃ-৩৬০), কারক-বিভক্তি, অতীত কালের জন্য নতুন ক্রিয়া, ধাতু সংযোজন রীতি ও লিঙ্গ ভেদ (পি. সি. মজুমদার, ১৩৭৮ : ১৫-১৬ ; ৩৩), প্রভৃতিতে অতীতের রূপ প্রায় সংরক্ষিত। তবে ভাষার প্রাচীনতম (তারকা চিহ্নিত ভাষা রূপের) কালে ভাষাতাত্ত্বিকগণ লিঙ্গ ভেদ দেখান নি ; অনুমান করা হয়, ক্লীবের বহুবচনের রূপান্তরে স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতি এসেছে। মূল ভাষায় কালও সময়জ্ঞাপক ছিল না। (তুং. সুনীতি বাবুর মত, বর্তমান প্রবন্ধ), কারক সংখ্যা প্রায় সংস্কৃতের অনুরূপ (কেবল আর্মেনীয়, আলবানীয় ও তুখারিয়-তে কারকের সংখ্যা একেবার নগণ্য দেখা যায়, এবং বুলগারিয়তে মাত্র একটি।) টানা স্বর ও ঝোঁকের চাইতে শ্বাসাঘাতে প্রাধান্য আছে [বিভিন্ন উপ-ভাষায় অবশ্য ভিন্নতা দেখা যায়]।

১. ১. ৬

রুশ ভাষার সাথে সংস্কৃতের এবং বিশেষতঃ বাংলা ভাষার মিল সন্ধান করেছেন ডঃ সুনীতিকুমার, এটি যে কোনো পাঠককেই কৌতূহলী করবে ; অনুরূপ আলোচনা বাংলায় কেন, অপর ভাষাতেও আমাদের দেশে ইতোপূর্বে হয় নি। সুলভ ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থগুলি একচক্ষু হরিণের মতো। কিন্তু মূল ধ্বনির প্রতিবর্ণীকরণ লেখক যে ভাবে করেছেন, বাংলায় তা আনা অসম্ভব। এরজন্য আমাকে বিকল্প ব্যবস্থা নিতে হয়েছে এবং প্রতি মুহূর্ত P. Lehman-এর এই রকম ভাষাতাত্ত্বিক কিছু প্রবন্ধের অনুবাদের সমালোচনায় জর্জ লেন (১৯৬৯) যা বলেছিলেন আমার তা মনে পড়ে গিয়ে সংকোচ বোধ করেছি : তিনি ল্যেহ্‌ম্যানের পরিকল্পনা ও অনুবাদের প্রশংসা করা সত্ত্বেও পাঠকের উপকার অনুভব করেছেন মূলের পুনঃপ্রকাশে ও তৎসহ টীকা / ভূমিকার সংযোজনে। অনুবাদের ভিন্ন উপকার কিংবা স্বাদ তিনি পাননি। সেক্ষেত্রে পাঠকের তৃষ্ণা জাগানোটুকুই আমার এখানে উদ্দেশ্য ; এবং লক্ষ্য।

১.২.১

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ আবশ্যক যে, পাশ্চাত্য দেশে প্রাচীন ভাষাগুলির প্রতি আবার একটু লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে (আমাদের দেশে অনুরূপ অনুরাগ কখনো জন্মাতে পারেনি)। অ্যাংলো-সেক্সন পূর্ব ব্রিটানিকের ওয়েল্‌শ্‌ ও ব্রিটন প্রভৃতির পুনরাবিষ্কার বা তৎবিষয়ক নতুন তথ্যাদি সন্ধানের চেষ্টা চলছে ; তেমনি হিব্রুর পঠন-পাঠন নির্ধারণে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের গন্ধ পেয়েছেন অনেকে। জুনিয়র গ্রীসন তাঁর Genetic Relationship Among Languages প্রভৃতি আলোচনায় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের আধুনিক গুরুত্বটি দেখিয়ে দেওয়ায় লুপ্ত ভাষাগুলির বা সনাতন ভাষাগুলির সাহায্যে তৌলন পদ্ধতির আলোচনায় উৎসাহ বেড়েছে দ্বিগুণ।

এ্যালেন, Henry Hoenigswald প্রভৃতিদের ইদানিংকার কাজেও তা উপলব্ধ। সংস্কৃতের প্রতি অথবা EI ভাষার প্রাচীন নমুনার জন্য প্রাচীন ভারতীয় ভাষা পুনর্গঠন বা আবিষ্কারের প্রতি ঝোঁক ও তদবিষয়ক নতুন নতুন চিন্তা হওয়া আবশ্যক—কেবলমাত্র ডঃ শহীদুল্লাহ বা সুনীতি বাবুকে বরাত দিয়ে সব উৎরানো উচিৎ হবে না।

ভারতের রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, ডঃ সিদ্ধেশ্বর বর্মণ, ডঃ বেনারসী দাস জৈন, ডঃ পি. এস. শুভ্রমাণ্য শাস্ত্রী, ডঃ টি. পি. মীনাক্ষী সুন্দরম পিল্লাই, বটকৃষ্ণ ঘোষ, রামস্বামী আয়্যার, জি. ভি. রামমূর্তি, সৈয়দ মহীউদ্দিন কাদরি ঝোর, জি. গোণ্ডা, ডঃ তারাপরওয়ালা, জি. ভি. টাগারে, কাত্রে, হাজরা, ঘাটেজ ; আসাম বা গৌহাটিতে বাণীকান্ত কাকতি ও ডঃ এস. বিশ্বাস ; পশ্চিমবঙ্গে শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্রীসুকুমার সেন, পি. সি. মজুমদার প্রভৃতি গবেষকবৃন্দের যে সব অবদানে ভাষাতত্ত্বের এই বিশেষ শাখাটি সমৃদ্ধ হয়েছে (ষন্মুগম পিল্লাই, খুব্‌ চান্দানী, কেলকার, বিল্বগিরি বাঙ্গালোরের পট্টনায়ক, দিল্লীর দাশোয়ানী, পি. বি. পণ্ডিত বা শর্মা প্রভৃতি ভিন্নধারার ভাষাতাত্ত্বিকগণের কথা বাদ দিয়েও) তাতে এর মূল্য বা গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট। তদুপরি আছে ভারত-প্রবাসী বিদেশী পণ্ডিতবর্গ ও অন্যান্য বিদেশী ভারতপথিক, ম্যাক্সমূলার থেকে ম্যাকডোনাল্ড, গ্রীয়ার্সন থেকে বীম্‌স, ব্লচ থেকে লেভি ; রাশিয়ার নভোকভ্‌ থেকে ওলগা আথমানোভা, অথবা মার্কিনী পণ্ডিত এ্যালেন কীলার (১৯৭২) থেকে গার্লাণ্ড ক্যানন (উইলিয়াম জোনস্‌ সম্পর্কিত কাজের জন্য বিখ্যাত), লে. উইলফোর্ড, ম্যারো ইমেন্থ, হ্যারিস—প্রভৃতি [বলা বাহুল্য এটা তালিকা নির্ণয় নয়, সীমানার

দিঙ্‌নির্ণয়ন চেষ্টা মাত্র; এবং নামোল্লেখ স্বেচ্ছাচারিতাচ্ছন্ন] এবং তাদের ১৯ শতকীয় ও বিশ শতকের প্রথম দিকের পূর্বসূরীগণ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব পঠন-পাঠনের নতুন দিগন্তের সন্ধান জানিয়েছেন। [এ ক্ষেত্রে সুনীতি বাবুর সমগ্র কর্ম সম্পর্কে আগ্রহীদের First All India Conference of Linguistics. (Poona, 1970) এ তাঁর 'সভাপতির অভিভাষণ' এবং মৎ সম্পাদিত 'নিসর্গ'। ভাষাতত্ত্ব সংখ্যা : ১৩৮০ দেখতে অনুরোধ জানাই।] সুনীতি বাবুর প্রধান কয়েকটি কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

1. The Origin and Development of the Bengali Language.
   George Allen & Unwin, London,
   Vols. I, II, [1971] & III [1972].
2. A Bengali Phonetic Reader
   University of London Press, 1928.
3. Indo-Arayn and Hindi
   Farma K. L. Mukhopadhyay, Cal. 1969
4. Scientific and Technical Terms in Modern Indian Languages. Vidyodoy Library, Cal. 1953.
5. Phonetics in the study of classical Languages in the East. University of Bangalore, 1967.

এ ছাড়া আছে তাঁর একাধিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা-সঙ্কলন ('Selected papers')।

বর্তমান প্রবন্ধটি একটি সাধারণ আলোচনা মাত্র, তবু সাধারণ পাঠক এমনকি বিশেষজ্ঞগণও যে কারণে কৌতূহলী হন, সে গুণ বর্তমান। রুশ ও সংস্কৃত বা ভারত-বাংলা উপমহাদেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন ও তুলনার এবং তদবিষয়ে সঠিক পথটি নির্ধারণে এ প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। এবং একটি ক্ষুদ্রাকৃতি প্রবন্ধে এই একাধিক গুরুত্ব নির্মাণ তাৎপর্যপূর্ণ।

১. ২. ২

কোনো তন্নিষ্ঠরচনারই ফলশ্রুতি অসন্দিগ্ধ সর্বশেষ সিদ্ধান্ত স্থাপনে নয়; শেষ কথা বলার দাবী কারো থাকে না। ভাষাতত্ত্বের মতো বিষয়ে সে কথা আরো খাটে। এখানে বিভিন্ন জনের মতভেদ অবশ্য স্বীকার্য এবং একাধিক দৃষ্টি কোণে, অভিজ্ঞতায় ও তাৎপর্য অনুধাবনের তাৎক্ষণিক গুরুত্বে সে মতামত বৈচিত্র্য আনে। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ১০টি শাখার কথা এখন সকলেই উল্লেখ

করছেন, ডঃ শহীদুল্লাহ ইতালো-কেলটিক একটি ভাষা মনে করেন বলে তাই ৯টি শাখার উল্লেখ করেন ; সুনীতি বাবু ৮টি। পার্থক্য এই, সুনীতি বাবু হিত্তী এবং মিতান্নী প্রভৃতি ভাষাগুলিকে মূল ভাষার শ্রেণীভাগের কালে উল্লেখে বিরত হয়েছেন। অনেকের মতে হিত্তী ভাষা IE-র ভগিনী স্থানীয়, সন্ততি নয়। এ ভাষা আরো প্রাচীন।

সুনীতি বাবু IE ভাষার আদি ভূমি, কাল ও মানুষ সম্পর্কে একটি মত উপস্থিত করেছেন,,

— 'Some 3,500 years ago there was a single speech spoken—according to the latest view, some where in the dry grass-lands to the south of the Ural Mountains in Russia—by a race of people called by anthropologists the Nordies.. to which the name 'Primitive Indo-European' has been given.'

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্তে বলেছেন (পৃঃ ২৩),

'আজ হইতে ন্যূনাধিক ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্বে এক জাতি ইউরোপের মধ্যভাগ হইতে দক্ষিণ পূর্বাংশ ভূভাগে বাস করিত এবং তাহারা মোটামুটি একই ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করিত। এই ভাষাকে আমরা হিন্দ-য়ুরোপায়ণ মূল ভাষা বলিব।'

মূল IE ভাষাভাষীদের আদি বাসভূমি সম্পর্কে ম্যাক্সমূলারের অভিমত ছিল পামীরে, ডঃ লাথামের মতে স্ক্যাণ্ডিনাভিয়ায়, গিলেসের মতে হাঙ্গেরী, জর্মন পণ্ডিতদের মতে উত্তর জর্মানী, শ্লাভভাষী পণ্ডিতদের মতে পোলাণ্ড প্রভৃতি। ভারতীয় ভাষাবিদগণের মধ্যে বালগঙ্গাধর তিলকের মতে উত্তর মেরু, রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্ত শাস্ত্রীর মতে মধ্যভারত ('The Earliest Abode of the Aryas,' Calcutta Review, Aug ; Dec. 1963.)। পরেশচন্দ্র মজুমদার উল্লেখ করেন,

'খৃঃ পূঃ প্রায় ২৫০০/৩০০০ বছর আগে মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার যৌবন পর্ব। ...মূল ইন্দোইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর আদিম অধিষ্ঠান এশিয়াতেই—এই মতবাদ নতুন করে ভেবে দেখা হচ্ছে। পূর্বে পণ্ডিত সমাজ রায় দিতেন—ইউরোপের অঞ্চল বিশেষই মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আদিম পীঠস্থান।'

এ বিষয়ে ব্রাণ্ডেনস্টেইন, শ্রড্যোর প্রভৃতি মনীষীদেরও মত সুবিবেচ্য। তবে ডঃ তারাপুরওয়ালার কৃষ্ট উক্তি এ ক্ষেত্রে আমরা স্মরণ করিতে পারি যে 'Each

different homeland was arrived at by reason of the languages with which the scholar was best acquainted.'

২. ০

সাধারণ পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টিতে কয়েকটি জিনিষ ধরা পড়বে, এখানে তার উল্লেখ করা গেল।

(ক) যে সব শব্দাবলীর ভিত্তিতে রুশ ও সংস্কৃতের তুলনা করা হয়েছে, সে সব শব্দ বর্তমান অভিধান বহির্ভূত, অপ্রচল এবং তার উচ্চারণও এখন ভিন্ন। [দুই] কে স্বচ্ছন্দে তিনি /দ্বি/ দিতে পারতেন, [দ্বৌ] দেওয়ার আবশ্যক হতো না ; কিন্তু যে স্তরের তুলনা হচ্ছে, সেখানে /দ্বৌ/ উচ্চারণটিই যে অধিক সঙ্গত এইটি তিনি কোথাও ধরিয়ে দেন নি বলে এ সংশয় থাকা স্বাভাবিক। লক্ষ্যযোগ্য, তাঁর ব্যাকরণে [ভা. প্র. বা. ব্য. দ্বি-সং. পৃঃ ৩১৫] সংখ্যা বাচক শব্দ তালিকায় এ শব্দটি নেই। প্রকৃতপক্ষে এটি কারক বিভক্তিযুক্ত ও লিঙ্গান্ত পদ। ডঃ সুকুমার সেন (১৯৭১) দ্রষ্টব্য : কর্তা/কর্ম—পুং লিঙ্গের মূল শব্দ—দ্বৌ (পৃঃ ১৩৪)। প্রাকৃতে [দো/দু]। এর কোনো অপভ্রংশ রূপ পাওয়া যায় নি। স্ত্রীলিঙ্গে বা ক্লীব লিঙ্গে [দ্বে]। বৈদিক উচ্চারণ /দ্বুবে/।

(খ) অপ্রচলিত অন্যান্য শব্দের, যেগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তাদের, একটি তালিকা এ ভাবে নির্মাণ করলাম :

এসমি / য়েসমি [esmi]>ইয়েস্‌ম্

এস্তে [est]>ইয়েস্তে

ওনি [oni]>আনি

তি য়োসি [ty esi]. —

(গ) কতক শব্দের একই উচ্চারণ রুশে পাওয়া যায়, যেমন [দেবর] প্রভৃতি ; তেমনি (আগো (ই) ন) স্থলে /অগ্নি/-ও এরা ব্যবহার করেন। চট্টগ্রামে রুশ নৌ-কর্মচারীদের মুখে জেনেছি জর্জিয়া বা তাশখন্দ প্রভৃতি অঞ্চলে এ শব্দ বহুল ব্যবহৃত।

(ঘ) ডঃ চট্টোপাধ্যায় স্ত্রীলিঙ্গ বাচক [গিরি] শব্দের পূর্বে [(চ) সিয়ারি] ব্যবহার করেছেন। /সি [চি] ওর্না (ই) য়া/ (F) অথবা /চিত্তর্

নিয়ে (PL) ব্যবহার করলেন না কেন বোঝা যায় না। এখানে (F) স্ত্রীলিঙ্গ বাচক ও (PL) বহুবচনের রূপ।

(ঙ) (সৃভেৎ) শব্দটি সং. (শ্বেত)-শব্দের সমার্থক দেখানো হয়েছে। শব্দটির অর্থ সুনীতি বাবু একবার (light) এবং আর একবার (bright) বলেছেন। আমি পরবর্তী অর্থে /স্বচ্ছ/ ব্যবহার করেছি কেননা তা 'উজ্জ্বল' ও 'শুভ্রতা'-র মাঝামাঝি বা মিশ্র।

নির্দেশপঞ্জী

ক.] ১। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : Balts and Aryans. Indian Institute of Advanced Study, Simla, 1968.

২। ঐ : Indo-Aryan and Hindi, Cal. 1969.

৩। ডঃ তারাপরওয়ালা : Elements of the Science of Language. Calcutta University, 3rd Ed., 1962.

৪। ডঃ পরেশচন্দ্র মজুমদার : সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ। সারস্বত লাইব্রেরী, কলি., ১৯৭১

৫। Mario Pei : The Story of Language
George Allen & Unwin, London, 1966

৬। L. H. Gray : Foundations of Language.
New York, 1958.

৭। Bloomfield : Language,
George Allen & Unwin, London, 1934

নিম্নলিখিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলীর প্রতিও পাঠকের উৎসুক দৃষ্টি কামনা করি :

খ.] ৮। J. Thomas Shaw : The transliteration of Modern Russian for English-Language Publications ; London 1967.

৯। Robert Auty, J. L. I. Fennel & J. S. G. Simmons (Ed.) ; Oxford Slavonic Papers ; New Series, Oxford, 1968.

[উপরোক্ত গ্রন্থ দুটিতে 'The Slovo O Polku Igoreve' এর পূর্বসূত্র নির্দেশ মিলবে। প্রাচীন রুশ সাহিত্যের জন্য ভিন্ন বই দেখতে হবে।]

১০। Dean S. worth, Andrew S. Kozak & Donald B. Johnson : Russian Derivational Dictionary ; New York, 1970.

১১। John Greer Nicholson : Russian Normative Stress Notation ; Montreal, 1968.

১২। Entwistle, William J., and W. A. Morison : Russian and the Slavonic Languages ; 2nd Ed. Barnes & Noble ; 1964.

১৩। G. L. Trager : Old church Slavonic Kiev fragment ; Kirans, 1933.

১৪। Mario A. Pei : The world's Chief Languages ; London 1961 (Chapter X & XI)

গ.] Journal of Linguistics (C U P)-এ H. Andersons, J. Miller, T. M. Lightner প্রভৃতি গবেষকবৃন্দের আলোচনা সমূহ লক্ষ্য করুন।

দ্রষ্টব্য : Vol. 4. No. 1. Ap. 1968 / Vol. 5. No. 1. Ap. 1969 / Vol. 7. No. 1. Ap. 1971 / Vol. 8. No. 2. Sep. 1972 প্রভৃতি।

১৫। New Indo-Aryan and Modern Slavonic. Some points of parallel Development—V. Poriz'ka, Indian Linguistics. Vol. 21 (1960) Pp. 112-115.

১৬। The Slavic and East European Journnl ; University of Wiscongin Press for Aatscel. (বিশেষতঃ Summer এবং Fall-এর সংখ্যা সমূহ, 1969)।

[১৯৫৫ সালের ২৯শে নভেম্বর 'দি স্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় Sanskrit and Russian : A comparison নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনিরুজ্জামান ঐ প্রবন্ধটি বাঙলায় টীকাসহ অনুবাদ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'সাহিত্যিকী' থেকে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রণ করা হল। —সম্পাদক]

কলকাতায় চ্যাটার্জিকে দেখলাম

ফোস্‌কো মারাইনি

ভারতের মানবিকী বিদ্যার জাতীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৬শে নভেম্বর ৮৫ বৎসরে পদার্পণ করলেন। আমরা তাঁর শতাধিক বর্ষের পরমায়ু কামনা করে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার নিদর্শন রূপে এই প্রবন্ধটি ছাপছি। প্রবন্ধটি ফোস্‌কো মারাইনির বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিক্রেট টিবেট'-এর অংশবিশেষ। মারাইনি ইতালীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ গিউসেপ্পে তুচির শিষ্য, ইনি গত মহাযুদ্ধের কয়েক বছর পরে তুচির শেষ তিব্বত-যাত্রায় তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। এই প্রবন্ধে মারাইনি কলকাতায় শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকারের একটি অনবদ্য বিবরণ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত একটি কথা বলা প্রয়োজন: কলিকাতা শহর সম্পর্কে মারাইনির অনুভব খুবই আংশিক এবং একজন বিদেশীর পক্ষে কয়েকদিনে এই শহরকে বুঝে ওঠা সম্ভবও না। বলা বাহুল্য, এই রচনার ঐ অংশগুলি পড়ার সময় পাঠকমাত্রেই এই কথা মনে রাখবেন। —সম্পাদক

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন ভারতীয় নগরীগুলির মধ্যে কলকাতার বরাবরই একটা বিশেষ ধরনের গুরুত্ব ছিল। ইংরেজরা কলকাতায় যেত রাতারাতি বড়লোক হবার দুরাকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এদিক দিয়ে বম্বের সঙ্গে কলকাতার একটা পার্থক্য আছে। বম্বে, বলতে গেলে, কিছুটা অল্পেতুষ্ট ইংরেজদের শান্ত জীবনের আবাস হয়েছে। কিন্তু কলকাতা এর বিপরীত, এর জীবন ঠিক ছকে বাঁধা নয়—জীবন এখানে আবর্তময়, এর পদে পদে অভাবিত রহস্য। বম্বের বৈশিষ্ট্য, বম্বে গড়ে উঠেছিল পোর্টরূপে; আর কলকাতার বৈশিষ্ট্য তা গড়ে উঠেছিল ফোর্টরূপে। অনেক ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যভিচার ও নীতিহীনতার সাক্ষী এই কলকাতা। উপনিবেশের জন্য যুদ্ধে কিংবা শাসন চালনায় ইংরেজের হিংস্রতার তুলনা নেই. কিন্তু ইংরেজ চরিত্রে কপটতা বড় একটা কখনো ছিল না; এই কুটিলা নগরী কলকাতা ইংরেজকে জালিয়াতিতে

পাকা করেছে। ক্লাইভ যখন মীরজাফরের সঙ্গে চুক্তি করে, তখন দেশী রাজাদের ধোঁকা দেবার জন্য দুটো দলিল তৈরি হয়েছিল—একটা খাঁটি, আর একটা মিথ্যা। এমনি হল কলকাতার স্থান মাহাত্ম্য, এই সৌধনগরীর ভিত্তি রচনা করেছে শঠতা।

ভৌগোলিক দিক থেকে কলকাতা নিম্নগঙ্গার জলাভূমির উপর গড়ে উঠেছে। কোনো আদিম যুগে এ অঞ্চল গ্রীষ্মমণ্ডলের নিবিড় অরণ্যে আবৃত ছিল। নিরবচ্ছিন্ন ক্ষয় ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এই অরণ্যের নিত্য রূপান্তর হয়েছে। যখনই কোনো বনস্পতির মৃত্যু হয়েছে, জলে কাদায় তা পচতে আরম্ভ করেছে—তখন তার দেহের উপর জন্মেছে অজস্র কীট, অজস্র ছত্রাক। এ ভাবে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তের মধ্য দিয়ে একটা জৈব ধারা আত্মবিকাশ করে চলেছে। অধুনাকালের জীবজন্তু আর ফলপুষ্পের বিচিত্র বর্ণে এই প্রাণেরই অফুরন্ত প্রকাশ। আজ অরণ্য দূরে সরে গেছে, কিন্তু মানুষ তাকে পরাজিত করতে পারে নি।

এই প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বুদ্ধিমান, রূপবোধসম্পন্ন, কল্পনাপ্রবণ, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, চিন্তাশীল এবং মেধাবী বাঙালী জাতির মধ্যে পরবর্তীকালের হিন্দু-ধর্মের নানা জটিল ভাবধারা আশ্রয় পেয়েছেঃ নারীশক্তির পূজা, তুকতাক ও তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস, যোগের সঙ্গে যৌনতার মিশ্রণ, ক্রুদ্ধ শক্তিকে প্রসন্ন করার জন্য নিষ্ঠুর পশুবলি, এসব বাঙালীর ধর্মাচরণের অঙ্গ। এ যেন সেই প্রাচীন যুগের আদিম অরণ্য, যাকে মানুষ ধীরে ধীরে পরাভূত করেছে, অথচ যা গোপনে পূর্বের চেয়ে সহস্র গুণ গভীর আর ব্যাপক ভাবে তাদের ধর্মচিন্তায়, ঈশ্বরবিশ্বাসে পুনরাবির্ভূত হয়েছে। পৃথিবীতে এমন আর কোনো নগরী নেই যেখানে কলকাতার মতো এমন গভীর অরণ্যকতা রয়েছে—কলকাতা দাঁত আর থাবা উদ্যত করা একটা হিংস্র নগরী, কলকাতা অত্যাচার আর অবিচারের নগরী, কলকাতা বেদনার আর দুঃখের নগরী, কলকাতা পাপ আর সন্ন্যাসের নগরী। কলকাতার বায়ুমণ্ডলে এই অদৃশ্য অথচ অত্যন্ত স্পষ্ট ও নিশ্চিত এই লক্ষণটি অনুভব করা যায়। এই নগরীর লৌহলোষ্ট্রকাষ্ঠের ইমারত, তার কংক্রিট-অ্যাসফল্টের রাস্তা এবং দিক্‌দিগন্তমুখী লৌহবর্ত্মের তলায় সেই আদিম অরণ্য গর্জন করছে, সাপ বিচরণ করছে এবং অরণ্যের রহস্যময় সবুজের সমারোহ তাকে ঘিরে রয়েছে।

সকাল বেলা পিয়েরো আর আমি আমাদের তিব্বত যাত্রার উপাযাগী কিছু জিনিসপত্র কিনতে বেরিয়ে পড়লাম। কলকাতার বড় হোটেল গ্রেট ইস্টার্ন,

অবশ্য ইস্টার্ন সে খুবই, কিন্তু গ্রেট তেমন কিছু নয়। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের সদর দরজাটি এসে পড়েছে নোংরা একটি রাস্তার উপর—ট্রামের ঝর ঝর শব্দে কানে তালা লাগাবার উপায়—রাস্তা দিয়ে হরেক রকমের লোক যাচ্ছে। একটি ছোকরা আমাদের দিকে এগিয়ে এল, সে কি বলতে চায় আমরা জানতাম; কিন্তু তাকে হটিয়ে দিয়ে লাভ হতো না, কাছেই তার চেয়েও দৃঢ় সঙ্কল্পবান আর একজন দাঁড়িয়ে ছিল—'নো ওয়াণ্ট, গার্ল? পারহ্যাপস্ ওয়াণ্ট, বয়, ফর ম্যাসেজ? পালাবার উপায় জুটে গেল, পড়িমরি করে সৌম্যদর্শন শ্মশ্রুবান এক শিখের ট্যাক্সির ভিতরে লাফিয়ে পড়লাম।

কলকাতার সব ট্যাক্সি ড্রাইভারই শিখ কেন আমি জানি না। আধুনিক যুগ স্বাতন্ত্র্যবাদের যুগ কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে দেখা যায়, নানা জাতের লোক বেশ মিলেমিশে বাস করছে। শিখেরা ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী—কলকাতার জনতার ঘন অরণ্যের মধ্যে শিখেরা দৃঢ় এবং নির্ভরযোগ্য পাহাড়ের মতো। এরা সব সময়ই পাগড়ি পরে তার রঙ প্রায়শঃ ফিকে, প্যাস্টেলের কোমল টানের মতো। এদের দেখায় অনেকটা ওল্ড টেস্টামেণ্টের সাধুসন্তদের মতো, পাগড়ির প্যাস্টেল রঙটা সেখানে কিছুটা বেমক্কা দেখায়। শিখদের দাড়ি কামাতে নেই—সকলেরই একগাল দাড়ি, যৌবনে কুচকুচে কালো, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সাদা হতে হতে একাবারে ধবধবে সাদা।

ওল্ড টেস্টামেণ্টের সন্তপুরুষ আমাদের নিয়ে গেলেন পার্ক স্ট্রীটে কোডাকের দোকানে। গোটা কলকাতাকে মরুভূমি বললে পার্ক স্ট্রীটকে বলতে হবে তার ওয়েসিস—চমৎকার কয়েকটি দোকান আছে। সেখানে, রাস্তায় আয়ারা সাদা বাচ্চাদের ঠেলাগাড়িতে করে টইল দিতে বেরিয়েছে। পার্ক স্ট্রীটের এই প্রশস্ততা বা পরিচ্ছন্নতা কলকাতার আসল জিনিস নয়—একটু এগিয়ে নিউ মার্কেটের দিকে যাও, দেখবে, নির্লজ্জ সমৃদ্ধির সঙ্গে নিষ্করুণ দারিদ্র্য কি রকম ভাবে পাশাপাশি রয়েছে। যতই এগোও, দেখবে ভয়াল ব্যাধিগ্রস্ত সব মানুষ, দেখবে কী কুৎসিৎ অভিনয় করে ভিক্ষুকেরা তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আজ সকালেই কলকাতার প্রধান সড়ক চৌরঙ্গীতে প্রায় ন্যাংটা একটা ভিক্ষুককে দেখলাম। তার হাত নেই, পা দুটিও হয়ত অসাড়—লোকটা ফুটপাতের উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। রাস্তার পানের পিকে তার বুক পেট পিঠ ও পায়ে লাল ছাপ ছাপ হয়ে গেছে—দূর হতে দেখলে মনে হয় সর্বাঙ্গে ক্ষতগ্রস্ত একটা মানুষ যেন রক্ত জবজব করা শরীর গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। তার সঙ্গে ছিল

একটি মেয়ে, নয় দশ বছর বয়স, সম্পূর্ণ উলঙ্গ আর অবর্ণনীয় ভাবে কুৎসিৎ। মেয়েটার হাতে ভিক্ষা নেবার একটা টিনের চোঙা, কখনো সে ভিক্ষুকটার সামনে আসছে, কখনো পেছনে। ওরা দুজনে একটা গান, বরং বলা ভালো চীৎকার করছিল। গানের কলিগুলো সব এক রকমের—মন্থর, একঘেয়ে, তবু তাতে কেমন একটা সুর ছিল, যা মনকে ভয়ার্ত এবং অবসন্ন করে তুলছিল। পাশের দোকান থেকে একজদ সুবেশিনী দীর্ঘাঙ্গী মহিলা হাতে একটা কাঠের খেলনা ঘোড়া নিয়ে রাস্তায় নেমে এসে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

এই রোগ, আবর্জনা, পাপ, মালিন্য, ঐশ্বর্য, দারিদ্র্য ও নিষ্ঠুর বলিপ্রথার মধ্যে, এই মৃত্যু, নৃত্য ও মহামারীর সংসারে কলকাতায় চিরায়ত জ্ঞানের উজ্জ্বল ধারাটি কিন্তু স্বাভাবিকভাবে, হয়ত বা অবশ্যম্ভাবী ভাবেই বয়ে চলেছে। আমি এ বিষয়ে কলকাতার চমৎকার মিউজিয়মের কথা, তার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কথা, তার আধুনিক চিকিৎসাসমন্বিত হাসপাতালগুলোর কথা, বা তার আশ্চর্য বোটানিক্যাল গার্ডেনের কথা বলব না—আমি শুধু চ্যাটার্জির সঙ্গে আমার একদিন মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হবার যে সৌভাগ্য হয়েছিল সেই কথাটিই বলব। চ্যাটার্জি বাঙালী, তুচির অনেকে দিনের বন্ধু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভাষাতত্ত্ব পড়ান। চ্যাটার্জির বয়স পঞ্চাশ হবে, লম্বাও নন, খাটোও নন, জোয়ান না হয়েও বেশ শক্তসমর্থ—রঙ ময়লা, চুল ঘন কালো। চ্যাটার্জি ভারতীয় পোশাক পরেন, চোখে চশমা আছে। তাঁর চওড়া কপাল ও বুদ্ধিদীপ্ত চোখ যে কোনো দর্শককে নিমেষে আকৃষ্ট করবে। চ্যাটার্জির সর্বাবয়বে একটা অপূর্ব প্রসন্নতা আছে, যা বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষেই মাত্র সম্ভব। চ্যাটার্জি যখন এলেন তখন তুচি বাইরে ছিলেন, সুতরাং আমিই তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম, এবং হোটেলের লাউঞ্জে নিয়ে গিয়ে বসলাম।

ইংরাজিতে চ্যাটার্জির আশ্চর্য রকমের দখল। তা ছাড়া আজীবন তিনি মানবিকী বিদ্যার চর্চা করেছেন। সুতরাং যা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাজ্যের গল্প জুড়ে দিলেন আমার সঙ্গে—আমরা যেন কত দিনের বন্ধু—অফুরন্ত ভাবে কত বই, কত ব্যক্তি, কত স্থান, কত ঘটনার কথা আসতে লাগল। "হাঁ, হাঁ, রোম," চ্যাটার্জি বললেন, "রোমে আমার এক বন্ধু ছিল, তার স্ত্রী ছিল, যতটুকু মনে হচ্ছে—পোল, বা ঐ রকম কিছু। বন্ধুটি একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন…পত্রিকাটার নাম তো মনে পড়ছে না, যাক্, নাম খুব বড়ো কথা নয়…পত্রিকাটার মলাটের উপর ঢেউ আর তার উপর তারার

ছবি থাকত। চমৎকার লেগেছিল মলাটটা আমার। আমি যখন রোমে ছিলাম, বন্ধুকে বলেছিলাম—ঐ প্রতীকটা চমৎকার। ঐ ছবির তারা আমাকে এমার্সনের একটা কবিতা মনে করিয়ে দিত—'হিচ্ ইওর কার্ট টু এ স্টার।' ..জানো, টাগোরেরও এমনি একটা কবিতা আছে—আমি যতবার পড়ি ততবারই কবিতাটা আমার ভালো লাগে—আহা, কবিতাটার নাম তো মনে পড়ছে না। যাক্, নাম বড় কথা নয়, কবিতার ভাবটাই বড় কথা। কবিতাটা হচ্ছে আকাশের একটা তারার সঙ্গে গৃহস্থ ঘরের একটা প্রদীপের কথাবার্তা। 'ওগো ছোট প্রদীপ তুমি হলে গৃহের তারা; আর আমি ছোট তারা, —আমি হলাম আকাশের প্রদীপ।'—এই রকম। এ সব জিনিস তোমাদের কাছে একটু কবি-কবি মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের ভারতীয় মনকে এসব গভীর ভাবে নাড়া দেয়।"

আমাদের পাশে, ঠিক পরের টেবিলেই কয়েকটি মোটা, গোলগাল, সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোক কথাবার্তা বলছিল। তারা হাসিখুশি আড়চোখে এদিকে ওদিক দেখছিল, ওদের পরণে সাহেবি পোশাক। কথা বলবার সময় তারা চেয়ারের সামনে দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে কথা বলছিল। আচ্ছা, লোকগুলি কে? সোনারুপো বা বিদেশী মুদ্রার চোরা চালানদার? অন্যদেশে মানুষ রপ্তানীর ঠিকাদার? চোরাই গাঁজা-মদের ব্যবসায়ী।

"ভারতবর্ষের একটা রীতি আছে," চ্যাটার্জি বলে চললেন, "সন্ধ্যার সময় ঘরের প্রদীপটি জ্বালাবে ঘরের বধূ। তারপর তা নিয়ে যাবে তুলসীতলায়, ঠাকুরঘরে—সেখানে প্রদীপ দেখিয়ে তা নিয়ে আসবে ঘরে, তারপর তার থেকে ঘরের একটা একটা করে প্রদীপ জ্বালাবে···আহা, কী সুন্দর রীতি, প্রাচীনই শুধু নয়, কত কবিত্বময়। এটা যেন গৃহের নিত্য আলোকোৎসব। বলেছিলাম কথাটা আমার এক ইতালীয় বন্ধুর কাছে—আহা, কী নামটা তার? ভুলে গেছি—তা নামে দরকার কি? আমি তাকে ইংরেজিতে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝিয়ে বলেছিলাম, সে এত খুশি হয়েছিল যে বলেছিল আমার কথাগুলো তোমাদের ভাষায় সে লিখবে।"

পাশের টেবিলের লোকগুলি আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। চীনাম্যানের মতো একজন লোক, মনে হল দলের গোদা ইনি, টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল। বেশ একটু বেঁটে—তা বয়সও হয়েছে, কিন্তু পোশাক আসাক নিখুঁত রকমের ছিমছাম। লোকটা আসতেই টেবিলের মোটা লোকগুলো নিঃশব্দে উঠে

দাঁড়াল, তারপর আবার বসে পড়ল। কেউই কথা বলছে না, মনে হল একটা কোনো জটিল ষড়যন্ত্র হচ্ছে। একটু পরে একটা লোক তার ব্যাগ থেকে এক প্যাকেট ফটোগ্রাফ টেবিলের উপর রাখল, সবাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওগুলো দেখতে লাগল।

"জীবনে প্রতীকের মূল্য বড় গভীর।" চ্যাটার্জি এবার কোঁচার খুঁটে তাঁর চশমাটা একবার মুছে নিলেন। "তরঙ্গ আর তারা! তা দেখ, মানুষ কিন্তু প্রতীকের চাইতে বড়—ঠিক যেমন জীবন্ত বস্তু আর মৃত বস্তু। একবার একটা মজা হয়েছিল—ফ্লোরেন্সে একটা ডিনার পার্টিতে গেছি নিমন্ত্রিত হয়ে। আমার পাশেই বসেছিলেন একজন আমেরিকান মহিলা, উনি প্রাচীন ইতালীয় সঙ্গীত, প্রাচীন ইতালীয় কবিতা বলতে মূর্চ্ছা যাচ্ছিলেন। অনেক ক্ষণ তাঁর কথাবার্তা শোনার পর তোমার দেশের এক ছোকরা হেসে বলেছিল, 'প্রিয় মহাশয়া! এখানে নবীন ইতালীয় বলেও একটা বস্তু আছে।' এই কথাটা আমার মনে পড়েছিল কিছুদিন আগে আমি যখন একটা বক্তৃতা দিতে রাজপুতনায় উদয়পুরে যাচ্ছিলাম। উদয়পুর, বুঝলে, অনেকটা তোমাদের ফ্লোরেন্সেরই মতো যোদ্ধাদের আর চিত্রকরদের জায়গা; উদয়পুরে প্রতি পদ-ক্ষেপেই অতীতের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত অবিস্মরণীয় সব কীর্তির সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে।"

পাশের টেবিলে এবার সিগারেট জ্বলল। হুকুম হল —'লেমনেড ওর সোডা', কারণ সে-দিনটা ছিল ড্রাইডে, যাকে বলে মদ্যরহিত দিবস। চীনাম্যানের মতো লোকটা একটা ফটোগ্রাফ সম্বন্ধে বেশি আগ্রহী মনে হচ্ছিল। একটু পর পরই লোকটা অন্যদের কানে ফিস ফিস করে কি বলছিল—অন্যেরাও পরস্পর কি বলাবলি করছিল। মনে হচ্ছিল একটা গভীর ষড়যন্ত্র—লেমনেড আর সোডা চলছিল।

"প্রিয় চ্যাটার্জি!" আমার ঠিক পেছনে একটি অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। প্রফেসর তুচি এসে পড়েছেন। তাঁদের পরস্পর সম্ভাষণের পর আমরা আবার বসলাম, এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলল। ইতিমধ্যে কর্নেল মোয়াজ আর পিয়েরো এসে গেলেন—আমরা লাঞ্চের জন্য উঠে পড়লাম। আমাদের পাশের টেবিলের প্রতিবেশীরা তখন চলে গেছে; উঠতেই দেখলাম টেবিলের উপর একটা কার্ড পড়ে রয়েছে। কৌতূহল সামলাতে না পেরে হাতে নিয়ে দেখি—মেয়েদের জুতোর একটা নক্সা! বিকেলে পিয়েরোকে

কথাটা বলতে বকুনি দিয়েছিল, 'বোকা নাকি! বুঝতে পারছ না, এটা ইচ্ছা করেই ওরা ফেলে গিয়েছিল—কোনো সঙ্কেত হবে।' বা-ববা! পিয়েরোর কথায় পরিবেশ সম্পর্কে চেতনা ফিরে এল, আর বোকামি করলাম না।

হোটেলের সংলগ্ন বিরাট এয়ারকণ্ডিসনড্ রেস্টুরেণ্টে আমাদের লাঞ্চ্ শুরু হল। দুটি বিদ্যাসিংহ সাধারণ কথাবার্তা থেকে আলোচনার গভীরে প্রবেশ করলেন। এ রকম বুদ্ধির ভোজে সামিল হবার সৌভাগ্য জীবনে খুব কমই ঘটে থাকে—আমি তাঁদের কথাবার্তার কোনো অংশ যেন হারিয়ে না ফেলি এজন্য আমার সমগ্র চেতনাকে জাগ্রত করে রাখলাম। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহৃত শব্দাবলী সম্পর্কে একটা সাধারণ মন্তব্য নিয়ে এল মুণ্ডা ভাষার কথা—কিন্তু এটা সামান্য একটা ধাপ মাত্র; —'রায় কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর!' সুরের গমকের মতো মুণ্ডা ভাষাগুলিকে দ্রুতগতিতে ছুঁয়েই আলোচনা চলে গেল দ্রাবিড়ী ভাষায়। তাঁরা দুজনেই নিজ নিজ সতীর্থ ও বন্ধুদের গবেষণার কথা বলতে লাগলেন……'হাঁ, স্মিড্ৎ? স্মিড্ৎ-এর সব কথা আমি মানি না, তবে মোটামুটি মিল আছে আমার তাঁর সঙ্গে।'……আলোচনায় তুচির ধরন ছিল পুরাপুরি বৈজ্ঞানিক, জর্মন ধারার অনুসারী—চ্যাটার্জি ছিলেন অধিকতর মানবিক, ক্লাসিক্যাল রীতির অনুবর্তী। চ্যাটার্জি যখন কারো সম্পর্কে বলবেন, তখন তাঁর একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য ছবি তৈরি করে চোখের সামনে এনে হাজির করবেন। 'অমুক-অমুক এত এত বছর আগে কলকাতা দিয়ে গিয়েছিলেন,' এমন সাদামাটা কথা চ্যাটার্জি কখনোই বলবেন না; বলবেন, 'লোকটি বেশ লম্বা, সুন্দর চেহারা, কথাবার্তা কম বলেন, কিন্তু স্ত্রীটি অন্য রকম, ছোটোখাটো গোল হেন দেখতে, সাদা পোশাক পরা, টেনিস্ বলটির মতো সর্বক্ষণ স্বামীটির চারপাশে টপ্‌টপ্ করে নেচে বেড়াচ্ছেন।' এই কথা শেষ না হতেই চ্যাটার্জি শুরু করবেন কালিদাস বা কাঙ্গুর থেকে আবৃত্তি করে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের পার্থক্য বিচার করতে এবং তার থেকে নানা সিদ্ধান্ত টেনে এনে এশিয়ার ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে তার কি যোগ তা ব্যাখ্যা করতে।

রেস্টুরেণ্টে পরিচারকের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ ছিল। ওরা খলিফাদের মতো পোশাক পরেছিল, মাথায় লাল ফেজওয়ালা পাগড়ি। খুব আস্তে খালি পায়ে ওরা চলাফেরা করছিল—গোটা ব্যাপারটায় খানাপিনার চেয়ে জৌলুস অনেক বেশি ছিল। ওটা যেন কোনো রাজকুমারের রাজ্যাভিষেকের সভা বা ঐ রকম চমকদার কোনো ব্যাপার। একজন গম্ভীর প্রকৃতির সাদাগুঁফো পরিচারক

আমার সামনে সামান্য পরিমাণ একটা স্যুপের বাটি রাখল—হায়, হায়, তাতে একটা সবুজ পাতা ভাসছে, হয়ত বা উড়ে এসেই পড়েছে। পাশের টেবিলে, হাঁ, সুন্দরীই বলতে হয়, কয়েকটি পার্শি মহিলা, তাদের সঙ্গে কয়েকটি মোটা পুরুষ লোক। কয়েকটি টেবিল পরে একটি ইয়োরোপীয় পরিবার, মৌসুমী আবহাওয়ার 'ডাইনীর কড়াই'য়ে সেদ্ধ হয়ে হয়ে গায়ের রঙ চটে গেছে। পরিবারের স্বামীটি, বছর পঁয়ত্রিশ তার বয়স হবে, মনে হচ্ছিল ভালো কাজকর্ম করেন, কিন্তু রঙ চটা ; স্ত্রীটি কুৎসিৎভাবে অতিরিক্ত রকম সাদা, তাও ঐ রঙ চটা—সাত আট বছরের ছোট মেয়েটি, তার অবস্থাও ওই। হায়, পৃথিবীর এই অংশে সাদা চামড়ার বাচ্চাদের কী করুণই না দেখায়।

বিদ্যাসিংহ দুটি তাঁদের আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দুজনেই তাঁদের উজ্জ্বলতম প্রকাশশক্তি নিয়ে আমাদের সামনে বসে। মাঝে মাঝে তাঁরা অবিশ্বাস্য রকমে প্রবল হয়ে উঠছিলেন। মুণ্ডারী থেকে তাঁরা ততক্ষণে চলে গিয়েছেন তিব্বতে, তার থেকে উইঘুর্স-এ, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মধ্য এশিয়ার নেস্টোরিয়ান খ্রীষ্টধর্মে। তাঁরা স্যার অউরেল্ স্টেইন-এর কথা বললেন, আলোচনায় এলো মার্কো পোলোর নাম, ফন লে কক্-এর নাম, তারপর তাঁরা গেলেন ব্যাকট্রিয়ায়, সেখান থেকে পারস্যে—মনিকেইসম্, প্রাচীন আঞ্চলিক মুদ্রা, হিমালয়ের গুম্ফায় পাওয়া অপ্রকাশিত পুঁথিপত্র দুরন্ত ঝড়ো হাওয়ার মতো আলোচনায় এসে ঢুকতে লাগল। তাঁরা স্তেপ অঞ্চলে এবং মধ্য এশিয়ার ওয়েসিস গুলিতে গ্রীক শিল্পকলার অনুপ্রবেশ সম্পর্কে কথা বলতে লাগলেন। গোটা এশিয়ার দেহটাকে নগ্ন করে তারা আমাদের সামনে মেলে ধরলেন, প্রবল শক্তিতে তাকে টুকরো টুকরো করে ফেললেন, ঐ খণ্ডগুলিকে আবার সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদে শতভাগ করে দিলেন—তারপর আবার যাদুকরের মতো ইতিহাসের স্থানে কালে নিক্ষেপ করে করে ঐ খণ্ডকেই অখণ্ড করে, সমগ্র করে তুললেন। তাঁরা মানবেতিহাসের বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলোকে যুক্ত করলেন, সমতা আর সাদৃশ্য গুলোকে টেনে বার করে আনলেন এবং বিশ্বইতিহাসের ঘটনাপর্যায়কে নতুন করে উদ্ভাসিত করে তুলতে পারে এমন সব অভাবিত আন্তঃসম্পর্ক ও ঘটনার উল্লেখ করলেন। তাঁরা এশিয়া ভূখণ্ডের গোটা মানচিত্রটাকে প্রাণ আর গতিতে এমন করে পূর্ণ করে দিলেন যে কঙ্কাল আর বালুকাপরিকীর্ণ মহাদেশ যেন ইতিহাসের উৎসারিত আলোকের ঝরণায় স্নান করতে লাগল। মনে হল, ইতিহাসের বিধাতা পুরুষ যুগযুগান্তের মানুষগুলোকে পুতুলের মতো তাঁর

সর্বশক্তিমান্ আঙুলে ধরে খেলা করছেন আর আমরা সেই ঈশ্বরের ত্রিকালভেদী দৃষ্টি দিয়ে আমাদের চোখের সামনে এশিয়ার অতীত ইতিহাসের চিত্রবিচিত্র মহাপট উন্মোচিত হতে দেখছি।

আলোচনা প্রসঙ্গে একবার রোমের কথা উঠতে চ্যাটার্জি এশিয়ায় রোম নামের রূপান্তর সম্পর্কে বলতে লাগলেন। "সিরিয়ায়", চ্যাটার্জি বলে চললেন, "রোমকে বলা হত 'হ্রিম্'। চীনা বণিকেরা, যারা অতীতে ভূমধ্যমণ্ডলে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল, তারা হ্রিম সাম্রাজ্যের কথা বলত—কিন্তু 'হ্রিম্' কথাটা চীনদের মুখে আসত না; তাদের মুখে 'হ' হয়ে গেল 'ফু', 'হ্রিম্' হল 'ফু-রিম্'। তারপর চীনাদের মুখে মুখে আরো পরিবর্তন হতে হতে হল 'ফু-লিম্', কারণ তারা 'ল' উচ্চারণ করতে পারে, কিন্তু 'র' চীনা মুখে দুরুচ্চার্য। ' তখন থেকে চীনারা রোমকে বরাবর 'ফু-লিম্' বলে আসছে।"

চ্যাটার্জি খুব খোস মেজাজে ছিলেন, তিনি কথা বলছিলেন তো বলছিলেনই এমন কি খাবার কথাও ভুলে গিয়েছিলেন, হঠাৎ টেবিলের উপর নজর পড়তে অতি দ্রুত গপ্ গপ্ করে অনেকটুকু খেয়ে নিলেন, কোনো কিছুতে নিবিষ্ট হয়ে পড়লে চ্যাটার্জি তাঁর পরিপার্শ্বের কথা একদম ভুলে যান—তা বলে পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে তিনি অন্ধ একথা বলা চলবে না; পাশের টেবিলের সুন্দরী পার্শি মহিলাটি যখন উঠে দাঁড়াল, তখন চ্যাটার্জির সপ্রশংস দৃষ্টির দ্বারা সে অভ্যর্থিত হয়েছিল, এবং নিমেষের জন্য চ্যাটার্জি তাঁর কথার খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। চ্যাটার্জি তুচির তুলনায় অনেক সহজ এবং অনেক বেশি মানবিক, যদিও তুচির থেকে পাণ্ডিত্যে তিনি কোনো অংশে ন্যূন নন। চ্যাটার্জির মেধা আর বিদ্যাবত্তার তুলনা হয় না, তুচি সেদিন তাঁর কথাগুলো গভীর মনোযোগ এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছিলেন। সেদিন কথাবার্তার সময় চ্যাটার্জি বারবারই পাঞ্জাবির তলার ফতুয়ার পকেট থেকে এক কপি 'এ্যাক্টস্ অব্ এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' বার করছিলেন, এবং যখনই কোনো নতুন বই বা প্রবন্ধের কথা উঠছিল তখনই পেন্সিল দিয়ে ঐ বই-এর মলাটের উপর তা যত্ন করে টুকে নিচ্ছিলেন। শেষে ঐ মূল্যবান দলিলখানা যখন তিনি আবার ফতুয়ার পকেটে পুরতে যাচ্ছিলেন তখন লাঞ্চের পরেকার তাঁর বিস্তৃত লোমশ আদিম উদরটিকে তিনি উদ্ঘাটিত করে ফেলেছিলেন।

অনুবাদক : সুবোধ চৌধুরী

উমেদার থেকে পদাতিক

তরুণ সেন

ষাটের দশকের শেষার্ধ ও সত্তরের শুরুতে পশ্চিম বাঙলা ও এর প্রাণকেন্দ্র এই কলকাতায় যে কর্মকাণ্ড আমরা প্রত্যক্ষ করলাম—তার কতটুকু শিল্পে-সাহিত্যে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে সে বিচারের ভার সময়ের হাতে ছেড়ে দিয়েও একবার অন্তত ফিরে তাকাবার, তাকিয়ে দেখবার, দায় থেকে যায়। যা দেখলাম, যা ঘটল—তার কতটুকু কিভাবে আমাদের অস্তিত্বে আলোড়ন আনল—বা আদৌ তেমন কিছু ঘটল কি না —তা আজ ও আগামীকাল পরিমাপ করবে সমকালের শিল্প-সাহিত্যের দর্পণে। যেহেতু চলচ্চিত্র আজ তথাকথিত গল্প বলার নাবালকত্ব অতিক্রম করে অনেকদূর এগিয়ে গেছে এবং একটি বিশিষ্ট প্রভাবশালী শিল্পমাধ্যম হিসেবে আপন মর্যাদার দাবি প্রতিষ্ঠা করেছে, সেইহেতু এই অস্থির সময়ের শিল্পের দলিল-দস্তাবেজ রূপে মৃণাল সেনের ছবি—'ইণ্টারভিউ' 'কলকাতা ৭১' ও 'পদাতিক' নিশ্চয়ই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। 'ইণ্টারভিউ' থেকে মৃণাল সেন নিছক গল্প বলার সোজা রাস্তায় আর হাঁটছেন না। ছবি তিনটিকে ট্রিলজি হিসাবে হাইফেন-গ্রথিত করা অনিবার্য এই জন্যে যে, ছবির কাঠামো বা বলার ভঙ্গির একটা ক্রম 'ইণ্টারভিউ' 'কলকাতা ৭১' ও 'পদাতিক'-এ অনুসরণ করা হয়েছে। আর এখানে বক্তব্যেরও একটা সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা রক্ষায় তিনি সচেতন। তাঁর আগামী ছবি এই ক্রমানুসারী হবে কি হবে না, সে প্রশ্ন আলোচ্য ছবি তিনটির আলোচনায় আপাতত অবান্তর।

মৃণাল সেনের তিনটি ছবিরই কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা, যে শহর পশ্চিম বাঙলার প্রাণকেন্দ্র ত বটেই, সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহাওয়ারও পরিমাপক। তার কেন্দ্রীয় চরিত্র চাকুরীজীবী নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণকুল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বে স্বাধীন তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক সংকট ও রাজনৈতিক আবর্তের মৌলিক আত্মীয়তা কোনো আবিষ্কারের অপেক্ষা রাখে না। কাজেই এই তৃতীয় বিশ্বের সমকালীন বৃত্তিহীন মধ্যবিত্ত তরুণকুলের আশা-আকাঙ্ক্ষা-হতাশা-বিক্ষোভের একটা আভাষ এই কলকাতাই দিতে পারে। তৃতীয় বিশ্বের তাবৎ সংবাদপত্রেই এর খানিকটা প্রমাণও পাওয়া যায়। বিষয়বস্তুর

নির্বাচনে মৃণালবাবু তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য-হতাশা-বঞ্চনা-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার শিকার এই মধ্যবিত্ত যুবমানসকে তাঁর সাধ্যমতো বোঝার এবং দর্শকদের বুঝতে সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন। সাফল্যের বিচারের আগে অন্তত প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্যের জন্য খানিকটা সাধুবাদ তাই মৃণালবাবুর অগ্রিম প্রাপ্য।

ষাটের শেষের দিকে তীব্র গণআন্দোলনের চূড়োয় দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের সরকার গঠন এবং যুক্তফ্রন্ট তত্ত্বের প্রয়োগ ও পরীক্ষা, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের তীব্র মতবিভেদ, নকশালবাদী রাজনীতির আত্ম-প্রকাশ, ভিয়েতনামের মরণপণ সংগ্রাম, রাজনৈতিক নেতৃত্ব দানে যুক্তফ্রন্টের ব্যর্থতা, চলতি বামপন্থী নেতৃত্বে আস্থাহীন অশান্ত যুবমানসের হঠকারী কার্য-কলাপ, যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন, পুলিশী তাণ্ডব, সমাজবিরোধীদের অবাধ দৌরাত্ম্য, চটকল-কয়লাখনি অঞ্চলে ব্যাপক শ্রমিক বিক্ষোভ, জমিদখল আন্দোলন পশ্চিম বাঙলায় সাম্প্রতিক কয়েকটি বছরে এই পরস্পর সম্পৃক্ত বিচিত্র ঘটনার স্রোত বয়ে গেল, যার ঢেউ অনিবার্য ভাবে নাড়া দিল প্রাণকেন্দ্র কলকাতাকে। সময়ের সান্নিধ্যে দাঁড়িয়েও একথা নিঃসন্দেহে উচ্চারণ করা যায় যে, পশ্চিম বাঙলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এ এক আশ্চর্য অধ্যায়। মার্কিউস-ডেব্রে-ডয়েটশার নিয়ে হিমসিম খেয়ে গেলেন বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই। এই সময় ও সংকটকে প্রতিফলিত করার সংকল্প সাহসিক সন্দেহ নেই, বিশেষ করে বাঙলা ছবিতে এক-আধটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া যার মূল ধারায় এখনও যেখানে "একদিন দেখা হল দুজনায়" জাতীয় ধারা সগৌরবে বহমান। এই সময়ে শান্ত যুবমানসকে কেন্দ্র করে যে কটি ছবি মুক্তি পেয়েছে সেগুলোর দিকে তাকালে মৃণালবাবুর স্বাতন্ত্র্য প্রকট হয়ে ওঠে। 'আপনজন'-এ ব্যর্থ প্রেমের শিকার 'সফিস্টিকেটেড' লুম্পেন নায়কের সঙ্গে হিন্দী ছবির ফর্মুলায় প্রস্তুত নির্ভেজাল ভিলেন ছেনো, নেহাত ইস্কুল-কলেজ বন্ধ বলে দুপুর রাতে তরুণদের মাঠ পরিক্রমণ ও নেপথ্যে "আলো আমার আলো" গানটি মারফৎ রবীন্দ্র-নিগ্রহ, তারপর "ছিন্নপ্রাণ" বিষয় অবলম্বনে তপনবাবুর "ভিন্ন জাতের" বিজ্ঞাপিত ছিন্নভিন্ন ছবি ইত্যাদির পাশে 'ইণ্টারভিউ' অন্তত নির্যাতন অব্যাহতির স্বস্তি দেয় দর্শককে। সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' অবশ্য গুণগত ভাবে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম —কিন্তু এ ছবির কেন্দ্রবিন্দু নায়ক—যার প্রতিদ্বন্দ্বী '৭০-এর কলকাতা, যার রিফ্রেন হারানো শৈশবের নস্ট্যালজিয়া। আর মৃণালবাবুর ছবির বিষয়বস্তু সামগ্রিক ভাবে এই সময় ও সংকট—উচ্চাশার শিকার একটি যুবমানসে তার প্রভাব ও

প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে যার বিস্তার ঘটিয়েছেন তিনি। দুটি দু-জাতের ছবি বলেই আপেক্ষিক সাফল্য বা উৎকর্ষের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

ব্রিগেডে বিশাল গণমিছিল ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে জাতীয় পরাধীনতার স্মৃতিচিহ্ন সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মূর্তি উৎপাটন-দৃশ্য থেকে মৃণালবাবুর ট্রিলজির শুরু। এই পরিপ্রেক্ষিতে ছাপাখানার সামান্য মাইনের কর্মী এক নিম্নমধ্যবিত্ত যুবক কাকার সুপারিশে এক বিলিতি সওদাগরি অফিসে একটি চাকরির উমেদার এবং ইণ্টারভিউর জন্যে অপরিহার্য একটি স্যুট-এর সন্ধানে নাজেহাল। শেষপর্যন্ত স্যুট যোগাড় করতে না পারায় চাকরিটি তার হল না। ক্ষোভে শোকে সযত্ন রক্ষিত স্যুট সজ্জিত ম্যানিকুইনের উপর তার আক্রমণ ও আক্রোশের পাশাপাশি ভিয়েতনামের যুদ্ধের একটি দৃশ্য ও মূর্তি অপসারণের প্রথম দৃশ্যের পুনঃ উপস্থাপনার মাধ্যমে ছবির শেষ। এই ছোট্ট কাহিনীর আশ্রয়ে মৃণালবাবু সামগ্রিকভাবে নিম্নমধ্যবিত্ত যুবমানসে সময় ও সংকটের প্রভাব ও প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে বলেছেন। প্রচলিত আঙ্গিক ও রীতির তিনি ধার ধারেন নি। তিনি নির্দ্বিধায় কোথাও সংবাদের টুকরো উদ্ধৃত করেছেন, কোথাও সূত্রধারের কায়দায় সরাসরি প্রশ্ন উত্থাপন ও দর্শকদের সামনে সরাসরি নিজের বক্তব্য নিবেদন করেছেন। সময়কে প্রতিফলিত তিনি সার্থক ভাবেই করেছেন, কোনো ক্রম অনুসরণ বা ধারাবাহিকতার ধার ধারেন নি। এবং এই দুঃসাহসের ফলেই মৃণালবাবু একটি ছবিতে এক আশ্চর্য সময়ের চিহ্ন ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। প্রেসে কর্মরত নায়ক যে পঙ্‌ক্তিটির প্রুফ দেখছে, সে পঙ্‌ক্তিটিতে এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় চিহ্নিত হয়েছে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার তারিখ মারফৎ। কিন্তু পঙ্‌ক্তিটির কোনো তাৎপর্য তার ওপর বিন্দুমাত্র রেখাপাত করে না। ভালো চাকরির সম্ভাবনায় সে উৎফুল্ল। উমেদার হিসেবে হাজির হতে অবশ্য-প্রয়োজন একমাত্র স্যুটটি লণ্ড্রী থেকে আনতে গিয়ে অবস্থানরত ধর্মঘটী শ্রমিকদের দেখে সে তার চাকরির সম্ভাবনা সম্পর্কে শঙ্কিত এবং ধর্মঘটীদের ওপর ক্রুদ্ধ। তার প্রেমিকার সঙ্গে সাক্ষাতে যে-স্বপ্নের কথা সে বলে সেটা উচ্চমধ্যবিত্ত জীবন যাত্রায় উত্তরণের। তার শ্রেণীসুলভ উচ্চাকাঙ্ক্ষা উচ্চমধ্যবিত্তের জীবন যাত্রার উপকরণ আয়ত্তে আনার মোহ এবং সাফল্যের লোভকে মৃণালবাবু সংক্ষিপ্ত কয়েকটি সংলাপে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। নায়কের চেতনার স্তরটি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনি পক্ষপাতহীন।

বিরাট কমপিউটারের পাশাপাশি ধুতি পরিহিত নায়কের ইণ্টারভিউর দৃশ্য, অর্ধ-উলঙ্গ মানুষের মিছিল, ভিয়েতনাম—সব মিলিয়ে এই কলকাতার প্রাচীন বুকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশেষ এবং টেকনোক্র্যাটিক বিপ্লবের আধুনিক অবদানের সহাবস্থানের প্রেক্ষাপটে চাকরির উমেদার অসহায় মধ্যবিত্ত যুবকের অস্তিত্ব—রূঢ় এই বাস্তবতাটি তিনি কয়েকটি খণ্ড দৃশ্যে গ্রন্থিত করে তুলে ধরেছেন, বাঙলা ছবিতে যার উদাহরণ নেই। কিন্তু উমেদার যুবকটির চাকুরি হল না স্যুটের অভাবে। ক্ষোভে আক্রোশে সে পাথর তুলে নিল স্যুটধারী ম্যানিকুইনের শোকেস ভাঙতে। তার পাশাপাশি ইনকিলাব স্লোগান, মিছিলের দৃশ্য, ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ ও উৎপাটিত সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মূর্তি দর্শকের সমগ্র চেতনায় একের পর এক এই আপাত বিচ্ছিন্ন ঘটনা একটা সামগ্রিক ছবির জন্ম দেয়। এই চলচ্চিত্রে মৃণালবাবুকে ইতিপূর্বে একাধিকবার নাটকের সূত্রধারের মতোই সোচ্চার হতে দেখেছি। কিন্তু শেষাংশে এই খণ্ড দৃশ্যগুলো পর পর দর্শকের সামনে উপস্থিত করে তিনি দর্শকদেরও ভাবনার অংশীদার করে নেন। উমেদার যুবকের ভেতরে এই সময় ও সংকট যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল সেটি বিপ্লবের নয়—বিক্ষোভে, ব্যক্তিগত হতাশায় যার জন্ম। কারণ সে সেই সমাজের মধ্যবিত্তের প্রতিভূ যার 'স্ট্যাটাস সিম্বল' এখনো বিলিতি পোশাক, অথচ বিদেশী শাসকদের মূর্তি উৎপাটন তথা সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন উৎখাতের সাধু কর্ম সম্পাদনে যে মানসিকতা উৎফুল্ল। মধ্যবিত্ত মানুষের এই বাস্তব ট্র্যাজেডি তিনি অত্যন্ত নির্মম ভাবে তুলে ধরেছেন। আর তুলে ধরেছেন একটি প্রশ্ন—অপূর্ণ উচ্চাকাঙ্ক্ষা জনিত হতাশা জাত মধ্যবিত্ত তরুণের ক্ষোভ কি মূল্যহীন নয় যদি সে ক্ষোভ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত নিজ দেশের সামগ্রিক ব্যাপক গণআন্দোলনে সংযুক্ত ও সংহত না হয়! মৃণাল-বাবুর নায়ক দর্শকের সহানুভূতির মুকুটে শোভিত হওয়ার সুযোগ পেল না। এই নিষ্ঠুরতার জন্য পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও আর্তচীৎকার শুনেছি। নিঃসন্দেহ হওয়া গেল মৃণালবাবু "একদিন দেখা হল দুজনায়" ও তজ্জাত উত্থান-পতন-সংগীত-বন্ধুরপন্থা অনুযায়ী নিটোল গল্পে অভ্যস্ত দর্শককে বেশ খানিকটা বিব্রত করে ফেলেছেন। মাঝে মধ্যে অতিকথন ও ডকুমেণ্টারির মতো দৃশ্যপঞ্জীর গ্রন্থনা ক্ষেত্রবিশেষে স্থূল মনে হয়েছে সন্দেহ নেই—যেমন সমকালীন রাজনৈতিক দলগুলির পোস্টারের আদলে পর্দায় বার বার পোস্টাররূপে বহুবার ঘোষিত ভাবনা ভেসে ওঠা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যখন তিনি দর্শককে ভাবতে

বাধ্য করেন ও খানিকটা বিব্রত বোধ করাতে সমর্থ হন তখন এইসব ছোটখাট আপত্তির ব্যাপার গৌণ হয়ে পড়ে।

এ ছবিতে আমরা দেখলাম উমেদার মধ্যবিত্ত যুবককে—যার মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সঞ্চারিত হচ্ছে, যার প্রকাশ ব্যক্তিগত বিক্ষোভে। চলতি রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাকে সন্তুষ্ট করে না। সে তাকিয়ে দেখে তার হালের অতীতের দিকে। দ্বিতীয় যুদ্ধ পূর্বকালীন সময় থেকে ৭০-এর দশক পর্যন্ত অপরিবর্তিত বাস্তবতা এ দেশের মানুষের দারিদ্র্য, বঞ্চনা। অত্যাচারিত এ মানুষগুলোর সার্বিক অর্থনৈতিক মুক্তির সাধু সংকল্পের উচ্চারণ সত্ত্বেও স্বাধীনতা-উত্তরকালে সংকট তীব্রতর হল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্তের একটা অংশ বড় চাকুরী ও প্রশাসনিক পদ অলংকৃত করে, ফুলে ফেঁপে সর্বস্তরে অবিসংবাদিত মুরুব্বি হিসেবে বিরাজমান হল। পাশাপাশি ব্যাপক গণ-অসন্তোষকে সংহত করে উত্তরণের কোনো নমুনা পাওয়া গেল না বামপন্থী নেতৃত্ব থেকে। 'কলকাতা ৭১' এই সময়কে দেখার ব্যাপার। হতাশ উমেদার যুবক নিজেই এবার একটা সমাধানে উদ্যোগী। তার আক্রমণের লক্ষ্য মূলত সরকারী প্রশাসন যন্ত্র ও বিত্তবান শ্রেণী। তার কৌশল সন্ত্রাসবাদী, অনেকাংশে আতিশয্যপূর্ণ, মাত্রাহীন। তার বিক্ষোভ ও ঘৃণা নিখাদ। সে নকশালপন্থী। তাকে বোঝার ও তার ব্যাপারে ভাবনার দায় সম্পর্কে সচেতন করাই 'কলকাতা ৭১'-এর লক্ষ্য। কিন্তু যেহেতু মৃণালবাবুর কেন্দ্রীয় বিষয় এই দশকের কলকাতা—সংবাদের শিরোনামের উদ্ধৃতি, ডকুমেন্টারি দৃশ্য ইত্যাদির অঢেল ব্যবহার তিনি করেছেন। তিরিশ থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে প্রবহমান ও ক্রমে তীব্র দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও শোষণের ধারাটি তুলে ধরতে তিনি তিনটি গল্প ব্যবহার করেছেন। শেষদৃশ্যে ময়দানে নিহত নকশাল যুবকের মৃতদেহ, দর্শককে ব্যাপারটি একটু ভেবে দেখার আবেদনের মধ্য দিয়ে চিত্রের সমাপ্তি। একটি কাল্পনিক আদালতের দৃশ্যে প্রথম ছবির নায়ক কাহিনীর জের টেনে আগের ছবিটির সঙ্গে এর ধারাবাহিকতা উপস্থাপনার পর্বটি সম্পন্ন করে। তারপর প্রতিটি খণ্ডকাহিনীর শুরুতে এবং শেষে নকশাল যুবকের বক্তব্য (হাজার বছর ধরে সে দেখছে অবিচ্ছিন্ন ও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য বঞ্চনা হতাশা শোষণ ইত্যাদি) পর্দায় ফুটে ওঠে। বারবার এই ব্যাপার ঘটতে থাকার ফলে বক্তব্যটি ক্লান্তিকর ও অর্থহীন হয়ে ওঠে—তার আবেদন স্থূলতার পর্যায়ে এসে পড়ে। লেখাটি একবার দেখানোই কি যথেষ্ট ছিল না? আগের

ছবিতে মৃণালবাবু দর্শকদের ওপর যথেষ্ট ভরসা রেখে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো উপস্থাপনার উদ্দেশ্যে অনেক ইঙ্গিতপূর্ণ মুহূর্ত সৃষ্টি করেছেন। এ ছবিতে হঠাৎ তিনি রাগী যুবকদের বিক্ষোভের স্থূল ভঙ্গিটি গ্রহণ করলেন কেন? উপস্থাপিত তিনটি খণ্ডকাহিনীর মূল ঐক্যের ব্যাপারটি অগ্রিম বলে নেওয়া সত্ত্বেও দর্শকের চৈতন্যে থাকবে না—এমন একটা দুঃস্বপ্ন তাঁকে আক্রান্ত করেছিল কি? নাকি খণ্ডকাহিনী তিনটি তেমন ভাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন কিনা—এ সম্পর্কে তাঁর নিজেরই সন্দেহ ছিল? মূলচিত্রের শিরোনামে সর্বশেষ কাহিনীটির কাঠামো ও উপস্থাপনা একেবারেই স্থূল নিম্নমধ্যবিত্ত সুলভ ঈর্ষাকাতর বিষোদ্গারে দাঁড়িয়ে গেছে। দুর্নীতিগ্রস্ত মণ্ডপ অশিক্ষিত রাজনৈতিক নেতা অনেকসময় আপাতদৃষ্টিতে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা—কিন্তু ধনতন্ত্রের মতো জটিল ব্যাপারটির নিয়ন্ত্রণে সূক্ষ্মতর মেধা ও প্রক্রিয়া কাজ করে নিশ্চয়ই? 'কলকাতা ৭১'-এ এসেও এই চতুর আগ্রাসী ধনতন্ত্রের কোনো প্রতিভূর দেখা পাওয়া গেল না। শত্রুর সাময়িক স্থূল মুখোশটির বেশি কি তিনি দর্শকদের দেখাতে চান না? তাঁর সর্বশেষ গল্পের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এতটুকুই দাঁড়াতে পারে যে এদের উৎখাতই প্রথম এবং শেষ সমাধান। হ্যাঁ—এই মুখোশটির রক্ষাকারী মুখোশধারী পুলিশী শক্তির তাণ্ডবও তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু উপস্থাপনার গুণে ব্যাপার দুটি সংলগ্ন বলে মনে হওয়ার অবকাশ মেলে নি। রাজনৈতিক নেতৃত্বের স্থূল ও বিকৃত চেহারাটা উপস্থিত করে নিম্নবিত্তের মানসিকতায় নিজশ্রেণীর নৈতিক ঔৎকর্ষ সচেতনতার সুখকর পরিস্থিতির ভ্রান্তি খানিকটা এনে দেওয়া যায়, কিন্তু শত্রুকে খুব ছোট করে দেখা হয় না কি? উচ্চমধ্যবিত্তের জীবনযাত্রার ধারার প্রতিভূ হিসেবে হোটেল-ককটেল-পপগানের বহুল ব্যবহৃত ধারাপাত মৃণালবাবু পরিহার করবেন আশা করেছিলাম। কারণ, পরিবর্জনের সাহস যে তাঁর রীতি-মতো আছে আগের ছবিতেই তার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন এবং আমাদের আশা আরেকটু বাড়িয়ে দিয়েছেন। আগেই বলেছি দারিদ্র্য, হতাশা, বেকারী …কথাগুলি বর্ণপরিচয়ের মতো বারবার পর্দায় প্রতিফলিত করে খানিকটা স্থূল চটক সৃষ্টির কোনো প্রয়োজন ছিল না। ভেনিস-জুরিখ-মিউনিখের দর্শককুলের সামনে তৃতীয় বিশ্বের রূঢ় বাস্তবতাটা বোঝাবার তাগিদই কি এই পরিকল্পনার প্রেরণা? এদেশীয় অভাজনদের জন্য প্রথম কাহিনী দুটি এবং প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার যোগফলই মৃণালবাবুর ঈপ্সিত চৈতন্যে পৌঁছবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

নকশাল যুবকের গুলিবিদ্ধ হবার পর মুহূর্তে রঙীন পর্দায় বিচরণশীলা সুন্দরীটি একটি বিজ্ঞাপনের দৃশ্যের স্তরেই রয়ে গেল। এদেশে সকালের বেতারের স্নিগ্ধ সিগন্যালের শব্দ খুনীর গুলির আওয়াজ ঢেকে দেয়—এ উপস্থাপনাটি একটি কবিতার পঙক্তির মতোই আবেদনশীল, এবং সেখানে বিজ্ঞাপনের ছবির মতো সুন্দরীরা পরম নির্লিপ্ত আমেজে ঘোরাফেরা করে—এই দ্বিতীয় বক্তব্যটি তো একটু আগের কাহিনীতেই প্রতিফলিত, পুনরুত্থাপন নিষ্প্রয়োজন ছিল। এখানেও দর্শকদের প্রতি মৃণালবাবুর অনাস্থাই প্রকাশ পেয়েছে।

মৃণালবাবুর দুটি ছবিতে আমরা চাকরির উমেদার নিম্নমধ্যবিত্ত বেকার ক্ষুব্ধ যুবককে আত্মাহুতির জন্য প্রস্তুত বিক্ষুব্ধ বিচ্ছিন্ন অথচ বিশিষ্ট একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হতে দেখলাম। ইতিমধ্যে কলকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়ারও খানিকটা রদবদল হয়ে গেল। শরিকি সংঘর্ষ ও ব্যক্তিসন্ত্রাসের নারকীয় পরিবেশে ব্যক্তিগত বীরত্বের প্রতি মধ্যবিত্ত আবেগ থেকে উৎপন্ন সম্ভ্রম নকশালপন্থীরা হারিয়ে ফেললেন। নকশালপন্থীদের মধ্যেও অনিবার্য আত্মবিশ্লেষণ ও জিজ্ঞাসা দেখা দিল। যে কোনো ভাবে তাদের নিশ্চিহ্ন করার দৃঢ়সংকল্প ব্রতে প্রশাসন যন্ত্রও অনেকাংশে সফল হল। বামপন্থী নেতৃত্বের ব্যর্থতা, যুক্তফ্রন্টের পতন ও পশ্চিমবঙ্গে তার পরবর্তী সময়কালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা এখানে আর নতুন করে আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। এই পর্বের নানা জটিলতার মধ্যেই আপাত দৃষ্টিতে কৌতুককর কিন্তু আসলে বিপজ্জনক এক প্রবণতার আবির্ভাব হল। নকশালপন্থী যুবশক্তির বিরাট অংশ যখন বিনা বিচারে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে, তাদের আন্দোলন যখন ইতিহাসের নিয়মেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত, তখন আরামকেদারায় অভ্যস্ত নিরুদ্বেগ বৃত্তিভোগী এক শ্রেণীর নকশাল সমর্থক বুদ্ধিজীবীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। প্রবল উৎসাহে এঁরা নকশালবাদী আন্দোলনের সাফল্য-ব্যর্থতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে তাত্ত্বিক নিরীক্ষা চালাতে লাগলেন। কিন্তু মূল ঝোঁকটা সেই পাতিবুর্জোয়া রোমান্টিকতা, সেই সন্ত্রাসবাদী বীরত্ব ও বোমা-পিস্তল সম্পর্কে নিরীহ নিবীর্য মধ্যবিত্তের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ—তাকে উসকে দেওয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মৃণালবাবুর 'পদাতিক'-এর প্রকাশ। উমেদার থেকে পদাতিকে ক্রম রূপান্তরের যে বৃত্ত—তার শেষ অধ্যায় হিসেবে এই ছবিটি দেখতে আগের দুটি ছবির দর্শককে অনেক আশা নিয়েই হাজির হতে হল। কিন্তু মোটামুটি ভাবে শেষোক্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের ভাবনা ও উপরোক্ত ঝোঁকের প্রভাব মৃণালবাবুর ছবিতে এতটা প্রকট হয়ে উঠবে—এ

স্বপ্নভঙ্গের জন্য আমার মতো অনেক দর্শকই প্রস্তুত ছিলেন না। পরিচালক হিসেবে আর্থিক সাফল্যে দীর্ঘকাল বঞ্চিত থাকা সত্ত্বেও আপোষহীনভাবেই মৃণাল-বাবু ছবি করছিলেন। একটি দর্শক সমাজ সৃষ্টি করার সাফল্যে পৌঁছতে তাঁকে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হয়েছে—এ কথাটা মনে রেখেই খুব আশ্চর্য লাগে যখন 'পদাতিক'-এর আদ্যোপান্ত চেহারায় এমন সব উপাদানের প্রাচুর্য নজরে আসে যা দেখে বেশ তীব্র ভাবেই সন্দেহ করার কারণ ঘটে যে টিকিট ঘরের দিকে পরিচালকের দৃষ্টি একটু অতিরিক্ত রকমই নিবদ্ধ ছিল। গতানুগতিকতা পরিবর্জনে অভ্যস্ত মৃণালবাবুর এ ছবিটি একেবারে ছকে মাপা। আর মাঝে মাঝে চটক সৃষ্টির চমক এমন বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন যে মনে হয় দ্বিধা দ্বন্দ্বে দীর্ণ মৃণালবাবু ছবিটির নিধনপর্ব তাঁর অজ্ঞাতেই সেরে ফেলেছেন। এ ছবির নায়িকা বেশি মাইনের প্রচার-বিশেষজ্ঞা সুবেশা তরুণী—স্বামীর সঙ্গে যার বিচ্ছেদ ঘটেছে মানসিক দূরত্বের উপলব্ধিতে। নকশালপন্থীদের প্রতি তার সমর্থনের একমাত্র কারণ পাঞ্জাবের রূপারে তার ভাই নকশাল আন্দোলনে শহীদ। তার জীবনযাত্রায় ও মানসিকতায় একটা বিরোধের আভাষ দেওয়া আছে—কিন্তু যেন বস-এর ফ্ল্যাটে ককটেল পার্টিতে মদ না ছোঁয়ার জন্যেই তার বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। একটি বড় বিজ্ঞাপন সংস্থার সাহেবের পার্টিতে কিছু যুবক উপস্থিত—তাদের এ পরিবেশে আনার কারণ নায়িকার স্বাতন্ত্র্যের 'উজ্জ্বল উদ্ধার' ছাড়া আর কিছু মনে করার অবকাশ নেই। বড় সাহেবের স্ত্রী কুরূপা, স্থূল কথোপকথনই তার একমাত্র রপ্ত ব্যাপার। তার প্রসাধন উগ্র, বেশবাস দামী এবং রুচিহীন। ব্যাপারটা শরৎ-সাহিত্যের ছকমাপা ব্রাহ্মবিদ্বেষের মতো নিটোল এবং নিম্নমধ্যবিত্ত দর্শকের আত্মতুষ্টি বিধানের বহু প্রচলিত মোক্ষম অস্ত্র। এ শ্রেণীর মহিলাদের চলনে বলনে একটা অর্জিত পারিপাট্যও কি মৃণালবাবুর নজরে আসে নি? নায়ক নিম্নমধ্যবিত্ত নকশাল যুবক, উপরোক্ত নায়িকার পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে আত্মগোপন করে আছে। তার মা রুগ্না, শয্যাশায়ী। কেরাণী বৃদ্ধ পিতা 'যুগান্তর' 'অনুশীলন' যুগের বিপ্লবী, কিন্তু বামপন্থীদের কর্মকাণ্ডে আস্থাহীন। ফ্ল্যাটে আত্মগোপনে বাধ্য যুবকের আত্মজিজ্ঞাসার প্রয়াসে মৃণালবাবু বিপ্লবের সাফল্য-ব্যর্থতা প্রসঙ্গে মাও-সে-তুং-এর একটি উক্তির সুন্দর ব্যবহার করেছেন: শত্রু ও মিত্র চিহ্নিত করার ব্যর্থতা ও মিত্রের সঙ্গে মিলিত হতে না পারার মধ্যেই বিপ্লবপ্রয়াসের ব্যর্থতার মূল কারণ নিহিত। একটি মিত্রের সাক্ষাত পাওয়া গেল পার্ক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে। কেরাণী বৃদ্ধ পিতা

তুমি

ধনঞ্জয় দাশ

১.

স্বপ্নের সমুদ্র থেকে
বাস্তবের শ্যাম শস্য ভূমি
কতদূর জানি না তা,
শুধু জানি সেইখানে
দিন ও রাত্রির কাঁধে হাত রেখে
ডালিম দানার মতো
ভালোবাসা বুকে নিয়ে
অপরূপ সেতু হয়ে শুয়ে আছ তুমি।

২.

তোমাকে দিয়েছি যা
সে-তো শুধু দুঃখের গরল
আমাকে দিয়েছ তুমি
প্রিয়তমা,
ফুল-ফল ছায়াতরু
ভরা মুঠি অমৃত ফসল।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী জীবন

হীরেণ ভট্টাচার্য

মৃত্যুর সাথে কে তর্ক করে, জীবনের সংগীত মৃত্যুর
স্বচ্ছতায় শুদ্ধ, স্বর যার ধ্বনির প্রাকৃত উদ্ধৃতি, আমার
পিঠে হাত রেখে একটা প্রকাণ্ড মানুষ, কবিতা-পুরুষ;
আমি ওর ছায়ার পাশে, স্মৃতির মুক্তো তুলে চলছি,

মুক্ত স্বপ্নের সামনে আলোর আসা-যাওয়া, আমি জানি না
কবিতা কি? আমার ভয়ংকর যাত্রার সঙ্গী আর কে, অথবা
নিজের সীমাবদ্ধতা ; আমি আমার অবয়ব ভেঙে বেরিয়ে আসি
বা জীবন্তে সমস্ত মানুষটা মাটির নিচে ঢুকে পড়ি, মাটির
নিচে আমি সমস্ত মানুষটা, মাটি আমার শরীরের কাছে,
আকাশ-পাতাল আমার চারিদিকে মাটি, মাটি আমার
লোভী জিভে!

সহজও হেঁয়ালি বড়ো

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহজ বলতে কি কথা তেমন সহজ হয়
সহজও হেঁয়ালি বড়ো
বুঝে নিতে অবস্থান কার কোথা
হেঁসেলের পাশে কে ছুঁক-ছুঁক করছে দেখে
কেন দোষ দিচ্ছ তুমি বেড়াল-স্বভাবের
হেঁসেলেরও খোঁজ নিতে হয়

আঁচল টানলেই যদি
সম্ভ্রম হাওদা হাট, খ'সে পড়ে অহংকার
তবে অন্তরালে কারো কারো
চোখে আঁশ, মোচ সুড়সুড় করেই
এমন কি আশ্চর্য বা!

এ সবই তো জানা, তবু
উত্তর জেনেও যদি আঁক-কষতে তোমার এতো দেরি
তবে স্বপ্রকাশে প্রকাশ যার, তারই নামে জয়
একটু ভাবলেই পাবে, খ'সে যাবে ভাবমূর্তি

এ-সময়ে কেনইবা সে লোনাজল ঘোলা করতে
থাবা তুলল ;
অঙ্কটা কি এতোই কঠিন
পুরুষকে প্রেমের কাছে শেখাতে কি হয়
নতজানু হতে
একটু ভেবে দেখলে না
কন্যাকুমারিকা থেকে
দিয়াগো গার্সিয়া কতোদূর !

পায়রা ওড়ানোর কবিতা

প্রভাত চৌধুরী

আমি কি উড়িয়ে দেবো অলংকৃত বাক্স থেকে পায়রার ঝাঁক
নাকি ওদের রক্তাভ ঠোঁটে গেঁথে দেবো স্বপ্নের নোলক
যাতে বর্ণসমারোহে অলৌকিক আকাশের নিচে
ওরা চিনে নিতে পারে লোকালয় থেকে কতদূরে সাঁকো
সীমান্ত পরিধি বরাবর কাঁটাতার খুঁটি কিংবা নিদ্রিত রাইফেল

নিষিদ্ধ প্রদেশে কোন্ দিকে যেতে হবে সাংকেতিক চিহ্নমালা দেখে
আকাশে টাঙানো জালে কোন্খানে ছিদ্রপথ
ইত্যাকার যাবতীয় তথ্য আমি জেনে গেছি তাই
আমি তো উড়িয়ে দেবো অলংকৃত বাক্স থেকে পায়রার ঝাঁক
নির্দেশিত পথে ওরা উড়ে যাবে নিষিদ্ধ স্বপ্নের দেশে ।

তুমি ফিরিয়েছ পথে

বীতশোক ভট্টাচার্য

তুমি ফিরিয়েছ পথে আবার তোমার পথ তোমার ঠিকানা
মৃত্যুর ওপার থেকে অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভগ্ন প্রতি বাঁকে
বৃষ্টিধারা বৃষ্টিধারা তোমার স্নিগ্ধতা শূন্য মগ্নতাকে ডাকে ঃ
ফিরে এসো ফিরে এসো অচেনা পথিক এক গৃহের অজানা
পরিচিত অভ্যন্তরে ঘরের বাইরে এক সন্ধ্যাভ্র আকাশে
নক্ষত্র বিচ্ছুরণ চেনাতে যেমন অন্ধ দিগন্তকে ডাকে
সেরকম শান্ত এসো হাতের উপরে হাত অনুভবে তাকে
চিনে নাও যে ফিরেছে হাঁটু মুড়ে ব'সে আছে তোমার বাঁ-পাশে ।

বন ঝুমকা

কমল চক্রবর্তী

আসবি হে জলদি আয় বাপ
কতকাল অপেক্ষায় আছি, সিনা চাটে আঘনের ধূপ
সরকারী খামার ভেঙে মস্‌ত হাতি নাবে ধান ক্ষেতে
কে কাকে ডরায় শালা, কুম্পানি, দালল, রাত, নীল শঙ্খচূড়
আসমান মহল ঘিরে ফুললতা অর্জুনের প্রকৃত সভ্যতা
তোর ডোঙ্গা কোন জলে ঘুরে, রং চিংগা হাওয়ার মুকুল
মন কাড়ে, চেহারা ডরায় ।

শালবনে যাতে ভয় করে, শুকনো পাতায় শুয়াপুকা
চুটা ফুকে কাটালি জীবন রাতুমাঝি
কাকে ভয় বলে কাকে, বলে রাতের ভুবন, সব ফাঁকা
কেঁদ পাতা চলে যায়, ট্রাকের ডালায় নাচে আগামী মকর ।
টেবো পাহাড়ের গায়ে ঝুম হবে, আয় হে, নাচ হে
তুপু ডাংগে ফুটে ফুল, চিমনী লুটিয়ে পড়ে ভূ-এ
সিনায় আঘন মাস, মস্‌ত হাতি ভাঙে বরাভূম
আয় হে ডিংলা ফুল, চৈইত বোশেখের গাং মেতেছে আতুল ।

পাওয়া
জ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মোমের বাতিটা একটু আগেও
দমকা হাওয়াতে জ্বলছিল
এখন ঘর অন্ধকার
বুকের ওপর অসংখ্য হাপরের
ছুটোছুটি
এক পা এক পা ক'রে
বেশ তো আসছিলাম
খোলা দরজাটা বন্ধ করল কে
নিবন্ত মোমবাতি
জ্বাললেই তো
যা খুঁজছি তা আবার
পেয়ে যাই :
রামধনু আকাশের কোলে
অজস্র সূর্যের
আশ্চর্য ফোয়ারা !

ঘরের দরজা
দেবকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ঘরের দরজা নেই, কিভাবে ঠেকাব
চকচকে ছুরির আঘাত।
ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মুখ বরাবর
এক আততায়ী।
ভয়-ভয় এখন দারুণ,

মুখস্ত নামতা সব হঠাৎ ভুলের রাজ্যে ঢুকে যেতে থাকে
পাসপোর্টহীন,
সমস্ত রংয়ের আলো নিভে যায়, শুধু
জ্বলে নেভে, জ্বলে নেভে, বুক কাঁপা লাল।
তারপর, অপ্রয়োজনীয় তার যুদ্ধের ঘোষণা।
এ ভাবেই রোজ রোজ আমার ভূখণ্ডে
মার্চ করে শত্রুর পতাকা।

আমার ধারণা

মণীন্দ্র চক্রবর্তী

আমার ধারণা ছিল এইসব পথ আমি পায়ে পায়ে যাব
যতবার খুশি। ধূসর পথের পর আমলকি-ছায়া
জাফরির মতো, ইতস্তত ঝরা পাতা, দূরে প্রজাপতি
উপরে পাতায় ডালে রোদ পড়ে, পাখি ওড়ে সীমাহীন নীলে।

আমার ধারণা ছিল এইসব ভালো লাগে শুধু শিশুদের
তাল-ডোঙা চ'ড়ে খাল বেয়ে যেতে যেতে কচুরিপানায় হাত
কি রঙ সে ফুল, আশ্বিনের স্রোতে চোখ রাখা স্বচ্ছ জলে
শেওলা কাঁপে, ছুটোছুটি করে মাছ ট্যাংরা পুঁটি বেলে।

দিন যত চলে যায় চোখ হয় পুরাতন, ধারণা থাকে না,
তত ভালো লাগে এইসব : পাহাড়ের পাদদেশে মেঘ ধোয়
বনের বিরাগ, চারদিকে নামে ধারা, কিছু দূরে নদী বয়।
নিজেকে বিলীন ক'রে রেণু রেণু হই আমি আমার সময়।

সময়-বিবর ঘিরে
অনুপ গঙ্গোপাধ্যায়

আমায় বোঝাল বৃক্ষ, "ভালো হও"

আমায় শোনাল নদী, "ভালো হও"

আমায় শেখাল আকাশ, "ভালো হও"।

সময়-বিবর ঘিরে কোথা নদী, কোথা বৃক্ষ ..
তুমিও কি মূক, হে আকাশ—শুধু প্রশান্ত নয়নে
বিস্তীর্ণতা মেলে দাও—এ কেমন ক্ষমা ?

ফেরার
জয়ন্ত সান্যাল

কাচের বাইরে জমে হিম···

মানুষ মুখোশ আর
চলমান ছায়ারা উদয়াস্ত পাহারা দেয়
উদয়াস্ত চীৎকার ক'রে ব'লে যায়
"ফেরার ফেরার"

তারপর দৌড়। নৌকো বেয়ে
চর···জ্যোৎস্না···চকচকে বালি।
ক্রমশ দূরান্তরে আবার

জলে ঘূর্ণীর শব্দ, শবের
মতো নিষ্কম্প নিজের ছায়া,
আরো নীচে নিকষ পর্দা
অনচ্ছ তারা

অথচ সবকিছু মিলিয়ে চীৎকার এক
"ফেরার ফেরার"

সে ওই জঙ্গলে গেছে

রামচন্দ্র প্রামানিক

সে ওই জঙ্গলে গেছে, ওই হিম স্তব্ধ আবহাওয়া
বুক ভ'রে টেনে নিয়ে দাঁত চেপে বলেছে "সেলাম",
আর তৎক্ষণাৎ হেসে দশ হাতে মাদিল বাতাস
দেবদারু সেগুনের ঘাড় ধ'রে নাচিয়ে ছেড়েছে;
হামা দেয় অন্ধকার, চমকে ডেকে ওঠে খেঁকশিয়াল—
হাতিয়া পাহাড় ফুঁড়ে উঠে আসে রক্তমাখা চাঁদ।

রক্ত সবারই হাতে লেগে থাকে, কাঁচা গন্ধ ওঠে, তাই
রমারা দু-হাতে নেয় গোলাপজল, কাগজের ফুল—
এসব সে জেনে গেছে, কারণ সে স্বচক্ষে দেখেছে
কিভাবে চতুর্থ দিনে ধূপ-ধূনোয় বিবর্ণ দেখায়
শারদীয়া কলকাতার পিঁপড়ে ধরা আখের প্রতিমা।

এখন সে শুয়ে আছে জঙ্গলের দক্ষিণ চাতালে,
চারদিকে সারিবদ্ধ মুখকালো ঝোপের মিছিল
হা হা নাচে হাওয়া, ছায় তালি, ছায় শিস,
বুড়ো শিমূলের ডালে ঝুলে থাকে রক্তমাখা চাঁদ
মাটিতে ছড়ায় লাল, কিছু নয়, শিশির—শিশির;

উস্রি নদীতে বাজে ঘণ্টা, বন ম ম করে পাহাড়ী কুসুমে।

অগ্নি ও সুরেন

মতি মুখোপাধ্যায়

মুখোমুখি ব'সে আছে অগ্নি ও সুরেন:
নতজানু সুরেনের দুই হাতে খড়,
অগ্নির পদতলে সে দেবে অঞ্জলি;

কেননা তুষ্ট হলে, প্রীত হলে তিনি
দেবেন তীব্র তাপ : এই শীতে সুখ—
যার মুখ কতকাল ছাখে নি সুরেন।
কে ছাখাবে···সুপারিশ শো-কেসে ঝোলানো।
ছেলেদের ক্ষিদে পেলে বলে সে গোপনে :
চুপ কর, এই মাসে মাইনেটা পেলে
রাজভোগ কিনে দেবো। মা-র শান্তিপুরী
আসবে রঙীন শাড়ি। বোনের স্লিপার।
এখন রোদ্দুরে যাও, স্বাস্থ্য ভালো হবে।

সুরেনের হাতে ছিল চাবি···মেশিনের,
চাকরিটা চ'লে যেতে সেও চ'লে গ্যাছে।
ধুনুরির মতো আঁশ লোহার উড়িয়ে,
ইস্পাতের দাঁতে কেটে—সুরেনের কাজ
ছিল সূক্ষ্মতম। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ··তার চেয়ে
ভালোবাসা গভীর—গভীরতম বুকে।
কিন্তু প্রভু ছাখেনিক তার দিকে ফিরে,
ছাঁটাই সুরেন তাই ছায়া নিয়ে চুপ।

অগ্নি নেই···শীতলতা তাঁর তিরোধানে ;
ফিটার সুরেন আর কিছু কালো ছাই।

০

লেভিটা বাড়ে···

বৌধায়ন মুখোপাধ্যায়

অনেকদিন আগে শোনা গানগুলি স্মৃতি ডাকে, ডেকে ডেকে আনে
গ্রামে ফিরে গিয়ে সোনাঝুরি গাছটার সঙ্গে সাক্ষাতের সুখে
আধখানা পাপ মুছে যায়, শির্ শির্ সাপের মৈথুনে।

গতকাল এইখানে মারা গেল বুধুয়ার ছোট ছেলে
বুঝি ছুটে চলে শক্তিমান শিশুহন্তা ট্রাকটা—আশা হাতে।
অমিতার ডান পায়ে ছোট্ট একটা লাল, গত রাতে ভাগ্যবান মশাটির আঁচড়
নিথর ঝুপঝুপি, আকন্দ পাতার মর্মর। তিন লাফে পার হই সিঁড়ি
অদূরে শ্যামের ভাই মাদকে বিভোর—দিনের রোজগারী এক টাকা নোটে
বিড়িটা জ্বালায়।

বুড়িগুলো ব্লকে গেছে, মাসোহারা নিতে কম্বল কেরোসিনে
মৃতদের ধুকপুকি বাড়ে
রোজগেরে বুড়ি সব…

ইদ্রিস সব জানে :
ইদানিং মাঠের 'জো' এবং জোর দুটোই কমেছে
অথচ ওরা তো খবরই রাখে না তাই জমি আর
ধানে শুধু লেভিটা বাড়ে
লেভিটা বাড়ে…।

উন্মত্ত এ্যাকর্ডিয়ন

পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত

কী ক'রে বাঁধতে হয় উন্মত্ত এ্যাকর্ডিয়ন ?
সুকৌশলে! নির্ভাবনার দিনে ফাঁকা দীর্ঘশ্বাস
সামলে তোলা যেত, তাতেও চুপি চুপি শুয়েছিল
শিথিল পরিতাপ।

সারবন্দী চোখ জ্ব'লে ওঠে পাগলের মতো ;
এখন আকাশে তার নাচ ; স্থবির নিঃশ্বাস
থেকে উগ্র এ্যাকর্ডিয়ন ; তবু চোখগুলো ভাসে।

আফ্রো-এশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকা ঃ সমস্যা ও প্রতিকারের পথ

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নভেম্বর বিপ্লবের পর এশীয় খণ্ডে সোভিয়েত রিপাবলিকগুলির প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমে এশিয়ার আরও কয়েকটি রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্রের বিজয় এই মহাদেশে বিংশ শতাব্দীর সব থেকে বড় রাজনৈতিক ঘটনা। তারপরেই শুরু হয় ইতিহাসের পালাবদল। গত ত্রিশ বছরে এশিয়া-আফ্রিকার দেশে দেশে কয়েকশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং একের পর এক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের উদ্ভব পৃথিবীর মানচিত্রকে এক অনুপম শিল্পকর্মে পরিণত করে। অল্প কয়েকটি দেশের মুক্তি আজও অর্জিত হয় নি। কিন্তু, ইতিহাস-শিল্পীর আঁকা বিশ্বমানচিত্রে অচিরেই যে স্বাধীনতার শেষ আঁচড়টি পড়বে তাতেও কোনো সন্দেহ নেই।

এশিয়া-আফ্রিকা দুই মহাদেশ আজ ছোট-বড় অসংখ্য রাষ্ট্রের সমাহার। বহু তাদের ভাষা, বিচিত্র তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। তদুপরি আছে গত কয়েকশো বছরের অসম বিকাশের দায়ভাগ।

এশিয়া-আফ্রিকার সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকা বিষয়ে আলোচনার পৃষ্ঠপট হিসেবে এই ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য এবং অসম বিকাশের ইতিহাসটি তাই সর্বদাই স্মরণে রাখা দরকার। যে দেশ সমাজতন্ত্র গড়ছে, যে দেশ স্বয়ম্ভরতার পথে নিজেকে বিকশিত করছে, আর যে দেশ জাতীয় মুক্তির জন্য লড়ছে—তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রের সমস্যা সর্বতোভাবে এক হতে পারে না।

তবে, উন্নয়নশীল ও মুক্তিকামী দেশগুলির সমস্যার প্রকৃতিতে অনেকখানি মিলও আছে।

১. নিরক্ষরতা এই দেশগুলির সাধারণ অভিশাপ। আর অক্ষর জ্ঞানের প্রসার ব্যতিরেকে সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রের পাঠকসমস্যা কিছুতেই মিটবে না, বৈষয়িক স্ব-নির্ভরতাও অনায়ত্ত থেকে যাবে।

২. উপনিবেশ মাত্রেই শাসকশক্তির প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ অর্থে আধুনিক শিক্ষার সূচনা হয়। এই প্রথাগত শিক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ বার বার সমালোচনা করেছেন। ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে একদা এশিয়া-অফ্রিকার বিভিন্ন ভাষা

সাহিত্য ও সভ্যতা সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ থেকে উপনিবেশ-প্রভুর ইতিহাস মুখস্থ বলতে হত। এর ফলে আফ্রিকা ও এশিয়ার ভাষাগুলির মধ্যে যথোচিত লেনদেন হতে পারে নি। পরন্তু, সদ্যস্বাধীন অনেক রাষ্ট্রেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে এমন এক ধরনের হীনম্মন্য বিজাতীয় মনোভাব দানা বেঁধেছে, যার ফলে নিজ দেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতা ও আন্তর্জাতিকতার সুষ্ঠ মেলবন্ধন অদ্যাবধি ঘটে নি। এর দায় সেই দেশের সংস্কৃতি আন্দোলন তথা সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকাকে বহন করতে হচ্ছে।

৩. বিশেষত আফ্রিকায় ভাষা ও লিপির বৃহৎ সমস্যা আছে। আফ্রিকেয় ভাষাগুলির প্রায় কোনোটারই নিজস্ব লিপি নেই। সুদীর্ঘ পরশাসনের ফলে উপনিবেশ-প্রভুর (ইংরিজি; ফরাসী, ডাচ প্রভৃতি) ভাষাতেই আফ্রিকার সাহিত্য রচিত হচ্ছে।

ফলে আফ্রিকার বহু ভাষার অসামান্য লোকসাহিত্য লোকগীতির কোনো লিখিত রূপ আমরা পাই না।

সন্দেহ নেই নতুন আফ্রিকায় নতুন সাহিত্যের জোয়ার এসেছে—মহৎ সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু মাতৃভাষা ব্যতিরেকে প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না। দেশের বৃহত্তম পাঠকগোষ্ঠীর সঙ্গে তার নাড়ির যোগও গড়ে ওঠে না।

অর্থাৎ সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায় এবং পাঠকের অভাবে তার শেকড়ে পোকা ধরে। ফলে হয় তাকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়, নয় তার অপমৃত্যু ঘটে।

ভাষা ও লিপির এই সমস্যা এশিয়া মহাদেশেও কম নয়।

ভারতের কথাই ধরা যাক। আমাদের এই রাষ্ট্রে পাঁচ শতাধিক ভাষা ও ডায়লেকট আছে। কিন্তু লিপি আছে কুড়িটিরও কম।

ফলে ভারতের জাতীয় সংস্কৃতি বিপুল ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সংখ্যালঘু বহু জাতি-উপজাতির সাহিত্য গড়ে উঠছে না, সংস্কৃতি লোপ পাচ্ছে।

বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতি ও ভাষা সমস্যার বৈজ্ঞানিক সৃজনশীল সমাধান করেছিল। তারই ফলে সোভিয়েত তথা বিশ্ব সভ্যতার আজ কতই না ঐশ্বর্য। সে দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রগুলি এই কারণেই লোক-সাহিত্য-সংস্কৃতির নানা উপচারে এত সমৃদ্ধ!

এশিয়া-আফ্রিকার বহু দেশকেই এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

বহুভাষী রাষ্ট্রের অন্য সমস্যাও আছে। অসম বিকাশের বিড়ম্বনা শুধু যে দুই

ভিন্ন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়, ভারতের মতো বৃহৎ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষা ও অঞ্চলের অসম বিকাশও নানা সমস্যা সৃষ্টি করে।

ভারতে সংবিধানের তালিকাভুক্ত ভাষা ১৬টি। এই ১৬টি ভাষার লিখিত সাহিত্যের মান এক নয়, হতেও পারে না। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য- সংস্কৃতি পত্রিকাগুলির মান এবং অসম বিকাশজনিত সমস্যাও সর্বদা এক নয়।

এবং এরই ফলে কোনো কোনো ভাষার মধ্যে উচ্চমন্যতা দেখা দেয়। আপন শ্রেষ্ঠত্বের অভিমানে অনেক সময় সে নিতান্ত প্রতিবেশী সাহিত্য সম্পর্কেও অজ্ঞ থাকে। এশিয়া-আফ্রিকার অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহিত্য সম্পর্কে এই অজ্ঞতা যে আজও নানা কারণেই প্রবল আগেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হচ্ছে একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত ভাষাগুলির পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার কথা। পরিণামে জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সংহতির বিকাশে গুরুতর বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। আর তার দায় বহন করে সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রগুলি।

অর্থাৎ মূলত এ হল বিচ্ছিন্নতার সমস্যা। কয়েকশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসন এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের সমগ্রতাবোধের অভাব এশিয়া-আফ্রিকা মহাদেশে বিচ্ছিন্নতার এই বিপুল দায়ভাগ সৃষ্টি করেছে।

অনেক সময় তারই ফলে কোথাও বিদেশী ভাষায় কোথাও বা বিদেশী আদলে সাহিত্য সৃষ্টি হয়। স্রষ্টা মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত নাগরিক। তারই ফলে রাষ্ট্রের গরিষ্ঠ সংখ্যক অধিবাসী নিরক্ষর থেকে যায় এবং লিখিত সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে দরিদ্র অশিক্ষিত জনসাধারণের ব্যবধান বাড়তেই থাকে, তারই ফলে একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন ভাষার বা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক চেনা-জানা-পূর্বরাগ-মিলন এত কম।

৪. প্রতিক্রিয়া এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নেয়, তাকে বাড়াতে সাহায্য করে।

এশিয়া-আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদ পরাস্ত হয়েছে, হচ্ছে। তার নয়া-ঔপনিবেশিক নীতি সে কারণেই নতুন নতুন ছদ্মবেশ ধরছে।

শিল্প-সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবক্ষয়ী সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাবাদর্শগত অনুপ্রবেশ তো আছেই। তারও পর কি শিক্ষা, কি সাহিত্য, কি শিল্প—গোটা সাংস্কৃতিক জগতে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ অনুপ্রবেশ এবং প্রতিক্রিয়াকে সব ধরনের সহায়তা দান আজ আর কিছু গোপন ঘটনা নয়।

সাম্রাজ্যবাদকে সঠিকভাবেই অকটোপাসের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তার

একটা শুঁড় সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের অবশেষকে জীইয়ে রাখে—ধর্ম বর্ণ জাতি ভাষা অঞ্চলগত বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতার আকাঙ্ক্ষাকে বিপজ্জনকভাবে শক্তিশালী করে, অন্ধ কুসংস্কার ও দুর্জ্ঞেয়তাবাদকে মনে বদ্ধমূল রাখতে চায়।

সাম্রাজ্যবাদের আরেকটা শুঁড় অর্থহীনতা শূন্যতা বিচ্ছিন্নতার অনুভবগুলি জন্ম দেয়, বাড়ায়। এইভাবে মানবসভ্যতার সমস্ত অর্জনকে মিথ্যা প্রমাণ করে, মানবিক মূল্যবোধ ধ্বসিয়ে দেয়।

অর্থাৎ সমাজের নিরক্ষর ও শিক্ষিত, প্রাচীনপন্থী ও আধুনিক অংশের জন্য অকটোপাসের হরেক শুঁড় একই সময়ে সক্রিয় থেকে বিচ্ছিন্নতার শর্তাবলীকে জীইয়ে রাখে। ফলে রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে গভীর সংকট থেকেই যায়।

বলা বাহুল্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রগুলিকে এই সংকট নিয়ত বিপন্ন করে।

॥ দুই ॥

এশিয়া-আফ্রিকার এই মোটামুটি সাধারণ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এবার একটু বিশেষ অভিজ্ঞতার বিবরণ দেওয়া যাক।

আমি বাঙলাভাষী, বাঙলায় লিখি। পশ্চিমবঙ্গ ভারত প্রজাতন্ত্রের অন্যতম রাজ্য, বাঙলা এই রাজ্যের মাতৃভাষা, ভারতের ১৬টি রাষ্ট্রভাষার অন্যতম ভাষা।

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে বাঙলা সাহিত্যের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুবাদে এই শতাব্দীর প্রথম পাদেই বাঙলা সাহিত্যের বিশ্বস্বীকৃতি ঘটে।

বাঙলা ভাষায় সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকার উদ্ভব ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে।

সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকার ভূমিকা কি? এক কথায় বলা যায়, তা হল পত্রিকার পাঠকদের প্রাচীন বদ্ধ মানসজগৎ থেকে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করা, তাদের প্রাচীন সামাজিক রাজনৈতিক জগৎ বদলাতে উদ্বুদ্ধ করা। অর্থাৎ দেশে সামাজিক আর্থনীতিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক উত্তরণের আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

সেদিন বাঙলা ভাষার সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকাগুলি নানা পিছুটান এবং সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মোটামুটি সততার সঙ্গে এই ভূমিকা পালন করতে চেষ্টা করেছিল।

এই উনবিংশ শতাব্দীতেই আমাদের ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক বিশ্বের মানস পরিণয় ঘটে।

মনে রাখা দরকার ১৮২৯ সালে এদেশে আইন করে সতীদাহ প্রথা রদ হয়, ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ হয়, ১৮৭৩ সালে হয় অসবর্ণ বিবাহ আইন। আমাদের তদানীন্তন সামাজিক পরিবেশটি বুঝতে এই ঘটনাগুলি সাহায্য করবে।

বাঙলা ভাষায় প্রথম আধুনিক নাটক 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয় ১৮৫৯-৬০ সালে। প্রথম আধুনিক মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। প্রথম আধুনিক উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ সালে। বাঙলাদেশে সাধারণ নাট্যশালার উদ্বোধন হয় ১৮৭২ সালে।

একই বছর প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্র 'বঙ্গদর্শন'।

বাঙলা ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির আন্দোলনে তথা বাঙালির সর্বাত্মক জাগরণে 'বঙ্গদর্শন' সেদিন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ-প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

'বঙ্গদর্শন'-এর সূচনাপত্রে লেখা হয়েছিল "...এমন অনেক কথা আছে যে, তাহা কেবল বাঙ্গালির জন্য নহে; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, একপরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয়; কেন না এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালি, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী, ইহাদের সাধারণ মিলন-ভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যতদূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালি কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। ...আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময় ধরা পড়িব।...গিল্টী পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্দরী মূর্ত্তি অপেক্ষা, কুৎসিতা বন্যনারী জীবনযাত্রায় সুসহায়।...যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।...

"...সমগ্র বাঙ্গালির উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্‌কালে বুঝিবে, এমত প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালি কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনিবে না, ভবিষ্যতে কোনকালে শুনিবে না।..."

কত বড় উদ্দেশ্য সাধনে সেদিন একটি সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্র প্রকাশিত হয়েছিল এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

বাঙলাদেশে এই সময়েই মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব। আমাদের সমাজসংস্কার, রাষ্ট্রীয় ভাবনা এবং মানবিক মূল্যবোধে উদ্দীপিত সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনে এই মধ্যশ্রেণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮), 'বঙ্গদর্শন', 'সাধনা' (১৮৯১) প্রভৃতি তৎকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্র সেদিন যেমন আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নতুন তাৎপর্য দিয়েছে, তেমনই দীক্ষিত করেছে তার পাঠকদের। এবং তারই ফলে এই উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের এক ধরনের 'নব জাগরণ' সম্ভব হয়েছে।

আর, এই সূত্রেই বাঙলাদেশে তথা ভারতে আস্তে আস্তে দানা বেঁধেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তির আন্দোলন।

'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত "বন্দে মাতরম" ধ্বনি কণ্ঠে নিয়ে আমাদের শত-সহস্র দেশপ্রেমী শহীদ হয়েছে। আজও জাতীয় কংগ্রেস দলের ধ্বনি সেই "বন্দে মাতরম"।

বিংশ শতাব্দীতেও দীর্ঘকাল সে-ধারা অব্যাহত ছিল। তারই ফলে বাঙলাদেশে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের বহু নেতাই হয় নিজে সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্র প্রকাশ করেছেন, নয় কোনো না কোনো ভাবে তার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। উদাহরণ হিসেবে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুভাষচন্দ্র বসুর নাম অনায়াসেই করা যায়।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ত্রুটিতে ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা পেলাম, জন্ম হল ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের।

১৯৭১ সালে অবৈজ্ঞানিক দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রায়শ্চিত্ত করলেন তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলমান মানুষ। মুক্তিযুদ্ধে অপরিসীম ত্যাগ ও বীরত্বের মধ্য দিয়ে জন্ম নিল স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্র বাঙলাদেশ। নতুন এই রাষ্ট্রের মাতৃভাষা বাঙলা এবার বিশ্বের দরবারে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা অর্জন করল।

বাঙলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ তার প্রতিবেশী ও বন্ধু ভারত রাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য। বাঙলা উভয়েরই ভাষা। কিন্তু আমি এতক্ষণ বাঙলা সাহিত্যের কথা যা বলেছি বা পরে যেটুকু বলব—একান্তভাবেই তা হচ্ছে দেশভাগের আগের ও পরের ভারতের অভিজ্ঞতা।

১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্টের পর স্বাধীন ভারতের জাতীয় জীবনে শুরু হল সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়।

বলা নিষ্প্রয়োজন ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের 'রেনেসাঁস' ছিল অর্ধসমাপ্ত, খণ্ডিত। তা এসেছিল মুষ্টিমেয় ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত জমিদার, ছোটোখাটো পুঁজিপতি এবং মধ্যশ্রেণীর কিছুসংখ্যক সচ্ছল চাকুরিজীবীর হাত ধরে।

দেশের তাবৎ জনসাধারণের সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রায় ছিল না বললেই চলে। বস্তুত, শোষিত নির্যাতিত এ দেশের অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষায় অক্ষর-পরিচয়ই ঘটে নি। সুতরাং 'বঙ্গদর্শন'-এর উপরে উল্লিখিত সাবধানবাণী সত্ত্বেও আমাদের নতুন সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসীর যথার্থ সম্পর্ক কোনোদিনই গড়ে ওঠে নি।

স্বাধীনতার পরও নিরক্ষরতার এই অভিশাপ দূর হল না। ফলে ১৯৭৪ সালেও পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৭০ জনই থেকে গেল অক্ষরজ্ঞানহীন। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিও ক্রমেই হয়ে উঠল প্রধানত শহর-কেন্দ্রিক এবং আজ পর্যন্ত রয়ে গেল ইংরিজি শিক্ষায় শিক্ষিত পাঠকদের চৌহদ্দির মধ্যে।

আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলতে পারে নি বলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের যথেষ্ট অগ্রগতি সত্ত্বেও সমাজের এই গরিষ্ঠ অংশ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে থেকে গেল পশ্চাৎপদ, প্রায় 'আউটসাইডার'।

আগেই বলেছি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রগুলি বুর্জোয়া ও মধ্যশ্রেণীর পাঠকদের দীক্ষিত করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রয়োজন ছিল শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীকে দীক্ষিত করা। আমরা তা পারি নি, আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলন মোটের ওপর তার পুরনো পাঠকের চৌহদ্দির মধ্যেই ঘুরপাক খেতে লাগল। সেই পাঠকদের পারল না নতুনতর দীক্ষায় দীক্ষিত করতে, অচলায়তন ভেঙে নিজেও বেরোতে অসমর্থ হল। 'সবুজপত্র' মারফৎ ১৯১৪ সালে একবার ক্ষীণ চেষ্টা

করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। চল্লিশের দশকে 'পরিচয়'ও কিছু চেষ্টা করে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয় একথা মানতেই হবে।

অর্থাৎ, সেই বিচ্ছিন্নতা।

অন্যপক্ষে, স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতেও মনোপলির আধিপত্য ঘটল। ফলে শিল্প-সাহিত্য হয়ে উঠল লাভের কড়ি যোগানো পণ্য।

সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকাগুলি আগে প্রকাশিত হত আদর্শ থেকে। একচেটিয়া পুঁজি-প্রকাশিত সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকা অনিবার্যভাবেই আদর্শভিত্তিক না হয়ে হল মুনাফাভিত্তিক। মুনাকার স্বার্থে শিল্প-সাহিত্যের প্রগতিশীল আদর্শ সে হারিয়ে ফেলল। শুধু তাই নয়, সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকার চরিত্র আর চেহারাও পাল্টে দিল। কোথায় রইল 'বঙ্গদর্শন' 'সবুজপত্র' 'পরিচয়'-এর ঐতিহ্য!

ফলে পশ্চিমী অবক্ষয়ী সাহিত্য-সংস্কৃতির আদলে গড়ে উঠল 'পপ' সাহিত্য-সংস্কৃতির মনোরম বেসাতি। প্রগতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক ধারণায় দীক্ষিত পাঠকদের একাংশ সহ পাঠকসাধারণের গরিষ্ঠ অংশের রুচিকে এই সাহিত্য-সংস্কৃতি দিনে দিনে বহুলভাবে প্রভাবিত করল। লেখকদেরও এক বৃহৎ অংশকে মনোপলি এই সাহিত্যের যোগানদার হতে বাধ্য করল। এই পাপচক্রে দেশের সৎ সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা দ্রুত কমতে লাগল। এদেরই হাতে জনমাধ্যমগুলি থাকায় সিনেমা, থিয়েটার, রেডিও, যেখানে যেটুকু আছে টেলিভিশন, এমন কি প্রাচীন যাত্রা এবং লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির ওপরও এই অসৎ রুচির প্রভাব পড়ল।

বলা বাহুল্য মনোপলির এই পত্রিকাগুলিকে সাম্রাজ্যবাদ ও স্থানীয় প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সব ধরনের সহায়তা করতে লাগল।

ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকার প্রকৃত ভূমিকা পালনে ইচ্ছুক পত্রিকাগুলির পক্ষে মনোপলি পত্রিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ল। বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত এই জাতীয় পত্রিকার কয়েকটি তাই উঠে যেতে বাধ্য হল, কয়েকটি ভোল পাল্টাল, কিছু বা টিম টিম করে চলতে লাগল।

পশ্চিমবঙ্গে কোনো কোনো বামপন্থী পার্টির উদ্যোগে কয়েকটি সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে তাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির দরুণ এই পত্রিকাগুলি মনোপলি পত্রিকার কোনো বিকল্প সৃষ্টি করতে পারে না। সংখ্যাতত্ত্ব, দিয়েই প্রমাণ করা যায় তাদের ভোটাররাই তাদের

পত্রিকা কেনে না। ফলে এই ধরনের পত্রিকার আর্থিক সংকটও কিছুতেই ঘোচে না।

পরন্তু প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু প্রগতির তথাকথিত শিবির অত্যন্ত বিভক্ত। ফলে মনোপলি দিনে দিনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

আর, জীবিকার স্বার্থে বা প্রকাশ-মাধ্যমের প্রয়োজনে সৎ লেখক-শিল্পীদের ক্রমেই শিল্পকে পণ্য করতে হয়। প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রগুলি লেখকদের প্রয়োজনীয় অর্থ ও পাঠক যোগাতে পারে না বলে ক্রমেই লেখকদের হারাতে থাকে।

বলা বাহুল্য, জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির বা কোনো ভাষার সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রের পক্ষে এই ক্ষতির কোনো তুলনা নেই।

প্রতি বছর শরৎ ঋতুতে বাঙলা ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকাগুলি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। বাঙলা ভাষার সৃজনশীল সাহিত্যে যেন সৃষ্টির জোয়ার লাগে। মনোপলি পত্রিকা এই সময় বিশেষ বিশেষ লেখককে ফরমায়েশ দিয়ে শুধু গল্প-উপন্যাসই লেখায় না, সেই লেখকদের সেই ঋতুতে ভিন্ন পত্রিকায় উপন্যাস না লেখার নির্দেশও দিয়ে দেয়।

স্বাধীন দেশে শিল্পীর স্বাধীনতা আজ কোথায় এসে ঠেকেছে।

সৌভাগ্য আমাদের যে সৎ ও প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির পক্ষে লেখক-শিল্পীদের একাংশ এবং পাঠক-দর্শক-শ্রোতাদের একটি অংশ অতন্দ্র সংগ্রাম করছে। এমন কি মনোপলির পত্র-পত্রিকায়ও মাঝে মধ্যে সেই সংগ্রামের স্বাক্ষর থাকে।

॥ তিন ॥

ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, তৃতীয় বিশ্বের সম্মানিত সদস্য।

সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়া ভারতের স্বয়ম্ভর অর্থনীতি গড়ার ঘোষণা, প্রগতিশীল পররাষ্ট্রনীতি ও সমাজতান্ত্রিক জগৎ বিশেষত সোভিয়েত-ইউনিয়নের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান মৈত্রীকে ভালো চোখে দেখে না। ভারতের সাংবিধানিক গণতন্ত্রও তাদের চক্ষুশূল। এদেশের সামাজিক প্রগতি তারা চায় না।

উন্নয়নশীল অনেক রাষ্ট্রের মতোই ভারতের বিরুদ্ধেও তাই সাম্রাজ্যবাদের হুমকি আর ষড়যন্ত্রের অবধি নেই। তার অজস্র উদাহরণ তো চোখের সামনেই আছে।

সাম্রাজ্যবাদী অকটোপাসের অনেকগুলি শুঁড়ের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে উগ্র দক্ষিণ এবং উগ্র বাম প্রবণতার শুঁড়ও আছে। তারা নানা ছদ্মবেশে ভারতে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে কাজ করছে। কিছু অবশ্য প্রকৃত সৎ কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে বিভ্রান্ত ব্যক্তিও আছেন যাঁদের আন্দোলন কার্যত প্রতিক্রিয়াকেই সাহায্য করছে।

ভারতের বামপন্থী ও জাতীয় গণতান্ত্রিক দলগুলির এই পরিস্থিতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার হওয়া কর্তব্য।

বর্তমানে ভারতে কোথাও কোথাও সর্বাত্মক বিপ্লবের নামে সাংবিধানিক গণতন্ত্রবিরোধী একধরনের ফাসিবাদী আন্দোলন চলছে।

লক্ষণীয় যে মনোপলির সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকাগুলি সুকৌশলে এই আন্দোলনকে মদত দিচ্ছে। তাদের কিছু লেখক এই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিচ্ছে।

তাছাড়া ভারত সরকারের প্রগতিশীল পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে এই জাতীয় পত্রিকাগুলি প্রায়ই কলম ধরে।

সর্বোপরি ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর বিঘোষিত নীতির এরা প্রকাশ্য শত্রু। সলঝেনিতসিন বা তথাকথিত চিনি রপ্তানি···যে কোনো অছিলায় এই পত্রিকাগুলি ভারতের সরকারী নীতিকে আক্রমণ করে এবং পাঠকদের সোভিয়েতবিরোধী, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া-বিরোধী, কমিউনিস্টবিরোধী প্রচারে উত্তেজিত করতে চায়।

আগেই বলেছি মনোপলির অর্থ ও সংগঠনের তুলনা নেই। দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়ার সাহায্য তারা নিয়মিত পায়। এমন কি আমলাতন্ত্রের মূঢ়তায় বা ষড়যন্ত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার সিংহভাগও পায় তারাই।

সৎ প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকাগুলি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে সরকার ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে যথোপযুক্ত বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য সাহায্য পায় না। তাদের পাঠকসংখ্যাও সীমিত একথা আগেই বলা হয়েছে। ফলে সংকট ক্রমেই বাড়ছে। দুর্ভাগ্য এইখানে যে জাতীয় সরকার এবং দেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী পার্টিগুলি ভুলে যায় সৎ প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকা যদি বাঁচতে না পারে তাহলে মনোপলি পত্রিকা পরিবেশিত অপসাহিত্য-সংস্কৃতির চেতনায় দীক্ষিত পাঠক সমাজ আমাদের উন্নয়নশীল দেশের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতকেই বিপন্ন করবে।

তাছাড়া ভাষাগত ব্যবধানের জন্য ও সাংগঠনিক তৎপরতার অভাবে ভারতেরই বিভিন্ন ভাষার সৎ প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকাগুলির মধ্যেও যথোচিত সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। ফলে একই সমস্যায় আক্রান্ত হয়েও যৌথভাবে তার মোকাবেলা করার চেষ্টা প্রায়ই ঘটে না।

বিদেশী ভাষার এবং ভিন্ন রাষ্ট্রের সৎ ও প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রগুলির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের স্তরে আমরা ভারতের ঐক্য এবং এশিয়া-আফ্রিকার সংহতিতে প্রকৃতই বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মানস চর্চায় এবং সাহিত্য-সংস্কৃতির আন্দোলনে এ কারণে তার সংগঠিত প্রকাশ কম দেখা যায়।

কলকাতা শহর তার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক চেতনার সূত্রে জগদ্বিখ্যাত। এখানে মানুষ ভিয়েতনামের জন্য রক্ত দিয়েছে। এশিয়া-আফ্রিকার প্রতিটি মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে এ শহর রাজপথে নেমে মিছিল করেছে। কিন্তু এশিয়া-আফ্রিকার সাহিত্যের সঙ্গে আমরা যথেষ্ট পরিচিত একথা বলা যায় না।

এ ব্যাপারে সৎ ও প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকাগুলিরও কিছুটা আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

॥ চার ॥

এই অবস্থার অবসান হওয়া দরকার।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তাই কয়েকটি কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. দেশের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলিকে রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশে পাশে সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

জাতীয় সরকারকে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-একচেটিয়া পুঁজির সর্বগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করে বিজ্ঞাপন এবং আর্থিক অনুদান প্রভৃতির মাধ্যমে এই সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়া-বিরোধী সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনকে ইতিবাচক সাহায্য করতে হবে। স্বল্পমূল্যের গণ-প্রকাশনার কথাও এই প্রসঙ্গে ভাবতে হবে।

এই সঙ্গেই নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচীকে ক্রমে সফল করতে হবে। তা নইলে প্রকৃত সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের ভিত্তিই গড়ে উঠবে না।

২. ভাষা নির্বিশেষে প্রতিটি প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকাকে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। জাতীয় স্তরে তার শাখা থাকবে।

এই পত্রিকাগুলি প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিজ্ঞাপন দেবে, জানাবে পরিচিতি।

তাছাড়া যেখানে সম্ভব একে অন্যের জন্য বৈষয়িক ভিত্তিতে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করবে।

৩. প্রগতিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকা মাত্রেরই একটি যোগ্যতাসম্পন্ন অনুবাদকমণ্ডলী থাকবে। পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় বাধ্যতামূলকভাবে একটি এশীয় একটি আফ্রিকেয় সৃজনশীল রচনার (সম্ভব হলে মূল ভাষা থেকে, না হলে আন্তর্জাতিক কোনো ভাষার মাধ্যমে) অনুবাদ প্রকাশ করতে হবে।

৪. প্রতিটি পত্রিকাকে নিজ নিজ প্রকাশস্থলে বছরে অন্তত দুটি লেখক-পাঠক সমাবেশ ঘটাতে হবে, তার আলোচ্য হবে এশিয়া-আফ্রিকার সাহিত্য।

৫. বহুভাষী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে উপরোক্ত কর্মসূচী ছাড়াও বিভিন্ন ভাষার লেখক-সম্পাদকদের মধ্যে যৌথ আলোচনাচক্র এবং প্রতিনিধি বিনিময় করা অল্প আয়াসেই সম্ভব।

৬. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এ জাতীয় আলোচনাচক্র এবং প্রতিনিধি বিনিময় ক্রমেই বাড়াতে হবে।

৭. যে সব দেশে শক্তিশালী লেখক সংগঠন আছে সেই দেশগুলি ভিন্ন রাষ্ট্রের কোনো লেখককে ছ মাস বা এক বছরের জন্য আতিথ্য দিতে পারেন।

মনে রাখা দরকার সাম্রাজ্যবাদ ও স্থানীয় প্রতিক্রিয়া-পৃষ্ঠপোষিত মনোপলি সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রগুলি এ ব্যাপারে অনেক এগিয়ে আছে। অর্থ ও সংগঠনের জোরে নিজ দেশের বিভিন্ন ভাষার এবং বিদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকার সঙ্গে তাদের নানা ধরনের আদান-প্রদান নিয়ত চলছে। ফলে তাদের মনোমতো সাহিত্য তারা অনুবাদ করে প্রকাশ করছে বা প্রকাশের জন্য পাঠাচ্ছে। তাদের মনোমতো সাহিত্যিক বিনিময় হচ্ছে। তাদের মনোমতো আলোচনাচক্রাদির সংখ্যার কোনো লেখাজোখা থাকছে না।

এর ফলে দেশে দেশে এশিয়া-আফ্রিকার প্রকৃত বিকাশমুখী সাহিত্য প্রচারিত হচ্ছে না। তাদের মাধ্যমে তা হতেও পারে না।

সে দায়িত্ব ইতিহাস আমাদেরই দিয়েছে। মানব সভ্যতার আদি ধাত্রী এশিয়া-আফ্রিকা নতুন পৃথিবী গড়ার দিকে অনিবার্য পদক্ষেপে এগোচ্ছে।

আফ্রো-এশীয় লেখক সংস্থার মতো মহান সংগঠন এশিয়া-আফ্রিকার

দেশে দেশে যথার্থ সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনকে প্রেরণা দেবে, সাহায্য করবে।

প্রতিক্রিয়ার সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এশিয়া-আফ্রিকার সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রগুলি তাদের সংকট কাটিয়ে উঠবে, তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে—এই সম্মেলনই তার প্রকৃষ্ট গ্যারাণ্টি।

এশিয়া-আফ্রিকার যে দেশগুলিতে এই মুহূর্তে মুক্তিসংগ্রাম দুর্বার গতিতে চলছে—তাদের জানাই ভাইয়ের অভিনন্দন ও শুভকামনা। তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রের কিছু পৃথক সমস্যা থাকা সম্ভব, তার সমাধানও পৃথক পথে হতে বাধ্য।

এশিয়ার যে দেশগুলি সমাজতন্ত্র গড়ার মহান ব্রতে নিয়োজিত—তাদের জানাই ভাইয়ের অভিনন্দন ও শুভকামনা। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপের দিকে আমরা সঙ্গত কারণেই সাগ্রহে তাকিয়ে আছি।

প্রধানত এশিয়া-আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রের সমস্যাই এখানে আলোচিত হল।

কিন্তু এর সমাধান করতে হবে সকলকেই, সম্মিলিত ভাবে।

আফ্রো-এশীয় লেখক সংস্থার আহ্বানে এবং এই লেখক সংস্থার পার্মানেণ্ট ব্যুরো ও লেবানীজ রাইটার্স য়্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম উদ্যোগে গত ২ থেকে ৫ ডিসেম্বর লেবানন প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বেইরুট শহরে আফ্রো-এশীয় দেশগুলির সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকার ভূমিকা ও সমস্যা বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। বেইরুট শহরের বিখ্যাত সারস্বত প্রতিষ্ঠান এডুকেশনাল সেণ্টার ফর রিসার্চ য়্যাণ্ড ডেভলপমেণ্ট এই আলোচনাচক্রকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সর্বতোভাবে সহায়তা করেন।

তিনটি আফ্রিকেয়, দশটি এশীয় এবং সাতটি আরব দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকার মোট একান্নজন সম্পাদক বা সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মী এই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থেকে একজন দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এক শক্তিশালী

প্রতিনিধিদল এসেছিল। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চার দিনের এই আলোচনাচক্রে ইংরিজি ফরাসী বা আরবী—যে কোনো একটি ভাষায় অংশ নেওয়া যেত। প্রতিটি অধিবেশনের শুরুতে নির্দিষ্ট কয়েকজন আলোচক তাঁদের পেপার উপস্থিত করতেন, তারপর হত আলোচনা। এরই ভিত্তিতে শেষ দিনে আলোচনাচক্র একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে।

আলোচ্য বিষয় তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল

১. Role of the Literary and Cultural Magazines in the National Liberation Movement in the Social Progress and Peaee in Africa and Asia.

২. Role of the Afro-Asian Literary and Cultural Magazine in the Movement of the Creativity.

৩. Difficulties that encounter Literary and Cultural Progressive Magazines in Africa and Asia ; Ways and Means to Overcome these difficulties.

৪. ডিসেম্বর আলোচনাচক্রটি তৃতীয় বিষয়ের জন্য নির্ধারিত ছিল। ঐ দিনের বৈকালিক অধিবেশনে আমি আমার প্রতিবেদনটি পেশ করি। আমার মূল বাঙলা রচনার ইংরিজি তরজমা করে দেন অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়। এখানে মূল রচনাটিই প্রকাশিত হল।—লেখক

মেদিনীপুরের পট ও পটুয়া সমাজ

তারাপদ সাঁতরা

আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ অনুশীলন ছাড়া দেশের সাংস্কৃতিক রূপের ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য যে বোঝা যায় না, সে সম্পর্কে একদা রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশবাসীকে আহ্বান করে বলেছিলেন, "......সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রত-পার্বণগুলি বাংলার এক অংশে যেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার বিভিন্নতা আছে। এছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুতঃ দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে।"

সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে অনুশীলন সম্পর্কে সেদিন রবীন্দ্রনাথ যে আলোকপাত করেছিলেন, তা আজ গভীর ভাবে উপলব্ধির বিষয়। দেশের বিভিন্ন অংশের ছোট-বড় ও স্থানীয় সমাজ-সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সন্ধান ও সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি জোর দিয়েছিলেন বেশি করেই; কারণ স্থানভেদে যে সামাজিক প্রথার বিভিন্নতা আছে তা জানা দরকার এবং এই বিভিন্নতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যই প্রয়োজন বিভিন্ন অঞ্চলের জনকৃতির বিস্তারিত বিবরণ। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলের দ্রুত পরিবর্তনের মধ্যে গ্রামীণ সংস্কৃতি ধীরে ধীরে লুপ্ত হতে চলেছে। নাগর সভ্যতার অনেক কিছুই আজ গ্রামীণ সংস্কৃতিকে গ্রাস করতে চলেছে। সেইক্ষেত্রে এই সব বিবরণ অতি সত্বর সংগ্রহ করতে না পারলে গ্রামীণ সংস্কৃতির বহু উপকরণের পরিচয় ও বিবরণ আমরা হারিয়ে ফেলব। সুতরাং এই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই মেদিনীপুর জেলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের এক অবহেলিত উপকরণ 'পটশিল্প' নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করতে চেয়েছি।

পশ্চিমবাঙলার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এমন কতকগুলি জাতি-সম্প্রদায় আছেন, যাঁদের ইতিহাস বড় বিচিত্র। এঁদের মধ্যে চিত্রকরসমাজ হল এমনই একটি দৃষ্টান্ত। অন্যান্য জেলার মতো এই মেদিনীপুর জেলারও বিভিন্ন স্থানে এদের বসতি। এই সব চিত্রকর পটুয়ারা কাগজের উপর পট আঁকেন

আর সেই পট দেখিয়ে গান করে বেড়ান গাঁয়েগঞ্জে। এই সব গ্রামীণ শিল্পীদের দর্শকশ্রোতাও গ্রামীণ, তাই এই সব পটচিত্রের রূপচরিত্রও হল লোকচিত্রের বৈশিষ্ট্যে প্রভাবান্বিত। তাই পটুয়াদের গানের মধ্যে দেবদেবীর লীলা-মাহাত্ম্য থেকে শুরু করে থাকত লোকশিক্ষার অনেক উপকরণ। পৌরাণিক কাহিনীর নীতি-উপদেশ এইভাবে দর্শকদের মনে গভীর রেখাপাত করত। গ্রাম্য লোকজনের কাছে পট দেখিয়ে প্রদর্শনী বাবদ যে সামান্য দক্ষিণা পারিশ্রমিক হিসেবে পেতেন তাতেই এই সব পটুয়াদের কোনো রকমে দিন চলে যেত।

মেদিনীপুর জেলার পট নিয়ে আলোচনার আগে এই জেলার চিত্রকর সম্প্রদায়ের কথা বলতে হয় এবং তাঁদের সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বিবরণ না দিলে বিষয়টির গুরুত্ব অনেকাংশ কমে যেতে পারে। এই চিত্রকর সমাজ গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকেদের কাছে পরিচিত 'পোটো' বা 'পটিদার' হিসেবে। মেদিনীপুর জেলার আদিবাসী সমাজের কাছে এই চিত্রকররা হয়েছেন 'পাটকার' বা 'পাটকিরি' নামে অভিহিত। আমরা যাদুপট অঙ্কনকারীদের 'যাদু পটুয়া' বা 'যদু পটুয়া' বলে থাকি, কিন্তু আদিবাসীদের কাছে এঁরা কখনও 'যাদব পাটকিরি' বা 'যাদব পাটকার'। 'চিত্রকর' কথাটি এঁরা পদবী হিসেবে ব্যবহার করেন। আদিবাসী পটুয়া ছাড়া অন্যান্য পটুয়া সম্প্রদায়ের জাতিগত চরিত্রটি বড় বিচিত্র, এঁরা জাতিতে না হিন্দু না মুসলমান। নাম রাখা হয় হিন্দুদের নামের মতোই, আবার কখনো মুসলমান নাম; কিন্তু পদবী সবারই চিত্রকর। এঁরা নামাজ পড়েন, অন্নপ্রাশনের সময় ছেলেদের সুন্নত করান, মৌলবী এসে এঁদের ধর্মানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। আবার মেয়েরা শাখা-সিঁদুর পরেন, হিন্দুদের দেবীর পূজো দেন। হয়ত কোনোকালে মুসলমান ধর্মের প্লাবনে ধর্মান্তরিত হয়েছেন, কিন্তু জাতব্যবসা ছাড়তে পারেন নি। আজও তার জের টেনে চলেছেন অর্ধেক হিন্দু আর অর্ধেক মুসলমান হয়ে। বর্তমানে এই চিত্রকর সম্প্রদায়ের কেউ কেউ ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে শুদ্ধি করে একেবারে পুরোপুরি হিন্দু হয়েছেন। অন্যদিকে কেউ কেউ শুদ্ধির পরেও সেই পুরনো অবস্থায় ফিরে গেছেন।

মেদিনীপুর জেলায় চিত্রকরদের বাস যে এলাকায় এখনও রয়েছে এবং যাঁরা এখনও লোকশিল্পের এই পট অঙ্কনের ধারাটিকে টিকিয়ে রেখেছেন, সেই সব স্থানগুলি হল—নাড়াজোল, শিউরি, কেশববাড়-গোগ্রাম, ঠেকুয়াচক, নানকারচক,

বাসুদেবপুর, কুমীর মারা, আকুবপুর, চৈতন্যপুর, নয়া, মলিগ্রাম, শতানচক্, কুতুবপুর, গোলগ্রাম, আমদাবাদ, হবিবচক্ ও মুরাদপুর।

আদিবাসী পটুয়ারা প্রধানত ঝাড়গ্রাম, বীণপুর ও ধলভূমগড় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ রয়েছেন। এদেরও পদবী চিত্রকর। কিন্তু আদিবাসী ও ভূমিজ সমাজের মধ্যে এই চিত্রকর পাটকিরিদের আলাদা কোনো জাত নেই। ছবি আঁকা ও পট দেখানোর জন্যে এদের পদবী চিত্রকর; চিত্রকরের উপজীবিকা ত্যাগ করলে আবার তারা সেই পুরনো পদবীতে ফিরে যান।

এই জেলার পটুয়ারা সাধারণত দু'ধরনের পট তৈরি করে থাকেন। তার মধ্যে একটি হল 'জড়ানো পট', আর একটি হল যাদুপট বা যদুপট। জড়ানো পট চওড়ায় সাধারণত এক ফুট থেকে দেড় ফুট হয় এবং লম্বায় শিল্পীর রুচিমত দৈর্ঘ্য বিন্যস্ত হয়। কখনও আট-দশ হাত থেকে পনের-ষোল হাত পর্যন্তও হয়। এত বড় পট হওয়ার জন্যে তা দুই প্রান্তে দুটি কাঠির সঙ্গে জড়ানো থাকে। যখন একদিকের পট খোলা হয় তখন পটে আঁকা সব ছবিটা একসঙ্গে না খুলে ধীরে ধীরে খুলতে থাকে। আর পটে অঙ্কিত কাহিনী একটার নীচে আর একটা অংশে ফুল ও লতা-পাতার বর্ডার দিয়ে ভাগ করা থাকে। কাহিনীর প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত ঘটনাগুলি এইভাবেই সমান্তরাল বর্ডার দেওয়া খোপে খোপে সাজানো থাকে। পটুয়ারা যখন পট দেখান তখন একহাতে যেমন দেখানো অংশ জড়িয়ে নিতে থাকেন তেমনি অন্যহাতে ধরা পটের জড়ানো এক অংশ আস্তে আস্তে খুলে ধরেন। আর এই সঙ্গেই চলে গান। সঙ্গীতের মাধ্যমে পটের এই কাহিনী বর্ণনার সময় মনে হয় যেন চিত্রের মিছিল চলেছে একের পর এক; যেন আধুনিক জগতের চলচ্চিত্রের সিকোয়েন্সের পর সিকোয়েন্স।

জড়ানো পটের বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকে মনসা বা বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী, চণ্ডী বা কমলে কামিনী—যাকে কেউ কেউ বলেন শ্রীমন্ত মশান, দুর্গাপটের অসুর বধের পালা, গঙ্গা-যমুনার বিবাদ পালা, জগন্নাথলীলার পালা, কৃষ্ণলীলা আর সেই সঙ্গে রামলীলা, রামের বনবাস পালা বা রাবণবধ পালা। শিবপটের মধ্যে নরমেধ যজ্ঞ আর থাকে সতীর দেহত্যাগ কাহিনী। এ সব পটগুলি হল সাবেকী পৌরাণিক কাহিনীর পট। রূপকথার কাহিনী নিয়েও পট আছে যা মেদিনীপুর জেলায় বহুল প্রচলিত এবং তা হল মনোহর ফাঁসুড়ের পট বা রাহুতীর প্রেমকাহিনী। এ পটের বিষয়বস্তু হল, মনোহর ফাঁসুড়ে আর তার সাত ছেলে—সেকালের রাজপুত্র বা বিত্তবান যুবকদের ভুলিয়ে নিয়ে তাদের

বাড়িতে ডেকে আনত। মনোহর ফাঁস্থড়ের একমাত্র রূপযৌবনা কন্যা রাহুতী রাত্রিতে ঐসব যুবক অতিথিদের প্রেমের অভিনয় দেখিয়ে খুন করে সর্বস্ব অপহরণ করত। আসলে এই ছিল মনোহর ফাঁস্থড়ে আর তার সাত ছেলে ও এক মেয়ের কাজ। সেবারে এক রূপবান যুবক এদের ফাঁদে পড়ল আর সেই সঙ্গে মনোহর ফাঁস্থড়ের মেয়ে পড়ল সেই যুবকের প্রেমে, রাত্রিতে শলাপরামর্শ করে ঐ রূপবান যুবক রাহুতীকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চম্পট দিল। এদিকে মনোহর ফাঁস্থড়ের ছেলেরা ঘোড়ার লেজে সরষের গুঁটুলি বেঁধে দিয়েছিল। সরষের চিহ্ন ধরে ফাঁস্থড়ের ছেলেরা সেই রূপবান ছেলে ও রাহুতীকে ধরে ফেলে এবং তারপর কীভাবে তারা ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় সেই ঘটনাই পটে বিবৃত হয়েছে—অপূর্ব এক লোককথাশ্রয়ী পটুয়া সঙ্গীতে। বলা যেতে পারে, মনোহর ফাঁস্থড়ের এই পটকাহিনী মেদিনীপুর জেলার এক অপরূপ বৈশিষ্ট্য। এমন ধরনের আরও হয়ত অনেক রূপকথার পট ছিল, কিন্তু এখন তা দুষ্প্রাপ্য।

এছাড়া বর্তমান কালের ঐতিহাসিক বা সামাজিক ঘটনা নিয়েও রচিত পট আছে। সে পটের মধ্যে কাকদ্বীপে জাহাজডুবির ঘটনা বা নারাণপুরের বাস দুর্ঘটনাও যেমন আছে তেমনি আছে নায়েক বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে পট, অর্থাৎ কীভাবে সাহেবরা এদেশের প্রজাবিদ্রোহ দমন করেছিল, গাছের ডালে বিদ্রোহীদের ঝুলিয়ে দিয়ে, তারই কাহিনী। এগুলিকে পটুয়ারা বলতেন সাহেব পট। এছাড়া বর্তমান সমাজের নানান ক্লেদাক্ত কাহিনী নিয়ে রচিত পট, যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের প্রেম-কাহিনী, ১৫ই আগস্টের পর ভারতমাতার বর্তমান চিত্র ; অর্থাৎ রেশনিং প্রথায় কাঁকর চাল ভক্ষণের কাহিনী, পিতামাতার প্রতি অশ্রদ্ধা ও সিনেমা-থিয়েটারের প্রতি আগ্রহের দরুন বাঙালীর চরিত্রভ্রষ্ট হওয়ার সঙ্কেত—এ সবই এই ভারতমাতার পটে আঁকা হয়েছিল যথাযথ বর্ণনা দিয়ে গান করার জন্যে। এই ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত পটগুলিকে এই জেলার পটুয়ারা 'স্বাধীনতার পটিগান'ও বলে থাকেন। শুনেছি, নন্দীগ্রাম থানার পটুয়ারা নাকি পরিবার-পরিকল্পনার কুফল ও সুফল দিয়ে গান বেঁধেছেন এবং অঙ্কিত পটও সেই সঙ্গে দেখিয়ে বেড়ান।

এই সব জড়ানো পটচিত্রণের আদর্শ পাশাপাশি আদিবাসী সমাজকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই আদিবাসী সমাজে প্রচলিত সাঁওতাল জাতি-গোষ্ঠীর উৎপত্তি নিয়ে রচিত জড়ানো পটও প্রচলিত ছিল। এই ধরনের পটে থাকতো সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত মানবসমাজ সৃষ্টির কাহিনী। সেই

কাহিনীতে বলা হয়েছে আদিম মানব ও মানবী শুচিশুদ্ধ জীবনযাপন করত সেই আদিকালের যুগে। সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টি বিস্তারের উদ্দেশ্যে একদিন তাঁদের জন্য সুরার পাত্র রেখে দিলেন। সেই সুরা পানের লোভ তাঁরা ছাড়তে পারলেন না বলে তাঁরা তাঁদের শুচিতা নষ্ট করে ফেললেন। এর পরিণতিতে তখন ঐ আদিম মানব-মানবীর সাতপুত্র ও সাতকন্যা লাভ হয়। তারপর একদিন বাধল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ এবং এই বিরোধের পরিণতিতে তারা পুত্র-কন্যাদের ছেড়ে কোথায় যে চলে গেলেন, কেউ আর তাদের খোঁজ পেলেন না। বহুদিন পরে ঘটনাচক্রে আবার যখন সেই পুত্র-কন্যাদের দেখা-সাক্ষাৎ হল সেদিন তাদের পরিচয় দেবার জন্যে সেখানে তাদের পিতা মাতা কেউই উপস্থিত ছিল না। আর এমনি করেই সৃষ্টিকর্তা তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি করলেন।

জড়ানো পটের মধ্যে আদিবাসী সমাজে প্রচলিত যম পটও রয়েছে। যম এখানে মারাং বুরু এবং এই মারাং বুরুর শাস্তির চিত্রও অতি ভয়াবহ। হিন্দু সমাজের সংস্পর্শে এসে আদিবাসী সমাজের মধ্যে পুরাণ কাহিনীর অধিকাংশ পটই বিশেষ করে কৃষ্ণ বা কানাই পট, মনসা পট, জগন্নাথ পট আর চণ্ডীপট বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

জড়ানো পটের পর মেদিনীপুরের যাদু পটের কথা বলতে গেলে বলা যেতে পারে যে, এই ধরনের পটগুলি সাধারণত আদিবাসী সমাজের মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল এবং আদিবাসী সমাজের চিন্তাভাবনা এবং ধ্যানধারণাসঞ্জাত এই পটগুলির আকার হতো আয়তাকার বা বর্গাকার। বীরভূম অঞ্চলে চৌকো আকারের পটগুলিকে বলা হতো চৌকশ পট। মেদিনীপুরের পটুয়ারা কিন্তু চৌকশ পট বলেন না, তারা যদুপট হিসেবেই এগুলিকে চিহ্নিত করেন। এই ধরনের পটগুলির অনেক নাম পাওয়া যায়। এগুলিকে কেউ কেউ বলেন, যাদুপট আবার কেউবা বলেন, যদুপট। আর কেউ কেউ বলে থাকেন, পারলৌকিক পট বা চক্ষুদান পট। আদিবাসী অঞ্চলে কেউ কেউ এগুলিকে যমপটও বলে থাকেন। এ পটের মূল উদ্দেশ্য হল আদিবাসী সমাজের কারুর মৃত্যু হলে 'পাটকিরি'রা মৃত লোকটির একটি কল্পনামূলক ছবি আঁকেন এবং সেই ছবির মধ্যে অঙ্কিত ব্যক্তিটির চোখ আঁকা বাকী রাখেন। তারপর পাটকিরি মহোদয় সেই পট এনে মৃতের বাড়িতে উপস্থিত হন এবং গৃহস্বামী ও সেই বাড়ির অনান্য পরিবার পরিজনকে ডেকে বলেন যে, পরলোকে তাদের ঐ মৃত প্রিয়জন চোখের অভাবে বেশ কষ্ট পাচ্ছেন। পটে অঙ্কিত সেই মৃত ব্যক্তির অবস্থা দেখে গৃহস্বামী বা তার

বাড়ির লোকদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ এঁকে দেবার অনুরোধ জানালে, পাটকিরি মহোদয় সঙ্গে সঙ্গে পটের সেই অঙ্কিত ব্যক্তিটির চোখ এঁকে দেন। পরিবর্তে এর দরুন গৃহস্বামীর কাছ থেকে তার কিছু দক্ষিণা লাভ হয়। এছাড়া, যে পাত্রটিতে তুলি ডুবিয়ে চোখ আঁকেন ঐ পাটকিরি শিল্পী, আঁকার কাজ শেষ হলে তিনি ঐ পাত্রটি (সাধারণত এটি কাঁসা বা পিতলের থালা হয়ে থাকে) গৃহস্বামীর কাছে দাবি করেন। এইভাবে পাত্রটি উপরি লাভ হয় পাটকিরিদের।

পট নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা বলেছেন যে, অঙ্কিত ঐ যাদুপট পাটকিরিরা গৃহস্বামীকে দিয়ে দেন। আসলে কিন্তু তা নয়; প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পাটকিরিরা সঙ্গে করে ঐ পট নিয়ে চলে আসেন। এই সব পটগুলিতে আঁকা হয়, স্বর্গের প্রাসাদে বসবাসরত ঐ মৃত ব্যক্তি পরমানন্দে মালা জপ করছেন। মৃত ব্যক্তি যদি মহিলা হন তাহলে মহিলার চিত্র এবং পুরুষ হলে পুরুষের চিত্র অঙ্কিত করা হয় এবং ছবিটির উপরের দিকে 'হরি বল মন' কথাটিও লিখে দেওয়া হয়।

আলোচিত এই চক্ষুদান পটগুলিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'পারলৌকিক পট' বলেও আখ্যা দেওয়া হয়। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ধরনের পটের বিষয়বস্তুও ভিন্ন ভাবে দেখানো হয়। এইসব পটে দেখানো হয় পুনর্জন্মের ফল। এই বিষয়বস্তু নিয়ে পটে দেখানো হয় পুণ্যবানের চিত্র; পুণ্য করার জন্যে পটে তার আরামদায়ক জীবনের চিত্র এবং পাপ করার জন্যে তার শূকর বা মোরগ হিসেবে জন্মগ্রহণের দৃশ্য ইত্যাদি। উপযুক্ত দক্ষিণা পেলে যে পরিবারের লোক এমন পাপের ফল ভোগ করছেন, তিনি স্বর্গে যাতে চলে যান; সে ভাবেই আবার পট এঁকে আনেন এই সব পাটকিরিরা।

পট আঁকা ছাড়াও আদিবাসী সমাজের এইসব পাটকিরিরা আবার কবিরাজ বদ্যি হিসেবেও তাদের প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। কোনো মড়ক লাগলে পাট-কিরিরা 'শূল পট এনে দেখান এবং এই পট দেখিয়ে আদিবাসী সমাজকে আশ্বস্ত করান যে, শীগগিরই তাদের অসুখ বিসুখের উপশম ঘটবে। এ ছাড়া আদিবাসী সমাজে প্রচলিত আছে 'বেড়া পট' বা 'মঙ্গলপট, যা শিকারের সাফল্যের জন্যে নানা দেবতার ছবি এঁকে পূজো দেওয়া হয়। এরপর 'পৌরি পট'; এটি হল, কোনো কিছু শুভযাত্রার সময় 'পাটিকার' ডেকে আদিবাসীরা এই 'পৌরি পট' শুনে থাকেন। আরও একটা পট আছে, তার নাম 'মরা-হাজা' পট। জঙ্গলে

কেউ হারিয়ে গেলে আদিবাসীদের দেবতা মারাং বরুর নির্দেশে পাটিকার পট এঁকে এনে দেখায়—জঙ্গলের মধ্যে সে জীবিত না মৃত অবস্থায় রয়েছে। এছাড়া ধলভূমগড় অঞ্চলে পটুয়াদের আঁকা 'রঙ্কিণী পট' 'দগর শিলা পট' ও 'চন্দ্রাপটের' কথা জানা গেছে। বিষয়বস্তু না জানায় তা আলোচনা করা গেল না।

যাই হোক, মেদিনীপুর জেলার পটচিত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনায় দেখা গেল, এই জেলার চিত্রকর-পটুয়া বা আদিবাসী সমাজের পটুয়া 'পাটকিরি'রা—তাদের সৃষ্টি চিত্রের মধ্যে লোকচিত্রের এবং লোকসংগীতের সেই আবহমানকালের ধারাটিকে বিংশ শতাব্দীর এই সত্তর দশকে অনেক ভাঙ্গাগড়ার মধ্যেও টিকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কালের প্রভাবে এবং আধুনিকতার প্লাবনে তা আর কতদিন টিকে থাকবে সেটা সন্দেহের বিষয়। কিন্তু এখনও মেদিনীপুর জেলার পট ও তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ফটোগ্রাফ সংগ্রহ বা আলোচনা এবং তৎসহ পটুয়া-সঙ্গীত সংগ্রহ করা হয় নি। টেপ-রেকর্ডারে এইসব সঙ্গীতেরও কোনো সংগ্রহ ধরে রাখার চেষ্টা হয় নি। অপরদিকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন কারণে এইসব চিত্রকর-পটুয়াদের জীবন ক্ষত-বিক্ষত ও বিপর্যস্ত। এই উপজীবিকায় পটপ্রদর্শনী ও সঙ্গীতের মারফৎ সামান্য ভিক্ষালব্ধ পারিশ্রমিক লাভ হয়, এতেই বোঝা যায় পটুয়া সমাজের আর্থিক অবস্থা খুবই নিম্নস্তরের। তার উপর, অন্যদিকে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে এসেছে শহুরে আমেজ। সমাজ-রূপান্তরের ধাক্কায় পড়ে পটুয়া সমাজ আজ এক দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অবস্থা আজ এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে লোকরঞ্জনের জন্য পটুয়া-চিত্রকরও আর দেশে অবশিষ্ট থাকবে না। মিউজিয়মের অন্ধ খুপরির মধ্যে পড়ে থাকবে মেদিনীপুরের প্রথাগত লৌকিক শিল্পধারার এইসব উপকরণ—পটচিত্র, যার সৃষ্টিকর্তা হলেন মেদিনীপুর জেলার এইসব অবহেলিত চিত্রকর-পটুয়া।

পুলিনের কথা

বিশ্বনাথ বসু

দোকানটার সামনে ঝুলছে টিয়ে খাঁচা।

দোকানটায় কাজ পেল পুলিন। বাহাল হলো।

এ-দোকানেতে চাকর কর্মচারীরা বেশী দিন কেউ নাকি টেঁকে না। গুণীজন কারিগরদের কথা অবিশ্যি আলাদা। হাত যাদের চলে—আঙুলের নাড়ায় ফুলের মতো ফোটে, ফলের মত টসটসা—তাদের কে না তোয়াজ করে? আর বাদ-বাকিদের খাই-খরচা, একনজরে বয়স আর চেহারা দেখে নিয়ে মাইনা। মালিক কিন্তু লালস মোটেই বরদাস্ত করেন না—করতেই যেন পারেন না। দুপুরে, দোকান ধোয়া পাকলার পর রাতে—যতো খুশি টান। কেবল টিয়েটার ডাকে ঘুম তোমার ভাঙলেই হলো। তাছাড়া সকাল সন্ধ্যায় ঝলুশাই। মালিকের তেমাথা-ছ' চোখ। বাপ আর দু'বেটা। দোকানটাই উৎস, দোকাণের কল্যাণেই শহরের উপর দু'-দুটো বাড়ি—এক ট্রাক আর নামে নামে ধানী জমি।

দোকান বিরাট—বহুদিনের আর নাম করা। শ্রাদ্ধ বিবাহ মুখেভাতে, ছোট বা বড় কাজে—আনন্দ উৎসবে, বনেদী আর বড় বাড়ি সব মোটামুটি বাঁধা। এবং বাঁয়ে সিনেমা হল—ডানে বাসস্ট্যাণ্ড, সামনে মোড়। ভোর থেকে সারাটা দিন, দশটা রাত অবধি খরিদ্দারে গমগমা। ছ'ছটা কেবিন। তাছাড়াও ৩০।৩৫ জনের একত্রে বসবার মতো ব্যবস্থা। ঝক-ঝকে তক-তকে টেবিল-মেঝে-কাঁচ। ভের্তরটায় খিঁচ। আর যে ছেলেটি পোঁছে তার পরনের গেঞ্জি বা নুড়িটায় ধরা যেন একটু মুশকিল—কোনটা ঠিক, কোনটা। অবিশ্যি নুড়িটা ৫।৭দিন অন্তর বদলায়।

সিনেমা দর্শক—বাসযাত্রী, আরো সব খরিদ্দার। আর খুন-খারাপির সময়টাতে মোড়ে সময় মতো দাঁড়ানো ছেড়েছে; নটা রাতের আগে ঠিক ঠিক বাড়ি ফেরে, তাস দাবা খেলে না, গালিগালাজ মুখ খারাপে নেই—পুলিশ দারোগায় কিছু বলে না, ফট করে ইংরেজী কথা দিয়ে **C. R. P.**কে ঘাবড়ায়, সদ্য ঘুম ভাঙা আমেজিয়া, ফোলা ফোলা টসটসা মুখে ছুরির ফাল সম এক বৃষৎ জুলপী। তারা ভালো মনের মতো চাকরী পায় আর মেদের শরীর নিয়ে

তারিয়ে তারিয়ে কথা বলে—যেন ছেনেছুনে দেখেছে। জেমসবণ্ড, হেডলী চেজ দেখে অথচ কোনো পরিচিতার হঠাৎ দেখা পেলে নার্ভ হারায়। ৭২-এর ওয়ার্লড বিউটির জাম্বুজেটের এয়ার হোস্টেজদের নামও তারা জানে—বা ইমপালা গাড়ির দাম কত। বাবা কাকুকে ধরেছিল তাই চাকুরী হলো ; কিন্তু নিজে দেখে শুনেই বিয়ে করবে—অতঃপর ছোট্ট সংসার—সুখী সংসার। তারপর একদিন হঠাৎ মাথায় রক্ত উঠে, রক্তের প্রাচুর্য উথলে মরে যাবে—তারাই কেবল ছোট আড্ডার মতো করে বসে।

আমদানী ঘরে, নতুন আমদানি এলো। অবিশ্যি এটা দোকান। কাজ পেয়েই পুলিন টের পেয়ে গেল বেশীদিন সে যেন থাকতেই পারবে না। এমনিতেই সে অস্থির—কোথাও থাকতেই পারছে না।

হাত গুটিয়ে পুলিন একদমও বসে থাকতে পারে না। বেদম খাটাখাটুনির মাঝখানে হঠাৎ করে সে নেতিয়েও পড়ে না। সময় মতো খিদে পায় বা খাওয়ার সময় ছুটো কম খাবে না। তবু মালিক রাজি। কারণ মোটেই সে তালকানা গোছের নয়। ক্রিমিকীট খাউজানো মেজাজও নয় তার। খদ্দের বিগড়ে দেবে না, এমন একটু চালাক চতুর। তিনটে সিঙ্গাড়া তিনেটে রাজভোগ চায়ের দাম কেটে পাঁচ টাকার কত ফেরৎ দিতে হবে ইত্যাদি বা আরো সব জটিল, কাটাকাটির হিসাব সে যেন একটু বোঝে কম, আর বুঝতেও চায় না বড়। এক নাগাড়ে যে খাটাখাটুনিটা খাটে—যেন গাধা। আর জলে-কাদায় এমন অভ্যাস আছে যে আঙুল জলের ঘায়ে খসে খসে পড়বে না। তবু সে বুঝে নেয় এখানে তার মাত্র একটা মাস হয়ত। সে পালিয়ে বেড়ায় না, কেউ তাকে তাড়িয়েও বেড়াচ্ছে না এখন। যা ঘটবার তা ঘটে গেছে। আর যা ঘটবে তা অপেক্ষা করছে। কেবল মাঝখানে তার বুকটা মোচড়ায়—বছর হলো সে গ্রাম ছেড়েছে।

দিনটায় ঝড়জল আর বাদলা।

দুপুরের পর থেকেই আবহাওয়া ক্রমশ দ্রুত পাল্টে যেতে থাকল। বাজ-বিদ্যুৎ-মেঘের বর্ণে, বন্যতায় থমথমা ছমছমা পূর্বাভাস। জনপ্রাণশূন্য নিরাল হয়ে গেল কালো রাস্তা; যেন কার্ফু লাগবে। রাস্তায় আমি তবে একা? না একজন কাবুলিওয়ালাও। একটা কুকুর। কাবুলি সাইকেলে চৌচা দিল। কুকুরটা ঢুকে পড়ল ঘুঘনি দোকানের ঘুমতি ঘরটার তলায়। নিরাপদ চমৎকার আশ্রয় আর গন্ধ পাবে।

ঝড়বৃষ্টির তাড়না—ঝড়ো বাতাস ঠেলে এনে তুললো আমাকে দোকানটায়। ঝড় উঠেছিল। বৃষ্টিও নামল—আকাশখানা কাঁচের মতো চৌচির হয়ে ভেঙ্গে পড়তে লেগেছে ততক্ষণে।

সর্বরোগহরা আসনে গুম মেরে বসে আছেন মালিক। চাকরে-বাকরে ঝুট-ঝামেলা করলে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিয়ে, কি বেত না হোক বেতন কেটে, সিজিল সায়েস্তা করা যায়। কিন্তু এতো বৃষ্টি আর ঝড়!

দোকানে খরিদ্দার না থাকার শূন্যতা। ভাগ্যবানের খরিদ্দারই ভগবান। বড় টেবিলটার উপর ভাঁজ করে দু'হাত রেখে মাথা পেতে দু'জন যেন ঘুমায়। চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে, যেন আরাম চেয়ারে, আধ-শোয়া আধ-বসা হয়ে বিড়ি ফুঁকছিল কাছতা। নির্বিকার হাতের পাতার আঙুলের ভাঁজের মাংস খুঁটে খুঁটে তুলছে আর একজন—জলের ঘায়ে মাংস এমন পচে গেছে যে টানতেই তা আলগা হয়ে ন্যাতার মতো ছিঁড়ে উঠে আসে—ব্যথা লাগে না কোনো।

টেবিলে দুটো খালি কাপ-প্লেটে চামচ। কাঁধে কাঁধ রেখে কোল খালিকরা চেয়ার। কেবিন (স্পেশাল)। কেবিনে ঝোলানো পর্দা। দেয়ালে দেয়াল ঘড়ি। ধূসর দেয়াল আয়না। সুইচ বোর্ড। ক্যালেণ্ডার—সমুদ্রের ছবি। এক ঝুড়ি সিঙ্গাড়া। নিমকি খাস্তা। দই হাড়ি। রসগোল্লা-সন্দেশ-মালাই-কারি। খালি বোতলের বাক্স। কোকাকোলা, ফ্যান্টা। জুস্লার ভাঙা কাঠি মুখে একটি শূন্য বোতল—খর রোদের কথা মনে পড়ায়। কাটা কাগজ—গ্রামের খবর কাটা। কাগজে চাপা দেওয়া পাথর। ষ্টিল লাইফ।

আর পুলিন খাঁচাটা বইরে থেকে এনে রান্নাঘরের বারান্দায় লটকে দিচ্ছে।

—বানা (বন্যা) কি হবে বাবু?

—কি করে বলা যায়? সবে তো বৈশাখ।

—মুজনাইত কিন্তু কোনো বছর বাদে নাই। আসিবেই আসিবে। আসি আছে।

—তবে তো মুশকিল!

ছানচা তলায় জল পড়ছে অবিরল। বৃষ্টি দিয়ে বেড়া। বেড়াটা হেলে পড়ছে—ভেঙ্গে পড়ছে—সোজা হচ্ছে—বেড়া হচ্ছে বাতাসে। পুলিনের পিঠ ভিজছে ছাটে। খাঁচা লটকে দিচ্ছে পুলিন।

—ছোট মতো বাঁধ আছে একটা। সোতা এট্টু ধার হইলেক হয়, শ্যালা

শালা খালি খসি খসি পড়ে। এক্কে মাতে খতম। শ্যালা মানুষ ঘর গরু জমিন সব দলা মোচরা। বান আসিলরে, তিস্তা নদীর নাথান বান। আর সব থাকি বড় মজাটা হইল, বাঁধ ভাঙ্গেসে আর মাটি ফেলা হসে। বাঁধ ভাঙ্গেসে আর মাটি ফেলা হসে। নতুন মাটি গাড়িত করি আসে আর নদীত করি চলি যায়।

এ সর্বত্রই। নদী মাটি খায়, আরামে গেলে, আবার যত না খায় তার চেয়ে বেশী নাম হয় তার। এদিকে নাকানি চোবানি খায় মানুষ গরু। ঠিকাদার কিন্তু জলটল আর ছোঁয় না। গোল লাল হয় কেবল।

পুলিন হাসে। খাঁচাটা টাঙ্গিয়ে দেয়। ছাতির কালো কাপড়টায় খাঁচা ঢেকে দিতে দিতে দেয় না। সে হাতখানা বাড়িয়ে ধরে বৃষ্টি। আজলা করে দুই হাত। চাষার মজবুত দীর্ঘ দুই হাত।

—এ বৃষ্টি আজি কিন্তু থামিবার মতো না হয়। বোয়া গাড়িবার সময় এই সং বৃষ্টি হইলে না কাম। ঠোঁট কামড়ে ধরে আফশোস করা আড়মোড়া ভাঙে পুলিন।

—চা দাওহে চা এক কাপ।

—কড়া ?

—না। বরং একটু আদা দিও, গলাটা একটু খুস খুস করছে যেন। আর এক প্লেট ঝুরি বোঁদে।

—মিকশ্চার ? পুলিন হেসে ভেতরে যায়।

ঝড় বাড়ছে। জমজমাট বাঁধছে। এলোপাথাড়ি গাছগাছালির মাথা। বৃষ্টি ফোটা ঘন মোটা। বেগ তার ক্রমতীব্র তুমুলতর। খাঁচাটা ঝুলিয়ে দিয়েছিল পুলিন—বাতাসে ঝুলছিলই। পাখী ঝড়ো বাতাসে ডানা মেলবার অধীরতা ভুলে গেছে নাকি ?

—পাখী পোষেন তোমরা বাবু—পাখী ?

—না তো পুলিন।

—মুজনাইয়ের ধার ঘেঁষি বরাবর শাল শিমুল বন। খালি বন। বন আর বন। মেলা, হাজার, টিয়া ময়না হরিয়ালের কোনো যেন শ্যাষ নাই। কতলা উড়েসে...এক ঝাঁক বন টিয়া উড়ি চলি গেইল...গাছের পাতাগুলান যেন পাখী হইসে...পাখী হওয়া পাতা বাতাসময় উড়ি যাসে...কতলা ডাকেসে খুব,... ডাকেসে বাঁশ বাঁশীর চিকন সুর।

...একটা মা উয়ার ছানাক্ খিলাসে—উড়িবার শিখাসে . উড়ি এট্টু করি যায়—ডর করে...ডাকে...আর ফিরি আসে—মা উয়ার মলমলিয়া গায়ে ঠোঁট বুলি দেয় ..দুইটা পাখী, জোড়া হরিয়াল...যেন ভাসি আসি শিমুল গাছটার মাথাৎ বসিল—পাখীর মেলা বসি গেইসে বাবু...পাখীর হাট...সারাটা দিনমান বসি থাক...সারাদিন ঘুড়ি বেড়াও মাইল মাইল... ।

—ঐলা পাখী পুষি কি লাভ বাবু? যায় একা একা থাকে, বাসা বাঁধেসে না—ডিমা পারেসে না ঃ যায় উড়িবার কথাও ভুলি যায়?

—শখ। পেলে কি তোমাকেও ছাড়ে পুলিন? গরাদ হাজত আছে। শেকল বেড়ি আছে।

ঝড়তো এখন চণ্ডাল, প্রচণ্ড—গজরাচ্ছে। বৃষ্টি দিয়ে বেড়া। বেড়া এখন দেয়াল। দেয়াল ভাঙছে—ঝমঝম—ঝরঝর—দেয়াল হচ্ছে। শোলার কদম ফুল শাদা—এখন হলদে। নারকেল দড়িতে গাঁথা মুছি, মরা আমপাতা, সিঁদুরের টিপ দেয়ালে, স্বস্তিকা—ধূপতি—গণেশ। দাড়িপাল্লা নাবছে উঠছে—লাভ-ক্ষতি—লাভ। জমি-বাড়ী-ট্রাক। ফোন—ক্যাশবাক্স—পানের ডাবর। মালিক। জুসলার কাঠি। কোকাকোলা—তরল জাম। ফ্যাণ্টা—রক্তের বোতল। লস্ঠি মেসিন-বিজয়ীর ট্রফি। তুষারে কাঠের হাতুড়ী। ক্যালেণ্ডারে নগ্না নারী—হায় সে স্বর্গ! আইসবক্স এনজয়।

ঝন্‌ঝার আকাশে ছুটন্ত তুফানী ঘোড়ার হঠাৎ ছেঁড়া লাগামের মতো বিদ্যুতের নীলাভ ঝলক আর তিস্তার ফাঁপা বুকের চরায় পাহাড়ফাটা বানা আসার মতো গুরু গুরু গর্জনের পর—আকাশ মাটি থরথরিয়ে বাজ পড়লে পুলিন বললো—ওই শিকলটাক ছিড়া লাগে।

দেয়ালে চার রঙ। উঁচুতে গোলাপী আর তাতে কালো বর্ডার, মাঝে সবুজ—নীচটা লাল। মেঝেটার লাল যেন ফোঁটায় ফোঁটায়, চুঁইয়ে চুঁইয়ে জমা।

শোকেসে শোকেসে খাস্তা-নিমকি, হিঙকচুরী, ক্ষীর-সন্দেশ, চমচম, দই, মালাইকারি, নৌকাবিলাস, রাজভোগ টসটসা—স্টিল লাইফ।

দেয়ালে দেয়াল ঘড়ি। চটা ডায়াল। ডায়ালের বুকে দু'কোণে দু-কাটা—যেন দু'হাত—কাঙালি শিশুর কঙ্কাল দুই হাত।

—মোর একটা কাম করি দিবেন বাবু? মোক একটা চিঠি লিখি দিবেন? ভাষাতো মোর রাইসে না। লিখি দাও ক্যানে এট্টু বাবু।

মুখে জলবিন্দু—চুল তার ঝড়ো। খোলা বুক। কোমরে গামছা বাঁধা।

—কাকে লিখবে তুমি ?

পুলিন পকেট খোঁজে—বুকের পকেট। পুলিন যেন কিছুবা ভাবছে। পুলিন হাতড়াতে হাতড়াতে—খুঁজতে খুঁজতে—ভাবতে ভাবতে বলে—কি লিখিবেন ? আছা লিখি গান ক্যানে—লিখেন গৌরী তোক মুঁই বিশ টাকা পাঠাইম। লিখি গান— কাঁহ তোরা মোর আর মাথাটা খারাপ করাইস নাই। মোক পাগল করাইস নাই। আর কোনো বেশী বাড়াবাড়ি শুনিলেক হয়, শ্যালা তোক খুন করিম। মুঁই তিনটা খুন করিম। পুলিন হাতখানা তার ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল। হাতে তার পোস্টকার্ড।

আঁতকে উঠলাম। আরে ব্যাটা বলে কি ? দারুতুরু খায়নি তো ? সে তো রাত দশটার পর সম্ভব। তবে পাগল !

—মিছামিছি বাবু। খালি হাউ (ভয়) দেখাবার চাসি। মিছামিছি। দু'হাতে, কড়াপড়া কঠিন দু'হাতে আলতো ভাবে ও মাথার চুল সাপটে নেয়। পুলিন আবছায়ায়। পুলিন বলে—

—একটা বুদ্ধি আছে। চিঠিতো উয়ার বাপের হাতৎ পড়িবে—শ্যালা যদি কিছু হয়।

সন্ধ্যা নামেনি তবু অন্ধকার। ঘরে বাল্‌ব যদিও জ্বলছে তবু আলো কালো দাগটার নীচে আর নামছে না। নামতে পারছে না। কালো দাগটা—আলো কোনোক্রমে পেরুতেই পারছে না। আর তাই সবুজ ঘাস ঘাস মাঝখানে এখন নীল, লাল মেঝে দানা দানা কালো জমাট—লাল জমে কালো। পুলিন মেঝেতে বসে আছে। শরীর তার যেন আবছায়ায়—না অন্ধকার—না আলোয়। পুলিন বলছে—

উয়ার সাথে তো মোর খালি মন্ত্র বিহাটা হয় নাই। সগায় জানে। যায় যায় মোক চিনহে সগায় জানে। আত (রাত) গুলান জানে। জানে আকাশের তারা-অরুনধুতি। আর জানে হামার মুজনাইও। উয়ার বাপটাও সব জানিশুনি এ্যালা উমাক গিরির ঘরে বেঁচাবার চাসে। বেশ্যা করিবার চাসে। বেশ্যা হুবে না উয়ে ? বেশ্যা কেনং করি হসে বাবু ?

পুলিন মুখে নয় যেন খোলা বুকে—খোলা বুক থেকে কথা বলছে :

—মিছামিছি বাবু—মিছামিছি। একটা হুশিয়ারি দিবার নাগে—কড়া হুশিয়ারি, যেন হুমারল্লার ভয় ধরি যায়। কিন্তু বাবু সত্যি করি আগ উঠিলেক হয় মোর—মুঁই বুঝি খুন করিবারও পারি। জমিনের লড়ায়ে বেনামা জমিন

দখল করিবার বাদে জোতদারের ব্যাটাটার মাথা ডাঙ্গমারি জখম করি দিসুলু মুঁই। মারি কাটি—আতি জাগি হাউলি দিয়া উয়ার বাপটাক বসি দিনু জমিৎ—ঘর তুলি দিনু হামরালা। এলায় শালার মাথা ভাঙ্গা উয়াক বিহা করিবার চাসে, ভয় দেখাসে—লোভ দেখাসে, বুদ্ধি ব্যবস্থা করিবার আর কোনো বাদ আখে নাই।

পুলিন বলে। বৃষ্টি ঝড়। পুলিনের 'কাথা' ঘুরে ঘুরে, ঘোরে ফেরে:—হামরা চাষাটাষা মানুষ বাবু। হাত পা হামারলার, সর্বাঙ্গ, গিঁঠে গিঁঠে বাধা। হামরা গতর খাটি। মাটির বুকটা আলুথালু করি ফেলি। মাটি হামাক খিলাসে, তোমাক আরো বেশীটা খিলায় বাবু। হামরালা মাটি চষি,—মাটি চাসি। মাটি চাসে মোক—মাটি চাসে মোর হাত গতরের জোর; আদর, সেবা-যতন। মাটি যেন বেটি ছাওয়া—জল লাগেসে, জলসার বীজ লাগেসে। কোঠে পাম হামরা ? হামরা শরীল জীবন মন দিবার পারি, হামরা নাড়াচারা করিবার—গুক্ ছেনিবার পারি। হামার লারও শরীল রাখিবার বাদে খোয়া পানি চাই। হামারলার ঘরৎ, এগিনাৎ, বিছানাৎ, চালাৎ অসুখ আর খিদার উইবাসা। আর যায় দিনটা এট্টু ঘুড়িল, জখম বাঘটা ফিরি আসিল—এগিনাৎ (উঠানে) আসি দাঁড়াইল।

আলো কালো দাগটার তলায় নামছে না। আলো কালো দাগটা পেরুতেই পারছে না। আবছায়া। ছায়া ছায়া। অন্ধকার। দেয়ালে দেয়ালে লতিয়ে গেছে ওয়ারিং-এর তার। ফ্যানটাই বুঝি ডানা মেলা রাতভাসা। ছাড়ানো ছালের মতো ঝুলছে পর্দা। চিত্রবিচিত্র জংলা। সুইচ বোর্ড যেন চোখকান নাকমুখ দন্তহীন মাথা। পুলিন জোরে জোরে থেমে থেমে মেঘ জল ঘন ঘোরে কথা বলছে।

—মাথা ভাঙ্গাটা ফিরি আসিল। ফিরি আসি উয়ার বাপটাক ডাকি কসে—এ—এ্যাই ধুরকুটু, তুহে তো আর থাকির পারবু না এইঠে। এ্যালায় দলটার জোরে আইনটার দিন শ্যাষ। এ জমিন তুমার না হয়। বেদখল কইসেন তোমরা। জমিন মোর বাপের না হয়, হামার। আইনমতো উঠি যাবার নাগিবে তোমাক। আর দলের মাতব্বর কাঁহ আসিলেক হয় এ্যালা আইনে পুলিশে ডাঙ্গে মোকাবিলা হুবে। শ্যালা আগৎ মরিবেন তোমরা। কিন্তু মুঁই চাছ এইঠেই থাক তোমরা। শান্তি মতো থাক। আর বিছন-ধান খোয়ার-ধান গরু হালটাও লাগেসে। বেটিটার তোর এ্যালা বিহা দেয়াও তো কাম। একটা

ভালো দেখি পাত্তর চাই। এইলা সব তুহে পাবু কুঠে? কিন্তু মুঁই তোক তামানটায় দিম। দেখিস, পুলিন যেন তোর ঘরৎ আর না ঘুষির পারে—চেংরির মনটা আর না মজাবার পারে। আর চেংরিটাক খালি মোক দাও।'

—যায় ভয়ে শ্যালা ঘরৎ, পোহাল পুঞ্জিতলাৎ, ইন্দুরের গত্য- সোন্ধাই—ছিল গোমা চিতা হইসে এলায়। মোক মারি ফেলাবার তানে, গৌরিক বেশ্যা করিবার তানে তামানলায় এককাট্টা—জোট বাঁধিসে এলায়। হুমরাও একটা দল। ডাকাত খুনা চোর চাট্টা থাকিও শয়তান।

পুলিন যখন 'কাথা' বলে মাঝখানে থামে না। বৃষ্টি পড়ে—ঝড়, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্; ঝড় আসে পাগলা ক্ষ্যাপা—ঝড়ের শব্দ, ছটফট করে যেন বুকের কথা। পুলিন কথা বলে। হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানি তীব্র বংকিম নীলাভ, বাজ মেঘের গুমরানি—বুকপোড়া আকাশ থরথর আওয়াজ। পুলিন যখন বলতে লেগেছে যেন থামবে না।

—তিনটা বিঘা খালি জমিন ছিল মোর। মোর বাপঠাকুরদ্দার জমিনটা বাবু। লাউ গাছটার লতা চালৎ লকলকায়, জালি ধরাগছ; পুঁইমাচা কাগজী নেবু—সবরী ক্যালা বাবু।

বাপটায় মরিল হঠাৎ করি মোর। মাতো মরি গিসে আগৎ। জমিন মোর বাপ মা। মুঁই একায়। মোর জমিন মুঁই চষি। ঠেকা পড়ি যায়তো আধি কাম করি, করিও না। কিন্তু মুঁই এতো বুঝো নাই বাবু। মুঁই ঠিক বুঝো নাই। আর সময়টাও হঠাৎ করি খুবায় খারাপ পড়ি গেইল শ্যালা। খোয়া খরচা নাই, না বিড়ি খরচটাও। আর শ্যালা একদিন ভবিন বানিয়াটা আসি কসে তোর তো এলায় কোনো কাম নাই পুলিন? চল ক্যানে হাটৎ। পাটা ধরবি তুহে। দুইটা করি টাকা দিম। তুহে তো আঁশটা চিনিস ভাল। আতিৎ একা একা ফিরিবার কালে হাউ করেসে পুলিন মোর। সেই দিনটায় একটা ছিনতাই হয়া গেইল। তুহে থাকিলে মোর সাহস।

মুঁই তো গেনু কয়বার। দুইটা করিতো টাকা পাওয়া যায়। সেই দিনটায় পাইকারের গদী থাকি ফিরিবার ধইসি, আত হইসে। চাঁদের আত। চাঁদনি রাত। জ্যোৎস্নার ঢল যাসে। ছায়া পড়েসে, হামার নিজের দেহার চলা ছায়া। মনে হয় ছায়ার ভেলা করি ভাসি যাসি, কোনঠে যাম কোনঠে না যাম যেন কোনো ঠিক ঠিকানা নাই। দেবতরা বাজে যেন কুঠে। প্রাণটা

খুশী খুশী করেসে। মন চান্দাসে একটা ভাটিয়ালি গাও—স্থর হসে কি না হসে—কাথা হসে কি না হসে, একটা মুঁই গাও।

মনে হসে গৌরী কুঠে তুই? ভাউলে ডিঙ্গাখান কুঠে? কুঠে মুঁই। গৌরী মোর—গৌরী আজি এই নং আত। আর শালা ভবিনটা শ্বালা হঠাৎ করি বলি বসে—তুঁহে জমিনটা বেঁচালু পুলিন, মোক তো কিছু কলু না। কত করি বেঁচালু?

মুঁই কাথাটা প্রথমে বুঝো নাই। ভাবিসি মজাক করেসে। ভবিন কাথাটা ফের কয়—তুঁহে তুধ সাক্লক জঁমিনটা বেঁচালু পুলিন?

ওর গলাটা কিন্তক মুঁই ধরি ফেলালু শ্বালা। আর মোর পায়ের তলাৎ মাটি খসি গেইল। মোর পায়ের তলাৎ মাটি নাইরো—লাফ দিছু মুঁই। লাফ দিছু যত মোর গায়ে জোর। উয়ার কলারটা চাপি ধরলু—কাক মুঁই জমিন বেঁচালু শালা?

—মুঁই কি জানো। যায় কিনিসে তায় কসে।

—হারামী লাউডগা সাপ! তোক—কায় কসে, বাপের ব্যাটাটা কায়?

—পুলিন মোক ছাড়ি দে। মুঁই কি জানো। প্রণব দেউনিয়া কসে। মোর নাগেসে পুলিন। মাইরি নাগেসে—

একে ঢাক্কায় মুক থুবড়ি পড়ি গেলু হুমরায়। ঘুনষির পয়সা ছড়ি ছিটি পড়ি গেইল। উয়ার মুখখানা মুঁই ঘষি দিনু মাটিৎ।

—লাউডগা শালা হারামী। পাছাৎ এক লাথি কষি দৌড় করি ছুটি আসলু বাড়ীৎ।

—শ্বালা মোর ঘর নাই। লাউচালা, পুঁইমাচা নাই, নাইরো হামার নেবু গছ। হু হু করেসে খালি জমিনটা। মোর জমিন, মোর ঘর কোনো নাই—খালি জ্যোৎস্না ঢল যাসে। ভাউলে ডিঙ্গা করি মুজনাইত, ভাসিবার জ্যোৎস্না। গৌরীর চেহারার, গৌরীর কথা ভাবিবার জ্যোৎস্না। চাঁদনি-জ্যোৎস্না চষা মাটিৎ জ্বল জ্বল করেসে। রূপার মতো, জোনাকি, মুক্তার মতো। মোর বাপের মায়ের চোখের জলের মতো।

চুরমার করে বাজ ভাঙ্গছে আকাশ। চারিদিক দরদালান বাড়ী ঘর খাঁচা যেন ধসে যায়। পুলিন মেঝেতে নয়—যেন ভেজা আলের উপর বসেছে। পুলিন কালো দাগের নীচে সবুজের পর চুঁইয়ে চুঁইয়ে জমা লাল মেঝেতে বসে। পুলিন ভেজা আলের উপর সত্যচষা জমির ধারে বসে আছে—'কাথা' বলেছে ঃ

মুঁই মোর মাটিৎ বসি, হাতখানা মোর মাটিৎ—হাত মোর ডুবি যায়। হাত মোর রক্তে বাবু মাখামাখি। সারা গায়ে মোর মাটি মাখামাখি। সারা গায়ে মোর জ্যোৎস্না—সারা গায়ে মোর রক্ত। মুঁই বাবু শ্যালা আর থাকিবার পারিলেক না হয়। শ্যালা কি বাবু থাকিবার পারা যায়? মুঁই ছুটি গেনু—খালি হাত মোর—মুঁই একেলা।

খাওয়া করি, দাওয়াৎ বসি শ্যালা খুব মোজা করি তাংকু টানেসে। প্রণব বাবুই। খোলাতে বসি দশবিশ জন। মোঙ্গলার দল। হুমরায় মানুষ না হয় ছায়া। প্রণবের ছায়া। উয়ার মরা বাপ ঠাকুরদ্দার ছায়া।

মুঁই পুলিন। মুঁই সিধা কলু—কবে তোক জমিন বেঁচালু শালা?

—মুঁই কোনো বেরাইনি (বেআইনি) কাম কিছু করো নাই। মুঁইতো চাষ ভাত্ত নাই। চাষ দিসে মোঙ্গলা। মুঁই খালি ওক রাইন মতো দখল দিসি। আর জমিনটাও ওক বেঁচাবারই মনস্থ করসি।

—বাহারের মোজা, কার জমিন কাঁয় দখল দিসে, আর কাঁয় বেঁচায়? তোর নদারীটাক কি দখল দিবার পারি মুঁই—বেঁচাবার পারি, যায় তোর ব্যাটা মাথাভাগটাক জন্ম দিসে?

—পারিস না ক্যানে পারিস। সেই মতো হইলেক হয়, পারিস—তোরটা যেই নং, তোর জমিনটা যেই নং। জমি তোর জন্ম দেওয়া বাপই বেঁচি গেইসে। তুহেতো সব জানিস, এলায় ফির না জানার ভান ক্যানে? আর কাগজ পত্তর সবতো মোরঠে আসেই—দেখিবার চাসতো দেখিবার পারিস। তোর বাপেরঠে মোর পাওনা হইছিল ৫০০ টাকা। আর একটা বিপদে ঠেকি মুঁই টাকাটা ফিরৎ চানুতো জামিনটা নিখি দিলেক তোর বাপ। খালি এই মতোই একটা শর্ত করা গেইছিল দুইটা বছরের মধ্যে টাকাটা তোমরা শোধ দিবার পারিলে হয় দলিলটা মুঁই ফিরি দিম গোটাই। দুইটা বছর তুহে, তোর বাপ জমিনটা ফাঁকতে খাইছিস—ঠকাইছিস। বাপ তোর গত হইসে শ্যালা আজি তো তুহে রাজা। প্রণব দেউনিয়া বিলাইতি তাংকু গঢ় গঢ় টানে......মান্না হইছিস......দল করিস......মানুষের মাথাৎ ডাঙ মারিস ......মাইয়া ছাওয়া, ছেনাল যাস...।

মোর বুকৎ যেন জলন্ত টিক্কার ছেঁকা নাগিল। মুঁই দুই পা আগি গেনু। —খপরদার পুলিন! আজি তোর হাতে লাঠি নাই। মুঁইও এইঠে লাঠি রাখি

নাই কোনো। নল আছে লোহার। আর জমিনে ফয়সালা করিবার চাছিস তো মোঙ্গলার সাথে বুঝ।

মোঙ্গলার দলটা এগিনাৎ বসি ধবধবা জ্যোৎস্নায় ফ্লাশ তাস খেলায়। আর একজন কাঁয় যেন পারোর (কবুতর) খোপ হাতড়ায়।

—তুহে রিজিষ্টি অফিসৎ যাবার চাসতো যাবার পারিস ক্যানে পুলিন। সদর সহরৎ যায়া কোর্টকাচারি করিবার চাসতো কর। একটা উকাল মহুরী ধর ক্যানে। সেইটাই হুবে ভাল্। শান্তি মতো। আইন মতো। আইনে আইনে মুকাবিলা। প্রণব দেউনিয়া তখন গন্ধালির ফুরসির মৌতাতে।

পুলিনের যেন ভাবান্তর হয়। ঝড়, অঝোরে জল। পুলিনের হাতে পোস্টকার্ড।

মাটি নাই, ঘর নাই, নাইরো মোর নেবুগছ…হালটা কুড়ালে কাটা দুই টুকরা ;…নাই গৌরী, ভালবাস, উত্তরাধিকার—দোতরা আর ঘর…জ্যোৎস্না খালি জ্যোৎস্না,…জ্যোৎস্নাই যেন গতর পুড়ায়…জ্যোৎস্নাৎ হায় হায় পাথার !

—হঠাৎ করি কয়টা ছায়া মোক ঘেরি ধরে নদীটার ধারে। শশ্মান তো হামার গ্রামের নদীর বা জলের ধার হইলেই হয় ! বুঝি গেনু আজি মোর শ্যাষ। কপালোৎ আছে মরা।

—কায় পুলিন ? আয়, চল। কিন্তুক হামার আপনার মানষি গুলাই সব।

—একজন খবরটা করি গেইল প্রণবের ঠে আসিস তুই।

—অয় কাঁয় হে ?

—মুখ দেখি নাই।

—গলটা যেন খিব চিনা ?

—চিনা আর দরদদিয়া।

—অয় দৌড়ি আসিল আর খবর করি চলি গেইল।

—দশবিশ জন লাঠি কোঁচা বন্দুক ধরি আসিল—শ্যালা ব্যালাটা শেষ হুবে হুবে।

—কি করিম হামারলার কপালের দোষ।

বাপের মরণ খবরটা যেন গ্যাছে। আমার রাগ উঠি যায় :

—আর তামান মানষিলা তোমরা বোনুসের আচলৎ সোন্ধাইসেন। ভাবিসেন, যায় তো পুলিনের ঘর যাউক, পুলিনটা একেলাই মরুক। মুঁই মরি গেইল হয় তেলে জলে কি মিশ খাবে ? এক বৈঠকে কি অন্ন ভাগ করি খাবেন

সগাই আর শ্যালা খোয়ার মোজায় চক্ষু মুদি আসিবে। সকলে মিলি ঝুলি যেন সকীর্তনের একটা দল খুলিবেন। ধাম বসিবে ধাম প্রণব গিরির এগিনাৎ।

—ঐ মতোন ক্যানে কহ বন্ধু, হামরালা কি তোমার দুঃখ-কাথা কোনো না বুঝি? বর্ষাৎ—কাদাৎ—জোঁকে-সাপে মাটি না চষি, না গাড়ি ভাই?

—যার বুঝিবার তায় তো বোঝে। যদিও না হামার চেতন কম।

—শিকড়ের নাখান খালি হামরা মাটি খুঁজি।

—তুহে এলায় চলি যা পুলিন, পালি যা।

—পালি মুঁই না যাম্। এইঠে হামার সব, সগাই আছেন তোমরা বন্ধু।

—কালি আতে প্রণবের ঠে বুদ্ধিটা হইসে। মাথাভাঙা নাকি কসে মোঙ্গলা পুলিনটাক খালি ফেলি দিবার নাগিবে। ফেলি দাও—শ্যালা কি হয় না হয় দেখা যাবে।

—মোঙ্গলা কসে, জমি জিরাত মোর কি কামে নাগেসে?

—দেউনিয়া কসে, কিন্তক মোঙ্গলা হামারলার কাথা মতো চলা ছাড়া তোর আর কোনো গতি নাই। চলিলে শ্যালা কোনো ঝামেলাও নাই। টাকা তোর যত নাগে দিম। কত আর নাগেসে—দশটা টাকা ক্যানে এক কেজি চালে তো এলায় গাভুর বেটিই পাওয়া যায়। দেউনিয়া শ্যালা ঘুনষি কোমরের, কুঁচকির দাদ খাউজায়।

—তুহে এলায় চলি যা পুলিন। কয়টা দিনের বাদে যা।

—হামারলা সগাক হয়ত চলি যাওয়ার নাগিবে। মহামারী আকালে যেমন।

—যায় চলি যায়, তায় হয়ত ফিরি ফিরি আসিবে। হয়ত অন্য রকম।

—জলে জলে মুজনাইত বানা যেমন।

—জীবনটা মরিবার না হয় পুলিন, মরিবার না হয়।

—মরিলে তো মুজনাইত ডুবি মরা ভালো—জ্বালা জুড়ানো কত জল।

—মরার কাথা মোর মনৎ না আইসে।

এইলা কাথা সগাই কহিল। সগার কণ্ঠ এক কণ্ঠ, কণ্ঠে কণ্ঠ মিলি যেন একেটাই কণ্ঠ হইসে।

—গ্রামে মোর নিজের থাকাটা এলায় এট্টু অসুবিধা বাবু। গিরি জোতদার তামাল্লার ঘর এ্যালা এককাট্টা। হামরালা দিন দুফুর গতর খাটি, চিল্লা পারি, ডাঙ ধরি। আর হুমরায় রাত আন্ধারের কারবারি—পাছৎ থাকি মারেসে।

বন্দুক ভাড়া দেসে। খুনির হাত সাপের মতন। হামারলার দিশী মানষিলা একটা কাথা কসে : কসে, সাপ মারিবার ধইসেন তো মারি ফেলান ক্যানে—বাসাটা ভাঙি ফেলান। জখম হওয়াটা কোনোমতো বাঁচিলে হয়, বংশটা রক্ষা পায়া গেইল হয়, শ্যালা মুশকিল। এলায় তো ফির ঢোঁড়া হসে গোমা আর বিলাই হসে চিতা।

—তুমি কি ফিরে যাবে না পুলিন ?

—ক্যানে যামো না! নিশ্চয় করি ফিরি যামো। কিন্তুক এলায় মুঁই খালি জানি দিবার চাসি—মুঁই আছি—মুঁই বাঁচি আছি। মুঁই ফিরি গেনু হয়—গোমা চিতার আর কোনো অক্ষা নাই। মুঁই পুলিন, মুঁই পাগলা ক্ষ্যাপা।

—ফিরে গিয়ে কি আর হবে পুলিন ? খুন ? এ প্রশ্ন আমাকে করতেই হয় এখন।

শোকেসে রসে ভাসে পানতোয়া, রাজভোগ আর ট্রেতে নৌকাবিলাস। বাইরে ঝড় আর বৃষ্টির উথল পাথল।

—মুঁই তো আর মোঙ্গলা না—পুলিন। আর রাজাটাক খালি মারিলে তার ব্যাটাটায় রাজা হসে যে বাবু! ঐ নাখানই হামারলার কাথা বাবু। না জানি হামরা কাথার ভাষা।

আদলত-কোতয়ালীর, সদরের আকাশ কাঁচের মতো ভাঙছে। নিঃশালটিয়া পুলিনের ফালমুখী হালের কড়াপড়া হাতে পোস্টকার্ড, তাতে যদিও নেই আর রাজা-মাথা ছাপ—তার কথা লিখি দেওয়া যায় না। কারণ তা এখনও আইন মোতাবেক না।

ভ্রম সংশোধন

কার্তিক ১৩৮১ নভেম্বর ১৯৭৪ সংখ্যা 'পরিচয়'-এর ৪১৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'দুটি কবিতা'র লেখক সুবীর ঘোষ, সুধীর ঘোষ নন। এই গুরুতর মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।—সম্পাদক

আগামী কোনো একদিন

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বিনোদ টের পেল, ঘরের মধ্যে তার ছেলে বিজুকে তার মৃত দাদার ছেলে অজু বলছে, 'মনে কর তুই পুলিশ আর আমি ইনক্লাব করি। আমি রাস্তা দিয়ে মিছিল করে যাচ্ছি আর তুই দড়াম করে গুলি মেরে দিলি—' অজুর গলার স্বরে গুলির আওয়াজের মতো নকল একটি শব্দ পর্যন্ত বিনোদ শুনতে পেল।

উনিশ-শো সত্তর-একাত্তর সালে অজুর বয়স ছিল সাড়ে চার কি পাঁচ। তার এইটুকু মনে আছে, একদিন বিকেলে সারা গায়ে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো বাবার শরীরটাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হলে পাড়ার অনেকে এসে তাদের বাড়িতে জড়ো হয়েছিল। মা কাকু ইত্যাদি যথেষ্ট কাঁদছিল, তবে সেটা যে অনেক বড় একটা কান্নাকে চাপা দেবার জন্যে তা বোঝার মতো বয়স অজুর হয় নি। তার শুধু স্মরণ হয় যে বাবার মুখের ঢাকাটাকে—কেন কে জানে—কিছুতেই সরানো হচ্ছিল না। এই পর্যন্তই তার মনে আছে। স্বভাবিক ভাবেই—বলা যেতে পারে—তার চোখেমুখে সেদিন কোনো প্রতিক্রিয়া ছিল না; কিম্বা যা ছিল, তা যে কোনো শিশুরই সহজাত বিস্ময় ও কৌতূহল।

এই ঘটনার বছর তিন-চার পরে একদিন সুবোধের শোবার ঘরে তার যৌবনের যে ফটোটা টাঙানো আছে—তার দিকে চেয়ে ন বছরের অজু প্রথম জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাবাকে পুলিশ মেরেছিল কেন মা?' তার বাবার হত্যাকারীটি যে কে—কেমন করে যেন সেটা তার জানা হয়ে গিয়েছিল।

অজুর মাকে জবাব দিতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিতে হয়েছিল। অজুর চোখের তারায় এমনই একটা জোরালো জিজ্ঞাসার তাগিদ ছিল—আর পাঁচটা প্রশ্নের মতো যাকে 'ওসব তোমার শুনতে হবে না' বলে এক লহমায় উড়িয়ে দিতে মন সরে নি। বাস্তবিক, অপ্রাপ্তবয়স্কতার দোহাই দিয়ে সংসারে যে কোনো সময়ই যে কোনো শিশুর মুখ বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে; এবং এই ভাবে বাঁচা যেতে পারে বহু অবস্থা কিম্বা সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার থেকেও। কিন্তু বাপের মৃত্যুর কারণ জানতে চাওয়াটা ন বছরের একটা ছেলের দিক থেকে কোনো অপরাধ

নয়। বরং তাকে থামিয়ে দিতে যাওয়ার অর্থই মৃত্যুর স্বাভাবিক ঘটনাটাকে আরও ঘোলাটে করে তোলা। এই উপলব্ধিটিই সম্ভবত সুবোধের বৌকে কয়েক মুহূর্ত সময় নেওয়ার মতো দ্বিধায় দোলাচ্ছিল—তা থেকে বাঁচাতে শেষপর্যন্ত এগিয়ে আসতে হয় বিনোদকেই, 'তোমার বাবা ইনক্লাব করেছিল কিনা, তাই।'

বিনোদ ভেবে নিয়েছিল, সে জবাব দেবে, তোমার বাবা দুষ্টু করেছিল কিনা তাই—কিন্তু কণ্ঠনালী বেয়ে উঠে এসে ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছেও কথাটা যেন হঠাৎ বাঁক নিয়ে নিল অন্যদিকে। অন্তত ঘটনার সত্যটিকে প্রকাশ করে মৃত একটি মানুষের প্রতি এটুকু সম্মান জানাতে সে যেন বাধ্য ছিল।

কথাটি বলা শেষ হয়ে গেলেও মুখ তুলতে পারছিল না বিনোদ ; তার কথার জবাবে অজুর মুখের চেহারায় কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেতে পারে, চোখ তুলে তাকিয়ে দেখতে সাহস হচ্ছিল না তার। অজুর মা-র দিকে তাকাতেও যেন কেমন ভয় করছিল বিনোদের। ন বছরের একটা ছেলেকে এই উত্তরটা দিতে যাওয়া কতখানি বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে—এ ব্যাপারে তার নিজেরও সংশয় ছিল বৈকি।

সেদিন রাত্তিরে বিছানায় শুতে এসে বিনোদের বউ 'তুমি কেন অজুকে ও কথা বলতে গেলে' বলে তাকে ভর্ৎসনা করতে যেতেই কোথা থেকে যেন অনেক শক্তি এসে ভর করল তার শরীরে। বিছানার ওপরে উঠে বসতেই, বড় বেশি সাদামাটা মানুষ বিনোদ পলকের মধ্যে তার সাধারণত্ব খুইয়ে ফেলে কেমন অন্য মানুষ হয়ে গেল যেন, 'কেন বলব না ? ওরা কোথায়, কোন যুগে দাঁড়িয়ে আছে—এখন থেকেই সেটা বুঝতে শিখুক।' খুবই বলিষ্ঠ এবং দৃপ্ত শোনাল তার গলার স্বর। কিছু আগের দ্বিধা কেটে যাওয়ায় বিনোদ সুস্থ বোধ করছিল। সে রাত্তিরে সে ঘুমিয়ে পড়ল সন্তুষ্ট মনে।

আজকের ঘটনা তারও বেশ-কিছু পরের।…

বিনোদ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কপালের শিরাদুটো হঠাৎ কেমন টানটান হয়ে উঠল তার, ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল মাথার ভেতর, তারপর সিঁড়ি ভেঙে উঠে যেতে যেতে বিনোদ বিজুর কল্পিত গুলি বর্ষণের শব্দ শুনতে পেল, তারপরই একটা ধস্তাধস্তি…অজুর গলায় 'এই ছাখ, গুলি করলে কি হয়, দেখলি তো' উক্তি এবং তাকে ছাপিয়ে বিজুর গলায় কান্নার আওয়াজ…এই পর্যন্ত তার শোনার আওতায় এসে গিয়েছিল।

কয়েকটা-ধাপ লাফিয়ে বিনোদ যখন ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল, খেলা ভেঙে গিয়ে বিজু তখন মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছে আর বীরদর্পে পরম তৃপ্তিতে অজু তা লক্ষ্য করছে।

বিজুর অভিযোগ, তার কথা ছিল শুধু গুলি করার। কিন্তু সে গুলি ছোঁড়া মাত্রই, নিয়ম ভেঙে, অজু তাকে সঙ্গে সঙ্গে উল্টে ঘুষি মেরেছে।

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে বিনোদ পুরো দৃশ্যটাকে একবার জরিপ করল। গোল পৃথিবীটা তার চোখের সামনে একটা পাক খেয়ে নিলে বড় তাড়াতাড়ি তার মাথার ওপর পর্যন্ত যেন রক্ত উঠে আসছিল···প্রথমেই অজুর কানটা ধরে কাঁপতে কাঁপতে সে বলল, 'এসব খেলা কোত্থেকে শিখেছিস, বাঁদর?' অজু চীৎকার করে উঠতেই সে বাঁ হাতে মারতে যাচ্ছিল এক বিরাট চড়—তার আগেই বিনোদের বউ ছুটে এসে অজুকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কী হচ্ছে কী এসব? বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই কী শুরু করেছ!'

বিনোদ হাঁফাচ্ছিল, এক-বুক দম নিয়ে সে বলল, 'ছেড়ে দাও, হারামজাদাকে আজ আমি—।' বিনোদের বউ ঘুরে দাঁড়িয়ে একহাতে শাড়ির আঁচল গুছিয়ে নিতে নিতে বলল, 'থাক, আর শাসন করতে হবে না! ছোটোবেলা থেকে যা দেখে আসছে···এর চেয়ে ভালো খেলা ওরা শিখবে কোত্থেকে?' অজুর মাথাটিকে বুকের ভেতর চেপে ধরে সে তাকে শান্ত করতে চাইছিল ভালোবাসায়; আর কান্নার আবেগে অজু তখনও ফুঁপিয়ে উঠছিল দমকে দমকে।

বিনোদ দারুণ চমকে উঠল।

পৃথিবী তো আবর্তনশীল! নিজের কথার নিক্ষেপ যে সময় ও গতির তাগিদে আবার একদিন নিজের কাছেই ফিরে আসতে পারে—এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে। বিনোদের তো রাগ করা উচিত নয়!

রাগ নয়, প্রথমে চমকে ওঠার পর বিনোদের মনটা ধীরে ধীরে বিশ্রী এক বিষণ্ণতায় ভরে গেল। সন্ধ্যেবেলার এই সময়টিতে সে সকালের খবরের কাগজটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে; কিন্তু আজ বিনোদ কিছুতেই মন বসাতে পারল না। অস্বস্তিকর ভাবে সে কিছুক্ষণ পায়চারী করল এঘর-ওঘর। রোজকার অভ্যাসমতো অজু-বিজু পড়া মুখস্ত করছিল···বিনোদ দরজার আড়াল থেকে খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনল। একজন পড়ছে ইতিহাস, অন্যজন ভূগোল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে শুনতে শুনতে একটা জোরাল হাসি এসে গেল তার;

দেশের ইতিহাস-ভূগোল চিনতে যেন বাকি আছে ওদের ! নিষ্প্রাণ শবের মতো কতগুলো বইয়ের মধ্যে নিয়ে ওদের ভেতর প্রাণ সঞ্চারিত করে বোর প্রয়াসটাকে হাস্যকর মনে হল তার।

সুবোধ মারা গেছে বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। সেই দুর্ঘটনার শোক বহুদিন হল থিতিয়ে স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল···কিন্তু আজ যেন হঠাৎ সুবোধের বউয়ের দিকে তাকাতে গিয়ে কেমন দৃষ্টি কেঁপে গেল বিনোদের। কোথায় যেন সে বড় অপরাধী হয়ে যাচ্ছিল···কেমন এক অস্বস্তিবোধ খামচে ধরছিল তার ভেতরটাকে···সেদিনের সন্ধ্যেটা বড় বিষণ্ণতায় কাটল বিনোদের।

এই ঘটনার দিন সাতেক পরেই একদিন পাড়ার ছেলেরা রাস্তা থেকে ধরে এনে অজুকে সঁপে দিয়ে গেল বিনোদের হাতে। সে নাকি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে ছুটন্ত পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়ছিল। পাছে কোনো কেলেঙ্কারি হয়—এই আশঙ্কায় পাড়ার ছেলেরা তাকে জোর করে ধরে বাড়ি নিয়ে এসেছে।

বিনোদ দেখল, অজু চুপ করে তাকিয়ে আছে। তার চোখে কোনো অনুভূতি নেই ; কিন্তু তারা দুটো অদ্ভুত স্থির হয়ে আছে। এবার আর বিনোদ রাগল না, উত্তেজিত হল না আগের মতো ; শান্ত গলায় সে শুধু বলল, 'তুই ইট ছুঁড়েছিলি ?' অজু বলল, 'হ্যাঁ।'

—'কেন ?'

—'পুলিশ কেন বাবাকে মেরে ফেলেছিল ?'

বিনোদ দপ করে নিভে গেল।

ওকি পাগল ! বিনোদ পরে ভাবল—ন বছরের ছেলে ! কীই বা বলতে চায় ও !

অজুকে আড়ালে ডেকে একদিন সে বলল, 'ছি, ওসব করতে নেই বাবা। কথার অবাধ্য হয়ো না।' অজু তাকিয়েছিল অন্যদিকে—বিনোদ দেখল দৃষ্টিটা কি কঠিন ! ছেলেপুলের চোখ কত নরম টলটলে হয়, নাড়া দিতে ভয় লাগে, এই বুঝি গলে ঝরে গেল। কিন্তু এ ছেলেটার চোখ দুটো যেন পাথরের মতো। বিনোদ ফের বলল, 'আমার কথা এবার থেকে শুনবে তো ?'

অজু বলল, 'না। পুলিশ কেন বাবাকে···' তার ন বছরের নরম চোয়াল অকালে হঠাৎ শক্ত হয়ে এল যেন। বিনোদের মাথার ভেতর ঝিম ঝিম করে

উঠল। তার মনে হতে লাগল, উল্টে অজু যেন তাকেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল, তোমরা কেন তখন পুলিশকে ছেড়ে দিয়েছিলে? অতএব, এখন যা কিছু করার অধিকার যেন তার অবশ্যই আছে।

বিনোদের সবকিছুই যেন কেমন ওলট পালট হয়ে যেতে লাগল। রাত্তিরে শুতে এসে নিজের ছেলের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকাতে এখন তার ভয় হয়। কত টলটলে নিষ্পাপ ঘুমন্ত মুখখানা! ওর বয়েস এখন পাঁচ। বিনোদের মনে হয়, ঐ কোমলতার আড়ালেই– কে জানে—হয়তো সে লুকিয়ে রেখেছে কারো প্রতি কোনো রাগ বা ঘৃণা। সময় হলেই যা ফেটে পড়বে ভরন্ত আবেগের তাগিদে···

বিনোদের বুকের ভেতর কোথায় একটা ভাঙচুর শুরু হয়ে যায়।

ছেলেকে কাছে ডেকে একদিন সে চুপিচুপি বলল, 'আমাকে তুই ভালোবাসিস, বিজু?' সেদিন অজুর হাতে সে প্রহৃত হবার সময় বিনোদ অজুকে শাসন করতে গিয়েছিল। বিজু তাই বর্তমানে বাপের ওপর প্রসন্ন ছিল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'খুব। তোমাকে আমি ··' নরম হাত দিয়ে বাবার গাল দুটো চেপে ধরল সে।

ছেলের বুকে গাল ঘষতে ঘষতে বিনোদ বলল, 'তুই কোনোদিন বলবি না তো যে আমি তোকে খারাপ শিখিয়েছি—আমি তোর জন্যে কোনোদিন কিছু করি নি?'

বিজু অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কী বলছ বাবা?' বাস্তবিক কথাটা যে তার বুঝতে পারার কথা নয়—হঠাৎ উপলব্ধি করল বিনোদ। ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে সে বলল, 'না কিছু না। তুই এখন যা।···'

গোটা সংসারটার কাছেই বিনোদ যেন অপরাধী হয়ে যেতে শুরু করল। প্রথম কটি দিনের উচ্ছ্বসিত শোকের পর সময়ের নীচে মাটি চাপা পড়ে সবকিছু যেন কবর হয়ে যেতে শুরু করেছিল—আজ এতকাল বাদে বাচ্চা একটা ছেলের নিছক একটা খেলা যেন তাজা রোদের আলোয় খুঁড়ে বের করে নিয়ে আসতে চাইল তার টাটকা শরীরটাকে।

সুবোধের বউকে একদিন জিজ্ঞেস করল বিনোদ, 'তুমি কি মনে করো বৌদি দাদার মৃত্যুর জন্যে আমাদের পুলিশের এগেইনস্টে কেস করা উচিত ছিল?' অকস্মাৎ এতদিন বাদে এই প্রসঙ্গটি তুলে ফেলে নিজের কাছেই খাপছাড়া শোনাচ্ছিল বিনোদের। সুবোধের বউও অবাক বড় কম হয় নি। বিনোদের

দিকে নিস্পন্দ চোখ দুটো তুলে এক পলক স্থির রেখে বলল, 'তাতে আর কী লাভ হত ভাই।' বাস্তবিক এই কথাটি বলার পালা ছিল যেন বিনোদেরই। সুবোধের বউ যদি কেস করার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি খাড়া করত, তাকে খণ্ডাতে এই মন্তব্যটির প্রয়োজন হত বিনোদের। নিজে থেকেই আলোচনাটিকে স্বেচ্ছায় এমন নেতিবাচক করে তুলে বিনোদকে যেন আরও বেশি জব্দ করতে চাইল সুবোধের বউ।

প্রথমটা থতিয়ে গেলেও শক্তি সংগ্রহ করে বিনোদ বলল, 'কিন্তু আমাদের দিক থেকেও তো কিছু করার ছিল। অন্তত বিবেকের কাছে...' এমনই নড়বড়ে পঙ্গু ঠেকছিল বিনোদের যুক্তি, সুবোধের বউ সশব্দ হাসিতে ফেটে পড়লেও সে ক্রুদ্ধ হত না। কিন্তু সে একটু হাসল শুধু, 'ওসব বিলাস তো আমাদের মতো মানুষের সাজে না ভাই।' ঠোঁটের বাঁ পাশটি চেপে ম্লান হাসির সঙ্গে মিশে-আসা তার ছোট্ট কথাটি এমনই শোনাল—অস্বস্তি শতগুণে বেড়ে গেল বিনোদের।

ইতিমধ্যে আরও দুদিন অজু একই ভাবে পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইঁট ছুঁড়ে মারতে থাকায়; বিনোদ হুকুম দিতে বাধ্য হল—অজুকে পেছনের ঘরে বন্ধ করে রাখা হোক। দরজার খিল যেন কেউ না খোলে।

আসলে যথাসময়ে তার হুকুমটি কিছু শ্লথ হয়ে যেতেও দেরি হল না। মোটামুটি ভাবে দাঁড়াল এই, যে, সারা বাড়িতেই অজুর ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা রইল। শুধু সে যাতে রাস্তায় না বেরোতে পারে—এ ব্যাপারে তার ওপর সকলের কঠোর দৃষ্টি রইল।

দুটো দিন কাটল। পাহারা দেবার জন্যে বিনোদ একদিন অফিস পর্যন্ত গেল না। ঠিক সময়টিতে সে যখন বিশ্বস্ত প্রহরীর মতো দরজা আগলে এসে দাঁড়াত—বিনোদ লক্ষ্য করত, কেমন অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছে অজুর দৃষ্টিটা। সে যখন তাকিয়ে থাকত—বিনোদের মনে হত বড় কৌতুকে সে যেন লক্ষ্য করে যাচ্ছে তাদের এই আত্মরক্ষার খেলা।

একদিন সে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও না কাকু। কেন আটকে রেখেছ?' বিনোদ বলল, 'না।' অজু কী নির্লিপ্তভাবে বলল, 'কেন, পুলিশ তো আর তোমায় ধরবে না?' বিনোদ চমকে উঠল। ওর ন বছর বয়েস—বিনোদ ভাবল—তবু ও কেমন করে টের পেল. ভেতরে ভেতরে আমি ভয় পাই!

চারদিনের মাথায় অফিস থেকে ফিরে বিনোদ খবর পেল—কেমন করে যেন সকলের নজর এড়িয়ে অজু আজ রাস্তায় চলে গিয়েছিল। আজ তার ইঁটটা

সরাসরি গাড়িতে এসে লাগায় সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষে ভ্যান থেমে যায়। অজু অবশ্য ততক্ষণে ফেরার, কিন্তু পুলিশ নাকি গাড়ি থেকে নেমে পাড়ায় ঢুকে জিজ্ঞাসাবাদের পর খুঁজে খুঁজে তাদের বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত নিয়ে গেছে।

অদ্ভুত বিষাদের আবহাওয়ায় থমথম করছিল সারা বাড়িটা।

বিনোদ দেখল, ঘরের এক কোণায় অজু বসে আছে। সে আড়ালে সকলকে বলে দিল, 'ওকে তোমরা কেউ কিছু বোলো না।' আর ভেতরে ভেতরে নিজে গুম হয়ে গেল।

রাত্তিরে বিছানায় শুতে এসে বিনোদ শুনতে পেল তার ছেলে বিজু মাকে জিজ্ঞেস করছে, 'ইনক্লাব মানে কি মা?' কেন যে এত রাগ হল কে জানে, ছেলের ঘাড়টা চেপে ধরে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে বিনোদ বলল, 'কোত্থেকে শুনেছিস এসব কথা?' বিজু কিছু বলতে যাবার আগেই তার ঠোঁটে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বিনোদ ফের বলল, 'চুপ। আর একটা কথা বললে গলা টিপে মারব।' হিংস্রতায় ঘড় ঘড় করছিল তার গলা। বিনোদ কেমন নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছিল···তারপর এক সময় বিজু ঘুমিয়ে পড়লে তার কেমন মন খারাপ হয়ে গেল।

উঠে গিয়ে একবার পাশের ঘরের জানলা দিয়ে বিনোদ দেখে এল, অজু ঘুমোচ্ছে···কী নিষ্পাপ ওর মুখ···ন বছরের কচি দুটো গাল···ওকে আমরা ভয় পেতে শুরু করেছি···

ঘরে ফিরে এসে বিনোদ দেখল তার বউ খোঁপার থেকে চুলের কাঁটা খুলে রাখছে। বিনোদের আশঙ্কা হচ্ছিল—এই বুঝি সে তাকে কিছু বলে বসে। সুবোধের বউকে হঠাৎ ঘরে ঢুকতে দেখে অবাক হয়ে গেল বিনোদ।

সুবোধের বউ এ সময় এ ঘরে বড় একটা আসে না। সে এসে একেবারে বিনোদের কাছটিতে দাঁড়াল···বিনোদ অবাক হয়ে যাচ্ছিল···সরাসরি ভাবে সে তাকাতে, সুবোধের বউ বলল, 'ওকে তুমি বোর্ডিংয়ে পাঠিয়ে দাও ঠাকুরপো।' পাথরের মতো শক্ত ও প্রাণহীন শোনাচ্ছিল তার গলা, 'বোর্ডিংয়ে?' ···বিনোদের গলার স্বর বিস্ময়ে আর্তনাদের মতো শোনালে সে ফের বলল, 'হ্যাঁ। ওর একার জন্যে তো আর আমরা সবাই ডুবতে পারি না।' যার ভয়ে সবাই সিঁটিয়ে থম মেরে আছে সেই চরিত্রটির বয়েস যে ন বছর, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে শেষকথাটি যে কী হাস্যকর, তা মনে এল না বিনোদের। সে শুধু বলল, 'কিন্তু ওকে ছেড়ে তুমি···' সুবোধের বউ বলল, 'থাকতে পারব।' তারপর হঠাৎ

বিনোদের দুটো হাত চেপে ধরে বলল, 'তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওকে এখান থেকে সরিয়ে দাও।' সে হাঁফাচ্ছিল, শ্বাস টেনে যোগ করল, 'আমি ওর মা, কিন্তু আমি ওকে ভয় পাই, জানো! ওর চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে আমার সাহস হয় না…' বিনোদের দিকে চেয়ে চেয়ে তার দৃষ্টি অপলক হয়ে গেল।

বিনোদ বউয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল সেও তেমনি তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তখন তিনজনেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটি মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল।

বিনোদ নির্বাক হয়ে যাচ্ছিল…উত্তরটা তার জানা—একেবারে হাড়ের ভেতর, মজ্জার গভীরে তার সজীব অবস্থান। তাই ভয়টা যে কিসের, একথা শুধোতে তার আর সাহসে কুলোল না।

পুস্তক-পরিচয়

সাহিত্যে সমাজবাস্তববাদ। নগেন দত্ত। পরিবেশক : শিক্ষাভারতী, কলকাতা। আট টাকা

আমাদের দেশে সাহিত্য-সমালোচনা মূলত রসবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের মূল অন্বিষ্ট সাহিত্যে সর্বজনীনতা। এঁরা ভাবের সাধারণীকরণের কথা বলে থাকেন, কেননা, সাধারণীকৃত ভাবের মাধ্যমেই লেখক-পাঠক-সম্বন্ধ দৃঢ় হয়, সহৃদয়ের মনোমুকুরে তা প্রতিফলিত হয়, তখন সংবেদনশীল পাঠকের মনে হয়, এই বস্তু আমারও বটে, আমার নয়ও বটে, এবং তার মাধ্যমেই আক্ষিপ্ত হয় রস যা আনন্দের নিদান।

সাধারণীকরণ কথাটি ব্যাপক অর্থবহ। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ এবং ভাববাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের কথা বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিচার করলে এই শব্দটির মধ্যে একটি বস্তুবাদী দিক লক্ষ্য করা যায়। তা হল স্রষ্টার সমাজ সম্পর্কিত চেতনা, আর্থ-সামাজিক বিষয় সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান। এই জ্ঞান ব্যতীত ঘটনার সাধারণীকরণ সম্ভব নয়। কিন্তু সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বা পাশ্চাত্য ভাববাদী দার্শনিকগণ সেদিক থেকে বিচার করেন নি। তাঁরা দেখেছেন ভাবের শুদ্ধীকরণ হিসাবে। সেই কারণেই তাঁদের কাছে "The true tragic fear becomes an almost impersonal emotion attaching itself not so much to this or that particular incident. as to the general course of the action which is for us an image of human destiny." (Butcher) অর্থাৎ, সেই ভাবের শুদ্ধীকরণ বা "purification of the passions" এবং তার মাধ্যমেই "We pass from troublous emotion to the serenity of contemplation." (Croce)

আধুনিক কালের সমালোচকগণও মূলত এই ধরনের চিন্তাস্পর্শেই বর্ধিত, পরিচালিত এবং প্রতিষ্ঠিত। ফলে, এঁরা সাহিত্যবিচারে সাহিত্যের উপরিতলেই বিচরণ করেন, তথাকথিত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন কিন্তু ঘটনার গভীরে প্রবেশ করেন না। অর্থাৎ যে আর্থ-সামাজিক পরিবেশে চরিত্রের প্রকাশ

এবং বিকাশ বা তার মনোলোকের বিভিন্ন ক্রিয়া-বিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে, বা যে শ্রেণীসংস্থান থেকে তার উৎপত্তি—তার সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণে এইসব সমালোচকেরা উৎসাহী নন।

এর পাশাপাশি আরও একটি সমালোচনার ধারা আমাদের দেশে বেশ কিছুদিন ধরে চলে আসছে। বলাবহুল্য, এঁদের সমালোচনায় শিক্ষায়তনিক সংকীর্ণতা নেই, নেই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের নামে আত্মগত ভাবনার স্বেচ্ছাচারী বিলাস-বিস্তার। ফলে, এঁরা জগতকে এবং জীবনকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছেন এবং সেই বিচার, অবশ্যই, "শুদ্ধীকরণ"-এর অতীন্দ্রিয় বিলাস-উল্লাসের পথে নয়, চরিত্রের শ্রেণীগত ভিত্তি সামাজিক অবস্থান এবং আর্থনীতিক প্রেক্ষাপটে ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে তন্নিষ্ঠ হয়ে "social essence" আবিষ্কার করা। এই ক্ষেত্রে তিনি সাহিত্যসমালোচক এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতাত্ত্বিক—উভয়েরই ভূমিকা পালন করে থাকেন। আর, এই কারণেই একজন বৈজ্ঞানিক সাহিত্যসমালোচক শুধুমাত্র "not literary astronomer explaining the inevitable laws of motion of literary bodies.........He is more than this : he is a fighter and a builder." (Lunacharsky) এই রীতিকেই মার্কসীয় রীতি বলে চিহ্নিত করা হয়।

শ্রীনগেন দত্তের 'সাহিত্যে সমাজবাস্তববাদ' এই মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। সাহিত্যের ইতিহাসক্রম আলোচনা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়, এই কথা জানিয়ে ভূমিকা-লিপিতে লেখক সোজাসুজি তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। সমালোচক শ্রীদত্ত মনে করেন, "সমাজ-বিপ্লব বর্তমানে সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য," কেননা, "ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজ-বিপ্লবের পথ নিষ্কণ্টক করা।"

সমালোচকের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তাঁর লক্ষ্য হল যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই, দুঃখের সঙ্গে হলেও, বলা প্রয়োজন, এই গ্রন্থটিতে লেখক যতটা sociologist-এর ভূমিকা নিয়েছেন, ততোটা সাহিত্যসমালোচকের নয়। সাহিত্য স্বয়ম্ভূ নয়, তার সৃষ্টির উৎসভূমিতে বৃহত্তর সমাজজীবন আছে যা পরিচালিত হয় আর্থনীতিক অবস্থা অনুসারে—এ সবই তো আমাদের জানা। তবু, সাহিত্যের তো একটা নিজস্ব দাবি আছে, তার একটা নিজস্ব দিক আছে, সেই দিকটা উপেক্ষিত হলে তো চলে না !

লেখক অত্যন্ত পরিশ্রম করে এবং গবেষক ছাত্রের নিষ্ঠা নিয়ে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি বিশ্লেষণ করেছেন। সাহিত্যবিচারে এই ধরনের বিশ্লেষণ নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু অতিকথন এবং মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনীয় তথ্য মূল উদ্দেশ্যকে খানিকটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। পাঠকের পক্ষে তা শুধু ক্লান্তিকরই নয়, অনেক সময় বিরক্তিকরও হয়ে উঠতে পারে।

লেখক গ্রন্থটির মধ্যে মূলত বিশ-তিরিশ দশকের সাহিত্য আন্দোলন নিয়েই আলোচনা করেছেন। আলোচনায় লেখক কখনো এ্যাকাডেমিক হতে চেষ্টা করেন নি, বরং তথাকথিত রসবাদী সমালোচনার পরিবর্তে তিনি ঘটনা ও চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করে মূল সত্যকে অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছেন। আর এই প্রচেষ্টার নেপথ্যলোকে ক্রিয়াশীল ছিল তাঁর অকম্পিত বৈজ্ঞানিক জীবনদর্শন। সেই ঋজুরেখ দর্শনের আলোকে তিনি সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত বিচার করেছেন, দেশের আর্থনীতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন এবং চরিত্রের ঘনতম সান্নিধ্যে এসে, তার মনের প্রচ্ছদপটের বিশ্লেষণ নয়, হৃদয়ের গহনলোকে অবগাহন করে মানসিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার পর্যায়ক্রম আলোচনা নয়, অথবা দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের সমাধানের জন্যে একটা স্বেচ্ছাকল্পিত সূত্র আরোপ করাও নয়, আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত ব্যক্তিমানুষকে কিভাবে গঠিত করে, তার মনের ওপর কি প্রতিফলন সৃষ্টি করে এবং তার মন যে সমাজ-নিরপেক্ষ নয়, তার মনের গঠন এবং চিন্তা প্রক্রিয়ায় সেই সমাজ ও অর্থনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে যে, তার আলোচনা করেছেন তথ্যনিষ্ঠ ভাবে।

বিশ-তিরিশের সাহিত্য-সাধনায় লেখক দুটি ধারা লক্ষ্য করেছেন। একটি ধারা এসেছে "ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া তথাকথিত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে," অপরটি "শ্রেণী অবনমিত মানবের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা বিকাশের তিলমাত্র সুযোগ না দিয়েই একটা মেকি বাস্তবতার ভাবালুতাকে আশ্রয় করে।" এর অন্যতম কারণ হিসাবে দর্শিয়েছেন আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় বৈদেশিক শক্তির অবস্থান।

আমাদের মনে হয়, দেশে আন্দোলনের তীব্রতা না থাকলে এবং জনগণের সঙ্গে সেই আন্দোলনের ঘনিষ্ঠতা না থাকলে সাহিত্যে তার প্রকাশ ঘটতে পারে না। তাছাড়া, এই ব্যাপারে লেখকের একটি সচেতন ভূমিকা বা **political culture** থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সেই সামাজিক সচেতনতা বা দায়-দায়িত্ববোধ সে যুগের বহু লেখকের ছিল না। তাই ১৯২১ সালে চাঁদপুরে রেল-স্টীমার ধর্মঘট হওয়া সত্ত্বেও তার কোনো প্রভাব 'কল্লোল-কালিকলম'

গোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে লাভ নেই, কেননা, আজকের কমিটেড লেখকরাও কি সে দায়িত্ব পালন করছেন ?

আসলে তখনকার শহুরে জীবন ছিল অনিশ্চয়তার অন্ধকারে দিশেহারা। পশ্চাৎভূমিতে আছে বিশ্বযুদ্ধ এবং তার প্রত্যক্ষ ফলাফল। একদিকে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ভাঙন অন্যদিকে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির বিলম্বিত ও কূর্মগতিতে বিকাশ—ফল হিসাবে সামাজিক জীবনে নেমে এসেছে রুক্ষ উদ্‌ভ্রান্তি, নিরন্ধ্র অন্ধকার, বিচ্ছিন্নতাবোধ, অন্ধ অসহায়তা, স্বেচ্ছাচারী চিন্তার বিলাস, পুরনো মূল্যবোধের অবসান, শিক্ষিত নিম্নমধ্যবিত্তের আর্থিক হাহাকার, আত্ম-সংযম এবং সংরক্ষণের অভাব ও যৌন ব্যভিচার। এই সামগ্রিক হতাশা 'কল্লোল' গোষ্ঠীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কেউ কেউ সেই হতাশা, অন্ধকারময় যুগ থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রচলিত পরিবেশে বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের অভাবে মুক্তির পথ খুঁজে পান নি। ফলে, তাঁরা একটা কল্পিত মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন সাহিত্যের মাধ্যমে। তার মধ্যেই তাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের চিন্তার মুক্ত। বোধকরি, বুদ্ধদেব বসু সেটাকেই "a freer atmosphere" বলে চিহ্নিত করেছেন। শব্দের মোড়কে যাই থাকুক না কেন, তাকে যৌবনের মুক্তি-উল্লাস না বলে যৌন চেতনার মুক্ত উল্লাস বলাই অধিকতর সঙ্গত। নগেন্দ্রনাথ দত্ত 'কল্লোল' গোষ্ঠীর এই দিকটি খুব সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু, এই প্রসঙ্গে বক্তব্য, অতিশায়িতার মদিরতার যুগে স্থিতধী চিত্তের প্রমাণ কি একেবারেই পাওয়া যায় নি ? নগেনবাবু তার উল্লেখ করেছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র-শৈলজানন্দ সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত মন্তব্যে। আমার মনে হয়, এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন এবং অবশ্যই তা positive দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কেননা, যখন 'sex stimulus' ব্যতীত "the world goes grey" ধরনের চেতনার প্রচার দ্রুত গতিতে চলছিল, তখন এই দুজন লেখকের সাধারণ মধ্যবিত্তের জীবনসংগ্রামের চিত্র আঁকার চেষ্টা বা কয়লাকুঠির বেদনাতপ্ত জীবনকে ভাষা দানের প্রয়াস এই সময়ের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা! এর সার্বিক মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে। এ ছাড়াও, 'কল্লোল' গোষ্ঠীর এমন লেখক আছেন যাঁদের রচনায় সে যুগের চিত্রটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে ধরার একটা প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে গোকুল নাগের 'দেবতার গ্রাস' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম যুদ্ধোত্তর জীবনে যে সামাজিক পরিবর্তন লেখকের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছিল, তারই সংবেদনশীল সৃষ্টি এই গল্পটি। গল্পটিতে লেখক শুধু বিনষ্টি

ও বিভগ্নতার পাণ্ডুর চিত্রই অঙ্কন করেন নি, সেই সঙ্গে নবজীবনের আশা-স্বপ্নের দিকটিও রেখায়িত করেছেন, দেখাবার চেষ্টা করেছেন অবক্ষয়িত ইতিহাসের ভগ্নস্তূপের ওপর প্রত্যয়ের রূপালী রেখাকে। এখানে তাঁর প্রতিভা শুধু সৃজনধর্মী অভিনবতার মধ্যেই সীমায়িত নয়, বিজ্ঞানধর্মীও বটে। সত্য বটে, ওদের মধ্যে অতৃপ্তিজনিত বেদনার বুর্জোয়া রোমান্টিক এ্যাটিচুড আছে, কিন্তু নিতান্ত critical realist হিসাবেও এঁদের স্বতন্ত্র মূল্য-মহিমা, সেই বিনষ্টির যুগে, নির্ধারণ করার প্রয়োজন আছে। নগেনবাবু এঁদের সম্পর্কে আশ্চর্যভাবে নীরব থেকে গেছেন।

শুধু চরিত্র বিপ্লবী হল না কেন, এই আক্ষেপ করা অপেক্ষা যা পেয়েছি তার যথাযথ মূল্যায়ন অধিকতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। আর, সাহিত্য আলোচনায় এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিটুকু হারালে চলে না। কারণ, এর মধ্যে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ থাকে, থাকে "readiness to respect the perspective of Socialism and not condemn it out of hand." Lukacs-এর এই বক্তব্য বাতিল করে দেবার মতো নয় যদিও "the perspective of socialist realism is, of course, the struggle for socialism এবং "its ideological basis is an understanding of the future, the individuals working for that future will necessarily be portrayed from the inside." যে দায়-দায়িত্ববোধ থাকলে এই ধরনের চরিত্রসৃষ্টি সম্ভব হয়, 'কল্লোল-কালিকলম' গোষ্ঠীর মধ্যে তা ছিল না যে, সেকথা পূর্বেই বলেছি। তাই নগেনবাবু যে কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, তার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

ছকবাঁধা তত্ত্ব আরোপ করে সাহিত্য বিচার করলে তার মধ্যে অনেক সময় ভ্রান্তি দেখা যায়। নগেনবাবুও সেই ভ্রান্তি থেকে মুক্ত নন, ফলে 'গণদেবতা'র আলোচনা খানিকটা একদেশদর্শিতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। একথা সত্য, "The Marxist critic must try to find the fundamental social trend in a given work; he must find out where it is heading." কিন্তু তার মূল্যায়ন কখনো ছকেবাঁধা হতে পারে না। কারণ মহৎ শিল্পের মধ্যে "care too many aspects to be weighted." সেই সাহিত্য বিচারে যা মূল প্রয়োজন, তা হল "social sensitivity"। নগেনবাবুর "social sensitivity" অবশ্যই আছে, কিন্তু চরিত্র এবং বিষয়বস্তু বিচারকালে মার্কসীয় সমালোচকদের অবশ্য প্রয়োজনীয় "second judgement of a work" দিতে

তিনি দ্বিধা বোধ করেছেন। এমন কি নিতান্ত পেটি-বুর্জোয়া ঘটনাও সম্পূর্ণ বাতিল করে দেবার মতো নয়। কারণ "A great deal of benefit can be extracted from it"—একথা মার্কসীয় বিজ্ঞান-বিরোধী নয়। সুতরাং 'কল্লোল-কালিকলম' গোষ্ঠীর কিছু কিছু লেখকের পূনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন আছে, প্রয়োজন আছে তারাশঙ্করকে নতুন করে বিচার করারও।

কার্তিক ভদ্র

অন্ধকারের প্রতিবাদে। তুলসী মুখোপাধ্যায়। বাকসাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। তিন টাকা

শ্রীযুক্ত তুলসী মুখোপাধ্যায়ের কবিতাগুলি বেশ দিলখোলা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পড়বার সঙ্গে সঙ্গে যেন কবির ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের গরম আমাদের ঘিরে ধরে। তাঁর বাগ্‌ভঙ্গি, উচ্চারণ, নজর একবারও কবি-কবি ঠেকে না, এমনই সহজ আর স্বাভাবিক তাঁর শব্দবিন্যাস। অহেতুক একগাদা ভালো ভালো উপমা, বর্ণনা, প্রতীকের জবরজং ব্যবহার কবিতাকে কৃত্রিমতার দূরত্বে ঠেলে দেয়, পাঠক সেগুলো দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে যায়, বিরক্ত হয় এবং পাতা উলটে অন্য কোনো দিকে মন দেয়। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় পাঠককে তাড়িয়ে দেন না, কাছে টানেন।

সমকালীন দেশ আর মানুষের পরিস্থিতি আর এতদ্‌সংক্রান্ত একটা বিশেষ চাউনি তাঁর রচনায় ছায়া ফেলেছে বেশির ভাগই গদ্যছন্দে, কখনো কখনো বাঁধারীতির পংক্তিবিন্যাসে। চাউনিটা ঠাট্টা-বিদ্রূপের, প্রায়শই আত্মসমালোচনায় তীক্ষ্ণ, বিষণ্ণ, এবং সামাজিক। যে কোনো সুস্থ মানুষের মতোই তিনি অন্ধকারের প্রতিবাদে ঋজু হয়ে মাথা তুলতে চান, বলতে চান, "...আমার চাই করভারমুক্ত পুরো পরমায়ুর গ্যারান্টি / ফুটপাথজাতকদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা / মাঘের ন্যাংটো বস্তির জন্য গরম কম্বল / এবং ভিয়েৎনামে নির্বাসিত আমেরিকানদের ফুঁসে ওঠা / যেহেতু আমি জানি—/ এই দাবিগুলি আদায় না করলে / পৃথিবী আমার মুখে থুতু দিতে কসুর করবে না / অতএব জান কবুল— / এইসব অতি অবশ্য দাবি আদায়ের জন্যই / এখন আমার

বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি।" এমনিতর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে আরও কয়েকটা কবিতায়, যেমন 'লেনিন সরণি দিয়ে' (লেনিন সরণি দিয়ে একবার হেঁটে এলেই / অন্তর্গত বারুদ ঘর ফেটে যায় রক্তের ভেতরে / আর আমার মনে হয় / এখন পুরো পরামায়ু বেঁচে থাকা ভীষণ জরুরি।) বেশ আশাব্যঞ্জক এইসব পংক্তি, কিন্তু সেই সঙ্গে এগুলোর পাশাপাশি থেকে গেছে এমন কিছু কবিতা যা সাম্প্রতিক দুঃসময়ের অভিঘাতে ছায়াচ্ছন্ন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়—ব্যক্তিগত কেন, প্রায় সার্বজনীনই বলা যেতে পারে—প্রোথিত হাহাকার, যেমন অক্ষরিত হয়েছে 'স্রেফ নিরাপত্তার অভাবে' শীর্ষক কবিতায় যেখানে লেখা : "আজকাল বাইরে বেরোলে বুক টিপটিপ করে / মড়ার খুলি আঁকা পোস্টার দপদপিয়ে ওঠে চারপাশে / রাস্তাঘাটে যখন তখন শিবের ষাঁড়ের মতো গুণ্ডার আস্তিন / বিনা নোটিশে মৃত্যু এসে সামনে দাঁড়ায় / আজকাল বাইরে বেরোলে খাপ থেকে বেরোতে পারি না / ভয়ে কাঠ মেরে সিঁটিয়ে থাকি সারাক্ষণ / অথচ কে না জানে—ভালোবাসার অভাবে আমাদের সম্পন্ন গেরস্থালি / তাসের ঘরের মতো কী দারুন রক্তমাংসহীন।" সেই জন্যেই "একটা যেমন তেমন ডেথ সার্টিফিকেট পেলেই", কবি জানিয়েছেন, "আমি এখুনি গুডনাইট বলে বেরিয়ে পড়তে পারি।...একটা ডেথ সার্টিফিকেট হাতে পেলেই বিদায় পৃথিবী—বিদায়! বিদায়!" এগুলো মোটেই খুব সুখের কথা নয়, কোনো আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে তর্জনী প্রসারিত করে না এইসব অভিমানাহত জর্জর শব্দগুচ্ছ; কিন্তু পাঠক যদি এই বিষণ্ণতায় কবির সঙ্গে মিশে যান, কবির দুঃখের সঙ্গে পাঠকের দুঃখ একাকার হয়ে যায়, তৈরি হয় মানসিক সেতুবন্ধ, তাহলে সেখানেই তো সবচেয়ে বড় সার্থকতা। আসলে 'অন্ধকারের প্রতিবাদে' বইখানি একজন দ্বিধাবিভক্ত, আত্মচেতন, জ্ঞানপাপী এবং অসহায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীচেতনার প্রতিভূকে আমাদের মুখোমুখি দাঁড় করায়।

আশা-নিরাশার এই দোলাচল সত্ত্বেও এভাবেই শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় আমাদের বন্ধুতা অর্জন করেন, অবশ্যই শিল্পগত সাযুজ্য ঘটিয়ে। তাঁর আশাবাদ উদ্ভাবনের অনায়াস ভঙ্গিমায় যেমন মানবিক, নৈরাশ্যও তেমনি চাক্ষুষ ও মানসিক অভিজ্ঞতার তন্নিষ্ঠ অনুবাদ। কবি হিসেবে তিনি সত্যবাদী, এটা নিঃসন্দেহে একটি শুভঙ্কর সাহিত্য ঘটনা। বিনীত অনুরোধ, কবিতা লেখার ধরনধারণ তিনি এবার যদি একটু পালটান! তাঁর সব কবিতাই প্রায় একইরকম।

চলচ্চিত্র। সামসুল হক। কবিতা গ্রন্থাগার, কলকাতা। তিন টাকা

কবিতা লেখার কায়দাকানুন শ্রীযুক্ত সামসুল হক বিলক্ষণ রপ্ত করেছেন। অর্থাৎ কবিতার জন্যে তাঁকে এমন একটা ভঙ্গি আয়ত্ত করতে হয়েছে যা ছন্দ-শব্দ-প্রতীক-কল্পপ্রতিমার রাসায়নিক সমবায়ে কিছুটা তির্যক, কিছুটা গুন্ঠিত, কিছু বা সম্বৃত। এবং ভাষা, বাহুল্য হলেও বলতে হয়, কবির বিশেষ ধরনের পর্যবেক্ষণক্ষমতারই অনুবর্তী। অন্যথায় তা পুরোপুরি মেকি, অনাবশ্যক রকম আড়ষ্ট। অসার বাগাড়ম্বরে জবুথবু। সামসুল তাঁর চারপাশের পৃথিবীটাকে খুব—খুব কেন, মোটেই—সুনজরে দেখছেন না, দেখতে পারছেন না, প্রচুর ভেজাল মানুষে অধ্যুষিত এই ভূখণ্ড, হৃদয়হীনতায় আক্রান্ত সমাজ তাঁকে বিক্ষুব্ধ নাস্তিকতায় নিক্ষেপ করেছে। সুতরাং তাঁর অরুন্তুদ অভিমান এভাবেই তাঁর কলম থেকে নিষ্কাশিত হয়ে ওঠে, "বাবা, তুমি আবার আমায় ক খ শেখাও / ওরা বলে আকাশ বানান ভুল করেছি, / ওরা বলে উচ্চারণে ত্রুটি আছে ; / ...লক্ষ্মী বাবা, তোমার মাণিক ঢের সয়েছে, / সারা দেহে সুঁচ ফোটানোর জায়গা বিরল। / আকাশ লিখতে আমি নাকি পাতাল লিখি ; / বাবা, তুমি আবার আমায় ক খ শেখাও।" (এখন আবার বাল্যকালে)। সুতরাং আত্মভুক বিদ্রূপে প্রখর করে তোলেন 'ধন্যবাদ' শীর্ষক কবিতার প্রতিটি পংক্তি, যার নমুনা হিসেবে শেষ স্তবকটি উদ্ধার করি, "হাসপাতালে আমার মৃত্যু দেখে বড়ো ভালো লাগলো / বাইরে দোরগোড়ায় বাচ্চাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলুম / ডাক্তার হাসিমুখে এলে বললুম কেমন দেখলেন / ডাক্তার বললেন নির্বিঘ্নে মৃত্যু হয়েছে আপনার / বারবার নিজেকে ধন্যবাদ দিলুম।"

আশি পৃষ্ঠার এই ছোট্ট বইখানায় প্রচুর কবিতা ঠেসে দেওয়া হয়েছে। এবং সেগুলোর বেশির ভাগই সামসুলের বিরক্ত আর দুঃখী আর অভিমানী মেজাজের প্রতিভাসে বঙ্কিম, ইঙ্গিতময় এবং তীক্ষ্ণ। সঙ্গত কারণেই ভাষার প্রসঙ্গটা আবার ওঠে। তাঁর ভাষা পুরোপুরি কবিতার ভাষা যা আমাদের আটপৌরে এবং খবরের কাগজের তরল বাগ্‌ভঙ্গী থেকে ততটাই দূরে সমান্তরাল, যতটা অতিক্রম করতে প্রয়োজন হয় পাঠকের দীক্ষিত শব্দবোধ, অর্জিত শিল্পজ্ঞানের সাহায্য। স্বীকার্য, কবিদের একটা বড় অংশই আপনাপন ঢঙে এই বিশেষ ভাষানির্মাণের পক্ষপাতী, নিরুপায় হয়েই। নিরুপায় ; কেননা ভাষাই কবির চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি। একে কৃত্রিম, ধন্দময়, সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি অপবিশেষণে

অভিযুক্ত করা উচিত হবে না ঠিক ; বরং এর অনিবার্যতাকেই জেনে নেওয়া দরকার। 'চলচ্চিত্র' গ্রন্থে সামসুল প্রায়ই এরকম অনিবার্যতার পরিচয় তুলে ধরেছেন। কিছু কিছু জায়গায় অবশ্য তিনি বাড়াবাড়ি করেছেন, কায়দাগুলো কবিতার সংলগ্ন না হয়ে তাঁর কারিগরি জ্ঞানের সাইনবোর্ডে পর্যবসিত হয়েছে। যেমন ধরা যাক, 'আয়না' শীর্ষক কবিতার শেষাংশ, যেখানে কয়েকটি অক্ষরকে এলোমেলো করে গায়ে-গায়ে লেপটে দেওয়া হয়েছে ; এর কোনো বুদ্ধি ও অনুভবগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাই নি। প্রথমত, তা সরবে পড়া ও শোনানো যায় না ; দ্বিতীয়ত, প্রকরণগত দিক থেকে কবিতার নিছক চাক্ষুষভাবেই চিত্রময় হয়ে ওঠায় একধরনের চালাকিই বেশ উদগ্র হয়ে ফুটে ওঠে ; অভিজ্ঞতায় দেখেছি এতে কোনো কাজ হয় না। কাজ হয় না অর্থে মনে দাগ কাটে না। দেখলুম, পড়লুম, পড়তে গিয়ে হোঁচট খেলুম, হয়ে গেল। নিশ্চয়ই কবিতার এই অপমানকর পরিণাম সামসুল সজ্ঞানে সমর্থন করবেন না। একই কারণে কবিতার মধ্যে অক্ষরের চেহারা পালটে, স্পেস দিয়ে দিয়ে সাজিয়েও কোনো লাভ নেই। এরকম অনেক হয়ে গেছে, বিদেশে, স্বদেশে, অনেকেরই হাত দিয়ে। এগুলো এক-একটা ফ্যাশন-মনস্ক প্রচেষ্টা, শুধু প্রচেষ্টাই মাত্র। সামসুল আর নতুন করে কী করবেন। নতুন করে তিনি তাঁর অন্তর্জগতের পরিস্থিতিটাই আমাদের সামনে তুলে ধরতে পারেন ভাষার বিস্ফোরণাত্মক মধ্যস্থতায়। সেক্ষেত্রে তিনি সক্ষম, গুণবান—এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই নেই। এবং এই অকিঞ্চিৎকর অথচ আপাতলোভনীয় জিনিসগুলো তাঁর সুশিক্ষিত কবিত্বের তুলনায় খুবই কম, এবং, আশা করছি, অচিরেই পরিত্যক্ত হবে। ভালো কথা, মলাটের পেছন দিকে একগাদা প্রশংসা আর সার্টিফিকেট ছাপানো, এটা সামসুল বাদ দিতে পারতেন। এগুলোয় কারা ভোলে ?

তুমি রোদ্দুরের দিকে । কবিরুল ইসলাম । নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা । চার টাকা

"রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে মুহূর্তে আমার / জন্মান্তর ঘটে যায়! সমস্ত আকাশ / আমার হৃদয় যেন ধরতে পারে তাই / অন্তত দুদণ্ড আমি ভুলে থাকতে পারি / সকালের হাটবাজার, দুপুরে সন্ধ্যায়/যান্ত্রিক যন্ত্রণা।..." নীলিমা

সেনের বিখ্যাত ও চরিত্রময় গলার রবীন্দ্রসঙ্গীত কবিরুল ইসলামের কলমে এমনি করেই সম্বর্ধিত হয়েছে। এই কাব্যসম্বর্ধনা যে বাগ্‌ধারায় আশ্রিত তা খুবই সাদা-মাটা, স্বয়ংসম্পূর্ণ, আবেগে বেশ পুরু করে চোবানো। শুধু নীলিমা সেনই নয়, যেকোনো প্রসঙ্গই 'তুমি রোদ্দুরের দিকে' গ্রন্থের চারফর্মাব্যাপ্ত তাবৎ কবিতা-গুচ্ছে অনুরূপ সরলতায় পংক্তিবদ্ধ। অনেক দিন ধরে কবিরুল কবিতা লিখছেন, সুতরাং প্রকাশভঙ্গির এই বিশেষ চরিত্র তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও ভাবনাধারারই পরিণাম। তাই "রবীন্দ্রনাথ আমার ভাষা / আমার কাঁদা হাসা, রবীন্দ্রনাথ আমার আকাশ / আমার ভালোবাসা।" অথবা বাঙলাদেশ-কবিতাবলির অন্তর্গত "শুধু জানি এই মৃত্যু মৃত্যু নয়, দেশমাতৃকার/চরণবন্দনা। এই বলিদানে প্রাণ লক্ষ-প্রাণ পায়—/ তোমাদের কথা সব অমৃত সমান। / বুকের ভিতরে তূর্য বেজে যায়/মুজিব মুজিব মুজিবার।"— লাইনগুলি নির্দ্বিধায় লিখে ফেলে তিনি আমাদের, অন্তত আমার, অঢেল বিস্ময় অর্জন করেছেন। বিস্ময়, যেহেতু আজকালকার ব্যাপক সূক্ষ্মকারুকলামণ্ডিত কাব্যচর্চার শহুরে পরিমণ্ডলে, যেখানে বাচ্চাবাচ্চা ছেলেরাও বাঁকাচোরা এবং ইশারাপ্রবণ পংক্তি ফেঁদে ফেলছে অবলীলায়, কি করে তিনি এইভাবে লেখার সাহস পাচ্ছেন। মনে হয়, কবিরুল স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন গা-খোলা কবিতার গ্রামীণ লাবণ্যকে খুঁজে পাওয়ার কঠিনতম সাধনা। হয়তো ব্যর্থতার ক্রমান্বিত মসীক্ষেপের পরোয়াহীন চালচলনই তাঁকে কালক্রমে সিদ্ধির চূড়ায় পৌঁছে দেবে। সহজ হবার শিল্পব্রত তাঁর অভীষ্ট হলে, আমরা কবিরুলের উদ্দেশে অকুণ্ঠ অভিনন্দন পৌঁছে দিতে পারি।

শিবশম্ভু পাল

সজ্জিত মানুষ। কমলেশ সেন। পরিবেশক : নিউ বুক সেণ্টার, কলকাতা। তিন টাকা

শ্রীকমলেশ সেন কমিটেড কবি। এই কাব্যগ্রন্থের ৩৬টি কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য কখনও সোচ্চার ভাবে, কখনও তীব্র শ্লেষ ও বক্রোক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'সজ্জিত মানুষ'-এর রচনাকাল ১৯৬৩-১৯৬৮। এই সময়ের মধ্যে বাঙলাদেশ, ভারতবর্ষ, ভিয়েতনাম তথা এশিয়ার রাজনীতির

কোনো কোনো বিশেষ ঘটনাংশকে তিনি তাঁর কবিতার বিষয় করে নিয়েছেন। অধিকাংশ কবিতাই তাঁর সজাগ, সচেতন মনের সৃষ্টি; কিন্তু মানুষের সংগ্রামের কথা বলতে গিয়ে তিনি শিল্পবোধ হারান নি। যেমন—"একলক্ষ / একলক্ষ সজ্জিত মানুষ / উত্তরের / উত্তরের পলাশ ফোটা মাঠে / তাদের / তাদের বুকের আগুন / নিংড়িয়ে নিংড়িয়ে / স্তূপাকার করছে।" তীক্ষ, সবল উচ্চারণে তাঁর বিশ্বাস পাঠকের হৃদয়ে আমূল প্রোথিত হয়ে যায় এবং শিল্পের সংক্রমণ-ক্ষমতায় পাঠককে তিনি নিয়ে যান সেই অভীষ্ট ঈপ্সিত লোকে, যখন তাকে বিশ্বাস করতে হয় "একদিন ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মানুষের পাশে দাঁড়াবে।" সুষম শব্দ বিশেষণে, এলিটারেশন ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে তিনি কবিতায় এক বিশেষ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর স্বকীয়তাকে সুস্পষ্ট করে তোলে। কিন্তু যেখানে তিনি শ্লেষকে সামনে নিয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগোবার চেষ্টা করেছেন, শিল্পচাতুর্যের অভাবে সেখানে সফল হতে পারেন নি। তবু বলব 'পৃথিবীর সব উপকূলেই পরিচিত কণ্ঠ', 'একটি উদ্যানের মানুষদের', 'কোন এক প্রাচীন শিশুকে,' 'ভারতবর্ষ : ১৯৬৪,' 'জন্মদিন প্রতিদিন,' 'একটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে'—এই কবিতাগুলিতে তিনি তাঁর বিশ্বাস ও ক্ষমতার যে স্বাক্ষর রেখেছেন, সমসাময়িক বিশ্বাসহীনতার নৈরাশ্য থেকে তা আমাদের বাঁচাবে।

এখন রাখাল বাণীপ্রিয়র জন্য শাশ্বত স্বীকারোক্তি। অজিত দত্ত সম্পাদিত। বিশ্বজ্ঞান, কলকাতা। পাঁচ টাকা

শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামল পুরকায়স্থ ও শ্রীঅভিজিৎ ঘোষের বারটি করে নির্বাচিত কবিতা নিয়ে যথাক্রমে 'এখন' 'রাখাল' 'বাণীপ্রিয়র জন্য' এবং 'শাশ্বত স্বীকারোক্তি' শিরোনামা দিয়ে সেই নামগুলির সমাহারে এই সংকলন গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন স্বনামধন্য কবি শ্রীঅজিত দত্ত। সম্পাদক তাঁর ভূমিকায় এই চারজন কবি সম্পর্কে পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন। এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পাঠকের উপর এই ধরনের সংকলনে নির্বাচিত কবিতা ও সংকলিত

কবির তুলনায় সম্পাদকের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাবই বেশি পড়ে। ভূমিকায় তিনি বলেছেন এই সংকলন বাঙলা কাব্য-প্রকাশন ক্ষেত্রে একটি অভিনব পরিকল্পনা। কিন্তু এ-সংকলন প্রকাশের উদ্দেশ্য কি? কবি শ্রীশ্যামল পুরকায়স্থ ও শ্রীঅভিজিৎ ঘোষ বয়সে তরুণ এবং স্বল্প পরিচিত, সেই কারণে একসঙ্গে দশ-বারটি কবিতা দিয়ে পাঠকের সামনে তাঁদের পরিচয় তুলে ধরার একটা বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি আছে। কিন্তু শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাঙলা কবিতা পাঠকদের কাছে আজ আর আদৌ অপরিচিত নন, তাঁদের নতুন করে পরিচয় করাবার কি আছে? আর যদি সংকলনের জোড়া মলাটের ভেতর দুই যুগের দুজন করে কবির নির্বাচিত কবিতা সন্নিবদ্ধ করে পাঠকমনে তাঁদের সময়কে প্রতিফলিত করার ইচ্ছা সম্পাদকের হয়ে থাকে, তাহলে বলতে হয় তাঁর সে ইচ্ছা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ এঁরা কেউই সঠিকভাবে তাঁদের সময়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন নি। বইটি পড়ে বোঝা যায় শ্রীশক্তি চট্টোপাধ্যায় বৈচিত্র্যহীন বহুচর্চিত ছন্দে চলতি অপ্রচলিত শব্দে পদ্যবন্ধে যেন অভ্যাসবশেই লিখে চলেছেন, অধুনা-ঔপন্যাসিক শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবিতা লেখার সময় পাচ্ছেন কম এবং যেটুকু লিখছেন তাও একক ডাইমেনসনের অগভীর স্টান্টধর্মী কবিতা, তরুণ কবি দুজন এঁদেরই অনুসরণ করেছেন মাত্র।

জ্যোৎস্নার ভিতরে গর্জন। গৌতম গুহ। অনির্বাণ প্রকাশনী, কলকাতা। আড়াই টাকা

ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে গৌতম গুহের কবিতা আমাদের চোখে পড়ে। 'জ্যোৎস্নার ভিতরে গর্জন' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ—কিন্তু প্রতিটি কবিতায় স্নিগ্ধতার ছাপ, একজন পরিণতমনস্ক কবির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। তাঁর কবিতা কালাক্রান্ত; কিন্তু প্রাতিস্বিকতার অভিশাপে বিড়ম্বিত নয়। তিনি অভিজ্ঞতার স্তর ভেঙে সময়ের সেই বন্ধুর পথের দিকে যেতে চেয়েছেন যা জ্যোৎস্নায় আলোকিত নয়, "আঁধারের ক্রোধের ভিতর" যা "রাবণের চিতার মত দাউ দাউ জ্বলে"। 'আমারই মতন কেউ,' 'আঁধারের ক্রোধের ভিতর', 'জরুরী', 'আজ সন্ধ্যায় চাঁদ উঠবে' প্রভৃতি

কবিতাগুলি যে একটি সচেতন ও সজাগ কবিমনের সৃষ্টি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

গৌতম সাম্প্রতিকতার ভিড়ে এক নিজস্ব কণ্ঠ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থে তার স্বাক্ষরও যথেষ্ট রয়েছে: "কয়েকটি জায়গায় খুব দ্রুত পৌছানো প্রয়োজন / কয়েকটি জায়গায় খুব দ্রুত তির্য্যক পতন; সমস্ত দেশের মন যখন হাঁসের ডিমের মতো পচে যায়"।

মানুষের যৌবন খোঁজে সম্প্রসারণ; আর কবি পৌছতে চান সমাজের সেই বিঘ্নিত, বিকম্পিত জায়গায় যা বিনষ্ট হচ্ছে, ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে। গৌতম আশাবাদী, মানবতায় বিশ্বাসী। তাঁর মধ্যে ক্রোধ আছে, কিন্তু বিস্ফোরণ নেই। তাঁর অভিজ্ঞতা দুস্তর আঁধারের মধ্যে দূর নক্ষত্রের মতো জ্বলে ওঠে। কখনো কখনো তাঁর কবিতায় বিলাপ ও বিক্ষেপ, অনুরাগ ও আগুন একই সঙ্গে পাওয়া যায়। তিনি বলেন: "আমরা বহুদূর হেঁটে যাবো—সময়ের বৃত্তের বাইরে / কোনো স্পষ্ট গম্ভীর কথা বলার জন্য"; কিন্তু পরক্ষণেই উচ্চারণ করেন: 'শখ ছিল একদিন— / পৃথিবীর প্রিয়তম মানুষ হব আমি"।

গৌতমের মধ্যে এক দোটানা লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণেই কিছু উচ্চাশাপূর্ণ পংক্তি দুর্বল, ঠাণ্ডা ও বিচ্ছিন্ন পংক্তির নীচে চাপা পড়ে যায়।

দৃশ্যপট উপস্থাপনায় গৌতমের বিশেষ নৈপুণ্য স্বীকার করতেই হবে, চিত্রকল্পেও তিনি সিদ্ধহস্ত। এলিয়টীয় ভঙ্গিতে পাঠকের দিকে গল্পাংশের টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে কবিতাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে চান। 'ভোরের কাক', 'বেহু, বীণাদি: এ্যাপোক্যালিপ্স,' 'ভোরবেলায় যাই' প্রভৃতি কবিতায় তিনি এক বিশেষ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন যা তাঁকে আলাদা করে মনে করিয়ে দেবে।

অনন্ত দাশ

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারত-উপমহাদেশে মার্কিনী ষড়যন্ত্র ও ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী

ভারত-উপমহাদেশে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রীয়শক্তি মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী মিত্রদের কার্য্যকলাপ এক বিপজ্জনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ভারত-মহাসাগরের এক ক্ষুদ্র দ্বীপ দিয়েগো গার্সিয়ায় মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র এক সুবিশাল নৌ ও বিমান-ঘাঁটি তৈরি করছে। এই বোম্বেটে কার্য্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে আবার অস্ত্র পাঠাবার কথা ঘোষণা করেছে। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের এই বিপজ্জনক সিদ্ধান্তের ফলে এই উপমহাদেশের পরিস্থিতি রীতিমতো জটিল আকার ধারণ করেছে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে ভারত-মহাসাগরের এক অজ্ঞাত অখ্যাত দ্বীপে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের এই সামরিক-ঘাঁটি নির্মাণের জন্য এত ব্যস্ততা কেন ও বিশেষ করে যখন ইয়োরোপ-ভূখণ্ডে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক সংকটে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে উত্তেজনা প্রশমনের নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে তখন মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের এই কার্যকলাপ আপাত বিস্ময়কর মনে হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ ভিয়েতনাম-রণাঙ্গনে শোচনীয় পরাজয়ের পর ওয়াটারগেট-কেলেঙ্কারির পর স্বদেশে ও বিদেশে মার্কিনকুটনীতি চরমভাবে ধিকৃত হয়েছে। এক চরম অবমাননার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি নিকসনের পদত্যাগ মার্কিন-রাজনীতির চরম দৈন্যকেই প্রকাশ-করেছে মাত্র। এরই সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন-অর্থনীতিতে প্রবল মন্দা ও বেকারের সংখ্যার আশংকাজনক বৃদ্ধি মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে যে অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার থেকে পরিত্রাণের জন্য মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র এক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। লাওস, কাম্বোডিয়া, দক্ষিণ-ভিয়েতনামে আবার সংঘর্ষ বিস্তারের চেষ্টা, পশ্চিম-এশিয়ায় আবার যুদ্ধের আগুন জ্বালাবার জন্য নানা প্রচেষ্টা এবং দিয়েগো গার্সিয়ায় সামরিক-ঘাঁটি নির্মাণ ও পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী রণকৌশলের সঙ্গে এক ও অভিন্ন।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে মার্কিন সপ্তম-নৌবহরের বিধ্বংসীকার্যকলাপের বিবরণ সারা বিশ্বে সুবিদিত! প্রশান্ত-মহাসাগরের এই খণ্ডের বিভিন্ন দেশে নানা প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপ চালাবার বিবিধ প্রচেষ্টা সপ্তম-নৌবহরের নিয়মিত কার্যক্রমেরই অঙ্গ। বাঙলাদেশ মুক্তিসংগ্রামের সময় পরমাণুশক্তি চালিত মার্কিন বিমানবাহী-জাহাজ 'এণ্টারপ্রাইজ' বাঙলাদেশ মুক্তিসংগ্রামকে দমন করার জন্য বঙ্গোপসাগরের দরিয়ায় উপস্থিত হয়েছিল।

কিন্তু সাম্প্রতিকালে চীন-মার্কিন সমঝোতার দরুণ বিশ্ব-রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এর ফলে প্রশান্ত-মহাসাগরের দরিয়ায় সপ্তম-নৌবহরকে রাখার গুরুত্ব মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হ্রাস পেয়েছে। এইজন্যই মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ভারত-মহাসাগরেতে ঘাঁটি গড়তে চাইছে এবং দিয়েগো গার্সিয়া হবে এর মূলকেন্দ্র। অন্যদিকে সুয়েজ খাল খোলার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। মিশরের রাষ্ট্রপতি আনওয়ার সাদাতের প্রচ্ছন্ন সোভিয়েত বিরোধিতাকে কাজে লাগিয়ে সুচতুর মার্কিন পররাষ্ট্র-সচিব ডঃ কিসিঙ্গার পশ্চিম-এশিয়ার রাজনীতিতে, বিশেষ করে মিশরীয় রাজনীতিতে প্রভাববিস্তারে সক্ষম হয়েছেন। এরই ফলে সুয়েজ খাল খোলার পরে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরে মোতায়েন ষষ্ঠ-নৌবহরের জাহাজগুলি অতিসহজেই সুয়েজ খাল মারফৎ ভারত-মহাসাগরের প্রবেশ করবে। স্বাভাবিকভাবেই দিয়েগো গার্সিয়াকে কেন্দ্র করে ষষ্ঠ ও সপ্তম-নৌবহর ভারত-মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে প্রতিবিপ্লবী কর্যকলাপ চালাতে পারবে।

নানা প্রকার প্রাকৃতিক-সম্পদে সমৃদ্ধ ভারত-মহাসাগরের পার্শ্ববর্তী দেশগুলি যাতে নিজ সম্পদ ব্যবহার দ্বারা অর্থ নৈতিক-স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে না পারে তার জন্যও দিয়েগো গার্সিয়াকে ব্যবহার করা হবে। এই অঞ্চলের অফুরন্ত প্রাকৃতিকসম্পদকে অবাধে শোষণ করে বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ তাদের মুনাফাকে বৃদ্ধি করেছে। পারস্য-উপসাগরীয় অঞ্চলের তৈলসম্পদ মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ঈর্ষার বস্তু। এই সকল সম্পদের উপর নিজের আধিপত্য বজায় রাখার জন্যই মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের এই সামরিক চাপ সৃষ্টির প্রয়াস।

সর্বোপরি ভারত-মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে ক্রমবর্ধমান মুক্তি-আন্দোলন মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী মিত্রদের কাছে বিশেষ ভীতির কারণ হয়ে উঠেছে। গিনি-বিসাউ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, আঙ্গোলা, মোজাম্বিকও স্বাধীনতার পথে। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার ভোরস্টার সরকার ও রোডেশিয়ার

আয়ান স্মিথ সরকার সেইসব দেশের জনগণের আন্দোলনকে দমন করার জন্য অপরিসীম নির্যাতন চালাছে। উপনিবেশিকদের এই শেষচিহ্ন যাতে অবলুপ্ত না হয়, সদ্যস্বাধীন বিকাশমান দেশগুলিতে যাতে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলোর সহযোগে প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত চালানো যায়, দিয়েগো গার্সিয়াকে তার জন্য উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা হবে।

এই প্রসঙ্গে, ভারত-মহাসাগরে সোভিয়েত ইউনিয়ন নৌঘাঁটি স্থাপন করেছে বলে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র যে অবিরাম প্রচার চালায় সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সহ বহু বিশিষ্টব্যক্তি ভারত-মহাসাগরে কোনো সোভিয়েত-ঘাঁটি নেই বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা করা সত্ত্বেও মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র আসলে নিজেদের কুকীর্তি ঢাকার জন্যই ভারত-মহাসাগরের সোভিয়েত-ঘাঁটির কথা প্রচার করছে।

দিয়েগো গার্সিয়ায় সামরিক-ঘাঁটি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে পুনরায় অস্ত্র পাঠাবার কথা ঘোষণা করেছে। সিমলা-চুক্তির পর ভারত-সরকার কর্তৃক একতরফাভাবে নব্বই হাজার বন্দীবিনিময়ের ঘোষণা ও সাম্প্রতিক কয়েকটি চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যখন দুই দেশের পারস্পরিকসম্পর্ক স্বাভাবিক হবার পথে, তখন মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের এই অস্ত্র পাঠাবার সিদ্ধান্ত ভারত-উপমহাদেশে আবার উত্তেজনা বিস্তারই করবে।

এই পরিস্থিতিতে ভারতের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া কর্তৃক গণতন্ত্র বিনাশের জন্য যে অবিরাম চেষ্টা চলছে, তার দিকেও দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। যে প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত বর্তমানে জয়প্রকাশের নেতৃত্বে সংগঠিত হচ্ছে, তার সমর্থনে দাঁড়িয়েছে উগ্র-বামপন্থীদল সমেত দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দল ও গোষ্ঠী এবং কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি। জয়প্রকাশ নারায়ণ সার্বিকবিপ্লব ও পার্টিবিহীন-গণতন্ত্রের নামে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। এই কারণেই টাটা, বিড়লা, গোয়েংকা সহ বিহার চেম্বার অফ কমার্স, জনসংঘ, সংগঠন-কংগ্রেস প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ জয়প্রকাশের প্রতিবিপ্লবের সমর্থনে দণ্ডায়মান। জয়প্রকাশ আজ চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছেন সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, ভারত-সরকারের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে, রাষ্ট্রায়ত্ত-শিল্পসংস্থার বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে অকৃত্রিম মৈত্রীবন্ধনের বিরুদ্ধে।

সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের যা অভীষ্ট জয়প্রকাশ তা-ই সাধনের জন্য কোমর বেঁধে লেগেছেন। জয়প্রকাশের এই সর্বনাশা চক্রান্তের সমর্থনে শাসক-কংগ্রেসের এক গোষ্ঠী বিশেষ করে মোহন ধাড়িয়া, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্ত প্রমুখ জোট বেঁধেছেন। সুখের কথা শাসক-কংগ্রেস এঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে দেরীতে হলেও ক্রমে সচেতন হয়ে উঠছেন।

ভারতের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রের ওপর নয়া-উপনিবেশবাদীদের এই সাঁড়াশি-আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের অকৃত্রিমবন্ধুত্ব ও সহযোগিতার কথা সবিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। সকল বিকাশমানদেশ ও জাতীয়-মুক্তিসংগ্রামের অদম্য সমর্থক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের প্রতিটি সংকটের লগ্নেই ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৪ সালে সোভিয়েত-ভারত আর্থনীতিক সহযোগিতার ২০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময়ে একথা বিশেষ করে মনে রাখা প্রয়োজন। ১৯৭৫ সালে ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্যিক লেনাদনের পরিমাণ হবে ৭৫০ কোটি টাকা। ১৯৭৫ সালে এর পরিমাণ ছিল ৬৫০ কোটি টাকা। বর্তমান বছরে বাণিজ্যের পরিমাণ আরও ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। দু-দেশের বাণিজ্যের অব্যাহত বৃদ্ধি ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন, ১৯৫৩ সালে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কের যে শুভযাত্রা শুরু হয়েছিল আজ তা বিকশিত হয়ে সর্বাঙ্গীন মৈত্রীসম্পর্কে পরিণত হয়েছে। ভারতের ইস্পাত-শিল্প, ভেষজ-শিল্প, কয়লা-শিল্প, তৈল-শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তক্ষেত্রের বিস্তারে সোভিয়েতের কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সাহায্য ভারতের আর্থনীতিক স্বয়ম্ভরত্ব অর্জনে অসামান্য সাহায্য করে চলেছে। এরই বিরুদ্ধে আজ জয়প্রকাশী জেহাদ—৬ই মার্চের দিল্লী অভিযান—মোহন ধাড়িয়া, কৃষ্ণকান্ত, চন্দ্রশেখর সহ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ও দলগুলোর সরব ঘোষণা ঃ ভারত আজ সোভিয়েতের উপনিবেশে পরিণত।

ভারতের বিরুদ্ধে নয়া-উপনিবেশবাদীদের সর্বব্যাপী আক্রমণ ও প্রবল সোভিয়েত-বিরোধিতার এই পরিপ্রেক্ষিতে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি-সমিতির ত্রয়োদশ পশ্চিমবঙ্গ-রাজ্যসম্মেলন গত ২১-২৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সম্মেলনে উপস্থিত থেকে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও রসায়ন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী কে. আর. গণেশ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশংকর ঘোষ, তামিলনাড়ুর কংগ্রেস-নেত্রী ডঃ বিজয়লক্ষ্মী, প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও সমিতির সর্বভারতীয়

কমিটির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী লিট্টো ঘোষ প্রমুখ ভারতের সর্বব্যাপী উন্নয়নে সোভিয়েতের অপরিসীম সাহায্যের গুরুত্ব বর্ণনা করে আগামীদিনে এই সম্পর্ক যাতে আরও বিস্তারলাভ করে তার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এবারের সম্মেলনে ইসকাসকে একটি শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে গড়ার সংকল্পও পুনর্ঘোষিত হয়েছে। বিভিন্ন আলোচনায় মফঃস্বলের প্রতিনিধিদের সোৎসাহ যোগদান প্রমাণ করেছে যে এই আন্দোলন আজ গোটা রাজ্যে সংগঠিতভাবে ছড়িয়ে পড়ার মতো অবস্থা সৃষ্টি করেছে। সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের আর্থনীতিক-পুনরুজ্জীবনে সোভিয়েত-ভারত সহযোগিতা এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতার উপর দুটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ইঞ্জিনিয়ার এবং ক্রীড়াবিশেষজ্ঞরা সংশ্লিষ্টবিষয়ে তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। আগামীদিনে এক ব্যাপক কর্মসূচী রূপায়ণের লক্ষ্য সামনে রেখে প্রধানবিচারপতি শ্রীশংকর প্রসাদ মিত্রকে সভাপতি এবং ডঃ ফুলরেণু গুহ, অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত, অধ্যাপক তরুণ সান্যাল ও অধ্যাপক সৌগত রায়কে সাধারণ-সম্পাদক করে ৬৩ জনের কার্যকরী কমিটি ও ২০৩ জনের রাজ্য-পরিষদ গঠিত হয়েছে।

ভারতে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে নয়া-উপনিবেশবাদীদের সর্বাত্মক আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়ে দেশের সকল সংস্কৃতিমনস্ক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তিসমূহ সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বব্যাপী চক্রান্তের বিরুদ্ধে ক্রমেই প্রতিবাদে মুখর হবেন—এ-প্রত্যাশা যেমনি স্বাভাবিক, তেমন দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কেন্দ্রস্থল কলকাতা মহানগরীতে সোভিয়েত বিরোধিতার নামে যাঁরা ঘোলা জলে মৎস্যশিকার করতে চান তাঁদের সম্পর্কেও দেশবাসী নিরন্তর সজাগ থাকবেন।

কমল সমাজদ্দার

আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষ

পৃথিবীর অনেক দেশে, বিশেষত শোষণভিত্তিক সমাজব্যবস্থা যেখানে আজও বর্তমান সেখানে, সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত অংশ মেয়েরা। এইসব দেশে

সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক—সমস্ত ক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রগতি অবরুদ্ধ। বঞ্চিত নারীসমাজকে কোনোরকম মর্যাদা দেওয়া হয় নি। তাদের মনে করা হয়েছে পুরুষদের কর্তৃত্বাধীন সন্তানধারণের যন্ত্রবিশেষ।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা তাদের মর্যাদা ও সম্মান অর্জনে এগিয়ে এল। বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নারীমুক্তির আন্দোলন অগ্রগতি এবং বিজয়ের পথে এগিয়ে চলল। শিক্ষার আলোয় আলোকপ্রাপ্ত হয়ে মেয়েরা বেরিয়ে এল বোরখা ছেড়ে—মাঠে-ময়দানে, স্কুলে-কলেজে, কলে-কারখানায়—পুরুষের ঠিক পাশাপাশি।

আজ রাষ্ট্র-পরিচালনা থেকে মহাকাশচারণা পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে মেয়েদের সাফল্য বিশ্বের নারীসমাজকে প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদার স্পর্শ দিয়েছে, প্রেরণা যুগিয়েছে।

এত কিছু সত্ত্বেও পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের বৈষম্য কিন্তু সম্পূর্ণভাবে দূর হয় নি। অধিকাংশ উন্নতদেশের জাতীয় আইনে নারী এবং পুরুষের 'সর্বজনীন সমানাধিকার' স্বীকৃত হলেও নারীদের প্রতি চিরাচরিত বৈষম্যের অবসান আজও হয় নি। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে মেয়েরা অনেক পেছনে পড়ে আছে। এ-খবর কজন রাখেন যে ভারতবর্ষের সংবিধানে সাম্যের ধারাগুলির সাড়ম্বর অস্তিত্ব সত্ত্বেও আজও এদেশে অধিকাংশ পেশাতে পুরুষদের সমান কাজ করেও মেয়েরা মজুরী পান তাঁদের চেয়ে অনেক কম?

সারা বিশ্বের জাতীয়সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদন করছেন নারী। কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে সমানহারে বেতন পাচ্ছেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন তাঁদের মধ্যে আবার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। মেয়েদের শিক্ষালাভের অধিকারও পৃথিবীর সব দেশে সমানভাবে স্বীকৃত হয় না। মেয়েরা পণ্যবস্তু হিসাবে পরিগণিত হন এমন সমাজের কথাও আমরা জানি।

কিন্তু এই অবস্থা তো বেশিদিন চলতে পারে না। একটা জাতির অগ্রগতির মানের সূচক সেখানকার নারীদের প্রগতি ও মর্যাদা। সারা বিশ্বের জনগণের অর্ধেক যে নারীসমাজ, তারা যদি পিছিয়ে থাকে, তবে সারা বিশ্বের অগ্রগতিই যাবে রুদ্ধ হয়ে। তাই পৃথিবীর সর্বত্র মেয়েদের এগিয়ে আসতে হবে মর্যাদার আন্দোলনে, সচেতনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে স্বাধিকার।

এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই রাষ্ট্রসংঘ ১৯৭২ সালের ৩০ ডিসেম্বর সাধারণ

সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এই প্রস্তাবে ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। প্রস্তাবে মেয়েদের পূর্ণমর্যাদা অর্জন এবং রক্ষার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সর্বত্র উপযুক্ত কার্যসূচী গ্রহণ করার আবেদন জানানো হয়। রাষ্ট্রসংঘ আশা করে, এবং দাবিও রাখে, মেয়েদের অধিকার ও মর্যাদা স্থাপনের জন্য যা কিছু করণীয় পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার ও বেসরকারী সংস্থাগুলি তা করতে এগিয়ে আসবে।

রাষ্ট্রসংঘ তার সনদে আন্তর্জাতিক মহিলাবর্ষ উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছে। "পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে সমতা স্থাপন করতে হবে। সেই কারণে প্রাদেশিক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক—সর্বব্যাপী উন্নয়নে মেয়েদের ক্ষমতা ও যোগ্যতা পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে হবে। মহিলা এবং পুরুষদের সমান কাজের জন্য সমান মজুরী দিতে হবে।" আন্তর্জাতিক শ্রম-সংগঠনের এক কনভেনশনে এ-দাবি অনেক আগেই উঠেছিল। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে তা কার্যকরী করার জন্য রাষ্ট্রসংঘ সমস্ত দেশের সরকারকে আহ্বান জানিয়েছে।

শুধু তাই নয়, এই বর্ষ উদ্‌যাপনের আসল উদ্দেশ্য নারীদের সমস্যাগুলির প্রতি বিশ্বের ব্যাপক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং সারা বিশ্বের কোটি কোটি মহিলাকে তাদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সচেতন এবং উদ্বুদ্ধ করা, এক সংগঠিত শক্তিগঠনে তাদের উৎসাহিত করা।

কল্যাণকর কর্মকাণ্ডে মেয়েদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন মহিলা সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও শান্তি আন্দোলনে সহায়তা করে। এ ছাড়া ঔপনিবেশিক, ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসনাধীন জাতির নারীদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে সেইসব জাতিগুলির মুক্তি ও সার্বভৌমত্বের জন্য সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতেও প্রেরণা যোগাবে এই নারীবর্ষ।

ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র নারীবর্ষ উদ্‌যাপনে এগিয়ে এসেছে। রাষ্ট্রসংঘের এই কাজে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দেশের নারীর মর্যাদা রক্ষায় এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে সারা বছর জুড়ে বিভিন্ন কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সোভিয়েত রাষ্ট্র। যদিও একথা অনস্বীকার্য যে জারের আমলের তুলনায় বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে মেয়েদের অবস্থার যে অগ্রগতি ঘটেছে, এক কথায় তা

অকল্পনীয় ; তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর আর কোনো দেশেই তা হয় নি। এই পরিবর্তন পশ্চিমী দেশগুলির নারীজাতির পক্ষে ঈর্ষার বিষয়। এইসব দেশে 'women's lib' বলে যা প্রচারিত তা আর যাই হোক, নারীমুক্তি নিশ্চয় নয়। শিল্পোন্নত পশ্চিমের শোষণভিত্তিক সমাজের স্বভাবে যে ক্ষয় আছে তা এক বেপরোয়া মেজাজের জন্ম দেয়। হতাশা থেকে জন্মানো এই মেজাজ নারীমুক্তির সংগঠিত আন্দোলন গড়ার বদলে, নারীর অমর্যাদার মূল কারণ সামাজিক-অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বদলে, শরীরের আবরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকেই মুক্তির পথ বলে ভ্রম করে। এইসব কাণ্ড নারীর ভাগ্য পরিবর্তনের সংগ্রামে ক্ষতি ছাড়া উপকার করে বলে মনে হয় না।

আমাদের দেশেও আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উদ্‌যাপনে প্রভূত উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। সারাভারত মহিলা-ফেডারেশন ও অন্যান্য কয়েকটি গণসংগঠন সম্মিলিতভাবে একটি জাতীয় নারীবর্ষ উদযাপন-কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটি ১৯৭৫ সাল জুড়ে নানা কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এইসব কর্মসূচীর উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে মেয়েদের সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, শ্রমিক ও কর্মজীবী মেয়েদের জন্য সমান কাজে পুরুষের সমান মজুরী, সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক এবং কারিগরী শিক্ষা আর কর্মসংস্থানের সুযোগ দাবি, দেশব্যাপী ঊর্ধ্বমূল্য কালোবাজার দুর্নীতির বিরোধিতা এবং জাতীয় সংহতি ও বিশ্বশান্তির সহায়তা করা। এইসব আদর্শ সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষা ট্রাস্ট, কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ পর্ষৎ, নিখিল ভারত নারী সম্মেলন (A. I. W. C) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, খেলাধূলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে মেয়েদের কাজকর্মের তথ্যচিত্র, কাহিনীচিত্র তৈরি করবে। ডাক ও তার বিভাগ প্রকাশ করবে বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট। আন্তর্জাতিক বর্ষের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মেয়েদের অবহিত করার জন্যে জেলা ও ব্লক-স্তরে সেমিনার, সম্মেলন প্রভৃতির আয়োজন করা হবে। মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যেসব বাধাবিপত্তি রয়েছে সে সম্বন্ধে উপযুক্ত তথ্যের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়-গ্র্যাণ্ট-কমিশন, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব সোশ্যাল সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল-রিসার্চ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গবেষণার ব্যবস্থা করবে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য নিজ নিজ রাজ্যে রাজ্যকমিটি গঠন করে নারীবর্ষ পালনের ব্যবস্থা করেছে। জাতীয় নারীবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির শাখা হিসেবে পশ্চিমবাঙলায় অর্ধ শতাধিক মহিলা ও অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে পশ্চিমবাঙলা কমিটি গঠিত হয়েছে। পণপ্রথা উচ্ছেদ ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে

অভিযান—এই দুই প্রধানকর্মসূচীর ওপর পশ্চিমবাঙলা কমিটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এইসব কর্মসূচীতে জড়িত হবেন ভারতবর্ষের নানা ধর্ম ভাষা ও জাতির লক্ষ লক্ষ নারী। আপন মর্যাদা সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করা এবং সে মর্যাদা অর্জনে তাঁদের সক্রিয় করাও এই আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

কিন্তু নারী শুধু একা সংগ্রাম করে মুক্ত হতে পারে না। যুগ যুগ ধরে সে দমিত আছে শুধু তো নিজের দোষে নয়। যাদের ঔদাসীন্য, অবহেলা এবং ত্রুটিতে তার এই অবস্থা, তাদেরও ঋণ শোধের কিছু দায় থেকে যায়। দ্বিতীয় কথা, সমাজের অর্ধেক যদি পিছিয়ে থাকে তবে অন্য অর্ধেকের এগোনোও অর্থহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং, নারীমুক্তিতে পুরুষের কিছু দায়, কিছু দায়িত্ব এবং সক্রিয় আগ্রহের সঙ্গত কারণ আছে। নারীর প্রতি শুধুমাত্র মায়া দেখাতে নয়, নিজেকে এবং সমাজকে পরিপূর্ণ মুক্তির পথে নিয়ে যাওয়ার শর্ত হিসাবেই নারীর মর্যাদা ও মুক্তিসংগ্রামের পাশে দাঁড়ানো তার কর্তব্য।

মালবিকা চট্টোপাধ্যায়

আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক পত্র-পত্রিকার আলোচনাচক্র

সাধারণ ঘোষণা

আশা করা যায় যে আফ্রো-এশীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের দায়িত্ব উপলব্ধি করবেন এবং বিশ-শতকের এই শেষপর্বে যে সব ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে সচেতন হবেন।

আফ্রো-এশীয় লেখক ইউনিয়ন এই দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত আছেন। এই কারণেই ১৯৭৩-এর ৪-৭ সেপ্টেম্বর আলমা আটায় অনুষ্ঠিত পঞ্চম আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য লেবাননের বেইরুটে ১৯৭৪-এর ২-৫ ডিসেম্বর আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক পত্র-পত্রিকার একটি আলোচনাচক্র আহূত হয়। আফ্রো-এশীয় লেখক ইউনিয়নের এক্তিয়ারের অন্তর্ভুক্ত লেবানিজ লেখক ইউনিয়নের আমন্ত্রণক্রমেও এটি ডাকা হয়েছিল।

আলোচনা হয়েছিল জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক প্রগতির জন্য আন্দোলনে

আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক পত্রপত্রিকার ভূমিকা, সৃজনশীল সাহিত্যে তাদের স্থান এবং তাদের সামনে উপস্থিত প্রতিবন্ধ এবং সেগুলিকে অতিক্রম করার উপায়।

যোগদানকারীরা এই স্বীকৃতিতে এসেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদের স্বৈরাচার, নয়া-উপনিবেশবাদ যেহেতু আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করতে পারে নি তাই প্রাচীন উপনিবেশবাদের দ্বন্দ্বের ছুঁয়ে থাকা রেশ, জাতিগত অসম্মান, জিওনবাদী ঔদ্ধত্য, মানুষের নৈতিক ও বস্তুগত সম্পদের লুণ্ঠন ও সাবোতাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক পত্রপত্রিকাগুলি একটি মূল্যবান ও কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে।

যোগদানকারীরা তাঁদের শিল্পকর্ম এবং সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যবিষয়ক পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে নিজেদের মহৎ সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্পের শপথবাণী উচ্চারণ করেছেন।

তাঁরা জোর দিয়ে বলেছেন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক পত্র-পত্রিকাগুলি এমন একটি প্রধান বৈপ্লবিক প্রয়াস সৃষ্টি ও গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ তৈরি করতে পারে যে, এগুলিকে জনগণের সেবা করা, তাঁদের সৃজনশীল দক্ষতাগুলিকে সংগঠিত করা এবং তাঁদের সাংস্কৃতিক ও আত্মিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর কাজে শক্তিমান করে গড়ে তোলা উচিত।

অংশগ্রহণকারীরা সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যপত্রগুলির কাজের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কি হবে তা নির্ণয় করেছেন। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি এর অন্তর্গত :

১) সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ, উপনিবেশবাদের উৎসাদন, নয়া-উপনিবেশবাদের সম্প্রসারণ রোধ, বর্ণবৈষম্যবাদের গ্লানির অপসারণ, প্যালেস্টাইনের ভূমিখণ্ডের দখলদার ও প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শবাহী জিওনবাদের পরাজয় সম্পূর্ণ করার জন্য আফ্রো-এশীয় লেখকদের লড়াইকে ঘনীভূত করা এবং বুদ্ধিজীবীদের কার্যকারিতাকে বাড়ানো।

২) আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের এবং পশ্চিমী ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিভিন্ন ধরনের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা ও সৌভ্রাতৃত্বকে উন্নত করার জন্য ফলপ্রসূ পদ্ধতিতে প্রয়াস চলোনো।

৩) চিন্তা ও কাজের মধ্যে ঐক্যকে প্রতিনিয়ত শক্তিশালী করার প্রয়াস চালাতে হবে যাতে বুদ্ধিজীবী ও লেখকরা তাঁদের সমাজের এক অবিচ্ছিন্ন জৈবিক অংশ হয়ে উঠতে পারেন এবং গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সামাজিকপরিবর্তন-

সমূহের পদ্ধতির যে পটভূমি তার সামাজিক শক্তিগুলির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত একটি শক্তি হয়ে উঠতে পারেন।

খ. শৈল্পিক ও মননশীল সৃজনের ক্ষেত্রে:

১) জনসাধারণকে উদ্দীপিত করা এবং মৌল সামাজিক, আর্থনীতিক, মননশীল ও শৈল্পিক বিষয়সমূহ এবং শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে তাঁদের পরিচিত করানোর কাজ করতে হবে। এই বিষয়গুলির জন্য লড়াইয়ে, এগুলির মূল্যায়ন ও সমালোচনার সঙ্গে তাঁদের নিয়ত যুক্ত রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। তা ছাড়া রাজনৈতিক, সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত প্রগতির যুগে আফ্রো-এশীয় সাহিত্য সৃষ্টি ও চিন্তার ক্ষেত্রে যে জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তাকে উপলব্ধি করতে হবে। ব্যাপক জনসাধারণকে সহায়তা করতে হবে এবং তাঁদের নান্দনিক উপলব্ধিকে গড়ে তোলার কাজে হাত লাগাতে হবে।

২) শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রসমূহে যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচন ও পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। দেখতে হবে, তাঁরা যাতে সৃজনশীলতার উপযোগী পরিবেশ পান। আফ্রিকা ও এশিয়ার যে নতুন সাংস্কৃতিক আঙ্গিকগুলির সাম্প্রতিক অভ্যুত্থান ঘটেছে সেগুলির বিকাশের জন্য কাজ করতে হবে।

৩) ঐতিহ্যের সজীব ও নব নব রূপগ্রাহী উপাদানগুলিকে অক্ষুন্ন রেখে সাম্প্রতিক জাতীয় ও মানবিক ঐতিহ্যের ভেতরকার সম্পর্ককে বিকশিত ও ঘনীভূত করতে হবে।

৪) সদ্যস্বাধীন আফ্রো-এশীয় দেশগুলির জাতীয় ভাষাগুলিকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করে সেগুলির সংরক্ষণ, বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য কাজ করতে হবে।

৫) সাম্প্রতিক শিল্পসৃষ্টি এবং প্রাচীন মানবিক উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর আন্তর্জাতিক বন্ধন গড়ে তুলতে হবে, মননশীল ও শৈল্পিক অভিজ্ঞতাগুলির আদান-প্রদান ঘটাতে হবে, আফ্রিকার নবীন সাহিত্যগুলি এবং চিরনবীন প্রাচীন এশীয় সাহিত্যের পরিচিতি সাধনের কাজ করতে হবে।

৬) সভা, আলোচনাচক্র, স্থানিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে আলাপ-আলোচনাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে পত্রপত্রিকাগুলির সম্পর্কের ক্ষেত্রকে বাড়াতে হবে।

আফ্রো-এশীয় লেখক ইউনিয়নের তত্ত্বাবধানে শিল্পসৃষ্টির বিভিন্ন উপাদান নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনাচক্র ডাকার প্রশ্নটিকে এই আলোচনাচক্র অনুমোদন

জানাচ্ছে। অংশগ্রহণকারীরা সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক পত্রপত্রিকাগুলির আশু সমস্যা ও অসুবিধাদি এবং সেগুলির প্রতিকারের উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

যোগদানকারীরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অনুমোদন করেছেন:

ক) আর্থিক সাহায্যের বিষয়ে:

—জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল দেশগুলির উচিত সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক পত্রিকাগুলিকে সর্বদা সহায়তা করা, কারণ অন্যান্য জরুরী প্রকল্পের চেয়ে এই জাতীয় পরিকল্পনাগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

—এই পত্রপত্রিকাগুলিকে হয় সরাসরি আর্থিক সাহায্য দিয়ে না হয় সেগুলির গ্রাহক হয়ে আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর ভূমিকা সাংস্কৃতিক সংস্থা-সংগঠনগুলির গ্রহণ করা উচিত।

খ) সাংবাদিকতার প্রযুক্তিগত কাজকর্মের সমস্যাবলীর বিষয়ে:

—আফ্রো-এশীয় লেখকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য আফ্রিকা ও এশিয়ার আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ গঠনের বিষয়ে আফ্রো-এশীয় লেখকদের স্থায়ী ব্যুরো যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাকে কার্যকর করা ত্বরান্বিত করতে হবে। এই কেন্দ্রগুলিকে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যবিষয়ক পত্রপত্রিকাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলার কাজে লাগানো যেতে পারে।

—এমন একটি আফ্রো-এশীয় আঞ্চলিক সাহিত্যবিষয়ক এজেন্সি গঠনের সম্ভাবনাকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত—যার কাজ হবে লেখক ও পত্রপত্রিকার মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম সৃষ্টি করার জন্য প্রবন্ধ, উপন্যাস ও কবিতার বাজার সৃষ্টি করা।

—যে সব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আরব ও আফ্রো-এশীয় সংস্থা-সংগঠনগুলি ছাপা ও লে-আউটের উন্নত কারিগরিমান সৃষ্টিতে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করা।

—প্ল্যাসটিক শিল্প ও কারিগরি শিক্ষার পাঠ্যক্রম সংশোধিত করে এবং এক্ষেত্রে অধিকতর উন্নত দেশসমূহে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে ও সফরের মাত্রা বাড়িয়ে যোগ্য কারিগরি ক্যাডার সৃষ্টির জন্য কাজ করা।

গ) প্রচারের সমস্যাবলীর বিষয়ে:

—বিশেষজ্ঞদের পেশাদারি অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো এবং প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যবিষয়ক পত্রপত্রিকাগুলির সাংস্কৃতিক লক্ষ্যে পৌছনোর কাজে তাঁদের ব্যবহার করা।

—বাণিজ্যিক বাজার (সংগঠন-সংস্থা, পাঠাগারের গ্রাহক-চাঁদা এবং পাঠচক্র ইত্যাদি) ছাড়াও পত্রপত্রিকা সরবরাহের জন্য বহুমুখী ও ব্যাপক যোগাযোগ-ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য কাজ করা।

—পত্রপত্রিকা সরবরাহের পথ রুদ্ধকারী সেন্সরপ্রথা ও আর্থিক লেনদেনের সমস্যাগুলিকে দূর করার কাজে হাত লাগানো।

এই আলোচনাচক্রে যেসব পত্রপত্রিকার প্রধান সম্পাদকেরা প্রতিনিধিত্ব করেছেন তাঁদের নিয়ে আফ্রো-এশীয় লেখকদের স্থায়ী ব্যুরোর অন্তর্গত একটি সংস্থা গড়ার বিষয়টিকে আলোচনাচক্র অনুমোদন করছে। এই আলোচনাচক্র কর্তৃক অনুমোদিত বিষয়সমূহের রূপায়ণের জন্য তাঁরা মাঝে মাঝে মিলিত হবেন।

আন্তর্জাতিক সমঝোতার পরিপ্রেক্ষিতে এখন শক্তিসাম্য ঝুঁকে পড়েছে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সাবিকতার বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তির শক্তিসমূহের দিকে এবং জিওনবাদ ও বর্ণ বৈষম্যবাদের বিপক্ষে। আমরা যখন মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বীর ভিয়েতনামী জনগণের অর্জিত ঐতিহাসিক বিজয়কে অভিনন্দন জানাই তখন আমরা এই অগ্রগতি পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই লড়াইয়ের প্রতি আমাদের নিয়ত সমর্থন জানানোর প্রশ্নে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ি। আমরা অভিনন্দন জানাই গিনি-বিসাউ, কেপ ভার্দে দ্বীপপুঞ্জ, মোজাম্বিক ও আঙ্গোলার সেই সব সংগ্রামীদের—যাঁরা ইতিহাসের অমোঘ আন্দোলনের সঙ্গে গৌরবময় ভাবে পায়ে পা মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন জাতীয় মুক্তি অর্জনের দিকে। এ মূলত সম্ভব হয়েছে তাঁদের জঙ্গী ক্রিয়াকর্ম এবং পর্তুগালের প্রগতিশীল শক্তিসমূহের প্রয়াসের ফলে।

আমরা দক্ষিণ-কোরিয়ার লেখকদের সংগ্রামের প্রতি অভিনন্দন জানাই এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা বন্দী হয়ে আছেন তাঁদের মুক্তি ও বাক্-স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার দাবি জানাই। আমরা চিলির জনগণ, বিশেষত তাঁদের লেখককুল যেভাবে স্বাধীনতা শান্তি এবং সামরিক জুন্টার উৎসাদনের জন্য ফ্যাসিস্ট প্রশাসনের সঙ্গে লড়ছেন, তার প্রতি অভিনন্দন জানাই।

আরব দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের সমর্থনে আমরা আমাদের দায়বদ্ধতার শপথ নিই। জিয়নিস্ট (উগ্র ইহুদী স্বাতন্ত্রবাদী) সামরিক প্রাধান্যের কিংবদন্তীকে চূর্ণ করে, মুক্তি-যুদ্ধের দায় বহন করার ক্ষেত্রে আরব জনতা যোগ্যতা প্রদর্শন করে এবং আধুনিকতম কারিগরিজাত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ

করে ১৯৭৩-এর অক্টোবরের যুদ্ধে যে বিজয় অর্জন করেছেন, আমরা তার প্রতি অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই নিজেদের মাটিতে স্বায়ত্তশাসনের জাতীয় অধিকার পুনরার্জনের জন্য প্যালেস্টিনীয় জনতাকে। তাঁদের বৈধ ও একমাত্র প্রতিনিধি প্যালেস্টিনীয় মুক্তিসংস্থাকে অভিনন্দিত করি। আরব জনতা তাঁদের কেড়ে নেওয়া ভূমিখণ্ডের জন্য, জনগণের স্বার্থে সামাজিক প্রগতির জন্য এবং জাতীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতির পুনর্বিন্যাসের কাজে যে লড়াই চালাচ্ছেন, তার প্রতি অভিনন্দন জানাই।

দক্ষিণ-লেবানন, বিশেষত সেখানকার বেসামরিক জনতাকে তাঁদের বাস্তু ও জমি থেকে উচ্ছেদের জন্য এবং লেবানিজ প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও মানবিক অধিকারের আন্তর্জাতিক ঘোষণাকে লঙ্ঘন করে, লেবাননের জলজ-সম্পদকে নিজেদের তাঁবে আনার জন্য ইজরায়েল বারবার যে হানাদারি চালাচ্ছে তার প্রতি আমাদের ধিক্কার জানাই। আন্তর্জাতিক আইন ও জেনেভা সম্মেলনকে উপেক্ষা করে দখলিকৃত পশ্চিম তটভূমি থেকে ইজরায়েলি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরব জনগণকে বাস্তুচ্যুত করার প্রতি আমরা নিন্দা জ্ঞাপন করি। এই উদ্বাস্তু জনসংখ্যাকে অবিলম্বে তাঁদের ঘর-বাড়িতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এই আলোচনাচক্রের অংশগ্রহণকারীরা আবার জোর দিচ্ছেন সারা দুনিয়ার প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সংহতি গড়ে তোলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি। জোর দেওয়া হচ্ছে—জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ও গণতান্ত্রিক শক্তির, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শক্তিসমূহের সঙ্গে পশ্চিমী দুনিয়ার শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির সংহতি গড়ে তোলার জন্য।

সাধারণভাবে নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এবং বিশেষত আফ্রো-এশীয় মুক্তিসংগ্রামসমূহের পটভূমিতে, তা সে মুক্তি সামাজিক প্রগতির আন্দোলনের স্তরেই হোক বা সৃজনী সাহিত্যের স্তরেই হোক, আমাদের দেশসমূহে সাহিত্যবিষয়ক ও সাংস্কৃতিক পত্রপত্রিকার গুরুত্ব বাড়ছে।

সমস্ত ঔপনিবেশিক প্রশাসনের ভেঙে পড়ার মন্ত্রোচ্চারণকারী নতুন পরিস্থিতিগুলিতে আফ্রো-এশীয় লেখকদের সামনে নতুন বরণীয় সমূহ উন্মোচিত হচ্ছে: একটি স্বাধীন প্রগতিশীল আর্থনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো গড়ে তোলার কাজে সামগ্রিক গভীর ও সংহত পরিবর্তন অর্জনের জন্য এবং

প্রকৃত বা সম্ভাব্য সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী চক্রান্তসমূহ থেকে তাদের জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির অর্জনগুলিকে রক্ষা করার জন্য কাজ করতে হবে।

আমাদের দেশগুলিতে সর্বস্তরে সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক পত্রপত্রিকাগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার নতুন করণীয় আমাদের সাম্প্রতিক পর্বে উত্থিত হয়েছে। আমাদের নিম্নোক্ত কাজগুলি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক পত্রপত্রিকা একান্ত কার্যকর উপায়গুলির অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে:

(ক) সাহিত্য সৃষ্টি অথবা প্রগতিশীল মনীষামণ্ডিত পদ্ধতির মাধ্যমে ঐ কাজগুলিকে নির্ণীত করা ও সেগুলির ওপর আলোকপাত করা।

(খ) প্রগতিশীল সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিসমূহের ওপর অর্পিত দায়িত্বের উপলব্ধির জন্য বিপ্লবী নেতৃত্ব এবং জনগণের মধ্যে কঠোর গুরুত্ববোধের সঞ্চার করা।

(গ) এইসব কাজগুলিকে ক্রমান্বয়িকভাবে উপলব্ধি করা এবং সেগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনার বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য জনগণের ভূমিকাকে চিহ্নিত করা।

এই সব লক্ষ্যে পৌছানোর কাজে আমাদের সমাজগুলির শক্তিসমূহকে সক্রিয় ও সংঘবদ্ধ করার জন্য যদি দীপ্তিময় বক্তব্য ও দায়িত্ববান চিন্তাকে কাজে লাগাতে হয়, তাহলে সেগুলি প্রসারের জন্য ব্যাপকতম উপায় বের করতে হবে, কারণ জনগণও ঐ একই লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে মূলত সম্পর্কিত। একই সঙ্গে দেখা যায়, জ্ঞানমণ্ডিত বক্তব্য ও দায়িত্ববান চিন্তার বাহকরূপে আমাদের পত্রপত্রিকাগুলির অধিকাংশই এখন উপযুক্ত প্রচারের ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতায় ভুগছে। এসবের মধ্যে নিম্নোক্ত অসুবিধেগুলি প্রধান:

প্রথমত

আমাদের দেশসমূহ উপনিবেশবাদের দীর্ঘ ও ভারবাহী যুগগুলির কাছ থেকে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতাকে উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছে। এই মসীলিপ্ত ও ন্যায়বিহীন যুগগুলি এমন এক ঐতিহাসিক দুর্বলতার জন্ম দিয়েছে যা আমাদের পত্রপত্রিকার সাহিত্য সৃষ্টি, মনন-প্রবাহসমূহ এবং নতুন রীতির প্রকাশভঙ্গিকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অসুবিধে সৃষ্টি করে। এর ফল হয়েছে পাঠকের সংখ্যালঘিষ্ঠতা এবং জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠের লোকজনের মধ্যে পত্রপত্রিকাগুলির সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা। ফলত গভীর সংহত ও কার্যকর

সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয়, জনপ্রিয় এবং সাংস্কৃতিক চিন্তাধারাকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এই পত্রপত্রিকার ভূমিকা দুর্বল হয়ে পড়েছে।

দ্বিতীয়ত

এই পত্রপত্রিকাগুলি যাতে প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং দায়বদ্ধ বিপ্লবী সৃজনীসাহিত্য প্রকাশের পক্ষে অনুকূল হয়ে ওঠে, যে ব্যাপক জনগণ নিজেদের স্বার্থে সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে মূল উপাদান—যাতে তাঁদের মধ্যে ঐ চিন্তাধারাকে সঞ্চারিত করতে পারে, সে-অবস্থা সৃষ্টির জন্য যে পরিমাণ কারিগরি শিক্ষাসম্পন্ন ক্যাডারের প্রয়োজন, তার একান্ত অভাব রয়েছে।

তৃতীয়ত

প্রকাশের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার ব্যাপারে এবং আমাদের জনগণ যখন অদ্যাবধি সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও প্রতিক্রিয়ার চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করছে তখন এই ঐতিহাসিক ও প্রায় চূড়ান্তপর্বের প্রগতিশীল ও প্রকৃত উপাদন-গুলিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আমাদের অনেক দেশেই উপযুক্ত পরিবেশ বিরাজ করছে না।

চতুর্থত

সাধারণভাবে গ্রন্থস্বত্বের আইনগত সংরক্ষণ, সেগুলিকে বাজারজাত করা এবং আফ্রো-এশীয় দেশগুলির ভিতর সে-সবের লেনদেনের বিষয়টি আমাদের অধিকাংশ দেশেই অবহেলিত। বহিঃশুল্ক ও বণ্টন এবং এযাবৎ সংস্কৃতির উৎপাদন-কারীদের প্রেরণাসৃষ্টির জন্য বাস্তবিক ব্যয় সম্পর্কেও এই একই কথা বলা চলে।

সাধারণভাবে আফ্রো-এশীয় কাঠামোর মধ্যে আমাদের প্রতিটি দেশে এইসব ও একই ধরনের সমস্যাবলী নিশ্চিত প্রতিকার উদ্ভাবন করার প্রশ্নগুলিকে আমাদের ওপর ন্যস্ত করে। এই প্রতিকারগুলির সন্ধান করার সময়ে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক পত্রপত্রিকাগুলির সামনে নিম্নোক্ত কাজগুলো সফল করার জন্য ধারাবাহিক সংগ্রামের দায়িত্ব বহন করে নিয়ে আসে:

১। —প্রত্যেককে তাঁর নিজ নিজ দেশে চেষ্টা চালাতে হবে যাতে কর্তৃপক্ষ সাহিত্য বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং সমাজের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রসারণশীল অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে তা বাধ্যতামূলক হিসেবে চালু করে।

২। —ঔপনিবেশিক যুগ ও সাম্রাজ্যবাদী মতাদর্শ থেকে যে বস্তাপচা প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষাব্যবস্থা এবং নীতির উত্তরাধিকার আমাদের দেশগুলির উপর

রয়েছে, তার উচ্ছেদের জন্য কাজ করতে হবে। অধিকন্তু নতুন বৈজ্ঞানিক নীতি ও ভিত্তির ওপরে জাতীয় শিক্ষার কর্মসূচি ও পাঠ্যক্রম নির্ণয়ের কাজ চালাতে হবে। সংহত সামাজিক মুক্তির স্বার্থবাহী আর্থনীতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে অর্জন করার জন্য আমাদের দেশসমূহের উৎপাদনমুখী ভিত্তি দৃঢ় মনস্কতার সঙ্গে স্থাপন করতে হবে।

৩। মানবিক বিবর্তনের সাধারণ নিয়মগুলির কাঠামোর মধ্যে নিহিত যে ঐতিহাসিক তাৎপর্যগুলি আফ্রিকা ও এশিয়ার জনগণের সংস্কৃতির জাতীয় চরিত্রের মধ্যে পরিস্ফুট, সেগুলিকে তুলে ধরতে হবে। একই সঙ্গে, এই তাৎপর্যগুলির মধ্যে বন্ধনসৃষ্টি এবং দীর্ঘকাল আমাদের দেশগুলির সংগ্রামের মাধ্যমে স্তরীভূত স্বাধীনতার ও প্রগতিশীলতার আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলির মধ্যে বন্ধনসৃষ্টির কাজ চালাতে হবে।

৪। সাধারণভাবে আমাদের দেশগুলির সংস্কৃতি ও সভ্যতার উত্তরাধিকারকে খানিকটা স্থিতিশীল বা নীরব না ভেবে গতিমণ্ডিত আন্দোলনের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এর অর্থ, আমরা এই ঐতিহ্যকে বর্তমানের প্রয়োজনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখব, দেখব এর ভবিষ্যতমুখী সম্ভাবনাগুলোকে এবং খুঁজে নেব এর অন্তর্নিহিত বিকাশমান, প্রগতিশীল উপাদানগুলি।

৫। —আমাদের দেশসমূহের যাবতীয় মানবিক সম্ভাবনার জাগতিক ও আত্মিক প্রগতির প্রশ্নগুলির প্রতি দায়বদ্ধ সৃজনীসাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎপাদনকারীদের মনীষার মুক্তির ব্যাপকতম দিগন্তকে উন্মোচিত করার জন্য কাজ করতে হবে ; সাহিত্য ও মননশীল পত্রপত্রিকায় প্রকাশের ক্ষেত্রে সামাজিক ও বুদ্ধিচর্চার উৎস থেকে উঠে আসা যে কোনো জাতীয় বা প্রগতিশীল প্রবণতাকে বেআইনি করার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে হবে।

৬। —কর্তৃপক্ষের সহায়তায় আমাদের প্রতিটি দেশে সাংস্কৃতিক উৎপাদনগুলিকে রক্ষা করার পক্ষে প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করতে হবে এবং এই উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা আমাদের আফ্রো-এশীয় দেশগুলিতে এর ফলপ্রসূ আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে—এমন যাবতীয় আর্থনীতিক রাজনীতিক ও খেয়ালখুশির দ্বারা সৃষ্ট বেড়াগুলিকে ভেঙে দিতে হবে।

এই প্রস্থানভূমির বিন্দু থেকে এই আলোচনাচক্রে যোগদানকারীরা সংকল্পবাণী উচ্চারণ করেছেন তাঁদের পত্রপত্রিকা এবং শৈল্পিক ও মননশীল সৃষ্টির মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে, কৃত্রিম সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি এবং তার

নিঃসঙ্গতাবাদী নৈরাশ্যজনক ও নৈরাজ্যবাদী প্রবণতাসমূহের প্রকৃত রূপ উন্মোচন ও সেগুলি প্রত্যাখ্যান করতে। তাঁরা মনে করেন যে সৃষ্টি ও মৌলিকতার ক্ষমতা, আশাবাদের ক্ষমতা, জনগণের বোঝা ও আকাঙ্ক্ষাকে ভাগ করে নেয়ার ইতিবাচক সংকল্প এবং মানুষের প্রচণ্ড আত্মিক শক্তির পাশাপাশি সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামকে রক্ষণাবেক্ষণ ও সংহত করার বিষয়গুলিকে অফুরান সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে এবং প্রাণপণ প্রয়াস চালাতে হবে সেই ভবিষ্যতের জন্য—ন্যায়, মুক্তি, মর্যাদা ও শান্তির জন্য যে ভবিষ্যৎ বর্তমান মুহূর্তেই তার সব জট-জটিলতা নিয়ে উপস্থিত।

[বেইরুট, ২-৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪]

সেরামিক প্রদর্শনী

শ্রীদিবাকর সেনরায়-এর সেরামিক পটারি ও টালি প্রদর্শনী সম্প্রতি ১৬ থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারি অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর দক্ষিণ-গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীরায় নিজে সেরামিকস-এর শিক্ষক ও শিল্পী। এ-ধরনের প্রদর্শনী ঘন ঘন হয় না। দর্শকদের কাছে প্রদর্শনীটি নতুন অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছে।

আমাদের দেশে চীনামাটির কাজ খুব বেশি প্রাধান্য পায় নি। চীনে বা জাপানে, অথবা ইয়োরোপে, দৈনন্দিন জীবনে এর ব্যবহার ব্যাপক। মুখ্যত আমাদের দেশে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, শস্তা বাসনকোসন কিংবা অধিক তাপসহ চুল্লিতেই সেরামিকস-এর ব্যবহার হয়ে থাকে। সেরামিকসকে যে সুকুমার শিল্পের বাহন করে তোলা যায় আমাদের দেশের খুব বেশি শিল্পীর নজর সেদিকে পড়ে নি। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন এই কাজে ব্রতী হয়েছেন, শ্রীসেন-রায় তাঁদেরই একজন।

সেরামিকসকে সুকুমার শিল্পে রূপ দেবার পেছনে বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগ-কুশলতার দিকে বিশেষ নজর দিতে হয়। কেয়োলিন, কোয়ার্টস, ফেলস্‌পার, ট্রিরাটাইট, মার্বল পাথর, জীপসম, মিলিমাইট প্রভৃতির যোগ্য চূর্ণীকরণ, আনুপাতিক মিশ্রণ, মণ্ড তৈরি এবং উপযুক্ত ভিত্তি (base) রচনার কাজে

বিভিন্ন বর্গীয় তাপের ব্যবহার—এই শিল্পমাধ্যমটিকে ব্যবহার করার আনুষঙ্গিক দিক। যথোপযুক্ত গ্লেজ-প্রলেপ এবং বিভিন্ন ধাতুযৌগিকে [যথা তামা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, কোবাল্ট, ক্রোমিয়াম, ইউরেনিয়াম, নিকেল, রুপো ও সোনা—] রঞ্জক সৃজন এবং বিভিন্ন উত্তাপ-পরিমণ্ডলে প্রার্থিত রং-এর বিকাশ বিষয়ে পরিশীলন এই শিল্পকর্মের বিশেষ জটিলতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। উপযুক্ত রং তৈরি করতে হলে ঐ ধাতুগুলির অক্সাইডের সঙ্গে উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্য ও খনিজ মিশিয়ে ঐ মিশ্রণকে অতি উগ্র তাপে পুড়িয়ে নিতে হয়। এর ফলেই গড়ে ওঠে রঞ্জক বা স্টেন। এই স্টেনকেও চূর্ণ করে, জলে ধুয়ে, উপযুক্ত বাহন তেলে মিশিয়ে রঞ্জিত করতে হয়। ঐ রঞ্জিত পাত্রও যথোপযুক্ত আঁচে পুড়িয়ে নিতে হয়। তা ছাড়া বহু চিত্রের পশ্চাদ্‌ভূমি রচনার কাজে চুল্লি বা ভাটির তাপবিভিন্নকরণ এই শিল্পসৃজনের এক আবশ্যিক প্রক্রিয়া।

বলা যেতে পারে—ধাতুবিদ, রাসায়নিক, কারুশিল্পী এক সঙ্গে মিশে যান এক চারুকলাশিল্পীর মধ্যে। আজকের দিনে গৃহসজ্জা বা বৃহৎ স্মৃতিস্তম্ভ বা বৃহৎ প্রেক্ষাগৃহ ইত্যাদি সজ্জার জন্য টালি-ভিত্তিক ম্যুরালের চাহিদা বহু দেশে বেড়েছে। শ্রীযুক্ত সিকেরাস-এর রঞ্জিত টালির কাজ বা পিকাসোর শেষবয়সে সেরামিকস-এর কাজ এই নতুন দিকে পথনির্দেশ করে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বৃহৎ অট্টালিকা বা সরণীসজ্জার কাজে এই ম্যুরালগুলির ব্যবহার শিল্পবিশ্বে দর্শনীয় অবদান রেখেছে।

শ্রীদিবাকর সেনরায়-এর সেরামিক পটারি ও টালি প্রদর্শনীটি চারটি অংশে বিভক্ত: টালি, ওয়ালপ্লেট, কাহিনী বর্ণন ও গৃহতৈজস। টালি ঐকীকরণের মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত হয়েছে তাঁর চোদ্দটি 'চিত্র'। এর মধ্যে বাউল (১নং), মা ও শিশু (২নং), আদিবাসী দম্পতি (৩নং), শোভাযাত্রা (৬নং), দুই বউ (৭নং), নৃত্যপর ভঙ্গিমা (৮নং), ময়ূর (১০নং), অশ্ব (১২ নং), গাই-বাছুর (১৩ নং) উল্লেখযোগ্য। গাই-বাছুর রেখাঙ্কনশিল্পীর রেখা বিষয়ে মুন্সিয়ানার পরিচয় দেয়। এই চিত্রগুলির নমনীয়তা আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশিত—বিশেষভাবে মনে পড়ছে নৃত্যপর ভঙ্গিমা, গাই-বাছুর ও শোভাযাত্রার চিত্রণ-গুলি। ওয়ালপ্লেটগুলির মধ্যে দুর্গাসরা, মাছ ও মুখোশ মোটিফগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া কাহিনীচিত্রের মধ্যে রয়েছে সারস ও শৃগাল এবং খরগোস ও কচ্ছপের ঈশপীয় কাহিনীর পোর্সিলিন চিত্রণ। ব্যবহার্য তৈজসের মধ্যে অত্যন্ত সুরুচিসম্মত ফুলদানি, কফিসেট, জলপাত্র, প্রদীপস্তম্ভ ইত্যাদি

রয়েছে। বলাবাহুল্য এর প্রতিটিই ব্যবহারিক প্রয়োজনে ব্যাপক বাণিজ্যগত সাফল্যের ভিত্তি হতে পারে।

শ্রীদিবাকর সেনরায় মুখ্যত তাঁর চিত্রণের মধ্য দিয়ে বাঙালি লোকচিত্রণ, আলপনা, পটচিত্রণ ইত্যাদির সুযোগ্য ব্যবহার করেছেন। চিত্রগুলি গড়ে তোলার জন্য আঁচের যথোপযুক্ত ব্যবহার পটভূমিকে এমন বিশিষ্টতা দিয়েছে, যার ফলে প্রতিটি চিত্র একবারই অনন্য সৃষ্ট হয়েছে, কপি করাও যেখানে অসম্ভব বলে মনে হয়। বাঙালি শিল্পীদের আর্ট ও ইণ্ডাস্ট্রির এক বিশেষ সাযুজ্যকরণের প্রচেষ্টার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে এই প্রদর্শনীটি বিশেষ সহায়ক হবে। তাছাড়া সুকুমার শিল্পের নিজের দাবি তো রয়েছেই।

তরুণ সান্যাল

তিন যুগের তিন কণ্ঠস্বর ?

১ 'আমার মাথা নত করে দাও হে
'তোমার চরণ ধুলার তলে'
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ 'বল বীর চির উন্নত মম শির'
—কাজী নজরুল ইসলাম

৩ 'একমাত্র মাথা তুলবে সে
যে রণাঙ্গনের নিয়মে নিজেকে করেছে স্বেচ্ছাবন্দী'
—???

গোলাম কুদ্দুসের

স্বেচ্ছাবন্দী

পড়ে দেখুন যুগে যুগে কণ্ঠস্বর কেন বদলায়

দাম : চার টাকা

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৩/৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

5 APR 1975

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

পুরাকীর্তি গ্রন্থমালা

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি

রচনা : শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য : ৩·৭৫ টাকা

0

বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি

রচনা : শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী

মূল্য : ২·৫০ টাকা

0

কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি

রচনা : ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়

মূল্য : ৪·০০ টাকা

প্রত্যেকটি বই পুরাবস্তুর বিশদ বিবরণে সমৃদ্ধ ও বহু উৎকৃষ্ট আলোকচিত্রে সজ্জিত। ঝকঝকে সচিত্র প্রচ্ছদ, সুদৃঢ় বাঁধাই, উত্তম ও দীর্ঘস্থায়ী কাগজ, উৎকৃষ্ট ছাপা। যাবতীয় তথ্যসংবলিত মানচিত্র আছে প্রত্যেক বইতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়ের অধীক্ষকের কাছ থেকে পাইকারী খরিদের ক্ষেত্রে পুস্তক-ব্যবসায়ীরা ২০% কমিশন পাবেন।

0

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

প্রকাশন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়
৩৮, গোপালনগর রোড
কলিকাতা-২৭

প্রকাশন বিক্রয়-কেন্দ্র
নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবন
[illegible] রোড

প. ব. (তথ্য ও [illegible]

নিজস্ব সংগ্রহে রাখার ও উপহার দেবার মতো বই

সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি বই

ন হন্যতে ২০·০০

ঃ মৈত্রেয়ী দেবী

স্মৃতি বিস্মৃতি ও দূরস্মৃতি ১·০০

ঃ পাবলো নেরুদা

অনুবাদক ঃ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

কমিউনিস্ট পরিবার ও অন্যান্য গল্প ১২·০০

ঃ সৌরি ঘটক

তরী হতে তীর ২০·০০

ঃ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মনীষা গ্রন্থালয়,

৪/৩-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পরিচয়

বর্ষ ৪৪ । সংখ্যা ৭ । মাঘ ১৩৮১ । ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫

সূচীপত্র

[library stamp]

প্রচ্ছদ ঃ অজয় গুপ্ত

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য । হিরণকুমার সান্যাল । সুশোভন সরকার
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র । গোপাল হালদার । বিষ্ণু দে । চিন্মোহন সেহানবীশ
সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

সূর্যমুখীর অরণ্যে-র পর
তরুন কবি বিপ্লব মাজী-র
নতুন কাব্যগ্রন্থ

বিষুব দিগন্ত
দাম ঃ চার টাকা

নিশান প্রকাশন
ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘ
মীর বাজার, মেদিনীপুর

প্রাপ্তিস্থান ঃ মনীষা গ্রন্থালয় ॥ কলি-১২

...ন্ত) সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং
...৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে

মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক

সম্পাদনা ঃ ধনঞ্জয় দাশ

এই বিশেষ সংকলনে থাকছে কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনী যুগের তাত্ত্বিক পত্রিকা 'মার্কসবাদী'তে প্রকাশিত মার্কসীয় দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য বিচারের সেই দুষ্প্রাপ্য দলিলগুলি। এই রচনাগুলিই একদা প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া—উভয় শিবিরে তুমুল বিতর্কের ঝড় তুলেছিল। আজকের ভিন্ন প্রেক্ষিতে সেই যুগের সবলতা-দুর্বলতা এবং বহু ভ্রান্ত ও অনেক অভ্রান্ত পদক্ষেপ বুঝতে হলে এই দলিলগুলি অপরিহার্য। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কয়েকটি খণ্ডে এই বিতর্কের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য রচনাগুলিও প্রকাশিত হবে। বর্তমান খণ্ডটি হবে প্রায় দুই শত পৃষ্ঠার। গ্রন্থাকারে এর দাম দাঁড়াবে বারো টাকা। আমরা মাত্র ছয় টাকায় এই খণ্ডটি গ্রাহকদের হাতে তুলে দিতে চাই। ডাকমাশুলসহ লাগবে সাড়ে সাত টাকা। আগামী ১৫ মে, ১৯৭৫ সালের মধ্যে ইচ্ছুক গ্রাহক ও এজেন্ট নীচের ঠিকানায় মনি অর্ডার যোগে টাকা পাঠান।

নতুন পরিবেশ প্রকাশনী

৩০, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, ফ্লাট-১৮/ঈ, কলিকাতা-৫৪

প্রকাশের পথে

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ

প্রতিবেশী সহোদর

[আধুনিক অসমীয়া কবিতার সংকলন]

সীমা

৬/সি, স্কট

ফ্যাসিবাদের ওপর
মানবজাতির বিজয়ের
ত্রিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে
'পরিচয়'-এর
বৈশাখ ১৩৮২ মে ১৯৭৫ সংখ্যা
বর্ধিত মূল্যে ও কলেবরে
ফ্যাসিস্টবিরোধী সংখ্যা রূপে
প্রকাশিত হবে।
দেশী ও বিদেশী
লেখা ও চিত্রকর্মে সমৃদ্ধ
এই বিশেষ সংখ্যাটির জন্য
গ্রাহকদের কোনো বাড়তি মূল্য
দিতে হবে না।
এজেন্টরা চাহিদা জানান।
পরে অতিরিক্ত কপি দেওয়া
সম্ভব হবে না।

কর্মাধ্যক্ষ, **পরিচয়**

অবধায়ক / **মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড**
৪/৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট। কলকাতা-১২

বর্ষ ৪৪ । সংখ্যা ৭ । মাঘ ১৩৮১ । ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫

আমাদের সহযোদ্ধা মাইকেল এঞ্জেলো

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

"প্রকৃতিস্থ থাকা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হবার আর কোনো ভালো উপায় নেই উন্মাদ হওয়া ছাড়া।" এ কথাগুলি শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর।

সমসাময়িক সমাজের স্বার্থোন্মত্ততা ও তার আনুষঙ্গিক উপদ্রবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ, আচার-আচরণে বেপরোয়া খামখেয়াল ও শিল্পশৈলীতে এক ধরনের আতিশয্য ও অতিরঞ্জনের নিদর্শন স্থাপন করে, মাইকেল এঞ্জেলোই প্রথম 'আধুনিক শিল্পী'র মানসিকতা অভিব্যক্ত করেন। পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সব আগুয়ান শিল্পীদের গোষ্ঠী বা avant-garde জন্মেছে, যাঁরা প্রতি যুগেই 'উন্মাদ' বলে পরিহাস বা নির্যাতনের নিশানা হয়েছেন, মাইকেল এঞ্জেলো তাঁদের মিছিলের প্রথম সারিতে।

পাঁচশো বছর আগে যে-ইতালিতে মাইকেল এঞ্জেলোর জন্ম, সে দেশের 'রেনেসাঁস'কে ঐতিহাসিকেরা প্রায়শই স্বর্ণযুগ আখ্যা দেন এবং 'সদাশয়' ও 'আলোকপ্রাপ্ত' স্বৈরতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় তদানীন্তন শিল্পীরা সুখে শিল্পচর্চা ও কালাতিপাত করতেন বলে বর্ণনা করেন। আসলে কিন্তু ইতালির দৈনন্দিন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় সেদিন শিল্পচর্চা করতে হলে সূক্ষ্ম মানসিকতা ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন শিল্পীদের এক ধরনের উৎকেন্দ্রিকতার আড়ালে পালাতে হত।

রেনেসাঁসের আঁতুড়ঘর ফ্লোরেনস রোম বা ভেনিস প্রভৃতি শহরে বর্বরতা ও সভ্যতা—এই দুই যমজ ভ্রাতা—একই সঙ্গে লালিত হচ্ছিল। দুর্নীতি-ব্যভিচারের কলকোলাহল, রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যক্তিহত্যার অবাধ প্রচলন, গোপন শলাপরামর্শ-ষড়যন্ত্রের বিষাক্ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, মিথ্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার সোপানে চড়ে উন্নতি [illegible] র এই চিত্র যেন আমাদের বর্তমান যুগেরই এ[illegible] দেশ, ওয়াটারগেট, নিকসন, চিলির ঘ[illegible]

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইতালির এই পটভূমিকায় মাইকেল এঞ্জেলোর জীবন ও শিল্পকর্ম পর্যালোচনা করলে প্রায়ই মনে হয়, তাঁর সমস্ত কীর্তি ও অক্ষমতা নিয়ে, মহিমা ও দুর্বলতা নিয়ে তিনি যেন এ যুগেরই কোনো অস্থির বিদ্রোহী শিল্পী। তাঁর সারা জীবন একাধিক আত্মবিরোধ ও অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যবহারের ইতিহাস—'পোপ' ও রাজপুরুষদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ, আবার পরমুহূর্তেই তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পচর্চা; উগ্র ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য থেকে একদিকে রাজনৈতিক মুক্তিসন্ধানে অগ্রণী, অন্যদিকে সচ্ছলতা ও নিরাপত্তার বাসনায় আপোসে প্রয়াসী। তাঁর শিল্পেও এই একই দ্রুত সঞ্চলমান পরিবর্তনশীলতা। 'হাই রেনেসাঁস'-এর মানবদেহের অতি মহিমাময় নিখুঁত রূপায়ণ থেকে 'ব্যারোক' (baroque)-এর জাঁকজমকপূর্ণ বিকৃতিকরণ, দূরবিস্তৃত আবক্ররেখার সবেগ আবর্তন। সবশেষে এক আপাতদৃষ্ট আত্মবিরোধী বিয়োগান্তক পরিচ্ছেদঃ সাফল্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের শিখরে উন্নীত হয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার পেয়েও মাইকেল এঞ্জেলোর অন্তিম আক্ষেপ —পুরো শিল্পচর্চাই অসার···এই উপলব্ধিতে উপনীত হওয়া।

এ সবই হয়তো মনে হতে পারে অস্থির মস্তিষ্কের নিদর্শন। কিন্তু বর্তমান শিল্পকলা জগতের দিকে তাকালে ঐ পরিচিত প্রবণতাগুলিই চোখে পড়ে, মনে হয় মাইকেল এঞ্জেলোর জীবন ও শিল্পকর্ম এ যুগের শিল্পীদের আপাতদৃষ্ট উৎকেন্দ্রিকতারই বিবর্ধিত পূর্বাভাস। আজও শিল্পীদের সামনে সেই পাঁচশো বছরের পুরনো সমস্যা—ব্যবসায়ী বাজারি দাবির কাছে পরাজয় স্বীকারের গ্লানিকর ইতিহাসের মাঝে মাঝে প্রতিবাদ, ভেঙে বেরিয়ে আসার ব্যর্থ প্রয়াস, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি যশ ও ঐশ্বর্যের বাসনা; এবং শিল্পকর্মের অকার্যকারিতায় বিরক্ত শিল্পীর সমস্ত কিছুর প্রতি, এমন কি নিজের প্রতিও, বিদ্রূপ প্রকাশ করে বিদূষকের ভূমিকা পালন।

রেনেসাঁসের ইতালির নিশানা ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা। মানুষ তার নিজস্ব ক্ষমতার ব্যাপক পরিধি সম্বন্ধে এই প্রথম সচেতন হল। চিরাচরিত নীতি, সমাজ-আরোপিত চৌহদ্দি, মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় নির্দেশ—এ সবের বেড়া ডিঙিয়ে সে আ[illegible] হয়ে উঠল। শিল্পে মনুষ্যদেহ লজ্জা-সংকোচ [illegible] নিয়ে উপস্থিত হল।

[illegible] রূপ ছিল। বিজয়ী ব্যক্তিস্বতন্ত্রতাবোধ [illegible] হয়ে জঙ্গী স্বার্থপরতা ও যদৃচ্ছ

ক্ষমতা প্রদর্শনের রূপ নিয়েছিল 'পোপ', রাজপুরুষ, সম্রাট-সম্রাজ্ঞী ও বিবেকবর্জিত দুঃসাহসিক সব স্বার্থান্বেষীদের জীবনে—যারা রেনেসাঁসের জাঁকজমকপূর্ণ মঞ্চে সারা পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী জুড়ে একের পর এক মিছিল করে চলেছিল, এবং যাদের কীর্তিকলাপই আজকের ধনতান্ত্রিক সমাজের অবাধ যথেচ্ছ অহংবাদী মূল্যবোধের গোড়াপত্তন করেছিল।

মাইকেল এঞ্জেলো তাঁর চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে রেনেসাঁস-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের জন্মের জয়গান গেয়েছিলেন মানবদেহকে দুঃসাহসী স্বাধীনতার সঙ্গে রূপায়িত করে। কিন্তু তাঁর জীবনে ও চিন্তাধারায় এই একই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের উগ্র ও যথেচ্ছ প্রকাশের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন বিদ্রোহী ছিলেন। পোপ ও রাজপুরুষদের সমাজবিরোধী দর্শনের সঙ্গে তাঁর নিজের প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ সত্তার সংঘাত থেকে মাইকেল এঞ্জেলোর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পকর্ম জন্ম নিয়েছিল—সেই সব প্রকাণ্ড বিষণ্ণ মূর্তি, আগ্নেয়গিরির মতো যাদের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে পাঁচশো বছর আগেকার যন্ত্রণা ও ক্রোধাগ্নি।

সমাজসংস্কার, বিদ্রোহ ও শিল্পচর্চা :

কিন্তু মাইকেল এঞ্জেলো ছিলেন নিতান্তই নিঃসঙ্গ। সমসাময়িক যুগের ইতালিতে উগ্র ব্যক্তিস্বতন্ত্রতাবাদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে সব রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন চলছিল, তাদের মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও মাইকেল এঞ্জেলো তাদের সংস্কৃতিবিরোধী মনোভাবের পরিচয় পেয়ে অধিকাংশ সময়ই দূরে সরে এসেছেন। এ যেন অনেকটা এ শতাব্দীর বামপন্থী শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমস্যা: সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আদর্শে বিশ্বাসী হয়েও কোনো কোনো সময় সে আন্দোলনের নেতাদের সাংস্কৃতিক বিষয়ে অনুদারতা ও শিল্পে সাহিত্যে দলীয় মতবাদের প্রত্যক্ষ প্রচারের দাবিতে বিরক্ত হয়ে তাঁরা যেমন কখনো কখনো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, বা হতে বাধ্য হয়েছেন।*

সমকালীন আন্দোলনের প্রতি মাইকেল এঞ্জেলোর সমর্থন ও বৈরীভাবের এই সংঘাতের প্রথম নিদর্শন মেলে ১৪৯৪ সালে, যখন শিল্পীর বয়স ১৯। ফ্লোরেনসে তখন 'পিয়েরো দ মেদিচি' ([illegible] ...মত্ব। তার স্বৈরাচারে ও উৎপীড়নে উত্যক্ত জ[illegible] এঞ্জেলো স্বয়ং মেদিচির খোশখেয়া[illegible]

করতে এক শীতে সারা রাত জেগে বাগানে দাঁড়িয়ে তাঁকে তুষার দিয়ে মূর্তি গড়তে হয়েছিল।

এই বিস্ফোরক অবস্থায় যখন সন্ন্যাসী 'স্যাভোনারোলা' (Savonarola) তাঁর তেজস্বী ব্যক্তিত্ব এবং পাদরী ও রাজপুরুষদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর জ্বালাময়ী বক্তব্য সমেত এসে উপস্থিত হলেন, ফ্লোরেনসের সমাজজীবনে যেন একটা বিপ্লব ঘটে গেল। মনে রাখা প্রয়োজন যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা বা জড়বাদ তখনও সে যুগে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। ধর্মীয় সংস্কারই পারে অর্থনৈতিক বৈষম্য রাজনৈতিক স্বৈরাচার ও সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে উদ্ভূত যাবতীয় প্রতিকূলতার অবসান ঘটাতে—এ জাতীয় ধারণা স্বভাবতই সে যুগের অনেক চিন্তাবিদই পোষণ করতেন। আজকের মতো সে যুগেও সামাজিক অসঙ্গতির কর্কশতা শিল্পীর সাধনার তাল কেটে দিত। নির্জনবাসে শিল্পচর্চা সম্ভব ছিল না, সমকালীন আন্দোলনের তালের সঙ্গে প্রায়ই শিল্পীদের যুক্ত হতে হত।

'স্যাভোনারোলা'র প্রচার যুবক মাইকেল এঞ্জেলোর হৃদয়তন্ত্রীতেও ঝঙ্কার তুলেছিল। কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের সঞ্চিত ক্রোধের যে-বিস্ফোরণ ঘটতে চলেছে, শিল্পী তার আভাস পূর্বেই পেয়েছিলেন। এ তাপ সহনের ক্ষমতা কি তাঁর হবে? ভয়ে মাইকেল এঞ্জেলো ফ্লোরেনস ছেড়ে পালালেন।

১৪৯৪ সালের নভেম্বরে 'স্যাভোনারোলা'র সমর্থনে ফ্লোরেনসে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। মেদিচির পতন হল। তারপর শুরু হল এক ব্যাপক ধ্বংসের উৎসব। ইতিহাসে প্রায় প্রত্যেক বিদ্রোহী আন্দোলনই কালাপাহাড়ী। মধ্যযুগের ধর্মীয় বিদ্রোহীগণ—'অ্যালবিজেনস' (Albigens), দ্বাদশ শতাব্দীর ফ্রানসে যাঁরা খ্রীষ্টীয় ধর্মের কেন্দ্রস্থল রোমের গীর্জার দুরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দরিদ্র কৃষকদের মতো আড়ম্বরহীন জীবনযাত্রাকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেন ; বা পরবর্তী যুগে চতুর্দশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে জন ওয়াইক্লিফ (John Wycliff)-এর শিষ্যরা, যাঁরা 'লোলার্ড' (Lollard) নামে খ্যাত ছিলেন এবং দরিদ্র জনগণের দাবির প্রবক্তারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন; বা পঞ্চদশ শতাব্দীর বোহেমিয়ায় (বর্তমান চেকোস্লোভাকিয়া) 'ইয়ান হুস' (Jan Huss)-এর অনুগামীরা, যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে ধর্ম ও সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে সশস্ত্র লড়াই করে[illegible] ভূতির গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলেই তাঁরা সন্দিহান [illegible] র্যার জমকালো আচার-ব্যবহার ও প্রাচুর্যের [illegible] তায় সৃষ্ট শিল্পকর্মের বিরুদ্ধেও তাঁরা

প্রতিবাদমুখর ছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে শিল্পকলাও ধনীদের ভোগবিলাসের অংশবিশেষ, অতএব বর্জনীয়।

পরবর্তী যুগে ইংলণ্ডে ক্রমোয়েলের নেতৃত্বে যে-'পিউরিট্যান'রা রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করলেন, কুরুচির অভিযোগ এনে নাটক রচনা ও নাট্যশালাগুলির বিরুদ্ধে তাঁরাই হলেন খড়্গহস্ত।

এমন কি, এ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসেও অনেক সময় সামন্ততান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সে সমাজের শিল্পীদের সৃষ্টিকর্মকে গুলিয়ে ফেলে একই পর্যায়ভুক্ত করে সৃজনীশক্তিচ্যুত বা decadent আখ্যা দেবার প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময় কখনও কখনও রাজনৈতিক বিপ্লবীরা প্রাচীন শিল্পকর্মকে আশু প্রয়োজনের পক্ষে অবান্তর বলে মনে করেছেন। বা সর্বহারাদের ভুলিয়ে রাখার জন্য শাসকশ্রেণীর তৈরি আফিং বলে চিহ্নিত করেছেন।

ফ্লোরেন্স প্রজাতন্ত্রে 'স্যাভোনারোলা' বালকদের সংগঠিত করেছিলেন (সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চীনের 'রেডগার্ড'দের পূর্বসূরি ?) অতীতের প্রতিমাগুলো চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। শহরের অভিজাত ব্যক্তিদের বাড়িতে হানা দিয়ে তারা যা কিছু পৌত্তলিক অর্থাৎ প্রাক্-খ্রীষ্টীয় গ্রীক বা রোম্যান দেবদেবীর মূর্তি বলে সন্দেহ করত, তা-ই বার করে এনে ফ্লোরেনসের 'পিয়াৎজা দেল্লা সিনোরিয়া' (Piazza della Signoria)-তে এক বিপুল বহ্ন্যুৎসবে অর্পণ করত। ফলে লাতিন ও ইতালীয় কবিদের গ্রন্থ, বাদ্যযন্ত্র, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য ভস্মস্তূপে পরিণত হল।

যুবক মাইকেল এঞ্জেলো ইতিমধ্যে ফ্লোরেন্স থেকে ভেনিসে উপস্থিত হয়েছেন। পরবর্তী যুগের বহু বামপন্থী চিন্তাবিদদের মতো অতীতের শিল্পকর্মের প্রতি বিদ্রোহীদের জঙ্গী মনোভাব মাইকেল এঞ্জেলোর পক্ষে হজম করা সম্ভব হল না। কিন্তু ফ্লোরেন্সের বিদ্রোহীদের সমাজসংস্কারের আদর্শের প্রতি আস্থা বশতই মাইকেল এঞ্জেলো সরাসরি প্রতিবাদ করলেন না। মতবিরোধ বেরিয়ে এলো তাঁর এই সময়ে সৃষ্ট ভাস্কর্যের মাধ্যমে। একের পর এক গ্রীক দেবদেবীর মূর্তি সৃষ্টি করলেন—'ব্যাকাস' (Bacchus), 'অ[illegible] 'কিউপিড' (Cupid)—যেন তাঁর অসহিষ্ণু রাজ[illegible] চাইলেন যে শেষ বিচারে ধর্মীয় বা রাজ[illegible] নন্দনতাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্বই শিল্পকর্মকে অ[illegible]

রূপায়ণের প্রয়োজনে গ্রীক দেবী 'ভেনাস' (Venus) বা খ্রীষ্টীয় ধর্মের 'ঈভ' (Eve)—উভয়ই সমান উপযোগী।

আসলে মাইকেল এঞ্জেলোর প্রতিভা ছিল বহুধাবিস্তৃত। ভাবপ্রকাশের প্রয়োজনে কোনো পন্থা বা মাধ্যমই তাঁর কাছে যেমন অপাঙক্তেয় ছিল না, বিষয় নির্বাচনেও তেমনি তিনি ধর্মীয় সংকীর্ণতা দ্বারা প্ররোচিত হন নি। পেশাদারী বিপ্লবীর ব্রত—এক পথে অনমনীয়ভাবে স্থির থাকা, মতবাদকে বিশুদ্ধ রাখা—মাইকেল এঞ্জেলোর প্রয়োজন ছিল না। তাই তাঁর শিল্পশৈলীতে এত বৈচিত্র্য, বিষয়নির্বাচনে বাছবিচারহীনতা।

তাই তাঁর খ্রীষ্টভক্তি সত্ত্বেও বারংবার নিজ রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রকাশের জন্য অ-খ্রীষ্টীয় বিষয় বা শিল্পরীতি গ্রহণে তিনি সংকুচিত হন নি। ফ্লোরেনসে রক্ষিত তাঁর নির্মিত 'ব্রুটস' (Brutus)-এর আবক্ষ মূর্তি এই মনোভাবেরই প্রকাশ। স্বেচ্ছাচারী শাসক 'অ্যালেসানদ্রো দ মেদিচি' (Alessandro de' Medici)-র হত্যার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এটি নির্মিত। 'অ্যালেসানদ্রো'র হত্যাকারী 'লরেনজিনো' (Lorenzino)-কে সে সময় অনেকেই প্রশংসা করে 'ব্রুটস' নামে অভিহিত করতেন। সে যুগের ইতালিতে অত্যাচারী শাসকদের বিরোধীদের মধ্যে অতীত রোমের একনায়ক 'সীজার' (Caesar)-এর হত্যাকারী 'ব্রুটস'-এর প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব ছিল, যদিও তাঁরা খ্রীষ্টধর্মের অনুশীলনকারী ছিলেন।

অবিমিশ্র খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগবশত গীর্জার সংস্কার সাধন, অথচ রাজনৈতিক স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অ-খ্রীষ্টীয় রোমের স্বেচ্ছাচারবিরোধী সংগ্রাম থেকে প্রেরণা গ্রহণ—এই দুই চিন্তার সংঘাত ও সহাবস্থান সে যুগের ইতালির বহু চিন্তাবিদকে পীড়িত করত। মাইকেল এঞ্জেলোর সমসাময়িক 'পিয়েরপাওলো বসকোলি' (Pierpaolo Boscoli) একদা 'স্যাভোনারোলা'র অনুরাগী ছিলেন, পরে প্রাক্-খ্রীষ্টীয় যুগের স্বাধীনতার আদর্শে দীক্ষিত হন। ১৫৩৩ সালে ফ্লোরেনসে পুনর্প্রতিষ্ঠিত 'মেদিচি'দের শাসনের বিরুদ্ধে এক ব্যর্থ অভ্যুত্থানে তিনি অংশগ্রহণ করেন। প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত 'পিয়েরপাওলো' তাঁর মৃত্যুর পূর্বমুহূ[illegible]লেন—"দয়া করে 'ব্রুটস'-এর প্রভাব থেকে [illegible]খাঁটি খ্রীষ্টান হয়ে মরতে পারি।"

[illegible]সংগ্রামে অংশগ্রহণ, না তার প্রতি [illegible]-এর দ্বন্দ্ব মাইকেল এঞ্জেলোর চিন্তাকে

বারংবার দ্বিখণ্ডিত করেছে। ১৪৯৮ সালে 'স্যাভোনারোলা'কে ফাঁসিতে লটকানোর পর 'মেদিচি'রা আবার ক্ষমতাসীন হয়। কিন্তু ১৫২৭ সালে ইতালি বিদেশী শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে রোমে খ্রীষ্টীয় জগতের অধিকর্তা পোপ সপ্তম ক্লিমেন্টের আধিপত্য চূর্ণ হয় এবং ফ্লোরেনসের জনগণ বিদ্রোহে ফেটে পড়ে 'মেদিচি'দের গদিচ্যুত করে। প্রথমে যদিও পূর্বের মতো মাইকেল এঞ্জেলো শহর ছেড়ে পালান, পরে বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে ফ্লোরেনস প্রতিরক্ষার আহ্বানে সাড়া দিতে তিনি ফিরে আসেন, এবং নব-প্রতিষ্ঠিত সাধারণতান্ত্রিক সরকার প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে দুর্গ নির্মাণের দায়িত্ব দিয়ে মাইকেল এঞ্জেলোকে যুদ্ধদপ্তরের সভ্যপদে অধিষ্ঠিত করেন। পাথর কেটে মূর্তি খোদাইর পেশা ফেলে রেখে 'স্যান মিনিয়াতো' (San Miniato)-র পাহাড় জুড়ে প্রাচীর নির্মাণের কাজে মাইকেল এঞ্জেলো কম দক্ষতার পরিচয় দেন নি, গীর্জার মীনারকে তীরন্দাজদের অবস্থানস্থলে পরিণত করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। কিন্তু মনের গভীরে সর্বদাই আনাগোনা করছিল সন্দেহ ও অবিশ্বাস—রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি শিল্পীর স্বভাবসুলভ আস্থাহীনতা। এ সন্দেহ সত্যে পরিণত হল ছয় মাসের মধ্যেই যখন ফ্লোরেনসের সমরনায়কের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বিদেশী শত্রুর কাছে নতুন সাধারণতন্ত্রের পতন ঘটল।

আবার মাইকেল এঞ্জেলোকে পালাতে হল শহর ছেড়ে। কিন্তু ইতিহাসের নিদারুণ পরিহাসে যে-'মেদিচি'দের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন, সেই 'মেদিচি'দেরই নায়ক 'লোরেনজো' (Lorenzo)-র সমাধিতে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের উদ্দেশ্যে যে-পোপের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছিলেন, সেই সপ্তম ক্লিমেন্টই যুদ্ধের পর রোমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে মাইকেল এঞ্জেলোকে তাঁর আত্মগোপনের আবাসস্থল থেকে খুঁজে বার করে। এ পরিহাস শিল্পের ইতিহাসে বহুবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এক দিকে শিল্পীর বাঁচার তাগিদ, অন্যদিকে পৃষ্ঠপোষকের নিজস্ব পদমর্যাদার বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনে বা আধুনিক যুগে পুঁজিবাদীর পণ্যদ্রব্যকে বাজারে বিক্রির তাগিদে শিল্পের ব্যবহার—এই দুই তাগিদের সমন্বয় প্রায়শই বিদ্রোহী শিল্পীকে পৃষ্ঠপোষকের আজ্ঞাবহ কর্মচারীতে পরিণত করেছে। মাইকেল এঞ্জেলোর সমসাময়িক ও জীবনীকার 'কন্দিভি' (Condivi)-র মতে শিল্পী 'লরেনজো'র স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কাজে [illegible] দিচির প্রতি প্রীতিবশত নয়, বরং পোপের কোপানলের ভ[illegible]

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও মাইকেল এঞ্জেলো [illegible]

'লরেনজো'র স্মৃতিসৌধ নামে পরিচিত হলেও, আসলে তা ফ্লোরেনস শহরের বেদনা-যন্ত্রণা-পরাভবের নিদারুণ ইতিহাসের স্মারক রূপেই বেঁচে আছে। 'লরেনজো'র প্রতিমূর্তিকে ছাপিয়ে রয়েছে চারটি অর্ধশায়িত মূর্তি—'দিন', 'রাত্রি'. 'উষা' ও 'সন্ধ্যা'। ঔজ্জ্বল্যের দূত হিসেবে প্রাতঃকালের যে-ভাবমূর্তি—তাকে সরাসরি উল্টে দিলেন মাইকেল এঞ্জেলো। এক করুণ, ক্লান্ত, সদ্যঃ নিদ্রোত্থিতা এ 'উষা' যেন দিনগত পাপক্ষয়ের গ্লানি বহনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বাকি তিনটি মূর্তিতেও ঐ একই স্বর—হতাশা, ক্লান্তি, অসহায়তা। ঘুমন্ত মূর্তি 'রাত্রি'র উপর শিল্পী স্বয়ং কয়েক ছত্র কবিতা লিখে গেছেন :

"সুখী আমি নিদ্রামগ্নে, আরও সুখী স্বর্গসুখে
প্রস্তরে নির্মিত হয়ে। অন্যদিকে,
বেদনা ও লজ্জা সব কিছু সহনে বাধ্য।
পরম আশা আমার এ মুহূর্তে
যেন কিছু না দেখি, কিছু না অনুভব করি।
তাই অনুচ্চ কণ্ঠে কথা বলো, জাগিও না আমায়।"

এ সেই নির্বাকতা যার জন্ম প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাবোধ থেকে। পাঁচশো বছর আগের প্রতিবাদজ্ঞাপনার্থে মৌনাবলম্বনের এই নজির আমাদের এ যুগের বহু বিক্ষোভপ্রদর্শনের পূর্বসূরি : নাৎসি-অধ্যুষিত ফরাসীদেশে এ সেই 'ভেরকোর'-এর 'সমুদ্রের মৌন' ; সেই প্রতিবাদস্পৃহা, পুলিশের জেরা ও যন্ত্রণাদানের মুখে যা রাজনৈতিক বন্দীকে নীরব পাথরে পরিণত করে ; যুদ্ধ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই বাঙ্‌ময় নৈঃশব্দ্যই পরে হাজার হাজার মৌনমিছিলে পরিণত হয়েছে—যে-মিছিলের পায়ের চিহ্ন আজকের শহরগুলির রাস্তায় রাস্তায় শিলালিপি হয়ে আছে।

পৃষ্ঠপোষণ বনাম শিল্পীর স্বাধীনতা :

পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে মাইকেল এঞ্জেলোর সংঘাত প্রায় তাঁর সারাজীবন ধরেই চলেছিল। আধুনিক শিল্পী যেমন বাজারের চাহিদা বা অনীহা, মনিবের হুকুম বা প্রত্যাখ্যান—এ সবের তাড়নায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হন, মাইকেল এঞ্জেলো [illegible] কদের খামখেয়াল ও হস্তক্ষেপ এবং তাদের [illegible] তার বলি হয়েছিলেন। কখনও কখনও [illegible] রণ করত। 'সিস্তিন চ্যাপেল' (

Chapel)-এর প্রবেশদ্বারের প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত শিল্পীর 'লাস্ট জাজমেণ্ট' (Last Judgment) বা 'শেষ বিচার' পরবর্তী যুগের পোপদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মহাপ্রলয়ের যন্ত্রণায় আবর্তিত সারা প্রকৃতি ও মানবজগৎ, এবং বিচারপতির দণ্ডের আশংকায় ভীত বিকৃত মূর্তির ভীড় —এই হচ্ছে ফ্রেস্কোটির বিষয়। দ্রুত সঞ্চলমান বক্ররেখার আধারে মনুষ্যদেহের আকারের বিকৃতিকরণ—নগ্ন দেবদূত ও সন্তদের মোচড়ানো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—এ সব তদানীন্তন ধর্মীয় কর্তাদের কাছে মনে হয়েছিল ধর্মের মর্যাদাহানিকর। পোপ চতুর্থ পল (Paul IV) ফ্রেস্কোটিতে অঙ্কিত নগ্ন মূর্তিগুলি ঢেকে ফেলার জন্য এক বিশেষজ্ঞকে নিয়োগ করেন। পোপ পঞ্চম 'পায়স' (Pius V) আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ঐ অংশগুলি মুছে ফেলার হুকুম দেন। পোপ অষ্টম ক্লিমেণ্ট সমস্ত ফ্রেস্কোটিই নিশ্চিহ্ন করে ফেলার আদেশ দেন। অবশেষে অন্যান্য সমসাময়িক শিল্পীদের আবেদনের ফলে, বহু কষ্টে বেরসিক নীতিবাচস্পতিটিকে নিরস্ত করা যায়।

এ সব ব্যাপারে মাইকেল এঞ্জেলোর নিজের প্রতিক্রিয়া ছিল আত্মমর্যাদাবোধ-প্রসূত ঔদ্ধত্যপূর্ণ। যখন তাঁর ফ্রেস্কোর নগ্ন মূর্তিগুলিকে ঢেকে ফেলার প্রস্তাব নিয়ে পোপের দূত তাঁর কাছে এসে হাজির হয়, রুষ্ট শিল্পী জবাব দেন—"পোপকে গিয়ে বলো এ জগতটার সংস্কারে আগে মনোনিবেশ করুন ; একটা ছবির পরিবর্তন করা এমন কিছু একটা সমস্যা নয়।" পর্তুগালের চিত্রশিল্পী 'ফ্রানথিসকো দ ওলান্দা' (Francisco D' Ollanda) যখন ১৫৩৮ সালে রোমে মাইকেল এঞ্জেলোর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, পৃষ্ঠপোষকদের হস্তক্ষেপ প্রপীড়িত শিল্পী প্রায় ফেটে পড়ে পোপ সপ্তম ক্লিমেণ্ট সম্বন্ধে অনুযোগ করেন—"আমি তাঁর ব্যবহারে বিরক্ত ও ক্লান্ত।"

শিল্পশৈলী :

বস্তুত, তাঁর স্বভাবে আচার-আচরণে যে ঋজু পৌরুষ উপস্থিত, তাঁর চিত্রাঙ্কনে বা ভাস্কর্যে তা এক চূড়ান্ত রূপ নেয়। তাঁর সমস্ত কল্পনা জুড়ে ছিল পুরুষদেহের বলিষ্ঠ সৌন্দর্য। যদিও নারীদেহ ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর শিল্পকর্মে—সে সব দেহ যেন নিছক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেই নারী, ভাবপ্রকাশে নয়। বিশাল সেই সব মূর্তির বক্ররেখায় কোথাও নমনীয়তা খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাদের মুখমণ্ডলে লাবণ্যের সামান্যতম ছায়া পাওয়াও দুষ্কর। আসলে

মাইকেল এঞ্জেলো তাঁর যুগের মেজাজকেই নিজ শিল্পকর্মে নিজস্ব স্বভাব অনুসারে আরও বিবর্ধিতরূপে প্রতিফলিত করেছিলেন। যুগটা ছিল নারী-পুরুষের সমানাধিকারের যুগ। বহু বিদূষী মহিলা সমাজে স্বকীয় মেধা ও কীর্তির গুণে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন এবং অনেক সময়ই পুরুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে তাঁরা নিজ সৃষ্টিকর্মকেও প্রায় পুরুষালি করে ফেলতেন। মাইকেল এঞ্জেলোর বান্ধবী ছিলেন কবি ভিত্তোরিও কলোনা (Vittorio Colonna)। তাঁর কাব্য সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞর মত—"এমন কি তাঁর প্রেমের কবিতা এবং ধর্মীয় কবিতাও এত শব্দবাহুল্যবর্জিত, ভাবপ্রবণতার কোমল সন্ধ্যালোক এবং সচরাচর মহিলাদের কাব্যে যে রকম অসার সৌখিনতা দেখতে পাওয়া যায়—এ সব থেকে এত দূরবর্তী, যে, যদি না জানতাম, তাহলে অনায়াসেই আমরা এগুলিকে কোনো পুরুষ কবি রচিত বলে জাহির করতাম।" (Jacob Burckhardt : *The Civilization of the Renaissance*)। তাঁর সম্বন্ধে মাইকেল এঞ্জেলোর নিজের অভিমত একটি ছোট কবিতায় লিপিবদ্ধ আছে :

"নারীর মধ্যে পুরুষ ; বা আরও বড়, কোনো দেবতা
তাঁর বাক্যের মধ্য দিয়ে যেন কথা বলছেন।"

পরবর্তী যুগে মাইকেল এঞ্জেলো অতীতে সৃষ্ট তাঁর নিজস্ব অঙ্কনরীতি ভেঙে 'ব্যারোক'-এর গোড়াপত্তন করেন। এ ভাঙনের আড়ালে ছিল তাঁর উপলব্ধি। তিনি বুঝেছিলেন সমসাময়িক সমাজের ক্রমবর্ধমান আন্দোলন এবং নিজের মানসিক অস্থিরতা ও উত্তেজনা প্রকাশের পক্ষে অতীতের রচনাশৈলী আর উপযুক্ত নয়। এ উপলব্ধি প্রতি যুগেই বিদ্রোহী শিল্পীদের প্ররোচিত করছে পুরাতনকে ভেঙে নতুন সৃষ্টি করতে, অতীত 'ফর্ম'-এর আধারে বন্দী বর্তমানের অধৈর্য চিন্তা-ভাবাবেগকে মুক্তি দিতে। 'হাই রেনেসাঁস'-এর অঙ্কনশৈলী—যা মাইকেল এঞ্জেলো জীবনের প্রথমে অবলম্বন করেছিলেন—বাস্তবের সংস্পর্শমুক্ত এক দেবসুলভ আদর্শ মনুষ্যদেহের আকারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। শিল্পকর্মে দৈহিক গড়ন তৈরি হত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য ও সাযুজ্যের বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলীর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য থেকে, মূর্তিগুলি সাজানো হত ভারসাম্য ও দূরত্ব-নৈকট্যের সঙ্গতি বজায় রেখে। মাইকেল এঞ্জেলো ভেঙে দিলেন এসব। তাঁর 'লাস্ট জাজমেণ্ট' ফ্রেস্কোতে (১৫৩৪-৪১) অতীতের ছাঁচ উল্টে গেল। দূরের বস্তুকে টেনে আনলেন সম্মুখভাগে ; পূর্বের ঐকতান হাজার আকারের বৈচিত্র্যে ছিটকে পড়ল ;

আগের সেই সব নিবাত নিষ্কম্প মহীয়ান মূর্তিগুলি রেখার গতিময়তা পেয়ে কখনও দ্রুত পলায়মান, কখনও যন্ত্রণায় মুচড়ে দুমড়ে উঠল।

কিন্তু এই ভাঙন-পর্বও একদিন শেষ হতে বাধ্য। প্রতিবাদের ও প্রতিফলনের নিত্যনতুন ভাষা আবিষ্কারের উৎসাহ এক সময় স্তিমিত হয়ে এলো।

সৃষ্টির সংকট ঃ

জীবনের শেষ পর্বে মাইকেল এঞ্জেলোর যশ ও সাচ্ছল্য ক্রমশই নিশ্চিত হচ্ছিল। সাফল্যের ও খ্যাতির তরঙ্গশীর্ষে অধিষ্ঠিত শিল্পী সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁর শিল্পকর্মে যথেচ্ছ স্বাধীনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর। পৃষ্ঠপোষকদের হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ বন্ধ না হলেও, পোপ ও রাজপুরুষেরা বৃদ্ধ ভাস্করকে বড় একটা ঘাঁটাতেন না। এমন কি মাইকেল এঞ্জেলো এক সময়ে 'ভ্যাটিকান'-এর প্রধান স্থপতিও নিযুক্ত হন। সমসাময়িক জীবনীকার 'কন্দিভি'র ভাষায়—"তাঁর জন্য পৃথিবীর রাজারাজড়ারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় রত—তাঁর কৃতিত্বের এর থেকে বড় ও স্পষ্ট নিদর্শন আর কি হতে পারে?"

এ এক আশ্চর্য পরিহাস! ধনী পৃষ্ঠপোষকদের আস্ফালনকে অবজ্ঞা করার উদ্দেশ্যে মাইকেল এঞ্জেলো তাঁর আচার-আচরণে যে-উৎকেন্দ্রিকতা অবলম্বন করেছিলেন, তা শেষে পাগলের নিরীহ প্রলাপ বলে পরিগণিত হল। যে সব বিশাল ভয়ঙ্কর মূর্তি তিনি তৈরি করেছিলেন, 'মোসেজ' (Moses)-এর যে-রুদ্রমূর্তি অত্যাচারী শাসককুলের প্রতি অভিশাপ নিক্ষেপ করেছিল, শালপ্রাংশু 'ডেভিড' (David)-এর কুঞ্চিত ললাটের নীচে যে-ক্রুদ্ধ চাহনি পুরাণের দৈত্যের মর্মভেদ করে ইতালির স্বৈরাচারী শাসকদের বিদ্ধ করতে প্রয়াসী—সে সবকিছুকেই শাসকগোষ্ঠী কালক্রমে নিছক পাথরের খেলনা হিসেবে গ্রহণ করল। মূর্তিগুলির আঘাতের ধার যেন ক্রমশই ভোঁতা হয়ে গেল। এরও পরে যখন 'ব্যারোক'-এর ঝড় তুললেন তাঁর ফ্রেস্কোতে, পোপদের প্রাথমিক ক্রোধান্ধতা কেটে গেলে তা অভিজাতবর্গের মদের পেয়ালায় নিছক তুফানের উপাদানে পর্যবসিত হল, হাজার হাজার তরুণ শিল্পী তা অনুকরণ করতে উঠেপড়ে লাগল। সমালোচকেরা "মাইকেল এঞ্জেলোর বাড়াবাড়ি" বা 'extravagance' বলে সবকিছু সহ্য করতে শুরু করল।

অবস্থাটা অনেকটা এ যুগের বিদ্রোহী শিল্পীদের সমস্যার কথা স্মরণ করিয়ে

দেয়। মার্কিনমুলুকের সরকার ইতিহাসের অতি জঘন্যতম এক যুদ্ধে লিপ্ত; অথচ সেই সরকারই স্বদেশে বিপ্লবী নাট্যগোষ্ঠীগুলিকে তীব্র যুদ্ধবিরোধী নাটক করার অনুমতি দিয়ে, এমন কি বাহবাও দিয়ে, গণতন্ত্রের কি অসীম মহিমা— যে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে—এই বাণী প্রচার করছে। পুঁজিপতিদের মূল্যবোধকে কঠোরতম আঘাত করে শিল্প-সাহিত্য রচনা সম্ভব আজ খোদ পুঁজিতন্ত্রের দেশেই। অতি-পরিচয়ের ঔদাসীন্য নিয়ে ধনিকগোষ্ঠী প্রতিবাদের এইসব ভোঁতা ক্ষেপণাস্ত্রগুলি হজম করছে। শিল্পে সবরকমের বিদ্রোহী পরীক্ষা-নিরীক্ষা বরদাস্ত করার এই কায়দা একধরনের সূক্ষ্ম দমননীতি, শিল্পীর ভাষাকে অক্ষম করে নিস্তেজ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র।

শেষ বয়সে মাইকেল এঞ্জেলো উপলব্ধি করছিলেন কি ভাবে তাঁর প্রতিটি প্রতিবাদই অতি ধুরন্ধর শত্রুপক্ষ আত্মভূত করে নিচ্ছিল, প্রচলিত রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের নিরস্ত্র করছিল। নতুন ভাষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু বৃদ্ধের সৃজনীশক্তি অস্তমিতপ্রায়, যুগের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতার বেড়াজাল কাটিয়ে উঠবার সময় আর ছিল না। যদিও প্রায় মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর পাথর খোদাই-এর বাটালি তিনি হাতছাড়া করেন নি। মাইকেল এঞ্জেলোর শিল্পকর্মে ক্রমশই এক ধরনের ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। 'পায়েতা রন্দোনিনি' (Pieta Rondonini / ১৫৫৬-৬৪)—মেরীর কোলে মৃত যীশুখ্রীষ্টের সেই পরিচিত মূর্তি—যেন তাঁর এই চূড়ান্ত অসহায়তার কৃশ সারমর্ম। কোথায় গেল অতীতের সেই বিশালতা, মানবদেহের সেই অতিকায় কল্পনা? এ মূর্তিযুগল যেন থার্মোমীটারের মতো স্বল্পবাক্, যেন কেবল ইশারা দ্বারা ভাব প্রকাশ করছে।

বুঝতে অসুবিধা হয় না বৃদ্ধ শিল্পী শেষ বয়সে কি প্রচণ্ড মানসিক সংকটে জর্জরিত হচ্ছিলেন। কোথায় তিনি তাকাবেন? সমসাময়িক যুগের স্বার্থোন্মত্ততার বিজয়-অভিযান তিনি কোনোদিনই মেনে নিতে পারেন নি। আবার পাশাপাশি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের শিল্পবিরোধী মনোভাব স্বীকারেও তিনি অপারগ। সমকালীন রাজনীতি, তার ষড়যন্ত্র এবং হিংস্রতা, এক স্বৈরাচারী শাসকের পরিবর্তে আর-এক স্বৈরাচারী শাসককে অধিষ্ঠিত করার প্রবণতা, তাঁকে হতাশ করেছিল। একমাত্র মৃত্যুতেই শেষ বিশ্রাম লাভের আশায় দিন গণনা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। শেষ বয়সে রচিত একটি কবিতায় এই মেজাজই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ

"চিত্রকলা নয়, ভাস্কর্যও নয় আজ সক্ষম
আমার অস্থির চিত্তের সান্ত্বনায়।
তাকিয়ে আছে সে উর্ধ্বে তাঁর পরম ভালোবাসার প্রতি
যাঁর দু-বাহু আমাদের আলিঙ্গন করতে
ক্রুশে প্রসারিত।"

এ সংকট প্রতি যুগেই অস্থির শিল্পীদের জীবনে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। তখন শিল্পের ভাষা নতুন চিন্তাভাবনার খরস্রোতের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না, শিল্পের ধার যেন নিষ্প্রভ হয়ে যায় এবং মনে হয় এবার কর্মই শিল্পচর্চার একমাত্র প্রতিকল্প হতে পারে। এ চিন্তা থেকে অতীতে এবং বর্তমানেও বহু শিল্পী-সাহিত্যিক কোনো আদর্শের সমর্থনে অস্ত্র ধারণ করেছেন, অথবা তাঁদের শিল্পকর্মকেই ক্যানভাস-কাগজ বা মঞ্চের বেড়া ডিঙিয়ে রাস্তায় এনে হাজির করেছেন, তৈরি হয়েছে 'পোস্টার-ড্রামা', রাস্তার নাটক ব্যারিকেডের লড়াইতে মিশে গেছে, 'অ্যাকশন পেইন্টিং' বা 'হ্যাপনিং' ঘটেছে শহরের পথেঘাটে ছবির গ্যালারিতে।

কিন্তু যখন স্মরণ করি পাঁচশো বছর আগে আজকের বৈজ্ঞানিক দর্শনের আলোক বঞ্চিত, বর্তমান শিল্পজগতের নানা মাধ্যমের বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার অতুল সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত সেই নিঃসঙ্গ শিল্পী কি ভাবে জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছিলেন, এবং সেই লড়াইয়ের মেজাজ রেখাবদ্ধ করে গেছেন তাঁর ফ্রেস্কোতে, প্রস্তরীভূত করে গেছেন তাঁর ভাস্কর্যে—তখন এক-এক সময় মনে হয় আজকের যুগে মাইকেল এঞ্জেলোর উত্তরসূরীরা যে ভাবে সমকালীন সংকটের মোকাবিলা করছেন, তার ভাষা যেন সেই অতীতের শিল্পীর রণহুংকারের দুর্বল প্রতিধ্বনি মাত্র। কিংবা আধুনিক শিল্পকলা জগতের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়তো শৈশবেরই অস্ফুট বাক্যস্ফুরণ।

কালক্রমে তা স্পষ্ট উচ্চারণে পরিণত হয়ে কি মাইকেল এঞ্জেলীয় বিশালতার রূপ নেবে?

নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোএরিখ

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়

রেনেসাঁস যুগে যেসব ব্যক্তিত্ব বিশ্বমানব ('লুওমো উনিভেরসালে') অভিধায় আখ্যাত হতেন তাঁদের পূর্বসূরি পুব্‌লিউস টেরেন্টিউস আফের অনেক অনেককাল আগেই তাঁর 'হেআউতোন্‌টিমোরুমেনোস' (আত্মপীড়ক) নামীয় কমিডিতে স্পষ্টতই ঘোষণা করেন : আমি মানুষ, অতএব মানুষ সম্পর্কিত কোনও বিষয়ই আমার অনাত্মীয় নয় ("হোমো সুম্‌, হুমানি নিল্‌ আ মে আলিএনুম্‌ পুতো")। আলোচ্য নিবন্ধের নায়ক, এক প্রজ্ঞাবান রুশশিল্পী, নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোএরিখের চমকপ্রদ জীবনচর্যা, আবিশ্ব অভিজ্ঞতারাশি, অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি এবং সর্বোপরি তাঁর আপন সৃজনশীলতার স্বাচ্ছন্দ্য ও সংবেদন অন্বেষণে বলা যায়, উপর্যুক্ত মানবতন্ত্রী অভিজ্ঞারই আমৃত্যু সংক্রমণ।

হেল্লাসের সুবিখ্যাত ভাস্কর হৃতভাগ্য ফেইদিআসের শিল্পনৈপুণ্য শুধুমাত্র তাঁর সমকালীন সমগ্র বিশ্বের সংস্কৃতিবান সামাজিকের শ্রদ্ধার্জনেই শান্ত হয় নি, মধ্যযুগেও সমানে ছিল সজীব এবং প্রাণিত। অতঃপর সহস্রাধিক বৎসরের ব্যবধানে এক জনপ্রিয় নায়ক জোত্তো দি বোন্‌দোনে, যিনি জোভান্নি বোক্কাচ্চো ও ফ্রাঙ্কো সাচ্চেত্তির আখ্যানের বিষয় হিসেবে গৌরবিত, এক নূতন যুগের পুরোধাপুরুষ হিসেবে হাজির হলেন, যাঁর শিল্পকর্মে খ্রীষ্টীয় জগতের সুষমা ও সৌন্দর্যের সমুদ্ভাসন ; সর্বোপরি মধ্যযুগের সমাপ্তিপর্বে জোত্তো এমনতর এক সুদৃঢ় সেতুবন্ধন করেন যার ভিত্তিতেই উত্তরকালে রেনেসাঁসের সসাগরা বিস্তার। কার্যকারণসূত্রে পুনর্বার আমরা আর-এক সমাপ্তি-সূচনার সন্ধিক্ষণে উপনীত হই যখন রোএরিখ রণিত করেন এক প্রসন্ন প্রত্যুষের। ফেইদিআস যদি দেবোপম মূর্তির স্রষ্টা হন এবং জোত্তো গূঢ় সত্তার চিত্রকর, তাহলে রোএরিখে স্বভাবতই মূর্ত নিখিল বিশ্বচরাচর। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উপর্যুক্ত ব্যক্তিত্বত্রয়ের সঙ্গে যথাক্রমে আয়্‌সখ্যুলোস, দান্তে আলিগিএরি এবং ইওহান ভোলফ্‌গাঙ ফন গোয়েটের আশ্চর্য সাদৃশ্য স্পষ্টতর।

নিকোলাই কনস্তান্তিনোভিচ রোএরিখের জন্ম সেন্ট পেট্যার্সবুর্গে (১০ অক্টোবর ১৮৭৪) ; পিতা কনস্তান্তিন ফেদরোভিচ রোএরিখের দিক থেকে তিনি

স্কানডিনাভীয় ঐতিহ্যের অধিকারী যাঁর পিতৃপুরুষ রুশসম্রাট প্রথম পেট্যর ('মহান' আখ্যায় যিনি অভিহিত)-এর রাজত্বকালে রুশদেশে বসবাস শুরু করেন ; এবং মাতা মারিআ ভাসিলিএভনা (যাঁর পিতৃকুলের পদবি কালাশ্‌নিকভা)-র পূর্বপুরুষদের সন্ধান মেলে দশম শতকের পস্‌কভের প্রাচীন ইতিহাসে।

শৈশবে শিল্পচর্চার পরিবেশ রোএরিখ আদৌ পান নি। তাঁর সুপ্রতিষ্ঠিত পিতা আইনসংস্কারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ ব্যতীত ক্রীতদাসবৎ কৃষকগোষ্ঠীর মুক্তিসাধনে যত্নবান হন, অর্থনীতি ও জনশিক্ষা সম্পর্কে ঔৎসুক্য সত্ত্বেও শিল্পকলা বিষয়ে তাঁর ধ্যানধারণা ছিল ব্যবসাদারসুলভ। স্বভাবতই শৈশবাবস্থায় কলাবিদ্যার পক্ষে অনুকূল আবহ থেকে জ্যেষ্ঠপুত্রকে একজন স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী দূরে সরিয়ে রাখেন। রাজধানী-থেকে প্রায় পঞ্চান্ন মাইলের মধ্যে অবস্থিত ঈসভ্‌রা, রোএরিখ পরিবারের উদবংশীয় প্রবল বিত্ত ও ভূসম্পত্তির (তিন সহস্রাধিক একর) এক বিবরণী মেলে পরবর্তীকালে শিল্পীর স্মৃতিচারণে।

ন বছর বয়সে রোএরিখ ভর্তি হলেন এক বিখ্যাত বেসরকারী জিমনাসিআয় (ধ্রুপদী ভাষাশিক্ষাসমেত উচ্চ বিদ্যাপীঠ) যেখানে আলেক্সান্দের বেনোইস কনস্তান্তিন সমোভ্‌ প্রমুখ প্রখ্যাত মনীষা ছিলেন তাঁর সতীর্থ যাঁরা উত্তরকালে 'মির্ ইস্‌কুস্‌ৎভা' (শিল্পজগৎ)-এর সঙ্গে সবিশেষ যুক্ত হন। বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ কার্ল ইভানোভিচ সেই কৈশোরেই রোএরিখকে তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বগুণে 'অধ্যাপক' আখ্যায় অভিহিত করেন। উচ্চশ্রেণীতে পাঠকালীন প্রাকৃতিক ইতিহাস সম্পর্কে সন্ধিৎসা তাঁর প্রবলতর হয়। এবং ষোল বছর বয়সে আপন অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কারের বৈচিত্র্য পাঠককে পাইয়ে দেওয়ার তাগিয়ে 'মলোদয়' ও 'ইজ্‌গয়' ছদ্মনামে তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রাকৃতিক বিবরণ, শিকার-অভিযান এবং কবিতা প্রকাশনে তৎপর হন।

বিশ্বপ্রকৃতির এমতো প্রাথমিক প্রভাবেই ফলত রোএরিখের মধ্যে শিল্পচর্চার সংক্রমণ ; যদিচ বলা বাহুল্য, পারিবারিক পরিবেশগত ব্যত্যয় এ বিষয়ে তাঁকে যথাযথ ঔৎসুক্যদান করে নি। অতঃপর অকস্মাৎ রোএরিখ পরিবারের পরম সুহৃৎ, স্বনামখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রকর মিখাইল ও. মিকেশিনের নজরে আসে তরুণ রোএরিখের চিত্রাঙ্কন ; এবং তাঁরই প্ররোচনায় ব্যবহারজীবী পিতা তাঁর পুত্রকে আপন আকাঙ্ক্ষিত ও চর্চিত বিষয়ে গভীর অনুশীলনের সুযোগ দিলেন। ফললাভে ভাবী শিল্পী অচিরেই যাতায়াত শুরু করেন মিকেশিনের চিত্রশালায়

এবং তাঁর কাজ পর্যবেক্ষণের সৌভাগ্যার্জন করলেন (১৮৯১-১৮৯৩)। এবংবিধ প্রক্রিয়াতেই রোএরিখের মিলল শিল্পকলায় প্রথম পাঠ। মিকেশিনের অনুসরণ ব্যতিরেকে এই সময় (১৮৯১) তিনি আই. আই. কুদ্রিনের কাছ থেকেও চিত্রাঙ্কন বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করেন।

কলাবিদ্যা চর্চার সঙ্গে সমানে রোএরিখ নিজেকে নিয়োজিত করলেন পুরাতত্ত্ব অন্বেষণে ; ডিগ্রীলাভের এক বছর আগে তিনি প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ এ. এ. স্পিজিনের সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন খননকার্য সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ লাভের আকাঙ্ক্ষায়। স্পিজিনের সহযোগিতায় এ বিষয়ে বিস্তৃত অধ্যয়নের সুযোগলাভ ব্যতিরিক্ত ছাত্রাবস্থাতেই তিনি পুরাতত্ত্ব সমিতির সদস্যপদে মনোনীত হন। ডিগ্রীলাভের (১৮৯৩) অব্যবহিত পরেই রোএরিখের জীবনে কিঞ্চিৎ সমস্যা দেখা দিল। তাঁর একান্ত ইচ্ছা চারুবিদ্যার চতুস্পাঠী বা আকাদেমীতে যোগদানের ; পক্ষান্তরে পিতার প্রবল বাসনা তাঁর পুত্রকে আইনশাস্ত্র অধ্যয়নে সেণ্ট পেট্যার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণের। শেষাবধি উভয় বিষয়েই পারঙ্গম হওয়ায় প্রতিশ্রুত হলেন রোএরিখ ; অতএব গ্রীষ্মকালে কুদ্রিনের নির্দেশে চিত্রবিদ্যাচর্চা এবং শরৎ ঋতুতে আকাদেমী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রতালিকায় তিনি নিজেকে যুক্ত করলেন।

প্রাচীন চিত্রকলায় যেসব যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনাবিন্যাস বিধৃত, শিল্পী-আইনজ্ঞ সমাজবিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে উপর্যুক্তের বিচার-বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য তাঁর গবেষণাপত্র 'প্রাচীন রুশের চিত্রকর'। স্পিজিন ব্যতীত বিখ্যাত শিল্প ও সঙ্গীত সমালোচক ভি. ভি. স্তাসভের প্রভাবও রোএরিখে বর্তায় ; তাছাড়া আরহিপ আই. কুইন্দির কথা তো বলাই বাহুল্য। ছাত্রদের প্রদর্শনীতে (১৮৯৭) রোএরিখ 'বিজান্তিউম্', 'বার্তাবহ' প্রভৃতি কতিপয় চিত্রাবলী পেশ করেন। শেষোক্ত চিত্রটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সের্গে এর্নস্ত মন্তব্য করেছেন (১৯১৮): "..the fresh and sincere sense of the past which made such a powerful impression on the public and which for long years to come inspired the work of the artist" (Quoted in Nina Selivanova's *The World of Roerich*, New York, 1923, p. 22)। অতঃপর তরুণ শিল্পীর জনমানসে জেগে ওঠার সিদ্ধিতে সমানে লক্ষিত হয় অতীত অন্বেষণ (১৮৯৭-১৮৯৯)। শিল্প ও প্রাচীন নিদর্শন সম্বন্ধীয় তাঁর রচনাবলী পুরাতত্ত্ব সমিতির সরকারী পত্রসমেত 'সেণ্ট

পেত্যর্সবুর্গ ভেদোমস্তি' (সেণ্ট পেট্যর্সবুর্গ গেজেট), 'নোভ্য ভ্রেমিআ' (নবযুগ) প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকল। সর্বোপরি পুরাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা ব্যতীত পস্কভ ও নভ্গরদ প্রদেশের খননকার্যেও রোএরিখ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে তিনি 'মির্ ইস্কুৎস্ভা' এবং চারুকলায় উৎসাহদায়ক সমিতির সঙ্গে সবিশেষ যুক্ত হন।

উনিশ শতকের শেষ বসন্তে রোএরিখ গেলেন সংস্কৃতির পীঠস্থান পারিতে। প্রখ্যাত ফরাসী চিত্রকর ফের্নান্দঁ কর্মোঁর সৌহৃদ্য ও সাহচর্য তাঁকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা যোগায়। আর পুভি দ্য শাভানের স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয়তা এবং মহানুভবতা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে রোএরিখ তাঁর *Fiery Stronghold* (১৯৩৩) গ্রন্থে নির্দ্বিধায় লিখেছেন: "Puvis de Chavannes, who was full of benevolent and inexhaustible creativeness always inspired one with profound wisdom towards the self-expression of labour and the joy of the heart।" ফ্রাঁসের রাজধানীতে থাকাকালীন তরুণ রোএরিখ শিল্পচর্চার সঙ্গে সমানে নিরত ছিলেন ইতিহাস ও জাতিবিদ্যা অনুশীলনে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধ্রুপদী সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল গভীর; পুব্লিউস্ ওএর্গিলিউস্ মারো এবং পুব্লিউস্ ওভিদিউস্ নাসো তাঁর প্রিয়তম কবি।

পরের বছর গ্রীষ্মে পারি থেকে রোএরিখ স্বদেশে ফেরেন এবং অচিরেই চারুকলায় উৎসাহদায়ক সমিতির সচিবপদে মনোনীত হন। সমিতির এই নূতন দায়িত্বভার এবং স্থপতি শাপোনিকভের কন্যা য়েলেনা ইভানোভ্নার সঙ্গে বিবাহ তাঁর কর্মপ্রয়াসের অন্তরায় আদৌ হয় নি। নবতর চিত্রপ্রকল্প এবং নভ্গরদ্ প্রদেশে প্রসিদ্ধ খননকার্য এমতো সিদ্ধান্তের প্রামাণিক। অতঃপর রুশের প্রাচীন স্থাপত্যসম্পদের সন্ধানে তিনি য়ারোস্লাভ, কস্ত্রমা, নিঝ্নি-নভ্গরদ্, ভ্লাদিমির, য়ুরিএভ্-পলস্কি, গ্রদ্নো, কভ্নো, পস্কভ্ প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত পর্যটন এবং পরিশীলনে যত্নবান হলেন (১৯০৩-১৯০৪)।

বত্রিশ বছর বয়সে এই বিশ্বপথিক পুনর্বার শুরু করলেন বিদেশযাত্রা। পারিতে ইল্যার্ ঝ্যার্ম্যাঁ এদ্গার দেগা, ফিন্সেণ্ট ভিল্এম ফান্ গগ্ এবং বিশেষত পোল্ গোগ্যাঁর শিল্পকর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তিনি ইতালিআ পরিক্রমণে মগ্ন হলেন। মিলান, জেনোআ, পাভিআ, পিসা, সান জেমিনিআনো, সিএন্না, রোমা, রাভেন্না, বোলোঞা, পাদুআ প্রভৃতি স্থান পর্যায়ক্রমে যেন

বিস্ময়কর চিত্রাবলীরূপে মূর্ত হয় শিল্পীমানসে। সিএন্না স্কুলের মর্মস্পর্শী, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবোচ্ছ্বাস, বেনোৎসো গোজোলির সুশোভন সৌন্দর্য এবং বস্তুত জোত্তোর চিত্রকর্মে রোএরিখ প্রাণিত হন। এবংবিধ প্রক্রিয়ায় শিল্পীর বিশ্ববীক্ষা স্বভাবতই নূতনতর আকার পায়। এবং এই বছরেই (১৯০৬) তাঁর মিলল এক দুর্লভ সুযোগ—চারুকলায় উৎসাহদায়ক সমিতির বিদ্যাপীঠের তিনি অধিকর্তা নিযুক্ত হলেন। বলা বাহুল্য, এমতো অবৈতনিক বিশাল বিদ্যায়তন যাতে ছেষট্টিজন শিক্ষকসমেত দুই সহস্রাধিক ছাত্রের উপস্থিতি প্রত্যক্ষতর, সমগ্র রুশদেশে বিরল। উচ্চমানের শিক্ষাপদ্ধতি ব্যতীত বিদ্যাপীঠের সংস্কারকর্মেও তিনি উদ্যোগী হন।

অতঃপর রোএরিখের শিল্পচর্চার প্রেক্ষিতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষিত হয় (১৯০৭-১৯১৪); নাট্যশালা তাঁকে আকৃষ্ট করল তীব্রভাবে। শুরুতেই তিনি এমনতর এক শিল্পকর্ম রঙ্গালয়ে অযাচিতভাবে উপহার দিলেন-যার নৈকট্য মেলে ভিল্‌হেল্‌ম্‌ রিখার্ট ভাগ্‌নরের সঙ্গীতের মর্মস্পর্শী শিহরণে। এবং এই একই বছরে (১৯০৭) 'প্রাচ্যের প্রজ্ঞাবান মনুষ্যত্রয়' নামীয় দ্বাদশ শতকের এক রহস্যময় নাটকের দৃশ্যপট ও পোশাক পরিকল্পনায় তিনি প্রবল প্রতিপত্তির অধিকারী হন। অনন্তর আলেক্সান্দ্যর পর্‌ফ্‌য়িরিভিচ্‌ বরোদিনের বিখ্যাত 'রাজকুমার ইগ্‌র্‌' অপেরার মঞ্চসজ্জায় তিনি এক কাব্যিক সুষমা সঞ্চারিত করেন (১৯০৯)। রোএরিখের পরবর্তী প্রয়াস ইগ্‌র্‌ ফেদ্‌রোভিচ স্ত্রাভিনস্কির 'ল্য সাক্রে প্রাঁত্যাঁ' (নিষ্পাপ বসন্ত) শীর্ষক প্রাচীন স্লাভনীয় বালেটির জন্যে শুধুমাত্র সাজসজ্জাই নয়, লিব্রেত্তো বা বাচনাংশ রচনাতেও সক্রিয় ভূমিকাগ্রহণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উক্ত বালেটি রোএরিখকেই উৎসর্গিত এবং সর্বপ্রথম পারিতে মঞ্চস্থ হয় (মে ১৯১৩)। এস্‌পানীয় নাট্যকার লোপে ফেলিত্‌ দে বেগা কারপিওর 'ফুএনতে ওভেখুনা' (কৃষকবিদ্রোহ)-র সজ্জাতেও রোএরিখের নৈপুণ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য সুস্পষ্ট। এবং উল্লেখ্য, হেনরিক ইওহান ইবসেনের 'পের্‌ য়িন্‌ট্‌' নামীয় নাটকের দৃশ্যাবলী ও পোশাক-পরিচ্ছেদের পরিকল্পনায় রোএরিখের ঐতিহাসিক চেতনা ও শিল্পজ্ঞানের মুন্সিয়ানা প্রত্যক্ষতর। রোএরিখের আপন অভিমত অনুযায়ী অবশ্য তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান মোরিস মেত্যেরলিঙ্কের ট্রাজিডি 'লা প্রাঁ্যাসেস মালেন' (রাজকুমারী মালেন)-এর মঞ্চসজ্জা।

রোএরিখ-রজতজয়ন্তী (ডিসেম্বর ১৯১৫) নানাকারণে উল্লেখ্য। এই বর্ণাঢ্য

অনুষ্ঠান প্রথাসিদ্ধ উপাধিপ্রদানেই শান্ত হয় নি ; বস্তুত শিল্প ও সাহিত্যসমাজ প্রকাশ্যে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি দিলেন। রোএরিখের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও শিল্পবিদ্যাপীঠের ছাত্র ও বিভিন্ন চারুকলা সমিতির শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করা হয়। পরের বছরের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হল এক সংবর্ধনাগ্রন্থ যাতে রোএরিখের অনেক মূল্যবান রচনাসহ তাঁর শিল্পকলা সম্পর্কিত আলোচনা এবং সেগেই এর্নস্তের জীবনী অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর মাক্সিম গোর্কির উদ্যোগে সমগ্র শিল্পীসমাজ চিত্রকলার সমস্যা সম্পর্কিত এক ঘরোয়া আলোচনায় মিলিত হল (৪ মার্চ ১৯১৭) ; রোএরিখ ছিলেন সভাপতি। শিল্পকলা বিষয়ক পরিষৎ নামীয় এক কমিটি গঠিত হল। রোএরিখ উক্ত পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অন্তত ১৯শে মে ১৯১৭ অবধি। অনন্তর সপরিবারে তিনি ফিনল্যাণ্ডে যান। এবং এখানে থাকাকালীনই তিনি সুইডেন হয়ে পুনর্বার ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার মনস্থ করলেন।

লাণ্ডনের গুপ্ল্ গ্যালারিতে রোএরিখের শিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল (মে ১৯২০), যা The Spells of Russia' আখ্যায় অভিহিত। ভারতীয় রেণেসাঁসের সেরা ফসল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময় ইংল্যাণ্ডপ্রবাসী। অক্সফর্ড থেকে তাঁর লাণ্ডনে আসার পরই, অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় এই দুই মনীষার সাক্ষাৎকার ঘটে। সুনীতিকুমারের সাক্ষ্যে জ্ঞাতব্য : "রোেরিখ নিজে একদিন আমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে দেখ্‌তে এলেন—ছেলেরাও তাঁর সঙ্গে এল ; আমি কবিকে আগেই এঁর কথা ব'লে রেখেছিলাম। ইনি কবিকে নিজের আঁকা একখানি ছবি উপহার দিলেন, কবির একটী কবিতার রুষ ভাষায় অনুবাদ ("ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে……" এই কবিতাটি) প'ড়ে শুনিয়ে', ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"এখন আপনার নিজের লেখা বুঝতে পারলেন ?" দুজনের খুবই হৃদ্যতা জ'মে উঠ্‌ল। কবিও একদিন নিমন্ত্রিত হ'য়ে র‍্যোরিখের বাসায় গেলেন, র‍্যোরিখ-গৃহিনী খুব শ্রদ্ধা আর সম্মান-বোধের সঙ্গে কবিকে স্বাগত কর্‌লেন" (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথ,' 'শনিবারের চিঠি,' আশ্বিন ১৩৪৮, পৃঃ ৮০৩)। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছেন, "ইঁহাদের কৌলিক সরলতা ও স্বাভাবিক ব্যবহার-নীতি খুবই চিত্তাকর্ষক" (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশিকা', [তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৭] গ্রন্থে উদ্ধৃত)। রোএরিখ এক পত্রে (২৪ জুন ১৯২০) রবীন্দ্রনাথকে স্পষ্টতই

জানান : "Let my words remind you of Russia where th lovely poetical images which you evoke, bring beauty anc solace to human life and your personality is surrounded by a halo of admiring respect : You bring into contemporary life that lofty spiritual joy, which gives strength to the seekers of a radiant future. Please accept the heartfelt greetings o a Russian artist' (তদেব, পৃঃ ৪৮)। আর এই রুশশিল্পীকে তাঁর চিত্রাবলীর তারিখ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন (৮ অক্টোবর ১৯২০) "When I tried to find words to describe to myself what were the ideas your pictures suggested, I failed......When a picture is great, we should not be able to say what it is, yet we should see it and know......Your pictures are distinct and yet are not definable by words, your art is jealous of its independence because it is great." (তদেব, পৃঃ ৪৮)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সময় *The Modern Review* (December 1920, pp 571-573) রোএরিখের জীবন ও কর্মের পরিচয় সম্পর্কিত কিছু উদ্ধৃতিসহ রুশ থেকে পাঁচটি কবিতার উইলিয়ম উইলস্ট্যানলি পিয়ার্সনকৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন।

ইতিমধ্যে প্রাচ্যের চিত্রকলা সম্পর্কে সন্ধিৎসায় রোএরিখ ইংল্যাণ্ড থেকে সরাসরি ভারত ভ্রমণে আগ্রহান্বিত হন। যদিচ আকস্মিক এক দুর্বিপাকে শেষাবধি তাঁর পরিকল্পনা বিপর্যস্ত হয়। অতঃপর সপরিবারে তিনি নিউ ইঅর্ক যাত্রা করলেন (২৩ সেপ্টেম্বর ১৯২০)। রোএরিখের আমেরিকা অভিযান হয়েছিল খুব ফলপ্রদ। বিভিন্ন শহরে পর্যায়ক্রমে চিত্রপ্রদর্শনীর সাফল্য তাঁকে আর্থিক অনিশ্চয়তার হাত থেকে বাঁচায়। 'ক্যারোন্যা ম্যাণ্ডি' নাম্নীয় এক আন্তর্জাতিক শিল্পকেন্দ্রে গড়ে ওঠে তাঁর একক চিত্রশালা (১১ই জুলাই ১৯২২)। পরের বছর মে মাসে রোএরিখ পাড়ি জমান পুনর্বার পারিতে। ইতিমধ্যে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী পারি, (১৯০৭, ১৯০৮, ১৯০৯), লাণ্ডন (১৯০৯, ১৯১২), ব্রুসেল্ (১৯১০), রোমা (১৯১৪) প্রভৃতি বিভিন্ন শহর ব্যতিরিক্ত খোদ রুশদেশেও (১৯০৯, ১৯১০, ১৯১১, ১৯১৩, ১৯১৪, ১৯১৬) শ্রদ্ধার্জনে সমর্থ হয়। পারির লুক্সঁবুর্ চিত্রশালা ও সুবিখ্যাত লুভ্‌র্, রোমার জাতীয় চিত্রশালা এবং রুশদেশের সমস্ত চিত্রশালাই রোএরিখের

চিত্রকলা ক্রয় করেন। আর অসংখ্য অত্যুজ্জ্বল সম্মানের সমানে অধিকারী হলেন তিনি। পেত্রোগ্রাদের সরকারী চিত্রকলা পরিষৎ, স্থাপত্যবিদ্যা ও রুশীয় প্রত্নবিদ্যা সমিতির সদস্য, মহিলা স্থাপত্যবিদ্যা পরিষদের সভাপতি, সরকারী প্রত্নতাত্ত্বিক বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ; চারুকলায় উৎসাহদায়ক সমিতির রুশীয় চিত্রশালার সভাপতি ; পারির প্রাগৈতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সমিতির সদস্য ; লাণ্ডনের ইঙ্গ-রুশীয় সাহিত্য সমাজের সদস্য ; নিউ ইঅর্কের সম্মিলিত চিত্রকলার প্রধান প্রতিষ্ঠানের সভাপতি প্রভৃতি পদমর্যাদা এক দীর্ঘ তালিকার অংশমাত্র। রোএরিখের শিল্পকলা সম্পর্কে অনেকানেক নিবন্ধ প্রকাশিত হল। তিনি আখ্যাত হলেন 'the Maeterlinck of painting' এবং 'the poet of the North' অভিধায়। ইতালিআয় তিনি বিজান্তীয় চিত্রকর এবং ফ্রাঁসে গুস্তাভ্ মোরো ও গোগ্যাঁর সঙ্গে উপমিত।

পারিতে কয়েক মাস থাকার পর এই বিশ্বনাগরিক যাত্রা করলেন ভারতবর্ষের দিকে (১৭ নভেম্বর ১৯২৩)। অতঃপর পাঁচ বছর দার্জিলিংবাসের পর রোএরিখ হিমাচল প্রদেশের কুলু উপত্যকায় নগ্যাড়ে বসবাস শুরু করেন। য়ুরোপ-আমেরিকার আমন্ত্রণ সত্ত্বেও হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের আকর্ষণে আমরণ (১২ ডিসেম্বর ১৯৪৭) তিনি এদেশে কাটিয়েছেন। অবশ্য এই আগমনের অনেককাল আগেই তাঁর শিল্পকর্মে ভারতীয় বিষয়বস্তু মূর্ত ; 'লক্ষ্মী', 'শ্রীকৃষ্ণ,' 'দময়ন্তী,' 'ভারতের সন্তান,' 'ভারতের পথে' প্রভৃতি তাঁর চিত্রাবলী এমতো সিদ্ধান্তের প্রামাণিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইতালিআ পরিক্রমাকালীন (১৯০৬) রোএরিখ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন প্রতীচীর শিল্প-সংস্কৃতিতে প্রাচ্যের প্রভাব ; পরবর্তীকালে প্রভাব ও প্রসক্তির পারম্পর্যে ভারতবর্ষ হয়ে উঠল তাঁর "land of heart's desire"। *Altai-Himalaya* (১৯৩০) গ্রন্থে রোএরিখ ভারত সম্পর্কে তাঁর ধ্যানধারণা লিপিবদ্ধ করেছেন। কার্যত নগ্যাড়ে উরুস্বতি হিমালয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার (১২ জুলাই ১৯২৮) পর ভারতবর্ষের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক প্রতিবেদন (১৯২৯-১৯৩০) পাঠে জ্ঞাতব্য : "The Institute is an immediate outcome of the Roerich Central Asiatic Expedition, which toured under the leadership of Professor N. de Roerich the countries of the Middle East. The founders of the Institute realized the urgent necessity of building up a

permanent institution for the scientific study of this most interesting region of Asia...... Under the term "Middle East" We understand India and the whole of that desert and mountainous part of Asia stretching from the plateau of Iran in the West to the borders of China proper in the East, and including Chinese Russian Turkestan, Mongolia and Tibet' (*Journal of Urusvati*, Vol. 1, No. 1, MCMXXXI, p. 67) ।

অতঃপর অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (ও. সি. গাঙ্গুলী নামেই যিনি সমধিক পরিচিত) সম্পাদিত প্রাচ্য এবং প্রধানত ভারতীয় শিল্পকলার সুবিখ্যাত সচিত্র ত্রৈমাসিক পত্রিকায় রোএরিখের 'Tibetan Art' (*Rupam*, January, 1929, pp. 20-24) শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশন সবিশেষ উল্লেখ্য। এই বহুমূল্য গবেষণাপত্র প্রকাশনার মাধ্যমেই বলা যায়, বাঙালী তথা ভারতীয় চিত্রকলার বিত্তাবান বিবেচক ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়। অর্দ্ধেন্দ্রকুমার ব্যতীত অসিতকুমার হালদার, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, বীরেশ্বর সেন, কে. এস. রামস্বামী শাস্ত্রী প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা পরবর্তীকালে রোএরিখের শিল্পকর্মের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হন। উপর্যুক্ত পত্রিকায় রোএরিখের তিব্বতী শিল্পকলা সম্পর্কিত রচনাটি প্রকাশনাকালে সম্পাদকীয় মন্তব্যর শেষাংশ প্রণিধানযোগ্য : "Having emerged so recently from the heart of Asia, Roerich's voice my be considered as the most authoritative upon the present conditions of Tibet" (*Ibid*, p. 20) ।

The Heart of Asia (১৯৩০) রোএরিখের দুঃসাহসিক এশিয়া অভিযানের এক ঐতিহাসিক দলিল। নিউ ইঅর্কের রোএরিখ চিত্রশালায় এঁর এ সম্পর্কিত সহস্রাধিক চিত্রাবলী বর্তমান। রোএরিখ পরিবারে 'ভগবদ্গীতা' ও 'গীতাঞ্জলি' ছিল সর্বদাই সমাদৃত ; দুঃসাধ্য অভিযানের সতত সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন এই রুশশিল্পীর ভাষায় "noble images of India"। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত চমকপ্রদ *The Golden Book of Tagore* (১৯৩১)-এর জন্যে রোএরিখ 'Strongholds of Culture' নামীয় এক নিবন্ধ পাঠান যার শুরুতে তিনি স্পষ্টতই লেখেন : "When we think of invincible energy, blessed enthusiasm, pure Culture, before me always rises the so dear to me image

of Rabindranath Tagore. Great must be the potentiality of his spirit which prompts him to apply untiringly in life the foundations of true Culture." (*Ibid.*, p. 213)।

হিমালয়ের সৌম্য সৌন্দর্যের রোএরিখ ছিলেন উপাসক। অর্দ্ধেন্দ্রকুমারের ভাষায়ঃ "তাঁর মত হিমালয়ের দৃশ্য আর কোনও শিল্পী অঙ্কন করতে পারেন নি। হিমালয়ের রূপমাহাত্ম্য-বর্ণনে রোরিক কবি কালিদাসের যেন প্রতিদ্বন্দ্বী" (অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা', ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩২১)। রোএরিখের শিল্পকর্ম অনুশীলনে কচিৎকোনও কলাবিদ্যাবিৎ ভাবিত হবেন যে এই রুশশিল্পী বঙ্গীয় তথা ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে সমানে ছিলেন উৎসুক ও উৎফুল্ল। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কিত সপ্রশংস অভিনন্দনপত্রে রোএরিখের ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে সানুরাগ শ্রদ্ধা স্পষ্টতরঃ "The life of an artist is not easy one. But because of this very eternal struggle this life is a beautiful one. For eighteen years I am connected with India and long before I already felt the virility and essential strength of its growing self-expression. And now observing the glorious development of Indian Art, so manifold, I see how true was my first impression." (*The Visva-Bharati Quarterly*, Abanindra Number, May-October 1942, pp 4-5)।

ভারতের বিভিন্ন চিত্রশালাসমেত বিশ্বের প্রায় সমগ্র শ্রেষ্ঠ চিত্রশালায় রোএরিখের চিত্রাবলী সুশোভিত। শিল্পচর্চার সঙ্গে সমানে তিনি নিরত ছিলেন গ্রন্থরচনায়; *Adamant* (১৯২৪), *Flame in Chalice* (১৯৩০), *Shambhala* (১৯৩০), *Realm of Light* (১৯৩১), *Fiery Stronghold* (১৯৩৩) প্রভৃতি রচনাবলীতে বহুধাবিচিত্র বিষয়ে তাঁর সন্ধিৎসার সাক্ষ্য সুস্পষ্ট। *Shambhala*-য় প্রাচ্যের মানবজীবন সম্পর্কিত আয়াসসাধ্য অভিজ্ঞতা বিধৃত; তাঁর মতে প্রাচ্য-প্রতীচীর সমন্বয়ও সম্ভবপর। রোএরিখের শিল্পসাধনায় বিশ্বের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক তাঁর আপন শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো অনিবার্য। আর তাই গোর্কীর ভাষায় তাঁকে "One of the greatest intuitive minds of the age" আখ্যা দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

বিষ্ণু দেঃ পটভূমি

অরুণ সেন

মুখবন্ধ

ক্ষমাপ্রার্থনাপূর্বক সামান্য ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অবতারণা করে এই মুখবন্ধটুকু লিখতে চাই। তবে ভরসা এখানেই যে আপাতভাবে ব্যক্তিগত মনে হলেও এটা বাঙলাদেশের সেই মানুষেরই মনে কথা, যাদের স্মৃতিতে পরাধীন ভারতবর্ষের অনেক কাহিনী, বালককালীন অভিজ্ঞতায় দাঙ্গা ও স্বাধীনতালাভ, যুবক-অভিজ্ঞতায় স্বাধীন দেশের প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষা এবং পরিণত যৌবনের অভিজ্ঞতায় ব্যর্থতা ও নৈরাশ্য আঁকা হয়ে আছে। সেই মানুষদেরই একজন হয়ে বর্তমান লেখক বারবার ইচ্ছে পোষণ করেছে তার সময়ের অভিজ্ঞতার হৃদস্পন্দন যাঁর কবিতায় সে শুনতে পেয়েছে, তাঁর কথা, তাঁর কবিতার কথা, অর্থাৎ তার নিজেরই অভিজ্ঞতার কথা সে লিখবে।

কীভাবে লিখবে, কী ভাষায় লিখবে; কী মাপে লিখবে—এই রকম নানা দুর্ভাবনা লেখককে বিড়ম্বিত করছে অতীতে। এ প্রশ্নের উত্তর বোধহয় তার আজও স্পষ্ট করে জানা নেই। ধরা যাক, বর্তমান আলোচনার অন্যতম ভিত্তি যদি হয় এই স্বীকৃতিই যে, বিষ্ণু দে আধুনিক বাঙলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। লেখাটি কি তবে হবে এই স্বীকৃতিতে যাঁরা ঐক্যমত, তাঁদের ভিতরকার সংলাপ? নাকি এই মতের বিপরীত মেরুতে যাঁদের অবস্থান কিংবা যাঁরা বিষ্ণু দে-কে ভালো কবি, বড় কবি ইত্যাদি মনে করেও শ্রেষ্ঠত্বের গুরুত্ব দিতে নারাজ, তাঁদের রাজি করানোই হবে এর লক্ষ্য? কিংবা এর উদ্দেশ্য হবে আরো নিরীহ—যাঁদের এ-বিষয়ে এখনো কোনো মতামত বা সংস্কার তৈরি হয় নি, বাঙলা কবিতার সেই জিজ্ঞাসু পাঠকদের প্রাথমিক কিছু তথ্য সরবরাহ করা মাত্র? বলা বাহুল্য, প্রয়োজন বা তাগিদ নিশ্চয়ই কোনোটারই কম নয়। কিন্তু লেখাতে যদি এগুলো মিলে মিশে যায়, তবে তা কাউকেই খুশি না করতে পারে।

সুতরাং এই প্রশ্নটিই সবচেয়ে জরুরি : এই নিবন্ধ কাদের উদ্দেশ্যে এবং কিসের উদ্দেশ্যে রচিত ? অবশ্য প্রশ্নটি যত সহজ, উত্তর দেওয়া তত সহজ নয়। যিনি মনে করেন না, বিষ্ণু দে আধুনিক বাঙলা কবিতার একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, তাঁকে স্বমতে আনা কি খুব সহজ ? এটা কি শুধুমাত্র কাব্যালোচনার বা এমন কি শুধুমাত্র আলোচনার ব্যাপার ? বিষ্ণু দে-র ভক্ত পাঠকমাত্রই জানেন, ক্রমশই অনুভব করেন, তাঁর কবিতার সঙ্গে একাত্ম হওয়াটা শুধুমাত্র কবিতার ব্যাপার নয়, কবিতা তো বটেই, তার সঙ্গে কবিতাতিরিক্ত অনেক চিন্তা, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গি, অভীপ্সা ইত্যাদির ব্যাপারও। তাই তাঁদের কাছে বিচ্ছিন্নভাবে একটি বা দুটি কবিতা পছন্দ করা নয়, কবির সমগ্রতাই বিবেচ্য। তাই তাঁদের রসগ্রহণও চলে এই পথে, শ্রেষ্ঠত্বের বিচারও এই পথে।

কিন্তু যিনি এভাবে তাঁর কবিতায় সাড়া দেন না, এমনকি শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে ঐ সমগ্রতার বিবেচনা যাঁর কাছে দরকারি মনে হয় না, কিংবা যিনি বিষ্ণু দে-র কবিতার পেছনের ঐ অভিজ্ঞতাসমূহকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে চেনেন নি নিজের রক্তে, তাঁর কাছে কি স্পষ্ট হবে কবিতাগুলির অখণ্ড মহিমা ? অবশ্য পাঠকের চিত্তের চারপাশে শক্ত খোলশ জমে না থাকলে, কবিতার ভাষার আশ্চর্য যাদুই এনে দিতে পারে অজ্ঞাত অভিজ্ঞতার স্বাদ এবং এমনকি সহানুভূতির রাজপথ—কিন্তু সেখানেও শত অমিলের মধ্যেও একটা মিল থাকেই, অপরিচয়ের মধ্যেও পরিচয়ের আভাস।

শেষ পর্যন্ত তাই এই লেখার উদ্দেশ্য এটুকুই : বিষ্ণু দে-র কাব্যস্বভাবের মধ্যে স্বদেশ ও স্বকাল যেভাবে বিধৃত, তাকে উন্মোচিত করা—বিষ্ণু দে-র জগতকে গড়ে তুলেছে যে ঘটনা বা তথ্য, তাকে পারম্পর্যের সূত্রে মনে রাখা। এক কথায় তাঁর কাব্যের পটভূমির ইতিহাসানুক্রমিক আলোচনা। এই মাত্র। বলা বাহুল্য যে লেখক মনে করে, বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি যুগ ও সময়ের এই প্রতিনিধিত্বের মধ্যেই নিহিত, মনে করে তাঁর কাব্যের আনুপূর্বিক ইতিহাসেই ধরা পড়েছে আমাদের দেশের ও কালের যুগসত্য, তার ঐ পটভূমির ঐতিহাসিক আলোচনাতে কাব্যবিচারও স্বভাবতই অন্তর্ভুক্ত না হয়ে পারে না। উল্টো করে বলা যায়, বিষ্ণু দে-র কবিতা,

কাব্যরসের চরম সিদ্ধি সত্ত্বেও, তো শুধু কবিতারই ব্যাপার নয়, শুধু শব্দছন্দের চাতুর্য নয়, কারো কারো কাছে তা একটা স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ জগৎ—এবং ঠিক সেই অর্থেই বর্তমান প্রচেষ্টাটি নিছক কাব্য-সমালোচনা নয়, তার অতিরিক্ত, একটা যুগের ইতিহাসের আলোচনা, কেন তিনি তাঁর ভক্ত পাঠকদের কাছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের এক কবি, নিছক ভালো কবি মাত্র নয়, কবির অধিক, তার দলিল।

ইতিহাস আলোচনার রীতি হচ্ছে, একেবারে গোড়া থেকে শুরু করা। যথেচ্ছাচারের শৌখিনতা বা অভিনবত্বকে বাদ দিয়ে ইতিহাসের বর্ণনা বড় বেশি ক্লান্তিকর অ্যাকাডেমিক বলে ধিক্কৃতও হতে পারে। অ্যাকাডেমিক ধরনের লেখা যাকে বলা হয়, সেই ধরনের প্রতি লেখকেরও বিরাগ স্পষ্ট। কিন্তু অনেক কাটাকুটির পর এরকমই তার মনে হয়েছে, বিষ্ণু দে-র কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতা বা অজ্ঞতা বা আপত্তি দূর করতে হলে, ঐ রীতিমাফিকই এগোনো উচিত। এমনকি 'গবেষণাগ্রন্থ'র সব 'দোষ'ই সে গ্রাহ্য করে নেবে, ভয়াবহভাবে দীর্ঘ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পাদটীকা শুদ্ধ। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে প্রথমেই আসা উচিত বিষ্ণু দে-র কবিতার পটভূমির বর্ণনা—বাঙলা কাব্যের জগতে তাঁর আবির্ভাবের পটভূমি। এর জন্য যদি লেখাটি অংশত কবির জীবনী রচনার চেষ্টা বলে ভুল হয়, তবে লেখক নিরুপায়।

১৯০৯ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত বিষ্ণু দে-র গড়ে ওঠার সময়। ১৯৩৫ কেন? একটা সাল তো ধরতেই হবে, তাই। অবশ্য মনোযোগী পাঠকমাত্রই জানেন, ঐ সালেই তাঁর 'ঘোড়সওয়ার' কবিতাটি সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং তার এক বছর বাদেই 'জন্মাষ্টমী'। একজন কবি তৈরি হচ্ছেন, তাঁর ব্যক্তিগত সমাজ-রাজনীতিগত বা সাহিত্যগত নানা ঘটনা ও প্রভাবের মধ্য দিয়ে, সেই পটভূমির বর্ণনা দিয়েই লেখক তাই শুরু করতে চায়। তারপরই তো আসতে পারে কবির দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন কাব্যরচনার ইতিহাস। এই সর্বজনমান্য রীতিকে অবলম্বন করেই তাই লেখা শুরু হচ্ছে, যদিও তথ্যের অপ্রতুলতা তার সামনে বিরাট বাধা এবং মুদ্রিত সাক্ষ্য ছাড়া সে আপাতত প্রায় কিছুই অবলম্বন করতে চায় না।

পটভূমি : ব্যক্তিগত

১৯০৯—১৯৩৫

বিষ্ণু দে জন্মেছিলেন কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলের দে-বিশ্বাস পরিবারে। শ্যামাচরণ দে বিষ্ণু দে-র 'বট্-ঠাকুর্দা'। শ্যামাচরণ দে-র বাবা, অর্থাৎ বিষ্ণু দে-র প্রপিতামহ আসেন হাওড়ার পাতিহাল থেকে। প্রপিতামহ সংস্কৃত কলেজের উল্টো দিকে, বর্তমান শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটস্থ বাড়িরই আশেপাশে কোথায়ও প্রথম বাড়ি করেছিলেন। তিনি ছিলেন কোম্পানির মুৎসুদ্দি, মারা যান অল্প বয়সেই—দুই পুত্র নিয়ে অথৈ জলে পড়েন বিধবা পত্নী। ডেভিড হেয়ার এই দরিদ্র বালক দুটিকে ভর্তি করালেন নিজের স্কুলে এবং সেখান থেকে হিন্দু কলেজে। দুজনের মধ্যে শ্যামাচরণ দে জ্যেষ্ঠ এবং বিমলাচরণ দে কনিষ্ঠ। দুজনের ছিল অসম্ভব সদ্ভাব। দুজনেই হিন্দু কলেজের ছাত্র। দুজনেরই বিখ্যাত-সমসাময়িক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।[১] দু-ভায়ের মধ্যে অমিলও প্রচুর। শ্যামাচরণ দে শ্যামলা, রাশভারি, বলশালী স্বাস্থ্যবান, একটু রক্ষণশীল, আচারব্যবহারে সাত্ত্বিক। বিমলাচরণ ফরশা, মেজাজী, উদার, বরং বলা যায় কিঞ্চিৎ কালাপাহাড়ী, অর্থাৎ হিন্দু কলেজের যথার্থ ছাত্র, মদ বা নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণে উৎসাহী। শ্যামাচরণ দে ছিলেন চাকুরীজীবী, কিন্তু বিমলাচরণ কোম্পানির বেনিয়ান, জাহাজের মালের দায়িত্ব নিতেন আইনমাফিক, অর্থের বিনিময়ে। জাহাজডুবি হওয়ায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন বিমলাচরণ—কিন্তু সকলের পরামর্শ সত্ত্বেও তিনি নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করেন নি। ভগ্ন মনোরথ হয়ে তিনি অল্প বয়সেই মারা যান। শ্যামাচরণ দে ভাইয়ের ঋণ মাথায় তুলে নেন। কঠোর হিসেবের মধ্যে চলে তিল তিল সঞ্চয় করে তিনি ঐ ধার শোধ দেন, অবসর গ্রহণের ঠিক আগের দিন।[২] শ্যামাচরণ ও বিমলাচরণের পুত্রকন্যাদের নিয়ে যৌথ পরিবারটি ছিল বৃহৎ। এই বিমলাচরণেরই কনিষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র দে, বিষ্ণু দে-র পিতা। বিমলাচরণের যখন মৃত্যু হয়, অবিনাশচন্দ্রের তখন বয়স মাত্র ১০ বছর। অবিনাশচন্দ্র দে পরবর্তীকালে অ্যাটর্নি হন এবং তাঁর পঞ্চম সন্তান বিষ্ণু দে-র জন্ম হয় ১৯০৯ সালে ঐ বাড়িতেই— তাঁর বাল্য ও শৈশবও কাটে ওখানেই, ঐ যৌথ পরিবারের মধ্যে।[৩]

এমনকি এই সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয়ও হয়তো কিছুটা অবান্তর মনে হবে—

আর আমরা তো এখানে বিখ্যাত শ্যামাচরণ দে-র পৌত্রের জীবনী লিখতেও বসি নি—শুধু এটুকু জানানোই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে বিষ্ণু দে জন্মসূত্রে কলকাতার, বিশেষত উনিশ শতকের কলকাতার ঐতিহ্যের আবহাওয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং সে-সংবাদ কবির জন্ম ও বিকাশের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় নাও হতে পারে। বিষ্ণু দে-র জন্ম কলকাতায়, তাঁর শিক্ষা কলকাতায়, তাঁর প্রথমজীবনের জ্যেষ্ঠ ও সমসাময়িক বন্ধুবান্ধবরাও কলকাতার —পুরোপুরি কলকাতারই সন্তান তিনি।[৪] কলকাতার সঙ্গে তাঁর এই মানসিক অন্তরঙ্গতার ছবি ফুটে উঠেছে তাঁরই 'এই আমাদের কলকাতা' প্রবন্ধে। শুরুতেই বলেছেন, "আজীবন নিজেকে কলকাতার মানুষ জেনে এসেছি, যদিও সুহৃদ্বর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র মতো বংশগত কলকাত্তাই দাবি আমার সাজে না। কারণ পূর্বপুরুষেরা কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন না সেই আদি যুগে।......সেই কলকাতার বয়ঃসন্ধি প্রথম দেখেন প্রপিতামহ একশো সত্তর-আশি বছর আগে, যার ফলশ্রুতিতে মাইকেল, রাজনারায়ণ, ভূদেবের সহপাঠী পিতামহ হেয়ার শাহেবের ছাত্র এবং হিন্দু কলেজের বৃত্তিভোগী অর্থাৎ স্কলার হন ইংরেজিতে আর ইতিহাসে এবং তার গণ্যমান্য অগ্রজ হন গণিতে।"[৫] বলাই বাহুল্য ঐ গণ্যমান্য ব্যক্তিটিই শ্যামাচরণ দে। পরে আরো বলেন, "কম বয়সে অগ্রজ ও সমকালীনদের মতো আমিও কলকাতাকে আপনভাবে জেনেছি এবং সেকালে তার জন্যে বাঙালি শাহেব না হলে কারো পক্ষে লজ্জা বোধ করাটা দরকার হত না।"[৬]

অবশ্য তখনকার কলকাতা ঠিক এখনকার মতো বিষাক্ত ও ধ্বংসোন্মুখ হয়ে ওঠে নি। কলকাতা তখনও নিষ্প্রাণ বা জীবন্মৃত নয়, তখনও আধুনিক শহরের ছন্দহীন নৈর্ব্যক্তিকতা কলকাতাকে গ্রাস করে নি। সেকালের ঐ কলকাতা, বিষ্ণু দে যার জঠরে বড় হয়েছেন, উনিশ বা বিশ শতকের গোড়াকার বিকাশোন্মুখ কলকাতা নয় বটে, কিন্তু তখনও সেই "জীবন্ত শহরে" ছিল "আঞ্চলিক আত্মপরবোধ" কিংবা "প্রবল স্থানীয়তার মধ্যে একটা বেশ সত্তাবৈশিষ্ট্য"—

"সেকালে ছিল নানান ডাকের
হরেক মালের নানাদেশী ফেরিওলা, কলকাতায়

পাড়া ছিল, পাড়ায় পাড়ায় গন্ধ ছিল স্বাদ ছিল
ছিল বিশিষ্ট চেহারা, ছিল প্রতিবেশী।
তারপরে কিছুটা বা ঘষামাজা, ওরই মধ্যে
যাই হোক শাড়ির বাহার"[৭] —

সব লেপেমুছে এক হয়ে যায় নি মেট্রোপলিসের বিরাটত্বের গহ্বরে —তখনও বলা চলত "আমরাই আসল কলকাতার মানুষ" কিংবা "আমাদের সেই চেনা মাতৃনগরী" কলকাতা—"দীঘির মতো যা স্বচ্ছ, সীমা যার জানা"। এই শহরই তো দিতে পারে পায়ের তলায় বাস্তব জমি, গড়ে তুলতে পারে অনুভূতি ও স্মৃতির জগৎ, কারণ নিজের ছন্দস্বর, নিজের আবেগ, নিজের লক্ষ্য বলতে যা বোঝায় তা ছিল সে যুগের ঐ কলকাতা শহরের। এবং এই কলকাতাতেই তখন ভাবা চলত "পিতৃপুরুষের স্মৃতি কলকাতার স্মৃতিও বটে", যুক্ত করা যেত ঐতিহ্যগর্বে নিজেকে রামমোহন বা বিদ্যাসাগর বা দীনবন্ধু-কালীপ্রসন্নর কলকাতার সঙ্গে।[৮]

এই উনিশ শতকী রেশ ছিল বোধহয় মধ্য কলকাতার যে বিরাট যৌথ পরিবারে তিনি বড় হয়েছিলেন, সেখানেও। সে যুগের বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ তো ছিলই ঐ বাড়ীর শ্যামাচরণ দে-র আমল থেকে, পরবর্তীকালেও, বিষ্ণু দে-র বাল্যস্মৃতির সীমানার মধ্যেই, তৎকালীন কলকাতার অভিজাত ব্যক্তিদের অনেকেরই আনাগোনা ঘটত। আইনজীবী পিতা, পিতৃব্য ও খুল্লতাত এবং তাঁদের পুত্রকন্যা, বিভিন্ন সম্পর্কের ভাইবোনদের ভিড়ে ও সাহচর্যে বিষ্ণু দে-র বাল্যকাল কেটেছে।

"বিষ্ণু দে বড় হয়েছিলেন সম্পূর্ণভাবে গোছালো এবং সুনিয়ন্ত্রিত যৌথ পরিবারের গৃহস্থালীর মধ্যে—সেখানে প্রত্যেকেরই ছিল কাজ এবং তার জন্য মর্যাদাও দেওয়া হত প্রত্যেককে। শিশু বয়স থেকেই বিষ্ণু দে-র শরীর ছিল পল্‌কা এবং ফলে তার সব কাকা-কাকী, জ্যেঠা-জ্যেঠী বা তুতো সম্পর্কের ভাইদের কাছ থেকে পেতেন মনোযোগ এবং উষ্ণ আদর। তাঁরা বিষ্ণু দে-র লাজুক স্পর্শকাতর প্রকৃতি বুঝতেন এবং সমাদরও করতেন। এই সস্নেহ স্বীকৃতি ও গ্রহণ, নানা প্রকোষ্ঠ সমন্বিত সেই বিরাট বাড়ির স্বাধীন প্রশান্তি —চারদিকে বারান্দা, নীচে চৌকো উঠোন এবং তিন তলায় একটি চত্বর, যেখানে ছিল ছোটদের খেলার জন্য প্রচুর জায়গা এবং আলমারিতে ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের প্রচুর বই, পত্রিকা—তিনি সে সব অনুসন্ধান করে বের

করতেন এবং পড়তেন প্রশান্ত অবসরে। এই আবহাওয়াতেই অন্তত বছর দশেক বয়স পর্যন্ত বড় হয়েছেন বিষ্ণু দে।"৯ এই ছোট্ট বিবরণীতেও তাঁর শৈশবের পরিবেশের যে ছবিটি ফুটে উঠেছে, তা যে-কোনো শিশু মনস্তত্ত্ববিদই অনুকূল বলে অনুমোদন করতেন, বিশেষত শিশুর কল্পনা বা হৃদয়বৃত্তির স্ফূর্তির পক্ষে। সুস্থ মানসবিকাশের দিক থেকে শিশু বা কিশোর মনের উপর বৃহৎ যৌথ পরিবারের যে-সব প্রভাব নির্দেশিত হয়ে থাকে—একক স্বার্থপর জীবন নয়, সমষ্টি জীবনের মিলিত আনন্দ, সংবেদনশীল অনুভূতির জাগরণ, বিভিন্ন মানবিক বৃত্তির অনুশীলন—তার অনেক কিছুরই হয়তো এই পরিবেশেই সূত্রপাত ও যাত্রারম্ভ। বেঞ্জামিন স্পক ১০ শিশুযত্নবিষয়ক গ্রন্থের সেই বিখ্যাত লেখক, যিনি একই সঙ্গে শিশুচিকিৎসক ও শিশুমনস্তত্ত্ববিদ এবং যিনি জীবনের পরিণতসীমায় পৌঁছে বুঝতে পেরেছিলেন, শিশুকে ভালো করার সব চেষ্টাই ব্যর্থ যদি না পালটানো যায় বিরুদ্ধ পরিবেশ (এবং তাঁর অভিজ্ঞতায় পরিবেশ বলতে মার্কিন সমাজ শুধু নয়, পরিবারের অভ্যন্তরে চারিয়ে গেছে যে কুরুচি, স্বার্থপরতা ও বৈরিতা...তাও)—'শান্তির সৈনিক' ঐ ভদ্রলোকটির নিম্নলিখিত সরল উক্তি প্রাসঙ্গিকতাবোধে উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "মানুষের আধ্যাত্মিকতা (spirituality) অর্জিত হয় পিতামাতার জন্য প্রথম শৈশবে সে যে আনন্দময় ভালোবাসা অনুভব করেছে তা থেকে এবং তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে অন্যদের ক্ষেত্রেও—অন্য মানুষ কিংবা তার বীর নায়ক কিংবা ভগবান বা শিল্পসাহিত্যের সৌন্দর্যের দিকে। ...আমরা তো সুখই অনুভব করি, যখন আমরা অংশ হই বিরাট কিছুর, তার প্রতি মুখ্য আনুগত্যে—জাতি, গির্জা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, বিরাট বা ছোট পরিবার যাই হোক। এই সুখ আমাদের শিশুকালে পরিবারের অংশ হিসেবে গর্ব এনে দেয়। আমাদের বুঝিয়ে দেয় কেন মানুষেরা এত বন্ধুত্বপূর্ণ, কি করে যুদ্ধের সময়ও নৈরাশ্য বা আত্মহনন এড়িয়ে সে দেশের জন্য নিজেকে জরুরি ভাবে এবং পরস্পর আরো কাছাকাছি আসে।"১১ যেখান থেকে উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে, সেই পরিচ্ছেদটির শিরোনাম: 'কোথা থেকে আসে আদর্শ?' বিষ্ণু দে-র ঐ শৈশববর্ণনাতেও সেই সংহতির অভিজ্ঞতাকেই যেন গড়ে উঠতে দেখি। পরবর্তীকালে বিষ্ণু দে-র মধ্যে পেতে থাকব এমন অনেক চেনা অভিজ্ঞতার জন্ম ও লালন কি এখানেই ঘটে নি? পরন্তু এই পরিবেশই দিতে পারে সৌকুমার্য-পুষ্ট ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য নির্জনতা বা অবসরের বোধ

এবং স্বায়ত্তশাসনের স্বাধীনতা, এবং এই সুযোগ স্পষ্টত তিনি যাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন তাঁর পিতা অবিনাশচন্দ্র দে।

পিতার ঔদার্যের কথা বিষ্ণু দে স্মরণ করেছেন অনেকবার। অত্যন্ত ঘরোয়া অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক ছিল তাঁর সঙ্গে ছেলেদের—প্রায় বন্ধুর মতো কথাবার্তা চলত, এমনকি হাস্যপরিহাসও। পিতাপুত্রের গল্প চলত অবিশ্রান্ত, নানা প্রসঙ্গে নানা সূত্রে। তর্কবিতর্কও হত। পুত্রের শিক্ষার ব্যাপারেও পিতার মত ছিল অত্যন্ত উদার, রবীন্দ্রনাথের বা বলা যায় শান্তিনিকেতনের শিক্ষার আদর্শের প্রভাব তাঁর উপরেও পড়েছিল। মনের সম্পূর্ণ স্বাধীন পরিবেশ তৈরি করাই ছিল সেই শিক্ষার ভিত্তি।[১২] বিষ্ণু দে নিজেই এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবে, তাঁর শিক্ষা-সম্পর্কিত বক্তৃতামালা ও রচনা পাঠ করে......স্কুলের বালক আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা বুঝে ফেলেছিল এবং চিরকালের জন্য চেয়েছিল স্কুল ত্যাগ করতে এবং ধৈর্যশীল পিতার সঙ্গে এ বিষয়ে দীর্ঘ তর্কও চালাত...।"[১৩] এমনকি এ সময়েও পিতা শাসন করেন নি, পুত্রের সঙ্গে মতমিনিময় ও বিতর্কে রত থেকেছেন। বিষ্ণু দে-র কবিতারচনার বিষয়েও তাঁর যথোচিত আগ্রহ ছিল। বিষ্ণু দে-র জবানিতেই জানা যায় তিনি এরকম উৎসুক প্রশ্ন করতেন: "কি নিয়ে কবিতা লেখ? মানুষ নিয়ে? প্রকৃতি নিয়ে? তুমি কি কোনো বিশেষ মেয়েকে নিয়ে লিখেছ? না এমনি লিখেছ?"[১৪] বিষ্ণু দে-র অন্তরঙ্গ আরেকজন লেখকও লিখেছেন, "তাঁর মর্যাদাবান সহৃদয় পিতা তাঁর সাহিত্যিক ঝোঁকের ব্যাপার জানতেন এবং অনুমোদনও করতেন—কবির রুচি ও সংবেদনশীলতার বিকাশের সেই গোড়ার পর্বে বিরাট সহায়কও ছিলেন।"[১৫] সেই রুচির বিকাশে তাঁর মা-র ভূমিকাকেও কি অস্বীকার করা চলে, যাঁর অসাধারণ সৌন্দর্যের খ্যাতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কর্মের নৈপুণ্য ও চারুতা?[১৬]

পিতামাতা এবং পরিবারপরিজনের পর বিষ্ণু দে-র উপর যাঁদের প্রভাব কালানুক্রমে বিবেচ্য, তাঁরা হচ্ছেন তাঁর স্কুল ও কলেজের শিক্ষকবৃন্দ। বিষ্ণু দে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন। দে-বিশ্বাস পরিবারের ছেলের পক্ষে হেয়ার স্কুল বা সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের সঙ্গে যোগ থাকাটাই প্রায় দস্তুর বলে মনে করা হত, শুধুমাত্র ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য নয়, পিতামহের আমল

থেকেই এটা ছিল রেওয়াজ। বিষ্ণু দে পরীক্ষার রেজাল্টের বিচারে কোনো সময়েই ভালো ছেলে ছিলেন না, নিজেরই ভাষায়, তিনি ছিলেন "পরীক্ষার নীচের তলার ভাড়াটে।" ১৭ অথচ এ সময়েই শুরু হয়ে গিয়েছিল নানা বিষয়ে তাঁর ব্যাপক জিজ্ঞাসা ও পড়াশুনার অভিযান। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে তাঁর কোনো কোনো শিক্ষক তখনই পরীক্ষায় অকৃতকার্য এই বালক বা কিশোরটির প্রতি শুধু স্নেহই অনুভব করেছেন তাই নয়, দিয়েছেন তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি প্রায় সাবালক মর্যাদা। "স্কুলেও তিনি অনুরূপভাবে গৃহীত হতেন গাম্ভীর্যের সঙ্গে এবং বয়ঃসন্ধিকালে ব্যাপারটা খুব সহায়কও বটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পণ্ডিত দক্ষিণনারায়ণ শাস্ত্রী তাঁর সঙ্গে সাবালক জ্ঞানে আলোচনা করতেন, মনে হত না একজন প্রাপ্তবয়স্ক কথা বলছেন অপরিণত তরুণের সঙ্গে।" ১৮

বাল্য বয়স থেকেই আত্মীয়পরিজন, শিক্ষক এবং সর্বোপরি পিতার কাছ থেকে বয়স্কমর্যাদালাভ বিষ্ণু দে-র মানসিক পরিণতিকে আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং খুব অল্প বয়সেই পরিণত রচনা লিখে যে তিনি অনেককে বিস্মিত করেছিলেন, তার মূলে শৈশবের এই সব ঘটনাও নিশ্চয়ই অনেকখানি দায়ী।

প্রথম রচনার বিষয়ে বিষ্ণু দে অনেক জায়গাতেই কিছুটা কৌতুক-মিশিত বর্ণনা দিয়েছেন। কৌতুক, কেননা রচনার অন্তর্নিহিত গরজ, বা তাঁর নিজেরই ভাষায় "ব্যক্তিত্বের বাইরে নিজস্ব তাড়না" তখনও শুরু হয় নি। 'কি করে লেখক হলুম' এই প্রশ্নোত্তরমূলক রচনায় তাই তিনি পরোক্ষ উক্তি করেন, "এই চাপের বোধ সব সময়ে এক কবিব্যক্তির মনে থাকবে এমন কোনো নিয়ম নেই, অভ্যাসিকতার বল অর্জনে আত্মীয় বন্ধুর বিবাহপদ্যও সে লিখে ফেলতে পারে, উপলক্ষ্যের তাগিদে অথবা নির্বন্ধে। এমনকি নিছক দশ টাকার পুরস্কারের লোভেও বালক তার প্রথম কবিতা লিখে বালকবালিকোচিত প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় পাঠাতে পারে। এবং পুরস্কারটা না পেলেও কবিতা লেখার বা পদ্য রচনার মজাটা পেয়ে যায় আর লিখে যেতে চায় নিজের নানারকম কৌতূহলের খুশিতে, যদিচ সে খুশি মুখাপেক্ষী হয়—কালোচিতভাবেই—সত্যেন্দ্রদত্তজ বাহারের।"১৯ পরবর্তী আরেক বর্ণনায় কাহিনীর তথ্য আরো

সম্পূর্ণতা পায়—"আশ্চর্যের বিষয়ই বটে আমি আমার পদ্যরচনার প্রথম পর্বকে মনে করতে পারি। ছোটদের একটি নামী পত্রিকায় কিছু চিত্র অবলম্বনে কবিতা চাওয়া হয়েছিল এবং পুরস্কারের উল্লেখও ছিল,···আমি চেষ্টায় রত হলুম, অংশত কারণটা এই যে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের উপর লেখাটা একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় এবং অংশত, এখন আমি নিশ্চিত, কারণটা এই যে তাতে পুরস্কারের ঘোষণা ছিল। খবর পাওয়ার জন্য ডাকটিকিট সহ লেখাটি এনভেলাপে মুড়ে আমি পাঠিয়েছিলুম, কিন্তু বলা বাহুল্য জবাব এল না। তবু এটা শুরু করে দিল আমার আবিষ্কারের চেতনা, আমার সেই আবিষ্কারকে লিখে ফেলার মজা, সব রকমের ছন্দে সব রকমের পদ্য লেখার উল্লাসের চেতনা। যদিও তেরো বা চোদ্দ বছরের আগে কিছুই ছাপা হয় নি, কিন্তু আমি জেনে গেছি লেখা ব্যাপারটা উত্তেজনা ও আবিষ্কারে ভরপুর, ঠিক যেন রুশ স্তেপভূমিতে বালক ছুটিয়েছে ঘোড়া।···কোনো কোনো জ্যেষ্ঠ লেখক তরুণ বালকের ছন্দের দক্ষতাকে প্রশংসাও করতেন। এখন আমি যখন পেছনে ফিরে তাকাই সেই যৎকিঞ্চিৎ বাকপটু পদ্যরচনার দিনগুলোর দিকে, তখন নিজেকে অন্তত ধন্যবাদ দিই এই জন্যে যে কোনো এক নাটকীয় আতিশয্যের ঝোঁকে আমি প্রায় দুশো পৃষ্ঠার কুশলী পদ্য ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলুম।"২০

পদ্যরচনার অবিশ্রান্ত মজা থেকে ক্রমশ এক পা করে করে তিনি বোধহয় প্রবেশ করেছেন কবিতার জগতে, ক্রমশ অর্জন করেছেন আত্মপ্রত্যয়, অন্তত ছাপানোর কথা ভাবছেন প্রতিষ্ঠিত পত্রপত্রিকায়। "এমনকি জিজ্ঞাসু—আর যশোলিপ্সু ও বটে—আত্মপ্রসাদে একটি রীতিমতো পদ্যরচনা প্রবাসীর মতো তখনকার উচ্চবর্ণ পত্রিকায় পাঠিয়েও দেয়। আর একটু অবাকই হয়—যখন ডাকটিকিটটাও ফেরৎ আসে না। উল্টো দিকে আবার অবাক হয়ে যায়—কিছুকাল পরে বিচিত্রা পত্রিকার কান্তিচন্দ্র ঘোষের স্বতপ্রবৃত্ত উচ্ছ্বাসে। যেমন খুশি হয় ঢাকার প্রগতি পত্রিকার বুদ্ধদেব বসুর বিস্মিত চিঠি পেয়ে অথবা কল্লোল-এর দীনেশ দাশ ও অচিন্ত্য সেনগুপ্তর সমর্থনে।"২১ কিন্তু এখনও পর্যন্ত এসব "ছন্দমিলের পালাকীর্তন" ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্তার যে সংকট এলে প্রকৃত কবিত্বের জন্ম হয়, কিংবা নিছক কুশলী পদ্যরচনার মজা থেকে উত্তরণ ঘটে সেই সংকট এল পরের ধাপে।

"হ্যাঁ, আমার মধ্যেও ছিল সংকট বা ক্রাইসিস। খানিকটা যেন আততির

হর্ষে স্নায়ুর ছিলার টান। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে আমি শারীরিক দিক থেকে ছিলাম চমৎকার, কিন্তু নিদ্রাহীন।”২২ এই ‘সংকট’ বলতে বিষ্ণু দে যা বুঝিয়েছেন, তার সঙ্গে মিল আছে প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী এরিক এরিকসনের পরিভাষার। এরিকসনের মতে বয়ঃসন্ধির একটি পর্বে মানুষের মধ্যে আসে আত্মপরিচয়-সন্ধানের সংকট বা আইডেনটিটি-ক্রাইসিস—এই সংকটে কেউ পরাজিত হয়ে চলে যায় বিকারের পথে, কেউ-বা সংকটের নিরসন করে নানা ধরনের সৃজনশীল কাজকর্মে। এই সংকটমোচন বা সত্তাসন্ধানের সাফল্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ শিল্পীসাহিত্যিকেরা। বিষ্ণু দে-ও তাঁর বিকাশের ইতিহাস প্রসঙ্গে সংকটের কথা বলেছেন—কিন্তু সংকটের চেহারাটা প্রকাশ করেন নি। অথচ, এরিকসনের মতে, শিল্পসাহিত্যের সংকটের চিত্র ফুটতে পারে তাঁদের আত্মজৈবনিক লেখাপত্রেই। “সেই সব সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের জীবনেও আমরা সত্তার সংকট বিচার করে দেখতে পারি, যাঁরা নিজেরাই সেই সংকটের সমাধা করেছেন সমকালীনদের কাছে সমাধানের নতুন একটি ‘মডেল্’ উপস্থিত করে, যা প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের শিল্পকর্মে বা মৌলিক কাজকর্মে এবং তদুপরি তারা আমাদের এ বিষয়ে সব কিছু বলতেও আগ্রহী—ডায়রিতে, চিঠিতে বা অন্যান্য আত্মোদ্ঘাটনে।”২৩ কিন্তু নিজের সম্পর্কে বিষ্ণু দে আশ্চর্য রকমের মিতবাক্, তাঁর কৃপণ আত্মপরিচয়দানে সেই সংকটের বিস্তৃত চেহারা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যেমন তিনি নিজে খুঁজেছিলেন রবীন্দ্রনাথের অজস্র আত্মপরিচয়মূলক উক্তির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সত্তাসংকটের চেহারা, মনোবিদ এরিকসনের মধ্যস্থতায়। “হঠাৎ প্রশ্ন হয়েছিল—কি করে লেখক হয়ে উঠলুম? যে নাটকীয় অতিকথনে সক্ষম হলে এই প্রশ্নের ভঙ্গিতেই উত্তরটাও হঠাৎ দেওয়া যায়, তা বোধহয় রবীন্দ্রনাথের মতো জাগতিক ঘটনার পরে বাংলা কবিতার কর্মীর পক্ষে, অন্তত বর্তমান লেখকের মতো আত্মসংকুচিত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়।”২৪

নিদ্রাহীন দীর্ঘ সময়ের কথা বলেছেন বিষ্ণু দে। এতদূর তীব্র আততির মধ্যে কেটেছে ঐ সংকট ও সংকটমোচনের পর্ব যে ঈষৎ কৌতুকের সঙ্গে তিনি এই তথ্যটি জানিয়েছেন যে কিভাবে, তাঁর সদাশয় হৃদ্‌বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতানুসারে, “সেই আততি ও হর্ষ আমার হৃদপিণ্ড ও যকৃৎকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।”২৫ কিন্তু এর বেশি আমরা কিছু জানতে পারি না—কোন্ ঘটনা কিভাবে তাঁকে উদ্বেজিত করেছিল, ঠিক কোন্ ভাষায় সেই সংকট তাঁর কাছে হাজির হয়েছিল, এই সব প্রশ্ন অনুত্তরিতই থেকে যায়।

ফলে নিরুপায়ভাবে আমাদের সেই সময়ের রচনার মধ্যেই সূত্রসন্ধানের চেষ্টা চালাতে হয়। শখের রচনা বা লেখা-লেখা খেলা থেকে রচনার গাম্ভীর্যে পৌঁছনোর প্রথম পর্বের ইতিহাস তিনি নিজেই এইভাবে বিবৃত করেছেন : "এই ছন্দমিলের পালাকীর্তনের পরে এল বিনিদ্র 'জন্মাষ্টমী'-র শেষাংশের আরম্ভের অসম্পূর্ণ গোটা দশেক লাইন।...কিন্তু ঝোঁকটা বোধহয় অন্তরঙ্গই ছিল, কারণ সবটাই সম্পূর্ণ হয়ে গেল প্রায় দশ বছর পরে হঠাৎ এবং প্রাথমিক দশ লাইন স্বতই এসে গেল বিলক্ষণ দীর্ঘ কবিতা 'জন্মাষ্টমী'র..." ইত্যাদি।[২৬] ঠিক একই কথা অন্যত্র লিখেছেন : "আমার মনে পড়ে কিভাবে আমার চতুর সাবলীল রীতির কবিতার মেজাজ রূপান্তরিত হল প্রকাশভঙ্গির দ্বিধান্বিত কিন্তু আবিষ্কার-উন্মুখতায়। আরো মনে পড়ে কিভাবে এক রাত্রে লাইন দশেক চলে এল প্রায় স্বয়ংক্রিয় লিখনভঙ্গিমায়—প্রায় ৮।৯ বছর পরে সেই লাইনগুলোই 'জন্মাষ্টমী' নামক অতিশয় দীর্ঘ কবিতার মধ্যে এসে গেল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। এবং সক্রেটিস-খ্যাত ডিয়োটিমার উদ্দেশ্যে নাটকীয়ভাবে সম্বোধিত অন্ধকার যাত্রা-বিষয়ক আরো আগের একটি কবিতাও এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।"[২৭] 'জন্মাষ্টমী' সম্পূর্ণ হয়েছিল ১৯৩৬ সালে—সুতরাং সেই "অন্তরঙ্গ ঝোঁকে" রচিত অংশটির কালসীমা ১৯২৬। এই একই বছরে রচিত হয় 'চোরাবালি' গ্রন্থের সেই পরিপক্ক রচনাটি, 'মন-দেওয়া-নেওয়া'। তারপর ১৯২৮ থেকে পর পর লেখা হতে থাকে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' এবং 'চোরাবালি'-র একেকটি কবিতা।[২৮] এই সময়টিকেই তিনি বলেছেন সংকটের কাল—বিষয় এবং প্রকরণ, চিন্তা এবং লেখায় কর্তৃত্ব অর্জনের সংকট। "এই প্রথম সংকটযুগের গোড়ার দিকেই লেখা হয় 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর সেই সব কবিতা, 'চোরাবালি'র কিছু কিছু ভের দ সোসিয়েতে-মার্কা লঘু কবিতার পরের লেখা, যাতে লেখকের লিখনচৈতন্যও ছিল সংকটদীর্ণ কিন্তু আবার উল্লসিতও, ভাষাও ছিল তাই দ্বিধান্বিত কিন্তু স্বাধিকৃত, ছন্দে মিলে কর্তৃত্ব হয়তো সময়ে সময়ে মনে হয় গৌণ—প্রচ্ছন্ন একটা মুক্তিবোধের নন্দিত চৈতন্যে, কিন্তু যে মুক্তি ছিল অনিদ্রাতত স্নায়ুর জ্যা-মুক্তি।"[২৯]

'জন্মাষ্টমী' কবিতার যে লাইন দশেক অংশটির কথা তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন, তাকে চোখের সামনে উপস্থিত করা যাক।

> "অস্তাচলে অন্ধকার; স্থবির রাত্রির
> স্থির বিরাট পাখায়
> ঘনায় আবেগ

আকাশে এসেছে নেমে আত্মীয়তায়
অন্তরঙ্গ, নির্বর্ণ, নির্মেঘ ;
দ্বারকার দস্যুভয় ইন্দ্রপ্রস্থে নৈকট্যে মধুর।
দীর্ঘ শালতরুসার
মহাবনে স্তব্ধ
স্তব্ধ প্রতীক্ষায় ধীর মৌন স্থির,
বিশ্বরূপ মহিমার স্নিগ্ধ কণা পেয়ে
অন্তরঙ্গ, অথর্ব-বিধুর।"৩০

বলা বাহুল্য, আত্মপ্রকাশের ও সত্তার যে সংকটে পীড়িত ছিলেন তিনি, সেই সংকটের চেতনার ও মুক্তির সাক্ষ্য লাইন কটি। বিষ্ণু দে-র এই নিদ্রাহীন সংকট ও সংকট-ক্রান্তির উল্লাস স্মরণ করিয়ে দিতে পারে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'র কবিকে এবং সে-বিষয় স্বয়ং বিষ্ণু দে-কৃত ব্যাখ্যা।৩১ সেই ব্যাখ্যায় জানতে পারি কিভাবে আত্মপরিচয়ের কৈশোর সংকট এড়িয়ে "দ্বিধান্বিত কবির চরণ মুক্তি পেল বিশ্ব-সাহিত্যের খোলা দরবারে" এবং ব্যক্তিপরিচয় ও কবিপরিচয়ের অভিন্নতার বোধে। কিন্তু এ যুগের কবির কাছে সেই উল্লাস ভাষা পায় বৈপরীত্যের চেতনার পটভূমিতে—"স্থবির রাত্রি"র পাশে "আবেগ", "দ্বারকার দস্যুভয়"-এর পাশে "ইন্দ্রপ্রস্থে নৈকট্যে মধুর"। এবং সবকে ছাপিয়ে ওঠে প্রতীক্ষার স্থৈর্য, যে প্রতীক্ষার কথা বারবার ফিরে এসেছে 'উর্বশী ও আর্টেমিস' গ্রন্থের অনেক লাইনেই। এই বৈপরীত্যের এবং প্রতীক্ষার টেনশনের পরোক্ষতাতেই তিনি মুক্তি পান সংকটের ব্যক্তিসর্বস্ব প্রত্যক্ষতা থেকে।

দ্বিতীয় কবিতাটির কথাও যদি ধরা যায়, সেই "অন্ধকার যাত্রা-বিষয়ক আরো আগের একটি কবিতা", সেখানেও দেখা যায় "স্তব্ধ প্রতীক্ষা" রূপ নিয়েছে "অসিধারব্রত যাত্রা"য়। কবিতাটির নাম 'যাত্রা'—উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর ১ম সংস্করণে স্থান পেয়েছিল। পরে ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় অন্তর্ভূত হয়। 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর যে-কবি নিজেকে মনে করেছেন, "মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক", সেই কবিই কঠিন একাকীত্বের মুখোমুখি হয়েছেন। লাইন কটি আরম্ভই হয়েছে এইভাবে :

"অমাবস্যা-তমিস্রারে দুই হাতে ঠেলি ঠেলি কোথা
ভারাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসের মাঝে পথ করি
চলিয়াছি সঙ্গীহীন কি উদ্দেশে কঠিন যাত্রায় ?

নাহি ভয় রজনীর,
বিজনের, পৃথিবীর, আঁধারের মুষ্টিবদ্ধ ভয়
হৃদয়ে কি নাহি তব, হৃদয় আমার ?
দৃষ্টিতে নাহিকো কেহ, জীবনের নাহিকো ঠিকানা
জনশূন্য সিক্তবালু সৈকত-উপরি
চলিয়াছ স্থিরদৃষ্টি একা।
দৃষ্টিতে নাহিকো কেহ, শুধু আছে আকাশ-ছড়ানো
অস্পষ্ট নিষ্ঠুর ক্রুর হাসি আঁধারের।"৩১ক

এই কঠিন উদ্দেশ্যহীন সঙ্গীহীন যাত্রায় কিন্তু একাগ্রতা ও তীব্রতার কোনো অভাব নেই—তাই "চলিয়াছি স্থিরদৃষ্টি একা" এবং এ যাত্রাকে বলা হয়েছে "অসিধার ব্রত", অসির ভয়ংকর ধারের উপর দাঁড়িয়ে ব্রত পালনের নিষ্ঠা। বৈপরীত্য এখানেই যে সেই ব্রতের কোনো লক্ষ্য নেই—যে যাত্রা উদ্দেশ্যহীন এবং যে অন্ধকার সঙ্গীহীন, দ্বান্দ্বিক পরিহাসে সেই যাত্রাকেই বলা হয়েছে "অভিনব জয়যাত্রা" এবং অন্ধকারে সন্ধান পাওয়া গেছে "রাত্রি-আঁধারের উদ্দাম প্রণয়।" বৈপরীত্যের এই তীব্রতাতেই কবি বলেন :

"তুমি শোনো নাই বুঝি গায়ত্রীর গুহাগুপ্ত গানে
তৃপ্তিহীন সংকটের তীব্র আর্তনাদ
দিবারাত্রি বিশ্বামিত্র করিছে একেলা ?"৩২

উদ্দেশ্যহীন অন্তহীন নিঃসঙ্গ যাত্রায় বাধ্যতামূলক এই অংশগ্রহণ—"এক ক্লান্তি হতে যাবে আর ক্লান্তি-দেশে/যাত্রা কভু যাবে না থমকি"—এর মাঝখানে কবির প্রত্যাশা শুধু গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে এই নিষ্ফল যাত্রা রোধ করার, ক্ষান্ত করার "মিনতি"তে। সংকটমোচনের জন্য যে আকৃতি সক্রেটিস-খ্যাত প্রেরণাদাত্রী ডিয়োটিমার প্রতি সাহায্যপ্রার্থনার আবেদনে রূপ পায়, তা-ই কি আমরা পাই 'জন্মাষ্টমী'র অন্তিম সংগীতমুক্তিতে কিংবা আরো আগে 'ঘোড়সওয়ার'-এর মুক্তিবাহী ব্যঞ্জনায় ?

এই সংকটমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বা প্রায় অব্যবহিত কালের মধ্যে যে-প্রভাব তাঁর কবিব্যক্তিত্ব গঠনে অত্যন্ত উপকারী হয়েছিল, তা হচ্ছে টি. এস্. এলিঅটের প্রভাব। প্রয়োজনের দিক থেকে এটাকে পরিপূরক বলা চলে। এবং এই

প্রভাব ক্রিয়াশীল থেকেছে দীর্ঘকাল, যদিচ উভয়ের সম্পর্কটা গ্রহণবর্জনে একটু অসরল। ১৯৩০ সালের পূর্বেই টি. এস. এলিঅটের রচনার সঙ্গে বিষ্ণু দে-র এই যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রথম সাক্ষাৎকার, সে ঘটনা তিনি এইভাবে বিবৃত করেছেন: "তারপরে এল আকস্মিকভাবে আমাদের পটলডাঙ্গা পাড়ার পুরোনো বই-এর কারবারী ইউসুফ-এর দাক্ষিণ্যে এলিঅটের 'দি সেকরেড উড' আর 'পোয়েম্‌স্‌ ১৯২৫'। পুরোনো কিন্তু শস্তা—টাকা টাকা। কিন্তু প্রায় আনকোরা অবস্থায়। এলিঅট শাহেবের নামটা আগেই জানতুম, কবিতা পড়েছিও গোটাকয় মার্কিন কবিতার সংকলনে...। তখনও তাঁর বিখ্যাত পত্রিকা 'দি ক্রাইটেরিঅন' চোখে দেখিনি।"৩৩ আর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, সংকটমুক্তির পর দ্বিতীয় পর্ব এই এলিঅট-আবিষ্কার—"টি. এস. এলিঅটের 'কবিতাবলি ১৯২৫' এবং 'সেকরেড উড', আমার ঐ নব-আবিষ্কারই কি বিকাশের দ্বিতীয় পর্ব ছিল না?"৩৪ ঐ প্রবন্ধে প্রসঙ্গান্তরের পর আবার তিনি লিখলেন, "আবার আমি স্মরণ করি এখানে টি. এস. এলিঅটকে। তাঁর 'ঐতিহ্য ও ব্যক্তিক গুণপনা' আমাকে আমার বিকাশে সাহায্য করেছিল প্রচুর।"৩৫

এলিঅটের কাব্যের কলাকৌশল তাঁকে প্রভাবিত করেছিল নিশ্চয়ই এবং তার সাক্ষ্যও রয়েছে অনেক এ-সময়ের কবিতায়—কিন্তু এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়, এলিঅটের কাব্যতত্ত্বের ঐতিহাসিক প্রেরণা বিষ্ণু দে-র কাছে তো বটেই, সে যুগের অন্যান্য আরো অনেকের কাছেই বাস্তব ছিল। সেজন্যই তিনি বলেছেন "বাংলাদেশে এলিঅট", বারবার উল্লেখ করেছেন তৎকালীন সাহিত্যিক বা এমনকি রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক পরিবেশে এলিঅটের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা।৩৬ অমলেন্দু বসু, যিনি এলিঅটের কাব্যতত্ত্ব-বিষয়ে কম উৎসাহী, এলিঅটের কাব্যের ও কাব্যতত্ত্বের বন্ধনমুক্তির প্রেরণার এই যে ভূমিকা তার সপ্রশংস উল্লেখ তিনিও করেছেন এবং তুলনা করেছেন ঠিক একই সময়ে ইংল্যাণ্ডের কবি অডেনের উপর এলিঅটের প্রভাবের কথা।৩৭ অডেন যেমন তাঁর শিক্ষককে বলেছিলেন ওয়ার্ডস্বার্থ-প্রভাবিত কবিতা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি লিখতে চান নতুন কবিতা, কারণ এলিঅট পড়েই তিনি বুঝতে পেরেছেন 'কিভাবে কবিতা লেখা হবে'—তেমনি বিষ্ণু দে-ও, "ছন্দমিলের পালাকীর্তন" শেষ করে পথসন্ধানের সেই সংকটপর্বে এলিঅটকে পেয়েছিলেন সংকটমুক্তির সহায়ক প্রেরণা হিসেবে, তাঁর কাব্যে ও কাব্যতত্ত্বে উভয়তই।৩৮

ঠিক এই সময়েই, এলিঅটের ঐতিহাসিক প্রেরণার সমকালেই যে-সব সমধর্মী বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটল, তাঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সূত্র এই এলিঅটই। তিনি লিখেছেন, "অচিরে সামাজিক সম্পর্কের সুযোগে জানতে পারলুম যে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মশায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সুধীন্দ্রনাথ এই কবির ও সমালোচকের মুগ্ধ পাঠক। কৌতূহল থেকে, বলা যায়, এলিঅট-পাঠের নন্দিত উত্তেজনা থেকে হল সামাজিক সম্বন্ধোত্তর সাহিত্যিক সৌহার্দ্য।"[৩৯] আরেকজন অপূর্বকুমার চন্দ—"আর এলিঅটের জগতের সঙ্গে পরিচয় ছিল শুনেছিলুম পিতৃপুরুষের ভাষায় দেওয়ানজীর পুত্র চারুচন্দ্র দত্ত মশায়ের জামাতা অধ্যাপক অপূর্বকুমার চন্দ শাহেবের। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অবৈতনিক প্রাইভেট সেক্রেটারি রূপে দুটি তিনটি চিঠির সূত্রে।"[৪০]

বিশেষ করে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর এলিঅট-কেন্দ্রিক মতবিনিময় এবং ক্রমশ নিবিড় সৌহার্দ্য কবিতারচনার প্রথম পর্যায়ে যে অসামান্য সহায়তা দান করেছিল, সে-কথা বিষ্ণু দে পরিণত জীবনেও বারবার স্মরণ করেছেন। একজন আলোচকের ভাষায়, "সুধীন্দ্রনাথের উদার রবীন্দ্রোত্তর আগ্রহ লেখকের কবিতা লেখার অভ্যাসকে প্রচুর উৎসাহিত করেছিল।"[৪১] বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-রচিত 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধটির[৪২]—"ইওরোপীয় সাহিত্যের মুক্তির চেষ্টা আমাদের সাহিত্যিক দিক থেকে প্রতিভাত হল দেরিতে, বলা যায়, প্রায় টি. এস্. এলিঅটের প্রান্তিক মধ্যবর্তিতায়। কলকাতার প্রথম প্রকাশ্য আলোচনা বোধহয় সেই ছাত্রসভার বৈঠকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধে যা পরে ছাপা হল কাব্যের মুক্তি নামে। সেই এলিঅটের প্রবেশ বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়…।"[৪৩] একই ঘটনা অন্যত্র বলেছেন এইভাবে: "তারপরে হল 'কাব্যের মুক্তি' নামক প্রবন্ধের প্রাথমিক ভাষ্যটি। এবং সেটি আমরা কয়েকজন অর্বাচীন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের ওপরতলার এক ছোট ঘরে ফরাস বিছিয়ে বসে শুনলাম।"[৪৪]

এলিঅটের প্রভাব সম্পর্কে অতিশয়োক্তি এবং অল্পোক্তি উভয়কেই এড়ানো যাবে যদি আমরা ঘটনাটিকে এইভাবে ঐতিহাসিকক্রমে দেখি। কেননা সে-যুগেও এলিঅটের কবিতার প্রভাব তাঁর উপর ছিল খুবই বাহ্য—কিছু প্রকরণ বা কলা-কৌশলকে তিনি সচেতনভাবে গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর ভিন্ন পথ সম্পর্কে এখন আর কারোর সন্দেহ থাকে না। কিন্তু এলিঅটের প্রেরণা ছিল বস্তুত ভাবগত—তাই পরবর্তীকালে তাঁর সম্পর্কে যে

সমালোচনামূলক বা দ্বান্দ্বিক মনোভাব গড়ে ওঠে, তার রেশ ছিল না তখন—পথসন্ধানের তীব্র সংঘাতে ও আলোড়নে এলিঅটের পরিচয় তাঁদের উচ্ছ্বসিত করেছিল।

"এলিঅটের সেক্রেড উড-এর অন্তত দুটি প্রবন্ধের বক্তব্য পাশ্চাত্যের অনেকের মতো আমাদেরও কাউকে কাউকে বেশ অনুপ্রাণিত করে এবং এইরকম আলোকিত ধাক্কা ফলপ্রসূ হয়—অন্তত তাই আশা করেছিলুম—কারণ তখন মনে হয়েছিল এইরকমই তো আমরাও ভাবতে চেষ্টা করেছিলুম। এবং তাঁর 'দি ওয়েস্টল্যাণ্ড' নামক তখনকার দীর্ঘতম কবিতাটি বিচলিত করে এত গভীরভাবে যে লাইনগুলো ঘরে-বাইরে ট্রামে-বাসে মনে গুঞ্জরিত হত এমনই জাদুর ভয়ঙ্কর লিরিক্‌ল্ শক্তি, একটা ঘোরের মধ্যে বহুকাল কাটে তীব্র নান্দনিক আততিতে।"[৪৫]

এই এলিঅট-সংবাদের পাশে পাশেই, বস্তুত কিছু আগে থেকেই, চলেছে সাহিত্য-শিল্প-সংগীত বিষয়ে তাঁর সীমাহীন আগ্রহ ও চর্চার অভিযান। তিনি দু-হাত মেলে মানবসভ্যতার সমস্ত সম্পদকে আহরণ করার পরিপাকশক্তি অর্জন করে চলেছেন। সাহিত্য তো আছেই। "পরীক্ষার নিচু তলার ভাড়াটে". কিন্তু স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যের উদগ্র পাঠক—সমকালীন বন্ধুদের ভাষায় "বইয়ের পোকা"।[৪৬] তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য পুরাণের মধ্যে তন্ময় হয়ে আছেন, যার পরিচয় আমরা পেয়েছি প্রথম দুটি কাব্যগ্রন্থে। সাধারণভাবে বিষ্ণু দে-র পরিক্রমা বিষয়ে অমলেন্দু বসু যে-কথা বলেছেন, সেই রুচি-অর্জনের অভিযান শুরু হয়েছে এ-সময়েই—"সত্যিই তাঁর মন ভরপুর হয়ে থাকত ইওরোপীয় সাহিত্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সম্পর্কে ব্যাপক ও সঙ্গে সঙ্গে গভীর ধ্যানধারণায়, তা সে প্রাচীন যুগেরই হোক অথবা মধ্যযুগীয় বা আধুনিক—আর পাশাপাশি আধুনিক চিত্রকলা ও সংগীতের বহু বিষয়েই সমানই সাড়া দিতেন। পরন্তু আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তার বিষয়ে তাঁর ঔৎসুক্য ছিল অসাধারণ। সংস্কৃত, বিশেষ করে উপনিষদ নিয়ে তাঁর পড়াশোনা তাঁর কবিতাতে এনেছে নানা বাক্যাংশ বা শব্দ বা চিন্তাভঙ্গি; বাংলা কাব্যের সামগ্রিক পরিধি নিয়ে তাঁর যে পঠনপাঠন তাকে তিনি সৃজনশীল ও ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করেছেন, এবং তিনি ছিলেন সমানভাবেই ভারতীয় সংগীতের বা

লোকসংগীতের কিংবা লোকশিল্পের বা বিদগ্ধ শিল্পের ভোক্তা। সর্বোপরি, রবীন্দ্রনাথের কবিতা তাঁর নিজস্ব কাব্যচেতনায় ছিল অঙ্গাঙ্গী।.. তাঁর ছিল জ্ঞানার্জনের বিষয়ে ডনের মতোই 'hydroptique thirst' এবং নিজের অধীনে যেন আনতে চাইতেন জ্ঞানবিজ্ঞানের সবটুকু না হোক অনেকটাই।"[৪৭] বলা বাহুল্য, এই পাঠতৃষ্ণা বা জ্ঞানতৃষ্ণা বা রুচি-অর্জনের তৃষ্ণা তাঁর স্বভাবের অন্তপ্রেরণায় ঘটেছিল এবং ফলত সে প্রেরণার বশেই তিনি গুরু হিসেবে পেয়েছিলেন এলিঅটকে, সহৃদয় বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে, চর্চার বিষয় হিসেবে পেয়েছিলেন এলিজাবেথান রেনেসাঁস যুগ ও তার সাহিত্যকে কিংবা আরো পরে এই সমগ্রতার সন্ধান মুক্তি পেয়েছিল মার্কসবাদে। চিন্তায়, পাঠচর্চায় ও রুচিতে-অনুভূতিতে এই সমগ্রতার পিপাসা ছিল বলেই সাহিত্যরচনার আরো পরের ধাপে তিনি একই সঙ্গে উপভোগ করতেন 'কল্লোল'-পত্রিকা-কেন্দ্রিক বোহেমিয়ান চর্চা ও 'পরিচয়'-পত্রিকা-কেন্দ্রিক বুদ্ধির চর্চা এবং দ্বান্দ্বিক পরিহাসের বোধে উপভোগ করতেন উভয় গোষ্ঠীরই পারস্পরিক কটুকাটব্য।

১৯২৮ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে তিনি 'কল্লোল'-'প্রগতি' 'বিচিত্রা' কিংবা 'ধূপছায়া' পত্রিকায় লিখে চলেছেন স্বদেশী ও বিদেশী চিত্রকর-ভাস্করদের সম্পর্কে প্রবন্ধ, বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ—অন্যদিকে গান শোনার পর্বও চলেছে বন্ধুদের সঙ্গে।

এই পরিগ্রহণের অভিযানে বন্ধু ও শিক্ষকের ভূমিকা ছিল তাঁর কলেজের কয়েকজন অধ্যাপকের। বিষ্ণু দে বি. এ. পড়েছিলেন সেণ্ট পলস কলেজে (১৯৩০-৩২)। সেণ্ট পলস কলেজের বেশ কয়েকজন অধ্যাপক শুধু তাঁর জ্ঞানচর্চার পরিধিকেই বিস্তৃত করেননি, তাঁকে উৎসাহিত করে তুলেছেন সংগীত বিষয়ে, পাশ্চাত্য সংগীত বিষয়ে। "কবি প্রসন্নচিত্তে স্মরণ করেন যে উষ্ণ সমাদর ও স্নেহ তিনি পেয়েছিলেন সেণ্ট পলস কলেজের দিনগুলিতে, রেভারেণ্ড সি. সি. মিলফোর্ড, অধ্যাপক এইচ ক্র্যাবট্রি এবং ঐ কলেজেরই তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ পি. জি. ব্রিজের কাছ থেকে। এবং সবচেয়ে অসাধারণ ক্রিস্টোফর একরয়েডের প্রভাব, যিনি তরুণ বিষ্ণু দে-কে চিনিয়েছিলেন আধুনিক ইতিহাসের জগৎ, এবং 'মার্কসবাদের গুপ্তরহস্য', যে মার্কসবাদ বিশ্বাস করত সাম্যবাদী সমাজে ("সব জিনিসই সকলের সমান"), কারণ সমস্ত

মানুষই তো ভাই-ভাই—"সকলেই ঈশ্বরের সন্তান।" ইওরোপীয় ধ্রুপদী সংগীতের প্রতি ভালোবাসাও তিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন বিষ্ণু দে-র মধ্যে। ১৯৩২-এ সেন্ট পলস কলেজ থেকে তিনি পেলেন স্বর্ণপদক ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তির জন্য। এই সবই নিশ্চয়ই অত্যন্ত উপকারী হয়েছিল, ওয়ার্ডস্বার্থ হলে বলতেন, কবির মনের বিকাশে"।[৪৮] বিষ্ণু দে-ও কোনো এক প্রসঙ্গে স্মরণ করেছেন তাঁর অধ্যাপকদের: "অধ্যাপক ক্রিস্টোফর একরয়েড আমার ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপক মিলফোর্ডের মতো তিনিও সংগীতোৎসাহী, অবশ্য মিলফোর্ড সাহেব ক্যালকাটা স্কুল অব মিউজিকের অর্কেস্ট্রা অনুষ্ঠানে চেলো ও ডবল বেস বাজাতেন। একরয়েড সাহেব অসাধারণ পরিশ্রম করতেন ছেলেদের নানা রকম সাহায্য করতে এবং একসময়ে কলেজে স্বেচ্ছায় সপ্তাহে ত্রিশ ঘণ্টা ক্লাসও করতেন।...যিনি মাঝে মাঝে কলেজ চ্যাপেলে অর্গ্যানে বাখ বাজতেন পাশের ঘরে ছাত্রকে চকিত করে তুলে, তিনি অধ্যাপক ক্র্যাবট্রি...।"[৪৯] মনে হয়, যে পাশ্চাত্য সংগীত বিষ্ণু দে-কে সারাজীবন পরবর্তীকালে অনুপ্রাণিত করে রাখে, কবিতারচনাকেও প্রভাবিত করে, সেই সংগীতানুরাগ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয়েছে এখান থেকেই।

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য এম. এ. পড়তে এসে তিনি সাক্ষাৎ পান দুজন বিখ্যাত অধ্যাপকের—একজন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ,[৫০] আরেকজন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।[৫১] এই দুই অধ্যাপক বিষ্ণু দে-কে গভীরভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেন (সেই কৃতজ্ঞতাতেই তিনি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চোরাবালি' উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষকে এবং বহুকাল পরে 'হে বিদেশী ফুল' নামক অনুবাদগ্রন্থটি প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে)।

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত, "অসাধারণ ছিল যাঁর প্রাণময় শিক্ষণ উৎসাহ আর বহুভাষার সাহিত্য বিষয়ে তন্ন তন্ন জ্ঞান।"[৫২] "এম. এ. ক্লাসে তিনি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের, সেই এলিজাবেথান ও শেকসপীয়রীয় বিষয়ের মহাপণ্ডিত, যিনি প্রত্যেকটি ছাত্রের মধ্যে সঞ্চারিত করতেন এলিজাবেথান উত্তাপ, সে-যুগের কর্মপ্রেরণা ও প্রাণশক্তি।"[৫৩] অবশ্য প্রফুল্লচন্দ্রের উৎসাহ এলিজাবেথান যুগ সম্পর্কে যতটা, পরবর্তীদের সম্পর্কে ততটা নয়, বিশেষত এলিঅট-পাউণ্ড প্রমুখ আধুনিক কবি সম্পর্কে তিনি খড়্গহস্ত—"যিনি আঠারো শতাব্দীর পরে প্রায় সব কাব্যসাহিত্যই বিপথগামী অথবা বাজেই মনে করতেন।"[৫৪] বিষ্ণু দে কৌতুকের সঙ্গে স্মরণ করেছেন কিভাবে

এলিঅটের কবিতার 'পাঠাহত' কপিটি দেখে চমৎকৃত হন প্রফুল্লচন্দ্র ছাত্রের অধ্যবসায়ী কাব্যপাঠের সিরিয়সনেসে। ফলে যদিও এলিঅট-সম্পর্কে তখনও তিনি ছিলেন বিমুখ, কিন্তু ঐ কাব্যে ছাত্রের তৃপ্তি বিষয়ে তিনি আর সন্দেহ পোষণ করেন নি—"সে উদারতা তাঁর পাণ্ডিত্য ও শিক্ষক-যশের মধ্যেও ছিল।"[৫৫]

রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের প্রকৃতি ছিল অন্যরকমের। তিনিও নিঃসন্দেহে উঁচুদরের পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর রুচির ব্যাপ্তি ছিল আরো বেশি এবং শুধু শিল্পসাহিত্য বিষয়েই নয়, জীবনযাপনের সমগ্রতার দিকে ছিল তাঁর ঝোঁক। বিষ্ণু দে-র উপর তাঁর গভীর একটা প্রভাব ছিল বলে মনে হয়। "বিষ্ণু দে-র শিক্ষকদের মধ্যে নিঃসংশয়ে অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষই সবচেয়ে সঠিক উপলব্ধিতে ও সমাদরে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের ব্যক্তিত্বের আত্মসংবৃত প্রশান্তি, তাঁর ব্যাপক পাণ্ডিত্য ও জীবন সম্পর্কে জ্ঞান ও-সংগীতপ্রীতি—এ সব কিছুই গভীরভাবে স্বরে স্বরে মিলেছিল বিষ্ণু দে-র ব্যক্তিত্বের মধ্যে। বিষ্ণু দে এই সদা স্নেহশীল শিক্ষক ও বন্ধুর কাছেই মন খুলে দিতে পারতেন নানা স্বাধীন বিষয়ে, শেষপর্যন্ত তাঁর নিজের সাহিত্য-বিষয়ক পড়াশোনা ও পরীক্ষানিরীক্ষা সম্পর্কেও।"[৫৬]

বিষ্ণু দে-র নিজের কৃতজ্ঞ উক্তি এ-বিষয়ে: "অন্যদিকে প্রাজ্ঞ অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, যাঁর সাহিত্যে শিল্পে সংগীতে ইতিহাসে ভূগোলে জ্ঞান ও প্রাণময় আগ্রহ ছিল আশ্চর্য। যাঁর বিষয়ে প্রফুল্লবাবুর মতো কড়া বিচারকও বলতেন: আমাদের অ্যাকাডেমিক জগতে একমাত্র রবির স্থান আছে নিজেরই রুচিবোধে···। রবিবাবুর আত্মসংকুচিত বিনীত সজ্জন স্বভাব, কিন্তু প্রতিষ্ঠাখ্যাত বহুবিধ পাণ্ডিত্যের মধ্যে আর অধ্যক্ষজীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও এলিঅট-পাউণ্ডদের রচনার বিস্মিত ও নন্দিত পাঠই তার প্রমাণ। রবিবাবুর তখন থেকেই স্থির লেখকের প্রতি আশ্চর্য স্নেহপ্রীতি ও সাহিত্যিক পরিগ্রহণ ও অনুমোদন। এবং ঐতিহ্যজিজ্ঞাসায় তাঁর জ্ঞান ছিল সহায়।"[৫৭] স্পষ্টতই রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের সমগ্রতা—বিশেষত তাঁর বিশ্বজনীন আগ্রহ, রুচিবোধ ও ও ঐতিহ্যজিজ্ঞাসা এবং সঙ্গে সঙ্গে কবির প্রতি সহমর্মিতা—এ সমস্তই বিষ্ণু দে-র কাছে ছিল সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক, ফলত তাঁর প্রভাবই ছিল অনেক বেশি সৃষ্টিশীল—যদিও তিনি উভয় প্রান্ত থেকেই পরিগ্রহণে সক্ষম: এক প্রান্তে প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অ্যাকাডেমিক কিন্তু নিখাদ শুদ্ধ পাণ্ডিত্য, অন্য প্রান্তে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের শিক্ষিত সৃজনধর্মী সমগ্রতার অনুসন্ধানী রুচি ও ব্যক্তিত্ব।

সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সূত্রপাতেই সম্পূর্ণ দুই ধরনের, কিন্তু বোধহয় কোনো এক দিক থেকে তুলনীয় দ্বান্দ্বিক পরিগ্রহণের দৃষ্টান্ত পেলাম বিষ্ণু দে-র জীবনে —যিনি একই সঙ্গে 'কল্লোল' ও 'পরিচয়'-এর আড্ডার রস পান এবং দুই ভিন্নধর্মী অধ্যাপকের কাছে হতে পারেন ঋণী।

ধীরে ধীরে এইভাবে জ্ঞান ও রুচির পরিধি বেড়ে চলেছে—শুধু সাহিত্য নয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের নানা শাখা প্রশাখার সংলগ্নতা; শুধু শব্দজ্ঞান নয়, চিত্রকলা ভাস্কর্য বিশেষত সংগীতের রসপিপাসা। সেণ্ট পলস কলেজের দিনগুলিতে যে গান শোনা শুরু হয়েছিল, তা পরবর্তী বছরগুলিতে তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে অর্কেস্ট্রা শুনতে যাওয়া, বাড়িতে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজানো—দীর্ঘদিনের এই সংগীতচর্চায় তাঁর সঙ্গী ছিলেন কখনো জ্যেষ্ঠ নীরদ সি চৌধুরী বা অপূর্বকুমার চন্দ, বন্ধু জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বা চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অনুজ সমর সেন, ইত্যাদি।[৩৮] সমর সেন এই আবহকেই ফুটিয়ে তুলেছেন তার ছোট্ট রচনায়: "বস্তুত সেই সব দিনগুলিতে তিনি এবং তাঁর কোনো কোনো বন্ধুরা কবির কাজের সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছিলেন।...কবিতার জন্য প্রয়োজন ছিল যেমন প্রেরণা, তেমনি শৃঙ্খলাবোধ। নানাস্তরবিশিষ্ট ঐতিহ্যেরই অংশ এটা এবং তা দাবি করত দর্শন, সংগীত ও চিত্রকলার জ্ঞান, ভারতীয় এবং পশ্চিমী উভয়ত—আবদুল করিম খাঁ, যামিনী রায়, বাখ বা বীটোফেনের সঙ্গে পরিচয়—এবং পরবর্তীকালে মার্কস ও লেনিন ও সঙ্গে সঙ্গে ফ্রয়েড। রবীন্দ্রনাথ ও শেলী যথেষ্ট নয়। ইংরেজি লেখকরাও যথেষ্ট নয়। জানতে হবে কিছু কিছু ফরাসী প্রতীকবাদী বা রিলকে বা এমনকি রুশ কবিদের। সংস্কৃত সাহিত্যের গভীরে ঢুকতে হবে। বস্তুত হাতে-তৈরি সেই সূক্ষ্ম গ্রামোফোনটি (ই-এম-জি), তার অদ্ভুতদর্শন চোঙাটিও কবিদের প্রেরণা ও শৃঙ্খলার অঙ্গ ছিল।"[৩৯]

ছাত্রবয়সের এই উত্তাল দিনগুলিতেই (১৯৩২-৩৪) বেরোয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস,' লেখা চলতে থাকে 'চোরাবালি'র বহু কবিতা, 'পরিচয়'-এর আড্ডার সূত্রে লেখা হতে থাকে প্রুস্ত-লরেন্স-হাকসলি-এলিঅট প্রসঙ্গে প্রবন্ধ—চলতে থাকে ছবি দেখা, গান শোনা—বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রবল আড্ডা—'পরিচয়'-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সহপাঠী বন্ধু জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বা ক্ষিতীশ

রায়। এ সময়েই এম. এ. ক্লাসের সহপাঠিনী ছিলেন প্রণতি রায়চৌধুরী। ১৯৩৪ সালে এম. এ. পাশের অল্প পরেই তাঁকে বিবাহ করেন বিষ্ণু দে।

এর পরই একটা বাঁক এসে যায় বিষ্ণু দে-র জীবনে ও সাহিত্যে। অনিবার্যভাবে এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্য তাঁকে নিয়ে যায় গভীরতর উৎসে। এলিঅট থেকে পাওয়া তাঁর আত্মসচেতনতা ও ঐতিহ্যবোধই তাঁকে প্ররোচিত করে এলিঅট-বর্জনে। এই উত্তরণের বিষয়ে পরোক্ষ উক্তিতে নিজের সম্পর্কেই বললেন : "একজন তাই থেকে উত্তরোত্তর বুঝতে লাগল যে পথ চওড়া হচ্ছে—সংকীর্ণ অর্থে, প্রাদেশিক অর্থে সাহিত্যসৃষ্টি ও চর্চা থেকে সাহিত্যের উৎসে ও বক্তৃতায়, ইতিহাসে, জীবনের দর্শনে, জ্ঞানের কর্মিষ্ঠতায়। কাল্পনিক ধর্মীয়তায় নয়, মৃত বা ভুঁইফোঁড় বর্বর রক্ষণশীলতায় নয়। দেখলেন যে অ্যাংলো-ক্যাথলিক রাজন্যবাদী এলিঅটের ঐ ঐতিহ্য ও ব্যক্তির সম্বন্ধের অসম্পূর্ণ নির্ণয়ই নিয়ে যায় সাহিত্যের পাদপীঠে, সমাজজীবনে, রাজনীতির ইতিহাসে, অতীতে ও ভবিষ্যতের চিন্তায় অর্থাৎ বর্তমানেই। সাহিত্যিক রূপান্তর হয়ে ওঠে সাবিক রূপান্তরের চৈতন্য।"৬০

১৯৩৪ সালে তিনি এম. এ. পাশ করেন—১৯৩৫ সাল থেকে তিনি শুরু করেন রিপন কলেজের শিক্ষকতা। রিপন কলেজে অধ্যক্ষ তখন তাঁরই প্রিয় শিক্ষক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। সহকর্মী বুদ্ধদেব বসু, যাঁর সঙ্গে 'প্রগতি' ও 'কবিতা' পত্রিকার সূত্রে বন্ধুত্ব ছিল নিবিড় এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যাঁর সঙ্গে আজীবন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রপাত তখনই।৬১ ১৯৩৫ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে 'পূর্বলেখ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি লেখা হচ্ছে একে একে। 'চোরাবালি'র নেতিবাচক ব্যঙ্গবিদ্রূপের জগৎ ছেড়ে এসে তিনি প্রবেশ করছেন সমাজসচেতনতার নতুন জগতে। মার্কসবাদে তাঁর প্রত্যয় কবিতার বিষয়ে ও শরীরে এনে দিয়েছে নতুনত্ব।৬২

সূত্রনির্দেশ ও টীকা

১ শ্যামাচরণ দে ছিলেন বিদ্যাসাগরের সহযোগী। তাঁর সম্পর্কে 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ'-এ আছে নিম্নলিখিত উল্লেখ : ক. বিদ্যাসাগরের কাছে শ্যামাচরণ সংস্কৃত পড়তে যেতেন (পৃঃ ১১৪)। খ. ১৮৪৭-এর এপ্রিল মাসে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত ও শিক্ষকরা যে আবেদনপত্র পেশ করেন

(বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ নামঞ্জুর করার জন্য), তার মধ্যে শ্যামাচরণ দে সরকার একজন (পৃ ১৫৫)। গ. ১৮৬৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ছোট লাটের কাছে পাঠানো আবেদনপত্রে (বহুবিবাহরোধের জন্য) স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে শ্যামাচরণ একজন (পৃ ২৮৩)। ঘ. বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্যুইটি ফাণ্ড'এর প্রতিষ্ঠাকালে চেয়ারম্যান ছিলেন শ্যামাচরণ (পৃ ৩৪৮)।

(বিনয় ঘোষ, 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ'। ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৩৭৩)

২ এই ঘটনার বিবরণ নাকি কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-লিখিত 'বঙ্গের রত্নমালা' (২য় খণ্ড)-তে আছে। ১ম খণ্ডটি অনেক গ্রন্থাগারে থাকলেও ২য় খণ্ডটি কোথায়ও খুঁজে পাই নি। শ্যামাচরণের জীবনের ঘটনাটি শুনেছি ঐ গ্রন্থের 'স্নেহের দান' শিরোনামায় বর্ণিত হয়েছে।

অবশ্য সংক্ষেপে ঘটনাটি শিবনাথ শাস্ত্রীও বর্ণনা করেছেন। প্রাসঙ্গিকতাবোধে পুরো অংশটাই উদ্ধৃত করলাম: "আর এক সাধু পুরুষের নাম এইখানেই উল্লেখ করা উচিত। ইনি সে সময়কার কলিকাতাবাসী শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের ও সর্বসাধারণের প্রীতির ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইহার নাম শ্যামাচরণ (দে) বিশ্বাস। কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের সম্মুখেই ইহার ভবন; সুতরাং প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার ভবনে সর্বদা গমন করিতেন। সেখানে প্রায় প্রতিদিন এই সকল মহাজনের একটি সুহৃদগোষ্ঠীর অধিষ্ঠান হইত। শ্যামাচরণবাবু নিজে সাধু, সদাশয়, সত্যবাদী, স্পষ্টভাষী ও অকৃত্রিম মানুষ ছিলেন। এজন্য তাঁহাকে সকলেই ভালবাসিত। এমনকি আমরা যখন কালেজের ছেলে, আমরাও তাঁহাকে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতাম। তিনি কিরূপে স্বীয় ভ্রাতা বিমলাচরণ বিশ্বাসের গুরুতর ঋণভার স্বীয় স্কন্ধে লইয়া, নিজের উচ্চ বেতন ও পদ সত্ত্বেও, চিরদিন টানাটানির মধ্যে বাস করিয়া ছিলেন, তাহা আমাদের ন্যায় যুবকগণের আদর্শস্থল ছিল। লাহিড়ী মহাশয় শ্যামাচরণবাবুর সহিত গভীর প্রীতিসূত্রে বদ্ধ ছিলেন।"

(শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ'। নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৩৬২, পৃ ৩৩০)

৩ বংশপরিচয়ের ব্যাপারে উৎসাহী ব্যক্তিদের অবগতির জন্য জানানো যেতে পারে: অবিনাশচন্দ্র দে-র ভগিনীপতি ছিলেন রাজশেখর বসু এবং বিষ্ণু দে-র সম্পর্কিত ভগিনীপতি শরৎচন্দ্র বসু। কিংবা "On his mother's side he

(বিষ্ণু দে) is related to the Bhoses of Pataldanga". (Kshitis Roy, A Note on Bishnu Dey. *Poetry Bengal,* ১৯৭০ ৷)

৪ পোষাক-আষাক বা চালচলন দেখে প্রথম আলাপেই বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মনে হয়েছে : "উনিশ শতকে বাংলার নবজাগৃতি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এবং কলেজ স্কোয়ারের উত্তরে বইয়ের-দোকানে-ভরা গলিতে নামাঙ্কিত শ্যামাচরণ দে-র বংশধর বিষ্ণুবাবুকে দেখে মনে হত যে বনেদী কলকাতার ধারা বজায় রেখে চলেছেন ৷"

(হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'তরী হতে তীর' ৷ মনীষা, ১৯৭৪, পৃ ৩২৩)

৫ বিষ্ণু দে, 'এই আমাদের কলকাতা' ৷ 'সপ্তাহ', ৮ জানুয়ারি, ১৯৭১ ৷

৬ ঐ ৷

৭ বিষ্ণু দে, 'আমাদের মেয়েরা' ('তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ') ৷

৮ এই অংশের সমস্ত উদ্ধৃতি ও বক্তব্যের উৎস 'এই আমাদের কলকাতা' ৷

৯ Ashok Sen, The Poet Bishnu Dey and His Poetry. *Bharatiya Gnanpith* (১৯৭৩ সালে পুরস্কারপ্রাপ্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ইংরেজিভাষায় স্মারকগ্রন্থ), পৃ ২ ৷ অনুবাদ বর্তমান লেখকের ৷

১০ ডঃ বেঞ্জামিন স্পক (১৯২৫-) ৷ *Baby and Child Care*-এর বিখ্যাত মার্কিন লেখক, যে গ্রন্থটির প্রচারসংখ্যা বাইবেল বা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-র সঙ্গেই মাত্র তুলনীয় ৷ পরবর্তীকালে ভিয়েতনামের যুদ্ধে মার্কিন যুবকদের বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য বিচারাধীন হন (দ্রঃ Jessica Mitford, *The Trial of Dr. Spock.* Vintage, 1970) ৷

১১ Benjamin Spock, *Decent and Indecent.* Fawcett Pub., ১৯৭১, পৃ ৩৬ ৷ অনুবাদ বর্তমান লেখকের ৷

১২ বিষ্ণু দে কথা প্রসঙ্গে এই গল্প অনেক সময়ই করেছেন অন্তরঙ্গদের সঙ্গে ৷

১৩ 'Speech of Shri Bishnu Dey.' *Bharatiya Gnanpith* (১৯৭৩ সালে প্রদত্ত বক্তৃতা), পৃ ৩ ৷ অনুবাদ বর্তমান লেখকের ৷

১৪ কবিতা সিংহ, 'ঘরোয়া কথা' ৷ 'দৈনিক কবিতা,' শরৎ ১৯৬৯ ৷ সাধারণভাবে অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য ও দিগভ্রান্ত এই সাক্ষাৎকার-বিবরণী, কিন্তু

আলোচ্য প্রসঙ্গটি বিষ্ণু দে অন্য অনেককেই গল্প করে বলেছেন।

১৫ Ashok Sen, 'The Poet Bishnu Dey and His Poetry' ৷ পৃ ২।

১৬ কবিতা সিংহ, 'ঘরোয়া কথা'।

১৭ বিষ্ণু দে, 'কি করে লেখক হলুম'। 'অমৃত', ৯ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা।

১৮ Ashok Sen, 'The Poet Bishnu Dey and His Poety' ৷ পৃ ২।

১৯ বিষ্ণু দে, 'কি করে লেখক হলুম'। "ছেলেবেলাতে 'সন্দেশ'-এ পুরস্কারের জন্য একটা কবিতা পাঠিয়েছিলাম—বলাই বাহুল্য পুরস্কার পাই নি।"

(বিষ্ণু দে, প্রশ্নোত্তর। 'অন্যমনে,' শরৎ ১৩৭৬)

২০ 'Speech of Shri Bishnu Dey'। পৃ ৪।

২১ বিষ্ণু দে, 'কি করে লেখক হলুম'।

২২ 'Speech of Shri Bishnu Dey'। পৃ ৪।

২৩ Erik H. Erikson, *Identity: Youth and Crisis*. Faber & Faber, ১৯৬৮, পৃ ১৩৪। অনুবাদ বর্তমান লেখকের। এরিকসন জর্মানিতে-জাত ড্যানিশ মনস্তত্ত্ববিদ। মনঃসমীক্ষণ এবং মানসবিকাশের আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁর *Childhood and Society* বা *Young Man Luther* ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি যে মানসবিকাশের, বিশেষত প্রতিভাধরদের মানসবিকাশের তত্ত্ব হাজির করেছেন, তা আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে।

২৪ বিষ্ণু দে, 'কি করে লেখক হলুম'।

২৫ 'Speech of Shri Bishnu Dey'।, পৃ ৪।

২৬ বিষ্ণু দে, 'কি করে লেখক হলুম'।

২৭ 'Speech of Shri Bishnu Dey'। পৃ ৫।

২৮ "প্রশ্ন: কবে থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেন?—বিষ্ণু দে-র উত্তর: সম্ভবত ১৯২৩-এ ছাপতে থাকি। প্রথম প্রকাশিত কবিতা মনে নেই। তবে যতদূর মনে হচ্ছে 'ফ্রেঞ্চ ভার্স ফর্ম' নিয়ে 'প্রগতি' আর 'বিচিত্রা'তে কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।"

('অন্যমনে,' শরৎ ১৩৭৬)

২৯ বিষ্ণু দে, 'কি করে লেখক হলুম'।

৩০ বিষ্ণু দে, 'জন্মাষ্টমী' ('পূর্বলেখ')।

৩১ বিষ্ণু দে, 'রবীন্দ্রনাথ ও শিল্পসাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা'। লেখক সমবায় সমিতি, ১৯৬৬, পৃ ৩৬।

৩১ক বিষ্ণু দে, 'যাত্রা' ('উর্বশী ও আর্টেমিস', ১ম সং)।

৩২ ঐ।

৩৩ বিষ্ণু দে, 'কি করে লেখক হলুম'।

৩৪ 'Speech of Shri Bishnu Dey' । পৃ ৪ ।

৩৫ ঐ। পৃ ৫।

৩৬ বিষ্ণু দে, 'টমাস স্টার্ন্‌স্ এলিঅট', 'এলোমেলো জীবন ও শিল্পসাহিত্য'। ইস্ট এণ্ড কোম্পানি, পৃ ৮১।

৩৭ Amalendu Bose, 'Bishnu Dey', *Poetry Bengal*, Bishnu Dey Special Number, ১৯৭০।

৩৮ "Mr Eliot's influence as a poet and critic has thus been......a releasing force." (Bishnu Dey, 'Homage to T. S. Eliot' in *In the Sun and the Rain*. P P. H., ১৯৭২, পৃ ২৭২)।

৩৯ বিষ্ণু দে, 'কি করে লেখক হলুম'।

৪০ ঐ।

৪১ ঐ।

৪২ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র 'কাব্যের মুক্তি' পরে ছাপা হয়েছে তাঁর 'স্বগত' গ্রন্থে (১ম সং, ভারতীভবন, ১৩৪৫। পৃ ১৯-৩৯)।

৪৩ বিষ্ণু দে, 'টমাস স্ট্যর্ণস এলিঅট'।

৪৪ বিষ্ণু দে, 'কি করে লেখক হলুম'।

৪৫ ঐ।

৪৬ "এন্তার বই আর দেদার সিগারেট—দুই-ই অজস্র পড়তে এবং পোড়াতে দেয় বন্ধুদের...।"

(অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, 'কল্লোল যুগ' ।এম. সি. সরকার, ১৩৭২. পৃ ২৫৬)।

"বিষ্ণু ছিল মনোযোগী ছাত্র, বিদেশী সাহিত্যের পোকা।"

(প্রবোধকুমার সান্যাল, 'বনস্পতির বৈঠকে'। 'দেশ,' ১৬ আষাঢ় ১৩৮০)।

৪৭ Amalendu Bose, 'Bishnu Dey.' *Poetry Bengal*।

৪৮ Ashok Sen, 'The Poet Bishnu Dey and His Poetry'। পৃ ২।

৪৯ কবিতা সিংহের 'ঘরোয়া কথা'-র প্রতিবাদে বিষ্ণু দে-র চিঠি। 'দৈনিক কবিতা সংকলন,' ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৭।

৫০ *Presidency College Centenary Volume* (1955)-এ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে বলা হয়েছে : "Professor of English, 1904, 1906-7, 1908-39, Emeritus Professor, 1939-48 ; the greatest teacher of English in the annals of Presidency College. While his far-reaching scholarship, amazing mastery of English, and incomparable teaching abilities (which included a rare gift for reading) breathed life into any topic or author he was asked to teach,......it was on Shakespeare that he reached the peak of his form and gave to generations of students an experience that can only be described as wonderful." এ সম্পর্কে তাঁর আরেকজন ছাত্রের উক্তিও উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা যাচ্ছে না :

"He was an institution in himself.......As a Shakspeare teacher Prof P. C. Ghosh combined the best of H. M. Percival with the best of D. L. Richardson, and added something distinctly his own. He imbibed the latter's art of marvellous Shakspeare reading and the former's power of masterly textual interpretation, and both these traits were sustained and enriched by a perfect projection of a lively personality and wit into his teaching "

(Krishna Ch. Lahiri, 'Shakespeare in the Calcutta University' in *Calcutta Essays on Shakespeare*. পৃ ১৮৮-৯০)।

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের "magical personality"-র কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "He was voluble, volatile, often volcanic, and changing the metaphor, he would shower upon his pupils a cascade of anecdote, allusion, ebullient sentiment and also trenchant satire of folly and pomposity." ('A Memoir,' *A Literary Miscellany : Taraknath Sen.* Rupa & Co., 1972, পৃ xxvii)।

৫১ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ সম্পর্কে পূর্বোক্ত Centenary Volume-এ এই

বলা হয়েছে : "One of the finest teacher of English Bengal has produced in the present century, one gifted with a rare literary sense, Rabindranarayan Ghosh was Professor of English at this college 1915-16. Later he joined the Ripon College and became its principaal."

কৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ীও পূর্বোক্ত গ্রন্থে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষকে "Stalwart among Shakespeare teachers" বলে উল্লেখ করেছেন (পৃ ১৮১)।

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষের মধ্যে তুলনা করে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন :

"P. C. Ghose was far too absorbed in the concrete to bother about abstract generalisations. Alone of the old guard, Rabindranarayan Ghose had the requisite temperament and also adequate equipment, but he never trod this ground." (ঐ। পৃ XV)।

"লোকমুখে শুনি রবীন্দ্রনারায়ণ পণ্ডিত এবং পণ্ডিত হয়েও আধুনিক সাহিত্যকে অস্পৃশ্য ভাবেন না, বহুনিন্দিত আমাদের লেখারও পাতা উল্টে থাকেন।"

(বুদ্ধদেব বসু, 'আমার যৌবন'। শারদীয় 'দেশ', ১৩৮০)।

"অধ্যক্ষ তখন ছিলেন রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সাহিত্যের পঠন-পাঠনে গভীর ব্যুৎপত্তি এবং চরিত্রের সদাশয় সারল্য বাংলার মহানুভব মণ্ডলীতে যাঁর মর্যাদা নির্দিষ্ট করেছিল, সাধারণ বাঙালি কুসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হলেও যাঁর চিত্তপ্রসার ও মানসিক ঔদার্য প্রকৃতই স্মরণীয়। 'স্বদেশী' প্রভাবে, এবং পুণ্যশ্লোক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্থাপিত 'Dawn Society'র সংস্পর্শে, প্রেসিডেন্সি কলেজের সরকারী চাকরি ছেড়ে রিপনে যোগ দিয়েছিলেন—ব্যক্তিত্বে অহমিকা ছিল না, উষ্মা ছিল না।"

(হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'তরী হতে তীর।' পৃ ৩২০)।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অসাধারণ দুই শিষ্য—রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ও বিনয় সরকার। এ-সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"The former wrote some important original papers on India's literary wealth, Indian nationalists and Indian art, the civilization of Northern India, and interpretation of Indian

art in the light of Indian records, the last name paper being singled out by Havell for particular praise."

(Bimala Prosad Mukherji, 'History' in *Studies in the Bengal Renaissancc*, পৃ ৩৮০) ।

"The pioneering role of Rabindranarayan Ghose, Nripendra Chandra Banerji and Radhakumud Mukherji in the matter of educational boycott, under the leadership of Satischandra Mukherji and Hirendranath Datta, is now a forgotten reality. (Uma and Haridas Mukherji, 'Attempts at national education,' পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪১৩) ।

৫২ বিষ্ণু দে, 'কি করে লেখক হলুম' ।

৫৩ Ashok Sen, 'The Poet Bishnu Dey and His Poetry'. পৃ ২ ।

৫৪ বিষ্ণু দে, 'কি করে লেখক হলুম' ।

৫৫ ঐ ।

৫৬ Ashok Sen, The Poet Bishnu Dey and His Poetry. পৃ ২।

৫৭ বিষ্ণু দে, 'কি করে লেখক হলুম' ।

৫৮ অবশ্য এই সাহচর্য ঠিক বর্তমান কালসীমার মধ্যেই সকলের সঙ্গে ঘটে নি—কিন্তু সব মিলিয়ে যে একটা সাংগীতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল, তার খানিকটা আভাস দেওয়া গেল ।

"বিষ্ণুর কাছে আমার আরও একটা ঋণ আছে। পাশ্চাত্য সংগীতের রামধনু-আকাশের প্রতি সে-আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। / ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে একদিন বিষ্ণুর বাড়িতে একটি রেকর্ড শুনলাম : Thousands Years of Music.··· / বিষ্ণুর বাড়িতেই শুনলাম বেঠোফেনের ফিফথ ও সিকসথ সিম্ফনি। / ··· বিষ্ণু একদিন বলল—চলো নীরদদার বাড়িতে যাই। ওঁর কাছে মোৎসার্ট-বেঠোফেন-বাখ-এর প্রচুর কালেকশন আছে। / নীরদচন্দ্র চৌধুরী মশাই তখন চক্রবেড়েতে থাকতেন। তিনি শুধু রেকর্ডই শোনালেন না, সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু ব্যাখ্যাও করে দিলেন। /··· সহোদরপ্রতিম চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় বিষ্ণুর বাড়ি আসত—আমাদের ঘনিষ্ঠ সহচর, মার্কসপন্থায় বিশ্বাসী উজ্জ্বল তরুণ। তারও ছিল ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রকাণ্ড সংগ্রহ এবং

এতৎ বিষয়ে অগাধ জ্ঞান। রেকর্ড শুনতে চঞ্চলের বাড়ি যেতাম। প্রত্যেক কমপোজারের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য বিষয়ে আলোচনা হত।"

(জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, 'আমাদের নবজীবনের গান।
'কালান্তর', শারদীয় ১৩৮১)

৫৯ Samar Sen, 'The Still Centre', *Poetry Bengal.* পৃ ৬।

৬০ বিষ্ণু দে, 'কি করে লেখক হলুম'।

৬১ "আরো একটি সুখের সময় মনে পড়ে : হঠাৎ কোনো-কোনো দিন, কোনো বিশেষ কারণে মধ্যদিনের ছুটি হ'য়ে গেলে, একসঙ্গে বাড়ি ফিরি আমি আর বিষ্ণু দে ; ইচ্ছে ক'রে আলিপুর-ঘুরতি ট্রাম ধরি এসপ্লানেড থেকে—ট্রাম ফাঁকা, ময়দানের মধ্য দিয়ে পথ নির্জন, আমাদের গায়ে মুখে ঝাপটা দেয় বাতাস, আকাশে কাঁপে রোদ্দুর ; আমরা বিনিময় করি গোল্ড ফ্লেক বা প্লেয়ার্স, বিষ্ণু দে তাঁর পকেট থেকে বের করেন তাঁর স্বগৃহরচিত মিঠে পানের ছোট্ট খিলি—পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্কৃতির সেই অনবদ্য অবদান, যাতে ঠোঁট লাল অথবা রসনা লালায়িত হয় না, শুধু একটা ঈষৎমিষ্ট সুগন্ধী স্বাদ ছড়িয়ে পড়ে সারা মুখে। মসৃণ কাটে ভ্রমণের সেই একঘণ্টা : বিষ্ণু যখন লেক মার্কেটে নেমে যান তখনও আমাদের কথা ফুরোয় নি—কিন্তু মনে জানি আজই হয়তো সন্ধেবেলা আবার দেখা হবে।"

(বুদ্ধদেব বসু, 'আমাদের কবিতাভবন।'
শারদীয় দেশ, ১৩৮১)

"রিপন কলেজে তাঁকে (বিষ্ণু দে-কে) প্রথম দেখলাম ; অনতিবিলম্বে চিন্তার খানিকটা সাযুজ্য আবিষ্কৃত হল ; সভাসমিতির ব্যাপারে অনীহাগ্রস্ত হলেও, 'প্রগতি' আন্দোলনকে মাঝে মাঝে বিদ্রূপ করলেও বিরূপতা দেখালেন না, বরঞ্চ নিজের ঈষৎ তির্যক ভঙ্গিতে সহায়তাই করলেন, 'পরিচয়' গোষ্ঠিতে আমার প্রতিষ্ঠাকে সুগম করে দিলেন—আরম্ভ হল অন্তরঙ্গ সহযোগিতা যা আজও অটুট।"

(হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'তরী হতে তীর'। পৃ ৩২৩)।

৬২ মার্কসবাদকে ঠিক কখন থেকে বিষ্ণু দে গ্রহণ করলেন, তা সঠিকভাবে আমার জানা নেই। তবে হঠাৎ করে নিশ্চয় হয় নি, ধীরে ধীরে এই প্রত্যয় গড়ে উঠেছে—এবং তার সূত্রপাত বহু আগে থেকেই। চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শুনেছি, বহু রাজনৈতিক কর্মীর সঙ্গে আলাপ তাঁকে

কীভাবে শ্রদ্ধাশীল করেছিল, কিংবা পররর্তীকালে অনেক কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে তাঁর কিভাবে যোগাযোগ বা আলাপ ঘটেছিল। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বও এ ব্যাপারে যথেষ্ট কাজ করেছিল—শুধু মার্কসবাদের পড়াশোনা নয়, তার কর্মকাণ্ডের প্রতিও তাঁকে আগ্রহী করে তুলেছিল।

"কলেজে নিয়মিতভাবে কবি বিষ্ণু দে-র সান্নিধ্য ও সৌহার্দ্যের গুণে... বুঝেছি যে মার্কসীয় নীতির মর্মবস্তু জীবনধর্মী প্রতিভা ও মনীষার প্রকৃত পরিপূরক বলেই তার আবেদন এত দুর্বার।"

(হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'তরী হতে তীর।' পৃ ৩২৬)

উপন্যাস পাঠের প্রস্তুতি

গোপাল হালদার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে
(২১-২৭ জানুয়ারি ১৯৭৪)
প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে।
মূল বক্তৃতা রাজশাহী বিশ্ব-
বিদ্যালয় থেকে 'বাঙলা
উপন্যাস পাঠের ভূমিকা' নামে
প্রকাশিত হবে। —লেখক

নভেলের বিকাশ : পাশ্চাত্য সাহিত্য

উপন্যাস এ যুগের সাহিত্যের প্রধান শাখা। আসলে গত দুশত বৎসরে উপন্যাসই হয়েছে যুগ-সাহিত্যের প্রধান মুখপাত্র। সে-দিক থেকে দেখলে সাহিত্যের ইতিহাসে উপন্যাস নবজাতক—বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তো নিশ্চয়ই। কারণ, ইংরাজি নভেলের আস্বাদনেই এ জাতীয় সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। সে দেড় শত বৎসর পূর্বেকার কথা—হিন্দু কলেজের ইয়ং বেঙ্গলের পর্বে (আনুমানিক ১৮২৯—১৮৩৯) হতে পারে, তার আগে নয় নিঃসন্দেহে।

নভেল, উপন্যাস : শব্দগত অর্থ

'নভেল' নামটার আমরা বাঙলা তর্জমা করি 'উপন্যাস' শব্দ দিয়ে। কিন্তু কবে এই 'উপন্যাস' শব্দটার প্রথম ব্যবহার, তাও সঠিক জানা নেই। ১৮৫৭/১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'আলালের ঘরের দুলাল'-কে কেউ উপন্যাস বলেছিল কি? কিম্বা বলেছিল কি 'নভেল'? 'সমাচার দর্পণ'-এর ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে

ফেব্রুয়ারির 'বাবুর উপাখ্যান' উপাখ্যান নামেই চলেছে—তা বিদ্রূপাত্মক লেখা। 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩) 'কলিকাতা কমলালয়'-এর মতোই নক্‌শা ছাড়া কিছু নয়। 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' (১৮২৬) নীতিকথা—তাঁর মিশনারী লেখিকাও তাকে 'নভেল' বলেন নি, 'উপন্যাস'ও বলেন নি। তা 'কথা', চিরদিনের 'কথাসাহিত্য'র নীতিমূলক কাহিনী। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর সময়কার (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থের নামটি তাই উল্লেখযোগ্য—তা 'উপন্যাস'। সে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-ই এদিক থেকে আসল উল্লেখযোগ্য বস্তু; তাতে উপন্যাসের গুণ স্বীকৃত। বিশ বৎসর পরে কিন্তু ভূদেববাবু ('পুষ্পাঞ্জলি'র মুখবন্ধে) লেখাটিকে "ইংরাজী রীতির অনুকরণে একটি আখ্যায়িকা" বলে উল্লেখ করেছেন, এবার 'উপন্যাস' বললেন না। উপন্যাস শব্দটা হয়তো ১৮৫৭-এর দিকেই প্রবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু তখনো পাকা হয় নি। তাই সে বছরের 'আলালের ঘরের দুলাল' 'উপন্যাস' নামটি ব্যবহার করে নি। বঙ্কিমবাবু 'রাজমোহন'স ওয়াইফ' (*Rajmohan's Wife*)-এ ইংরাজীতে 'নভেল' লেখায় নেমেছিলেন। বাঙলায় 'দুর্গেশনন্দিনী'কে ১৮৬৫-এর প্রথম সংস্করণেই বলেছিলেন, "বইখানি, ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস"। বোঝা যায় 'নভেল'-এর প্রতিশব্দরূপে 'উপন্যাস' শব্দটা তখন বাঙলায় স্থির হয়ে বসেছে। বোধহয় 'রোমান্স'-এর প্রতিশব্দরূপে 'উপন্যাস' আরও পরে কল্পিত। অবশ্য বাংলায় যথার্থ নভেলের প্রতিষ্ঠা 'বিষবৃক্ষ'-য় (১৮৭২), তা ঐতিহাসিক রোমান্স নয়, পারিবারিক-সামাজিক জীবনচিত্র বা কথাকাব্য। মোটামুটি তাই বলতে পারি—বাঙলা উপন্যাস মাত্র শতখানেক বৎসর আগে জন্মেছে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে (১৮৬৫) বা 'বিষবৃক্ষ'-য় (১৮৭২)। জিনিসটি না জন্মাতে তার নামকরণ হয় নি।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা জেনে রাখতে পারি: ব্যুৎপত্তির দিক থেকে 'উপন্যাস' শব্দটার অর্থ কিন্তু উপন্যাস নয়। সে অর্থ এই: উপ—অগ্রে বা পশ্চাতে, 'ন্যাস' (অর্থাৎ স্থাপিত প্রসঙ্গ); প্রস্তাবনা, উপক্রমণিকা বা মুখবন্ধ জাতীয় লেখা—মূল কথা নয়। উপন্যাস শব্দটা এখন বাংলায় চলে গিয়েছে, না-হলে ইংরাজী 'নভেল' শব্দটা চললেও ক্ষতি হত না। ভারতবর্ষের অন্য অনেক সাহিত্যেই 'নভেল' অর্থে 'উপন্যাস' অচল। হিন্দীতে 'নভেল'কে বলে 'কাহিনী'। তা সম্ভবত 'ফিক্‌শন' (fiction) অর্থেই সুপ্রযোজ্য। মারাঠীতে বলে 'কাদম্বরী', তা মোটেই সুপ্রয়োগ নয়। গুজরাতীতে বলে 'নওল কথা'

—বরং এটি ভালো—ইংরাজী 'নভেল'-এর সঙ্গে ধ্বনিগত আত্মীয়তাও রক্ষিত হচ্ছে, আর সাহিত্যের এ শাখার জন্মগত নবীনত্বও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে।*

ভারতবর্ষে কেন, সকল সাহিত্যেই নভেল নবজাতক

বংশধারা : কথা সাহিত্যের কথা

এ কথার অর্থ অবশ্য এ নয় যে, নভেল বা উপন্যাস হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েছে। নভেল এ যুগের সন্তান বটে, কিন্তু তারও গোষ্ঠী-গোত্র আছে। বহু পুরানো সেই বংশধারা। উপন্যাস বা নভেল শত হলেও গল্প। এ বংশ গল্পের বংশ। "The Novel tells a story"—ই. এম. ফর্স্টারের এ কথাটা কথার কথা নয়। নভেল সত্যই কথা-কাব্য বা কথা-সাহিত্য; তবে গল্প সাহিত্যের আধুনিক রূপ। কিন্তু গল্পের নেশা মানুষের চিরদিনের। মানুষ যেদিন থেকে মানুষ হয়েছে সম্ভবত সেদিন থেকেই তার গল্প শোনার আগ্রহ—সেদিন থেকে সেই শিশু-মানবের দাবি—যেমন আজকের মানবশিশুর দাবি—"গল্প বলো"। সেদিন থেকেই সে গল্প শুনতে শুনতে করেছিল প্রশ্ন—করেছে—"তারপর? তারপর? তারপর?" গল্প এমন জিনিস যাতে কৌতূহল জাগবে। গল্পের জন্মভূমি মানুষের মন। কালের পর কাল জগৎ ও জীবনের নব নব

---

* আসলে 'নভেল' শব্দটির ইংরাজীতে এখনো এক অর্থ—'নূতন'; আর সেই অর্থের সঙ্গেই যুক্ত দ্বিতীয় অর্থ 'নূতন কথা' সাহিত্যে। 'নভেল' বোধহয় ইতালীয় 'নোভেলা'-র থেকে ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় গৃহীত। বোকাচ্চিও-র "দশরাত্রি'তে (*Decameron*) যেরূপ গল্প সংকলন পাওয়া যায়, সেরূপ গল্পকে ইতালীয়তে বলত 'নোভেলা' বা নয়া কথা। এ সব গল্পের খুব প্রচলন হয়েছিল। ইয়োরোপের অনেক ভাষাতেই 'নভেল'-এর নাম কিন্তু 'নভেল' নয়—ফরাসীতে নাম 'রমাঁ' (Roman)। আসলে এ শব্দটাও রোমান্সের সঙ্গেই সম্পর্কিত। আর রোমান্স শব্দটাও মূলত Romance নামীয় ভাষাগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয়, পর্তুগীজ প্রভৃতি রোমক বংশের ভাষা-সন্ততিদের নাম 'রোমান্স ভাষা'। এ সব ভাষায় ইয়োরোপীয় 'নাইট এ্যারাণ্ট'দের অদ্ভুত রসের দুঃসাহসিক কর্ম ও প্রণয়কাহিনী খুব সচল হয়েছিল। তাই ওরূপ ভাবের কাহিনী মাত্রেরই নাম হয় 'রোমান্স'। সেই রোমান্স থেকেই নভেল অর্থে ফরাসীতে 'রমাঁ' গৃহীত হয়েছে; আবার রুশ প্রভৃতি ভাষায় ফরাসীর অনুসরণে 'রমান' (Roman) সেই অর্থে প্রচলিত হয়।

ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সেই মনের এই আগ্রহ স্ফুরিত হয়েছে ; গল্প-বলার ও গল্প শোনার ধারাও সেই ঘাতপ্রতিঘাতে বিকশিত হয়েছে। এসেছে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি, এসেছে বোধের ব্যাপ্তি ও প্রখরতা, বিষয়ের নূতনত্ব আর সেই সঙ্গে প্রকাশের রীতি, নূতন ভঙ্গি। তাই এপিক, ব্যালাড, রোমান্স প্রভৃতি বহু প্রজন্ম ছাড়িয়ে সেই আদিকালের গল্প আধুনিক কালে হয়ে উঠেছে 'নভেল' এবং তারও পরে আবার দেখা দিয়েছে 'ছোটগল্প'।

আরও একটা কথা সত্য—গল্প এক ভাবে না এক ভাবে সব ভাষাতেই ছিল—সে 'ইলিয়ড' বলি, 'ওডেসী' বলি, আইসল্যাণ্ডের সাগা বলি, আরব্য উপন্যাস বলি, চীনের 'বালিশের বই' ('বুক অব পিলোজ') বলি, জাপানের 'গেঞ্জির মহাখ্যান' বলি আর যাই বলি। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষের মতো গল্পের নেশা বোধহয় অন্য কোনো দেশের মানুষের নেই। আর ভারতবর্ষের মধ্যেও বাঙালীই বোধ হয় সব থেকে বড় 'গেঁজেল'। 'মহাভারত', 'রামায়ণ', বৌদ্ধ 'জাতক', 'পঞ্চতন্ত্র'—তারপর 'বৃহৎ কথা' না-পেলেও 'কথাসরিৎসাগর', 'দশকুমার চরিত' 'কাদম্বরী' ইত্যাদি ইত্যাদি সর্বভারতীয় প্রাচীন উত্তরাধিকার। এ সব থাক, শুধু বাঙালী লোকজীবনের কথাই ধরি : রূপকথা, উপকথা, ব্রত-পার্বণের কথা, সওদাগর বণিকদের কথা, কিম্বা ভূতের গল্প, প্রেতের গল্প, জিন পরীর গল্প—আবার 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র মতো গীতিকাব্য,—কেউ বাঙলার এই পুরনো গল্পের তালিকা শেষ করতে পারবে না। বাঙালী হচ্ছে 'গল্পী' জাতি। যাক সে কথা! মোটকথা আমরা দেখছি—কথাসাহিত্যের এক গোষ্ঠীরই প্রধান বংশধর এখন 'নভেল' বা উপন্যাস এবং তার অনুজ 'শর্টস্টোরি' বা 'ছোটগল্প'। নভেল এপিক নয়, রোমান্স নয়—বলেন পাশ্চাত্য সমালোচকরা। আমরাও তেমনি জানি, উপন্যাস 'রামায়ণ'-'মহাভারত'-এর মতো পৌরাণিক মহাকাব্য, অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত মহাকাব্য নয়—'রঘুবংশ' বা 'কিরাতার্জুনীয়ম্'-এর মতো খণ্ডকাব্য নয়—'মেঘদূত' প্রভৃতির মতো, এমনকি 'দশকুমার চরিত' কেন 'কাদম্বরী'র মতো গদ্য আখ্যায়িকা বা কথা-কাব্যও নয়। নাটক প্রভৃতিরও মূল বস্তু কথা বা গল্প। কিন্তু উপন্যাস দৃশ্যকাব্য নয়। ছোটগল্পও নয়। ছোটগল্প আকৃতিতে প্রকৃতিতে উপন্যাসের থেকে স্বতন্ত্র। সত্য বটে, সকল ধরনের আখ্যায়িকা কাহিনীতেই মানুষের কথা আছে, জীবনের কথা আছে। কিন্তু সে হল, সেদিনের দৃষ্টি দিয়ে দেখা মানুষ, সেদিনের মতো করে বোঝা জীবন। আচারে নীতিতে ধর্মবোধে মহাকাব্যের যুগে জীবন ছিল সারল্যে শৌর্যে বীর্যে

কিম্বা দুষ্কৃতিতে দুঃসাহসে সহজবোধ্য। মহাকাব্যের মনুষ্যচরিত্রেও আমরা তার প্রতিফলন দেখি। সামন্ত যুগেও তার জের টানা চলত। প্রধানত সামন্তশ্রেণীর ক্ষাত্ররীতির ও বীর্যশুল্কে রমণীরত্ন লাভের স্বপ্ন ছিল সেই সাহিত্যের বিষয়। কিন্তু সে যুগ অতীত। রেনেসাঁসের (Renaissance) পরে ইয়োরোপে ক্রমে ক্রমে আধুনিক যুগ উদিত হল, অর্থাৎ ক্রমে বণিক ব্যবসায়ীদের হাতে সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা আসে, আভিজাত্যের মহিমা নিঃশেষ করে সাধারণ মানুষের আত্মসচেতনতা ও আত্মাধিকারের যুগ দেখা দেয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ফলে জীবনের পটভূমি বদলে গেলে পূর্ব যুগের সমস্ত শিক্ষারূপেরও তাতে পরিপ্রেক্ষিত পরিবর্তিত হল—বিশেষ করে কথাসাহিত্যের হল রূপান্তর—নবকলেবর। কথাসাহিত্যের সেই আধুনিকতার রূপ দেখি 'নভেল'-এ। সাহিত্যের অন্য সকল শাখার তুলনায় নভেল হল তখন যুগের প্রধান প্রতিভূ। নভেল আধুনিক যুগের শিল্পরূপ—এ কথাটা তাই স্থির রূপে উপলব্ধি করার জন্য সামান্য করে হলেও এই আধুনিক যুগের রূপ একটু বোঝা দরকার। যে বিশেষ ক্ষেত্রে নভেলের উদ্ভব সেই বিশেষ ঐতিহাসিক যুগকে বুঝলে নভেলের ঐতিহাসিক উৎপত্তি ও চরিত্র পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

নভেলের যুগ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ

আধুনিক যুগ প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল ব্রিটেনে। তাই ইংরাজী সাহিত্যেই নভেলের প্রথম আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু যুগটার আভাস দেখা দিয়েছিল প্রথম ইতালিতে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁস তখন সেখানেই প্রথম মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের মনে উষার আভাস আনে। তার ফলে মানুষের জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে জাগল নূতন কৌতূহল, নূতন জিজ্ঞাসা ; মর্ত্য পৃথিবীর প্রতি মমতায় মর্ত্য জীবনের সম্বন্ধে অভাবনীয় বিস্ময়, গরিমাবোধ, আনন্দবোধ, শিল্পে-সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা—রাষ্ট্রে নূতন পরীক্ষার ঝোঁক; জ্ঞানে বিজ্ঞানে নূতন অনুসন্ধান প্রবৃত্তি ইত্যাদি। বিশেষ করে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুয়ার গেল খুলে ; মঠ-মন্দির থেকে সাধারণ মানুষের লোকালয়ের দিকে সরস্বতী এগিয়ে গেলেন। ইতালি কিন্তু রেনেসাঁসের সঙ্গত বিকাশ সম্পূর্ণ করতে পারল না। চার্চের বন্ধনে জড়িয়ে পশ্চিম ইয়োরোপও পেল না ধর্মে, সমাজ-রাষ্ট্রে সংস্কার-মুক্তির স্থির সাফল্য। নানা সূত্রে তা আয়ত্ত করল দ্বীপবাসী ব্রিটেনের মানুষেরা—যারা মহাসমুদ্রে অভিযানে বের হল। নিজেদের বন্দর থেকে

বাণিজ্যের পশরা নিয়ে দিগ্‌দিগন্তরে যাতায়াত আরম্ভ করল, আর বাণিজ্যের সম্পর্ক পাতিয়ে বসল এশিয়া-আমেরিকার সঙ্গে। ব্রিটেনের বণিক ব্যবসায়ী 'মধ্যবিত্তশ্রেণী' তাই উদ্যোগে আয়োজনে অগ্রগামী হয়ে উঠল—অর্থে উদ্যোগে ইংরাজ বণিক ব্যবসায়ীরা তাদের অচল সামন্ত অভিজাতদের ছাড়িয়ে গেল। ব্যক্তিগত উদ্যোগ আয়োজনে এই কর্মিষ্ঠ বণিকশ্রেণী ভাগ্য নির্মাণ করছে, ব্যক্তিমানুষের অধিকার আয়ত্ত করছে। সেই প্রয়োজনেই ক্ষমতাও তাদের চাই। রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাই তারা ১৬৪৪-১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করল। সুনিশ্চিত করল সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার (Civil Rights, Rule of Law), ব্যক্তিমানুষের মর্যাদা। তারা বণিক ব্যবসায়ী, বৈষয়িক প্রয়োজনেই বাস্তববাদী ; আর বাস্তববাদী বলেই ব্যবসায়িক জীবনে চতুর কৌশলী, উদ্যোগী, ব্যক্তিগত যোগ্যতায় বিশ্বাসী, প্রতিযোগিতায় সর্বদা প্রস্তুত ; যোগ্যের জয়ে আস্থাবান— সে জয় তো যোগ্যদের ভগবানেরই দেওয়া পুরস্কার—এ বিধান বিধাতার— উদ্যোগী হও; যোগ্য হও, স্বাবলম্বী হও—পুরুষার্থেই ধর্ম-অর্থ-কাম ত্রিবর্গলাভ ন্যায়সঙ্গত।

বণিকদের বিস্তারে ব্রিটেনের গঞ্জ-বন্দর ফেঁপে উঠল। ভারতবর্ষে, দূরপ্রাচ্যে, আফ্রিকায়, আমেরিকায় তাদের জাহাজ যাচ্ছিল। শহরে ব্যবসা-সূত্রে নানা মানুষের ভিড় বাড়ল। বিশেষ করে লণ্ডন হল পৃথিবীর কেন্দ্র। বৃত্তি ও জীবিকার নানা সুযোগ পেয়ে এক 'শহুরে সমাজ' গড়ে উঠল। তারা যেমন উদ্যোগী তেমন চতুর, তেমনই বেপরোয়া। আমোদ-প্রমোদে উৎসাহী—সর্ববিষয়ে মুখর। তারা জানতে উৎসাহী, বুঝতে উৎসাহী। তাই মুদ্রাযন্ত্র বাড়ল, ছাপা পুস্তক-পুস্তিকা বাড়ল। পুস্তক প্রকাশ একটা লাভের ব্যবসা হল। লেখাপড়ারও বিস্তার হল। ছোট ছোট সাময়িক পত্র ও পুস্তিকার দিন এল। সে সবের সঙ্গে সঙ্গে লোকের নেশা জাগল নানা রকমের কাহিনী-উপাখ্যান পড়ার। রোমান্স— অদ্ভুত দেশের অদ্ভুত কাহিনী—নিজের দেশ, বাস্তব পৃথিবীর বাস্তব মানুষের কথা—সাধারণ মানুষের প্রেম-প্রণয়, দেশ-বিদেশে ভ্রমণ, অ্যাডভেঞ্চার...এ সবেও তাদের নেশা। এই বাস্তব বিষয়ের ও কাহিনীর পাঠকগোষ্ঠী গড়ে উঠতেই নভেলের পাঠকও তৈরি হল। কাহিনীকারদেরও সুযোগ বাড়ল এরূপ বাস্তব কাহিনী লেখার।

বণিক ব্যবসায়ীরা শুধু ব্যবসায় নয়, বই লেখা ও বই পড়ার যুগকেও এগিয়ে

আনল। তা ছাড়া চার্চের পাদ্রী মোহন্ত ও সামন্ত অভিজাত গোষ্ঠীর ক্ষমতা খর্ব করে তারা নিজেদের আদর্শ অনুসারে বাস্তব দৃষ্টিতে আইন সংস্কার করেছে—নূতন নীতিরীতি তৈরি করেছে। ধর্মও সংস্কার করেছে। এ সবের প্রভাব পত্র-পত্রিকা-পুস্তিকায় পড়ে। রেনেসাঁসের পর থেকেই জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির উদয় হয়েছিল। জ্ঞানী পুরুষ ফ্রান্সিস বেকন বৈজ্ঞানিক যুক্তিধারার গোড়াপত্তন করেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আবিষ্কারে যুক্তিতে দীক্ষায় ব্যবসায়ী বণিকদেরও ছিল স্বার্থ। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে প্রথম রয়াল সোসাইটি বা প্রথম বৈজ্ঞানিক সমিতি গড়ে উঠতে লাগল। অন্যদিকে বাস্তববাদী চিন্তার ধারায় লক (Lock) প্রভৃতি দার্শনিকরা আবির্ভূত হলেন। ইংরাজী সমাজের জীবনদৃষ্টিই এভাবে বাস্তবমুখী হল। সমাজের পরিবর্তন হল সর্বব্যাপী। এরই নাম বুর্জোয়া বিপ্লব (Bourgeois revolution)।*

নভেলের উন্মেষ : ব্যক্তিচরিত্রের আবির্ভাব

রেনেসাঁসের মানুষের মনে যে দীপ্তি প্রথম জাগে তা কল্পনার ঐশ্বর্য। গীতি-কবিতায় ও নাটকীয় কর্মোল্লাসে ইংরাজী সাহিত্য তাতে মত্ত হয়। তাই তার ফলে এলিজাবেথীয় রাজত্বে ইংরাজী সাহিত্যে এল নাটকের গৌরবোজ্জ্বল যুগ—কবিতারও কাল। সে গৌরবের তুলনা নেই। কল্পনায়, উল্লাসে, কর্মপ্রেরণায় সাহিত্য বিভোর। বাস্তব জীবনের পরিচিত চিত্র আঁকবার জন্য মোটেই তাই এলিজাবেথীয় সাহিত্যিক ব্যস্ত হয় নি। সেই যুগের প্রধান সাহিত্য-সন্তান তাই নাটক। রোমান্টিক নাটক, বাস্তবমুখী উপন্যাস নয়। তবে বোধ হয় শেক্সপীয়ার

* বুর্জোয়া বিপ্লব প্রথম হল ইংলণ্ডে, ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। তার পরে তার বিস্তার ১৬৮১-এর ফরাসী বিপ্লবে ইয়োরোপময়। তারপর সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে, এমন কি উনিশ শতকে জাপানে (সেইজি বিপ্লবে), তার পরে চীনে (১৯১১-১৯৪৮), এখন ভারতে, সমস্ত পৃথিবীতেও বলা যায়। রাজ্যবিস্তারের মতোই ঘটেছে বুর্জোয়া যুগের বিকাশ। তার অর্থনৈতিক-সামাজিক চিন্তা ও উদ্যোগ আয়োজনে প্রায় সর্বক্ষেত্রে ইংরাজ খ্রীঃ ১৭০০—খ্রীঃ ১৮০০ পর্যন্ত প্রধান। বিশেষ করে খ্রীঃ ১৭৬২-১৮১৩—এই সময়ের মধ্যে ইংলণ্ডে 'শিল্প বিপ্লব' সম্ভব হল, যন্ত্রশিল্পের কল-কারখানার মালিকদের তাতে জয়যাত্রা অগ্রসর হয়ে যায়—অর্থশক্তি ও রাজশক্তি আয়ত্ত করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পৃথিবীর প্রধান কর্তা হয়। তার পরে আসে সাম্রাজ্যবাদীদের সংকট খ্রীঃ ১৮৯০-এর সময় থেকে। ১৯১৭-এর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বুর্জোয়া যুগ শেষ হতে থাকে।

ভালোমন্দে গড়া মানুষের যে অতুলনীয় চিত্রসমূহ এঁকে গেলেন তাতে চরিত্র-সৃষ্টির একটা ঐতিহ্য ইংরাজী সাহিত্যে পরোক্ষে পুষ্ট হয়ে থাকবে। এ জন্যই বলা হয়, "The English novelists are Shakespearean even without knowing it" (Walter Allen)। সেই এলিজাবেথের কালেই পুরোনো ধারার বেশ কিছু 'টেলস' বা কাহিনী লেখা হচ্ছিল। সাধারণ ধূর্ত, লম্পট মানুষের নানা দুষ্কৃতির কাহিনীও রচিত হয় (coney-catiching pamphlets)। এ সব কাহিনী খুব মুখরোচক কথাসাহিত্য। এরূপ দুর্বৃত্তের (picaro) দুষ্কৃতি-কথা বা picaresque ধারা কাহিনীর তখন ইয়োরোপের অনেক ভাষাতেই খুব প্রসার। সে সব ঠগ-লম্পটের কাহিনীতেও মানুষের ব্যক্তিচরিত্র দেখি না। বিচিত্র দুষ্কৃতিপূর্ণ ঘটনাবলী তার প্রাণ। আসল কথাটা যা তা এই—সাহিত্যেও ছাঁচে ঢালা মানুষের ছাঁচে ঢালা জীবন ছেড়ে ব্যক্তিমানুষের আভাস এখানে ওখানে ঝলক দিয়ে যাচ্ছিল। তা কি 'মহাভারত'-এই অনুপস্থিত? কিম্বা গ্রীক নাট্যকারদের নাটকেই কি তা ছিল না? কিম্বা 'কথাসরিতসাগর'-এর কথায়ও মাঝে মাঝে তেমন আভাস একেবারে পাওয়া যায় না? কিন্তু সে ব্যতিক্রম। বাঙলা কাব্যে কবিকঙ্কনের 'চণ্ডীমঙ্গল' কিম্বা 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন'-এও তেমন ছায়া আবিষ্কার করা যেতে পারে। অবশ্য তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিচরিত্রের আভাস দেখি ইংরাজ কবি জিওফ্রে চসারের (Chaucer, মৃত্যু ১৪৩০) কোনো কোনো কাহিনীতে। এ যেন যুগের পূর্বেই যুগের আভাস। রেনেসাঁস ইয়োরোপের কথাসাহিত্যে সে প্রবণতাকে আরও বেশি প্রবল করে। সেদিক থেকে ফ্রান্সের র‍্যাবলে (*Garguntuan*-এর লেখক Rabelais, মৃত্যু ১৫৩৩) অগ্রগণ্য। মনে হয় অতি আজগুবি কাহিনীর আড়ালে রঙ্গেব্যঙ্গে তিনি মানবতাবোধ জীইয়ে তোলেন। আর, স্পেনের সারভেণ্টিস (*Don Quixote*-এর লেখক Cervantes, মৃত্যু ১৬১৬) বিদ্রূপেব্যঙ্গে মধ্যযুগের নাইটদের রোমাণ্টিক কাহিনীকে উড়িয়ে দিয়ে পরোক্ষে কথাসাহিত্যে বাস্তববাদী কাহিনীর পথ প্রশস্ত করেন। তবে, এভাবে দেখলে, সারভেণ্টিসের সমকালীন ইংরাজ নাট্যকার শেক্সপীয়ারই কি ব্যক্তিচরিত্রের প্রধান এবং অতুলনীয় স্রষ্টা নন? অথচ বাস্তব-জীবনমুখী আখ্যানকাব্য শেক্সপীয়ার লেখেন নি। তিনি রোমাণ্টিক নাট্যকার। কিন্তু জীবনসত্যের এমন সত্যদর্শী কবি আর কে? কথা এই—সাহিত্যেও ব্যক্তিচরিত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পথ তৈরি হচ্ছিল। তবে সেই পুরোনো সামন্ত (ফিউডাল) সমাজ ভেঙে আধুনিক যুগের বণিক-ধনিক সমাজের বাস্তবে পত্তন

না হলে নভেলের সেই ক্ষেত্র সত্যই তৈরি হতে পারত না। বণিকরাজের পত্তন করতে প্রথম পেরেছিল ইংরাজ জাতি (১৬৪৮-১৬৮৮)। তাতেই ইংরাজের সাহিত্যে জীবনাগ্রহ ও মানবতাবোধ প্রথম স্ফুরিত হয়ে উঠল। যথার্থ নভেলেরও উদ্ভব ইংরাজী সাহিত্যেই প্রথম। ফরাসী সাহিত্যে নভেলের প্রকাশ তার প্রায় একশ বৎসর পরে। রুশ সাহিত্যে আরও একটু পরে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস প্রধানত এই তিন সাহিত্যেরই দান। আমাদের একদিকে সৌভাগ্য প্রথমেই ইংরাজের সান্নিধ্যে আসতে হল। তাতেই আধুনিক যুগের সংবাদ—কতকটা বাধ্য হয়েই—পাই। এবং সেই যুগের সাহিত্য-সন্তান ইংরাজী নভেলের আস্বাদন লাভ করি। তখন পর্যন্ত আমাদের সমাজে আধুনিক যুগও আসে নি, আধুনিক সাহিত্যও জন্মায় নি। ইংরাজী নভেলই প্রকৃতপক্ষে বাঙলা উপন্যাসের জন্মপ্রেরণা জোগায়।

কথা এই—ইংরাজীতে কবে কে নভেল প্রথম লিখেছিলেন? পথটা হঠাৎ একজনা তৈরি করে নি—ব্যুনিয়ন (Bunyan, *The Pilgrim's Progress*, ১৬৭৮) সুইফট (Swift, *Gulliver's Travels*, ১৭২৬), ডিফো (Defoe, *Robinson Crusoe*, ১৭১৯ এবং *Moll Flanders*, ১৭২২)...এসব আমাদের সুপরিচিত নাম। নানা ভাবে তাঁরাই ইংরাজী উপন্যাসের উন্মেষ সৃষ্টি করেন। ই. এম. ফর্স্টারের অনুসরণে ডিফোর 'মোল ফ্লাণ্ডার্স'কে আমরা চরিত্রপ্রধান নভেল বলতে পারি। নভেলের প্রধান বস্তু চরিত্র—ব্যক্তিমানুষের রূপ—ডিফোর সৃষ্টিতে তা সুস্পষ্ট।

প্রাথমিক প্রকাশ : ইংরাজি সাহিত্যে

মোল ফ্লাণ্ডার্স ব্যক্তির চিত্র—পুরুষের না, নারীর। মোল এমন 'চরিত্র' চরিত্রের বালাই যার নেই। প্রথম ব্যক্তিপুরুষের চিত্র রবিনসন ক্রুসো (খ্রীঃ ১৭১৯)। কোলরিজ ক্রুশোকে বলেছেন সর্বমানবের প্রতিনিধি (Universal representative)—মানুষ এমনি স্বাবলম্বী স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে জন্মেছে। এমনি করেই আত্মশক্তির বিকাশে সে সমর্থ। কিন্তু তখন পর্যন্ত ক্রুশো সে-যুগের ইংরেজের মুখপাত্র। ক্রুশো স্বাবলম্বী, বাস্তববুদ্ধি ব্যবসাবুদ্ধি ধর্ম-বুদ্ধি—সর্বদিকে সচেতন—"As much as Milton, Crusoe is Englishman and God helps those who help themselves।" কর্মকুশল ইংরেজ

মধ্যবিত্তের এই জীবনযাত্রা ও জীবনদৃষ্টির জন্য রবিনসন ক্রুশো ইংরাজী নভেলের সূচনাকালীন নিদর্শন ; সুইফটের 'গ্যালিভার্স ট্রাভলস', বানিয়নের 'পিলগ্রিমস প্রোগ্রেস' তার পূর্বাভাস। কিন্তু 'রবিনসন ক্রুশো' একদিকে খণ্ডিত চিত্র, নরনারী-সম্বন্ধ-গঠিত জটিল জীবন-চৈতন্য 'রবিনসন ক্রুশো'তে নেই। তাই জীবন এ গ্রন্থে সীমিত, মানুষের পুরো চিত্র তা নয় ; যথার্থ চরিত্রচিত্রণের অবকাশ তাতে নেই। ডিফো সে অবকাশ পেলেন 'মোল ফ্লাণ্ডার্স'-এ। তাতেই বুর্জোয়া যুগ নাগাল পেল তার প্রথম শিল্পরূপের (Art form-এর)। 'মোল ফ্লাণ্ডার্স'-এ ডিফো চিত্রিত করলেন চরিত্র। মোল চরিত্র ডিফো একেবারে অচেতনভাবেই রচনা করেছিলেন, মনে হয় না। হয়তো বেশি সচেতন ছিল তাঁর এই উদ্দেশ্য—শহরে বন্দরে অবজ্ঞাত স্তরে যে সব মানুষ জন্মায়, বুর্জোয়া যুগের আবর্জনা রাশির মধ্যে তারা জীবনে কর্মে কেমন গড়ে ওঠে—সেটি দেখানো। মোল-এর জন্ম তেমনি স্তরে। সে চোর মেয়ে, ধরা পড়লে যাদের সে দিনে হত প্রাণদণ্ড বা আজন্ম কারাবাস। বহু পুরুষের কাছে দেহদানে ও দেহবিক্রয়ে সে অকুণ্ঠিত। সোনারূপার লোভে সে খুনও করতে পারত ; কিন্তু সাহসে কুলোয় না বলেই করে নি। তার চেয়ে চুরি, ঠগবাজি, দেহবিক্রয় সহজ ও নিরাপদ পথ। মোল-এর কথাবার্তাও আখ্যানে কল্পপ্রসূত নয়—বাস্তব কথা। বুর্জোয়ারা শহরে বন্দরে যে নর্দমা খুলে দিয়েছে তাদের ব্যবসা ও মুনাফাতন্ত্রের পাশে-পাশে, মোল সে নর্দমারই একটি ক্ষুদে জীব। মোলের আত্মস্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়া যুগের তলাকার মানুষ প্রথম মূর্ত, বুর্জোয়া-তন্ত্রের তলাকার ক্লেদ স্পষ্ট।

মনে হবে এ তো সেই পুরোনো চোর-বাটপাড়-লম্পটের কথা—Picaresque বা দুর্বৃত্তের দুষ্কৃতি কথা ! সেই সম্বন্ধটা নিঃসন্দেহ আছে—দুষ্কৃতিকাহিনীই। ডিফো দুর্বৃত্তের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লিখেছেন, কিন্তু এক নূতন স্তরে তাকে তুলে দিয়েছেন। কারণ এ হচ্ছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমাজের ব্যক্তিচরিত্রের কথা। পুরোনো 'টেলস' দুষ্কর্মের পর দুষ্কর্মের গল্প জোগাত ; তাতে থাকত ঘটনার পর ঘটনার ঘটা। মানুষ নিয়ে মাথা ঘামাত না। বুর্জোয়া যুগে মানুষটা দরিদ্র হলে তখনো সমাজে নগণ্য, কিন্তু শিল্পকলায় সে-ই প্রধান। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আবিষ্কার আসলে মানবিকতারও আবিষ্কার : "For the rank is but the guinea's stamp. Man's man for a that...." অবশ্য এই বোধও বুর্জোয়ার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই হল, আর ক্রমেই হয় স্পষ্টতর। সাহিত্যে ব্যক্তিচরিত্রের

চিত্রাঙ্কনে ক্রমেই মানবতার ওপর বেশি করে জোর পড়ল। তাতেই অষ্টাদশ শতকেই নভেলের আকৃতি ও প্রকৃতি ক্রমশ সুস্থির হয়ে উঠল।

প্রধানত ইংরাজী সাহিত্যেই তা এল, কারণ ইংরাজীতেই প্রথম এসেছে ব্যক্তিস্বাধীনতার যুগ—বুর্জোয়া বিপ্লব, বুর্জোয়া বিকাশ। আর সেই বুর্জোয়া বিপ্লবের অভাবে ফরাসী সাহিত্যে ক্যারলের দেশ ফ্রান্সে এবং স্পেনীয় সাহিত্যে সার্ভেন্টিসের দেশ স্পেনে নভেল জন্ম নিতে পারে নি। সেখানে নভেলের জন্ম বিলম্বিত হল। ইংরাজের প্রাধান্য অষ্টাদশ শতকে দেশে দেশে যখন ছড়িয়ে পড়ছে—সর্বত্র অগ্রবর্তী, তখন ইংরাজী সাহিত্যে গদ্যের যুগ নভেলেরও যুগ সুপ্রতিষ্ঠিত। ইংরাজের অগ্রগামিতা দেখে ফ্রান্সের ভলতেয়রের (Voltaire) মতো মহাজ্ঞানী পুরুষদের ও দিদেরোর (Didero) মতো ফরাসী এনসাইক্লোপিডিস্টদের প্রাণপণ ছিল সেই নূতন জীবনপথ ফ্রান্সেও উন্মুক্ত হোক। তাঁদের চেষ্টার ফল ফলল ১৭৮৯-এর ফরাসী বিপ্লবে। সমস্ত ইয়োরোপে তার পর থেকে বুর্জোয়া সভ্যতার পথ খুলে যেতে থাকে। কিন্তু তার আগে সত্যকারের উপন্যাস তাদের কারো সাহিত্যে রচিত হয় নি। এমন জ্ঞানী ভলতেয়র, তাঁরও কাঁদিদ (*Candide*—১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ) সার্ভেন্টিসের 'ডন কুইকসোট'-এর ছাঁদে গাঁথা—ঠিক উপন্যাস নয়। কিন্তু ইংরাজীতে রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্মোলেট, স্টার্ন (Richardson, Fielding, Smollet, Sterne) প্রভৃতির দানে তার পূর্বেই ইংরাজী নভেলের প্রতিষ্ঠা প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। যা আমাদের লক্ষ্যণীয় তা এই যে, অন্য দেশে আধুনিক যুগ বিলম্বিত, তাদের ভাষায় উপন্যাসের আবির্ভাবও বিলম্বিত। ইংরাজের সামাজিক ভাবনা-চিন্তায় মশগুল হয়েও ১৭৫৯-এ ভলতেয়র উপন্যাসের দিকে বেশি এগুতে পারেন নি। দিদেরো (*La Religeus*) শুধু ব্যক্তিস্বাধীনতার বিপ্লবী নন, রিচার্ডসনের দানের মূল্য ধরতে পেরেছেন, বুঝেছেন ব্যক্তিচরিত্রের গুণেই কাহিনী উপন্যাস হয়। কৃতী লেখকের অভাব ফ্রান্সে কখনো ছিল না,—তখনো না। ভলতেয়র (মৃত্যু ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দ), দিদেরো গেল। রুশো, 'এমিল'-এর (*Emile*) স্রষ্টা আর সুবিখ্যাত আত্মস্বীকৃতির লেখক, রোমাণ্টিক প্রকৃতি-পূজারী হয়ে রইলেন। ল্য সাজ (Le Sage, মৃত্যু ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দ) 'জিল ব্লা'-র সুপরিচিত লেখক, সেই 'ডন কুইকসোট'-এর ধারায় লিখলেন ভ্রাম্যমাণের পঞ্জিকা। তবে 'জিল ব্লা'-তে ফ্রান্সের বাস্তব জীবনের কথা প্রচুর। অবশ্য ফ্রান্সের সাহিত্যে নভেলের উপযোগী ক্ষেত্র তৈরি ছিল, ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গেই ফ্রান্সে নভেলের পর্ব এল নেপোলিয়নের

যুগের পরে। ফ্রান্সের জীবনে তখন রিক্ত গরিমার মরু উষরতা। তাই বীর্যহীন অন্তরের পীড়া স্তঁদাল (Stendhal), বালজাক (Balzac), ফ্লোবের (Flaubert) সকলের নভেলকে পীড়িত করেছে, কিন্তু এই সূত্রেই নভেল প্রতিষ্ঠিত হল। স্তঁদালের 'রাঙা ও কালো' (*La Rouge* et *le Noire*) রচিত হয় ১৮৩০-এ, অর্থাৎ ডিফোর প্রায় একশত বৎসর পরে—আমাদের দেশে হিন্দু কলেজের ইংরাজী পাগল 'ইয়ং বেঙ্গল' যখন ডিরোজিয়োর ক্লাসে বিদ্রোহের দীক্ষা লাভ করছে, টম পেন-এর (Tom Pain) 'মানুষের অধিকার' (*Rights of Man*) ও 'যুক্তির যুগ' (*Age of Reason*) কিনতে পাগল, ফরাসী বিপ্লবের 'তেরঙ্গী' পতাকা তুলে দেয় ময়দানের মনুমেন্টের মাথায়। তবে উপন্যাস পড়ার উৎসাহ এই বাঙালী ডিরোজিয়ানদের ছিল কিনা কে জানে? না, লক (Lock), বেকন (Bacon), হিউম (Hume), ভলতেয়র, দিদেরো, মঁতেস্কু (Montesque) নিয়েই তাঁদের মাতামাতি চলেছিল? কথাটা হল—ফরাসী সাহিত্যে নভেলের প্রতিষ্ঠা ফ্রান্সে বুর্জোয়া বিপ্লবের পরে। ইংরাজী উপন্যাসের প্রেরণায় ফরাসী উপন্যাসের জন্ম নয়। ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের টালমাটালেই তার উৎস—ফরাসী জাতীয় চেতনাই তার জীবন। তাই ফরাসী উপন্যাসের রূপে প্রথম থেকেই দেখা যায় বিপ্লবী প্রখরতা, শাণিত আত্মসচেতনতা। এই কথাটা বিশেষ স্মরণীয়। কারণ তাতেই দেখা যায়—দেরিতে আরম্ভ করেও ফরাসী নভেল স্বতন্ত্র ও স্বয়ংভর। আমাদের উপন্যাস সাহিত্যের সঙ্গে তাই ফরাসী উপন্যাস সাহিত্যের তুলনা একেবারেই চলে না।

এ প্রসঙ্গে বলতে পারি—রুশ সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব কিন্তু সেভাবেও ঘটে নি—যেমন ফ্রান্সে ঘটেছে। বুর্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে রাশিয়ার যথার্থ পরিচয় হয় ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ানের পতনের পরে। রুশ অভিজাত গোষ্ঠীর 'দেকাব্রিস্ত' (Decabrist) বিপ্লবীরা চেয়েছিল সংস্কারের দ্বারা অজড় জারতন্ত্রের রূপান্তর (১৮২৫)। রুশিয়ায় আগে থাকতেই ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব ছিল। ভলতেয়র ছিলেন মহারাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সমাদৃত সুহৃদ। বিপ্লবী চিন্তা রুশ বিত্তবানদের কাছে তখন সখের ব্যাপার ছিল। কিন্তু এই বিপ্লব-বিলাস ফরাসী বিপ্লবের পরে চলতে পারে না। 'দেকাব্রিস্ত' বিদ্রোহের ব্যর্থতায় বরং উদ্বুদ্ধ হল একদিকে সুপ্রসন্ন রুশ সাহিত্যিক চিন্তানায়করা, অন্যদিকে নিম্ন-মধ্যবিত্ত নব্য শিক্ষিতরা। তবে প্রারম্ভ থেকেই রুশ সাহিত্য যতটা কল্পনাবাদী, তার অপেক্ষা বেশি বাস্তববাদী। রুশিয়ার শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা কবি আলেকসন্দর পুশকিন

(১৭৯৯-১৮৩৭) 'ক্যাপটেনের কন্যা' নভেলে (*Captain's Daughter*) যতটা রোমান্টিক কাহিনীকার, কাব্য-কথা 'য়েভ্‌গেনিয় অনিগিন' (*Evgen-Onigin*—১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ) তার চেয়েও সত্যকার বাস্তববাদী। এ বই কবিতায় লেখা অভিজাত শ্রেণীর প্রণয়-ব্যর্থতার কাহিনী, গদ্যে লেখা নয়। কিন্তু পুশকিন তাতে চরিত্রের যে অপূর্ব ও জীবননিষ্ঠ চিত্র অঙ্কন করেছেন তা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসেও দুর্লভ। অবশ্য রুশ উপন্যাসের প্রারম্ভ গোগল (N. V. Gogol, ১৮০৯-১৮৫২) থেকে। গোগল যে অনন্য প্রতিভা তা 'ওভারকোট'-এর মতো একটি ছোট গল্পেও পরিষ্কার। তবে তিনি রসোজ্জ্বল চরিত্রাঙ্কনে সুপটু, বাস্তবনিষ্ঠ 'তারাস বুলবা'র মতো দুর্ধর্ষ কশাক গোষ্ঠীর চিত্রে তেমনি রোমান্টিক। আর 'মৃত আত্মা' (*Dead Souls*) চিত্রে তিনি অতুলনীয় বাস্তববাদী—সমস্ত রুশ জীবনটাই যেন হাস্যে রঙ্গে তুলে ধরেছেন। তার পরে রুশ জীবনে উত্থিত হলেন তিনজন—তুর্গেনেয়েভ্‌ (Turgenev, ১৮১৮-১৮৮৫), দস্তয়েভস্কি (Dostoevsky, ১৮২১-১৮৮১) এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তলস্তয় (Leo Tolstoi, ১৮২৪-১৯১০)। রুশ জীবনে বুর্জোয়া বিপ্লব তখনো সম্পূর্ণ নয়, আবার ফিউডাল ধারাও তখন (১৮৬১-এর পরে) অক্ষুণ্ণ নেই। অথচ এগিয়ে আসছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা ও উদ্দাম উৎসাহ। তা ছাড়িয়ে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিদাস মুক্তির পরে দেখা দিল চিন্তায় কর্মে আরও বিপুল সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষুব্ধ সূচনা। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে একটা প্রতিক্রিয়ার পরিবেশে বিদ্রোহ ও প্রতিক্রিয়ার যে দ্বন্দ্ব রুশ সাহিত্যে দেখা দেয়, তার স্বরূপ না বুঝলে এই তুর্গেনেয়েভ্‌, দস্তয়েভস্কি এবং তলস্তয়দের সাহিত্যকীর্তিকে ঠিক প্রেক্ষাপটে দেখা সম্ভব হয় না। এ সময়ে রচিত রুশ নভেল পড়ে ইংলণ্ডের শিল্পী মনস্বীরা চমৎকৃত হয়ে মনে করেছিলেন বোধ হয় নভেলে রুশদের পরে আর কারও কিছু লিখবার রইল না। সে কথা নিশ্চয়ই ঠিক নয়। কিন্তু উপন্যাসপাঠকের পক্ষে রুশ উপন্যাস না-পড়লে, না-জানলে উপন্যাসের এক বিশেষ মহিমাই অজ্ঞাত থাকে। আমাদের উপন্যাসের জন্মকালে ও বাল্যে-কৈশোরে এদেশে রুশ উপন্যাসের ঘাত-প্রতিঘাত অবশ্য পৌঁছায়নি। এখানে, আমাদের উপন্যাস-আলোচনার উপক্রমণিকায়, রুশ উপন্যাস আলোচ্য না হলেও পারত। উনবিংশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যের অন্যতম মূল প্রেরণা ফরাসী উপন্যাস। এ বিশেষ শিল্পরীতি বা আর্ট ফর্ম রাশিয়ায় জন্মাতে দেরি হত, কিন্তু জন্মাল ফরাসী প্রেরণায়—পরোক্ষে, হয়তো ফরাসী ভাষার মারফতে ইংরাজী উপন্যাসের প্রেরণায়—আমাদের ক্ষেত্রে যা হয়েছে

তার বিপরীত পথে। কারণ আমরা এ দেশে উপন্যাসের আস্বাদ পেলাম ইংরাজী উপন্যাস পড়ে, আর ইংরাজী মারফতে পরোক্ষে পেয়েছি যৎকিঞ্চিৎ ফরাসী বা অন্য ভাষার সংবাদ। কিন্তু এ সব তথ্যে পৌঁছাবার আগে আমাদের তাই বরং ইংরাজীতে উপন্যাসের প্রতিষ্ঠার ধারাই লক্ষণীয়। কারণ রুশ উপন্যাসের আরম্ভ: উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে, প্রায় ফরাসী উপন্যাসের সমকালে কতকটা ফরাসী সাহিত্যের প্রেরণায়। নভেলের প্রতিষ্ঠা তার অনেক পূর্বেই সুসম্পন্ন হয়েছিল ইংরাজীতে।

নভেলের প্রতিষ্ঠা : অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী নভেল

রিচার্ডসন (Richardson—মৃত্যু ১৭৬১), ফিল্ডিং (Fielding—মৃত্যু ১৭৫৪), স্মলেট (Smolett—মৃত্যু ১৭৬১) ও স্টার্ন (Sterne—মৃত্যু ১৭৬৮) —এই চারজন দিকপালের সৃষ্টিতে নভেলের বিশিষ্ট ধারা স্থির হয়ে ওঠে। সর্বাগ্রে প্রকাশিত হয়েছিল রিচার্ডসনের পত্রাকারে লেখা 'পামেলা' (*Pamela*, ১৭৪০) যুবকযুবতীদের সুনীতি শিক্ষার উদ্দেশ্যে বইখানা পরিকল্পিত। গৃহপরিচারিকা মেয়ে পামেলা পত্রে নিজের হৃদয় উদ্‌ঘাটন ও বিশ্লেষণ করে— কেমন করে সে পবিত্রতা রক্ষা করেছে তার মুনিবের কবল থেকে। আর মুনিবই শেষে প্রায় বাধ্য হয়ে পামেলাকে বিবাহ করেছে। দ্বিতীয় উপন্যাস 'ক্লারিসা' (*Clarissa*, ১৭৪৮) বিরাট বই, কিন্তু আরও বাস্তববাদী ও জীবননিষ্ঠ। গ্রামের গরীব ঘরের মেয়ে ক্লারিসা। শহরের জালে পড়ে নিজের অসাবধানতায় লম্পট লাভলেস-এর নিকট কুমারীত্ব হারিয়েছে। কিন্তু তার পরে লাভলেসের বিবাহ প্রস্তাব সতেজ ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছে। গ্রামে ফিরে গিয়ে ভগ্নহৃদয় ক্লারিসা মৃত্যুকে বরণ করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বাস্তববাদের সঙ্গে 'ক্লারিসা'য় যোগ হয়েছে লেখকের মানবিক সহানুভূতি। রিচার্ডসনের অনেকটা বিপরীত দৃষ্টির লেখক ফিল্ডিং। আবেগবাহুল্য নেই, রক্ষণশীলতা নেই। ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে হাত পাকিয়ে স্বচ্ছন্দ আনন্দে লিখলেন 'টম জোনস' (*Tom Jones*, ১৭৪৯)। এক বিরাট জীবন্ত কাহিনী। এপিকের মতো সকল স্তরের নরনারীর চিত্রমালা। তাই বলা হয়, "টম জোনস তখনকার ইংলণ্ড"। আশ্চর্য প্লটের বুনোনি, তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ, পরিকল্পিত চরিত্র—তারা আদর্শ চরিত্রের মানুষ নয়, সমাজের বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে কুণ্ঠাহীন বিদ্রোহী, রঙ্গে-কৌতুকে হাস্যোজ্জ্বল। এ নভেল একই কালে বিদ্রূপ-কাব্য ও মহাকাব্য, আর নাটকের মতো সুসংগঠিত কাহিনী। ফিল্ডিং-এর

নভেল সম্বন্ধে দৃষ্টিও সুস্পষ্ট, স্বচ্ছ ও ঐশ্বর্যময়। ডিকেনস, থ্যাকারের তিনি অগ্রদূত। স্মলেট 'রোডরিক রেণ্ডম' (*Rodrick Random*), হামফ্রে ক্লিংকার (*Humphrey Clinker*, ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে পত্রাকারে রচিত) প্রভৃতি নভেলে কৌতুকমিশ্রিত দুর্দান্ত চরিত্রের চিত্র এঁকে চললেন, কিন্তু প্লটের বুনোট সম্বন্ধে যেন উদাসীন। চরিত্রগুলিও মোটেই ভালোমানুষ নয়, বরং উগ্র রূঢ় কতকটা স্থূল দুর্বার মানুষ। স্টার্নের 'ট্রিস্টান স্যাণ্ডি' (*Tristan Sandy*—১৭৬৩) একেবারে স্বতন্ত্র। নিজের মনেই কথা বলেছে তার মধ্যে চরিত্রগুলি —আছে টবিখুড়োর মতো বহু বিচিত্র চরিত্র, নানা ভাবনা-কৌতুকের সমাবেশ, এবং লেখকের মানবচরিত্রের অদ্ভুত জ্ঞান, সহবেদনা-শক্তি। 'চেতনা-প্রবাহ' এখন বিংশ শতকের নভেলের নিপুণ কলাকৌশল। অষ্টাদশ শতকের 'ট্রিস্টান স্যাণ্ডি'তে তার পূর্বগামী ছায়া আবিষ্কার করা যায়, একথা মিথ্যা নয়। এই চার লেখকের হাতে মাত্র ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই নভেলের প্রতিষ্ঠা সুস্থির হল, নভেলের আকৃতি ও প্রকৃতি গড়ে উঠল। নভেলের বহুবিচিত্র সম্ভাবনার আভাসও পাওয়া গেল। যথা—(১): নভেল বড় বই, বিস্তৃত আখ্যান ; (২) মুখ্যত সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবনের কথা ; (৩) প্লট সুগঠিত হতে পারে ('টম জোনস'-এর মতো), ঢিলেঢালাও হতে পারে (যেমন স্মলেটের লেখায়) ; (৪) চরিত্র সাধারণ মানুষও হতে পারে, অসাধারণ মানুষও হতে পারে, কিন্তু হওয়া চাই ভালো-মন্দ, সু-কুতে মিশ্রিত ব্যক্তি-চরিত্রের জীবন্ত মানুষ ; (৫) দৃষ্টিতে 'সিরিয়াস' হতে পারে, প্রায়ই কিন্তু সকৌতুক ও স্বচ্ছন্দ ; (৬) প্রকাশনা-পদ্ধতি পত্রাকারেও হতে পারে, বর্ণনায় সংলাপে অবাধ হতে পারে, একেবারে যা মনে আসছে যুক্তিশৃঙ্খলহীন সেই সব এক আত্মকথনের ঝুড়িও হতে পারে। কিন্তু যা স্পষ্ট—নভেল হল বাস্তবদৃষ্টির বাস্তবমুখী সাধারণ মানুষের কথাকাব্য। অবশ্য এই কালেও ইংরাজীতে হরেস ওয়ালপোল-এর 'ওট্রেণ্টোর দুর্গ'-এর (Horace Walpole : *Castle of Otranto*) বা মিসেস র‍্যাডক্লিফ-এর 'উডোলফো রহস্য' (*Mrs. Radcliff : Mysteries of Udalpho*, ১৭৯০)-র মতো 'গথিক বা রহস্যপন্থী ধারার রোমাণ্টিক কাহিনী রচিত না হচ্ছিল তা নয়। কাজেই রোমান্সের ধারণা সাহিত্যে একেবারে অনুপস্থিত ছিল না। একটু পরেই শতাব্দীর শেষ দিকে এল ইংরাজী সাহিত্যে 'রোমাণ্টিক রিভাইবেল'-এর যুগ, বিশেষ করে তা কাব্যের যুগ।

[ক্রমশ]

প্রজাতন্ত্রের একজন রাজার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার

ম্যাকসিম গোর্কি

…ইস্পাত আর তেলের রাজারা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্য সব রাজাই আমার কল্পনাশক্তিকে বরাবর বিপর্যস্ত করেছে। আমি ভাবতেই পারতাম না এত অঢেল টাকা-পয়সার মালিকরা কিভাবে সাধারণ মানুষের মতো হতে পারে।

আমার মনে হত যে তাদের প্রত্যেকের কমসে-কম তিনটে করে পাকস্থলি আর দেড়শোর মতন দাঁত অবশ্যই আছে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে একজন কোটিপতি সকাল ছ-টা থেকে মাঝরাত্তির পর্যন্ত একনাগাড়ে খেয়ে চলে; সে সবচেয়ে দামি দামি খাবার খায়, যেমন: হাঁস, টার্কি, শুয়োরছানা, মাখন দিয়ে মুলো, পুডিং, কেক ইত্যাদি সেরা সেরা খাবার। সন্ধ্যে নাগাদ তার চোয়াল এত শক্ত হয়ে যায় যে সে তার নিগ্রোদের হুকুম করে তার হয়ে খাবার চিবিয়ে দিতে এবং সেগুলো সে স্রেফ গিলে ফেলে। শেষে, যখন তার অবস্থাটা একদম জেরবার হয়ে যায়, টেনে টেনে দম নিতে থাকে আর ঘামে ভিজে যায়, তারা তাকে বিছানায় বয়ে নিয়ে আসে। পরের দিন সকাল ছ-টায় উঠেই সে ঐ কষ্টকর রুটিন আবার চালু করে।

কিন্তু এত মেহনত করেও সে তার পুঁজির সুদের এমন কি পঞ্চাশ শতাংশও গিলতে পারে না।

নিঃসন্দেহে এটা খুবই কষ্টকর জীবনযাপন। কিন্তু কি আর করা যাবে? কোটিপতি হয়ে লাভ কি যদি না আপনি সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি খেতে পরেন?

আমার ধারণা ছিল তার অন্তর্বাস নিশ্চয় ব্রোকেডের কাপড়ে তৈরি, তার জুতোর গোড়ালিতে সোনার নাল লাগানো আর টুপির বদলে তার মাথায় থাকে হীরের তৈরি শিরস্ত্রাণ। তার জ্যাকেট নিশ্চয় বানানো হয় সবচেয়ে দামি ভেলভেট দিয়ে, যার দৈর্ঘ কমপক্ষে পঞ্চাশ ফিট এবং যাতে অন্যূন ৩০০টি সোনার বোতাম লাগানো আছে। ছুটির দিনগুলিতে সে তার পরনে

একটির ওপর একটি করে আটটি জ্যাকেট আর ছ-জোড়া প্যান্ট চাপায়। নিঃসন্দেহে এ ব্যাপারটা খুবই বিড়ম্বনাময় আর অস্বস্তিকর···কিন্তু এ রকম একজন বড়লোক তো আর অন্যদের মতো পোশাক-আসাক পরতে পারে না···

আমি ভাবতাম যে একজন কোটিপতির পকেটটা এমন এক গর্ত, যার ভেতরে সে অনায়াসেই একটা গির্জা, সেনেট প্রাসাদ এবং অন্যান্য দরকারী জিনিসপত্র পুরে রাখতে পারে···কিন্তু যখন ভাবতাম যে এই ভদ্রলোকের পাকস্থলি অবশ্যই একটি ভালো জাতের সমুদ্রগামী জাহাজের খোলের মতো মাল মজুত করার উপযোগী হবে, তখনও আমি এই বস্তুটির পা জোড়া এবং ট্রাউজার্সের দৈর্ঘ হিসেব করে কুলিয়ে উঠতে পারতাম না। অবশ্য এ আমার বিশ্বাস ছিল, যে-লেপের ভেতরে সে শোয় তা কম করে মাইলটাক চওড়া হবে। আর সে যদি তামাক চিবোয়, তাহলে তা হবে সেরা জাতের এবং একবারে সে এক বা দু পাউণ্ড চিবিয়ে ফেলবে। যদি সে নস্যি নেয়, তাহলে এক টিপে অন্তত এক পাউণ্ড নেবেই। খরচ করার জন্যই তো টাকা···

তার আঙুলগুলি হবে অসম্ভব স্পর্শকাতর এবং ইচ্ছামাফিক লম্বা হওয়ার দৈব ক্ষমতা থাকবে সেগুলির। ধরা যাক সে যদি নিউইয়র্ক থেকে সাইবেরিয়ার কোনো জায়গায় গজিয়ে ওঠা একটা ডলার পেতে চায়, বেরিং প্রণালীর ওপর দিয়ে সে হাত বাড়িয়ে দেবে এবং তার আসন থেকে না নড়েই তার প্রিয় ফুলটি তুলে আনবে।

সবচেয়ে বিদঘুটে ব্যাপার হল, এই দানবের মাথাটা কেমন হবে তা আমি কল্পনা করতে পারি না। বরং আমার মনে হয় এই বিশাল পেশি আর হাড়ের স্তূপ, যার একমাত্র ইচ্ছে সব কিছু নিংড়ে সোনা আদায় করা—তার মাথা থাকার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বাহুল্য। সব মিলিয়ে বলা যায়, কোটিপতি সম্পর্কে আমার ধারণাটা ছিল খানিকটা ধোঁয়াটে। এক কথায়, প্রথমেই আমি যা দেখতাম তা হল দীর্ঘ, নমনীয় একজোড়া হাত। সেদুটি পৃথিবীটাকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে সেটিকে কালো কুচ্ছিত মুখের সামনে এনে চুষছে, চিবুচ্ছে আর গরম আলুসেদ্দর ওপর লোভী লালা ঝরানোর মতো আমাদের গ্রহটির ওপর লালা ফেলছে···

আপনি অনায়াসেই বুঝতে পারবেন, একজন কোটিপতির সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার পর তাকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে দেখে কি তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

একটা ভারী আরাম কেদারায় আমার সামনে বসে ছিলেন এক দীর্ঘকায় বিজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি, যাঁর সাধারণ মাপের বাদামি ভাঁজপড়া হাত দুটি শান্তভাবে পেটের ওপর ন্যস্ত ছিল। তাঁর মাংসল গাল দুটি সযত্নে কামানো, ঝুলে পড়া নিচের ঠোঁটের ফাঁক থেকে উঁকি মারছিল কয়েকটি সোনার টুপিসমেত চমৎকার বাঁধানো দাঁতগুলি। তার ওপরের ঠোঁট কামানো, বিবর্ণ আর পাতলা —সেটি লাগানো ছিল তাঁর চর্বণযন্ত্রের সঙ্গে এবং বৃদ্ধটির কথা বলার সময় তা একরকম নড়াচড়া করতই না বলা যায়। তাঁর ফ্যাকাশে চোখের ওপর ভুরু বলতে কিছু ছিল না, আর তাঁর রোদে-পোড়া খুলি জুড়ে ছিল পুরোপুরি এক টাক। মনে হচ্ছিল তাঁর মুখে আর একটু বেশি চামড়া থাকলে ভালো হত। লালচে, অনড়, মসৃণ—মনে হয় সবে পয়দা হওয়া কোনো বাচ্চার মুখ দেখছি। বোঝা কষ্টকর ছিল যে এই বস্তুটি সবে দুনিয়ায় এসেছে, না কি এ জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়ার মুখে···

তাঁর পোশাকও ছিল সাধারণ লোকজনের মতোই। সোনা বলতে যেটুকু, তা ছিল তাঁর আংটি, ঘড়ি আর দাঁতে। সব মিলিয়ে বড়জোর আধ পাউণ্ডের বেশি তার ওজন নয়। মোটামুটি বলা যায় যে ইয়োরোপের অভিজাত পরিবারগুলির বৃদ্ধ ভৃত্যদের যেমনটি চেহারা হয়, এই লোকটিকে ছিল তেমনি ধারা দেখতে।···

যে ঘরটিতে তিনি আমাকে বসালেন, সেটি বিলাসবাহুল্য বা সৌন্দর্যের দিক থেকে মনে রাখার মতো কিছুই নয়। আসবাবপত্রগুলি পেল্লায় মাপের—ব্যাস, আর কিছু নয়।

আসবাবগুলো দেখে এমন ধারণা হতে পারে যে এখানে সম্ভবত মাঝে মধ্যে হাতিরা ঢুকে পড়ে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে না পেরে আমি বলে ফেললাম, "আপনি কি···কোটিপতি ?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন তিনি, "হ্যাঁ, নিশ্চয় !"

জিজ্ঞাসা করলাম, "সকালের জলখাবারের সময় আপনি কতখানি গোমাংস খেতে পারেন ?" তিনি ঘোষণা করলেন "গরু খাই-ই না আমি ! এক টুকরো কমলালেবু, একটা ডিম, ছোট্ট কাপের এক কাপ চা—কুল্যে এই হল সব···

তাঁর শিশুসুলভ সরল চোখ দুটি দু ফোঁটা ঘোলাটে জলের মতো ম্লান আভা

ছড়াতে লাগল। সে দুটির মধ্যে আমি এক কণা মিথ্যেচারণের হদিশ খুঁজে পেলাম না।

"চমৎকার।" ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলে উঠলাম আমি, "কিন্তু, দয়া করে খোলাখুলি বলুন তো দিনে কবার আপনি খান?"

শান্তভাবে তিনি বললেন, "দিনে দুবার। ব্রেকফাস্ট আর ডিনার—এই আমার পক্ষে যথেষ্ট। ডিনারে আমি খানিকটা ঝোল, মুরগি আর একটা মিষ্টি খাই। ফল, এককাপ কফি, তারপর একটা সিগার..."

আমার বিস্ময় কুমড়োর মতো দ্রুত ফুলে উঠছিল। সন্তের মতো তিনি তাকিয়েছিলেন আমার দিকে। একটু থেমে দম নিয়ে আবার বললাম: কিন্তু এ কথা যদি সত্যি হয়, তবে আপনার এত টাকাপয়সা নিয়ে করেনটা কি?"

তিনি তাঁর কাঁধ দুটি সামান্য ঝাঁকালেন। কোটরের ভেতরে চোখদুটি ঘুরিয়ে উত্তর দিলেন, "আরও বেশি টাকা তৈরির কাজে সেগুলোকে খাটাই...

"দরকার কি?"

"আরে, আরও বেশি টাকা তৈরি করার জন্য..."

আমার জেদ চেপে যায়, "তার কি দরকার?"

তিনি সামনের দিকে ঝুঁকে চেয়ারের হাতলে কনুই চেপে সামান্য বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি পাগল নাকি হে?"

"না কি আপনি?" পালটা জবাব দিলাম। বৃদ্ধ মাথা নিচু করলেন এবং তাঁর দাঁতের সোনার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল, "মজার লোক বটে...মনে হয় না এর আগে এ ধরনের কারো সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে..."

তারপর তিনি মাথা উঁচু করলেন, মুখ দুটিকে আকর্ণবিস্তৃত করে নীরবে আমাকে জরিপ করতে লাগলেন। তাঁর শান্ত ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল যে নিজেকে তিনি খুবই স্বাভাবিক লোক বলে মনে করেন। আমি তাঁর টাই-পিনে একটা ছোট্ট হীরে দেখতে পেলাম। এই হীরেটা যদি অন্তত একটা জুতোর গোড়ালির মাপেরও হত, বুঝতে পারতাম কোথায় বসে আছি আমি।

"আপনি আপনাকে নিয়ে কি করেন?" জিজ্ঞাসা করলাম।

কাঁধ নেড়ে তিনি স্রেফ বললেন, "টাকা বানাই।"

"মানে, একজন জালিয়াত?" উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম। মনে হল রহস্য উন্মোচনের সীমানায় এসে গেছি আমি। কিন্তু এ কথা শুনে তাঁর হিক্কা শুরু হল। তাঁর সারা শরীরে ঝাঁকুনি জাগল। মনে হচ্ছিল কে যেন তাঁকে অদৃশ্য

হাতে নাড়াচ্ছে। তাঁর চোখ দুটি অনবরত পিটপিট করতে লাগল। "মজার ব্যাপার।" শান্ত হতে হতে আমার দিকে আর্দ্র, তৃপ্ত দৃষ্টিপাত করে তিনি বললেন, "দয়া করে আমাকে অন্য কিছু প্রশ্ন করো।" এই প্রার্থনা করে কি জানি কেন তিনি নিজের গাল দুটো চাপড়ে দিলেন।

এক মুহূর্তের জন্য ভেবে নিয়ে দৃঢ় গলায় প্রশ্ন করলাম, "কি ভাবে টাকা বানান আপনি ?"

মাথা নেড়ে তিনি বললেন, "আহ্! অনেকটা এ ভাবে। খুবই সহজ ব্যাপারটা। রেলওয়ের মালিকানা আছে আমার। কৃষক খাদ্যশস্য ফলায়। তাদের উৎপন্ন জিনিসপত্র আমি বাজারে চালান দিই। তোমাকে স্রেফ কষে বের করতে হবে কৃষককে কত কম টাকা দিলে সে না খেয়ে মরবে না আর কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। বাকি সব টাকাটাই তুমি মাল বয়ে নেওয়ার খর্চা হিসেবে পকেটে পুরে ফেলবে। খুব সরল ব্যাপার।"

"কৃষকরা কি খুশী থাকে এতে ?"

"আমার ধারণা, তাদের সবাই নয়।" শিশুর সারল্যে বললেন তিনি, "কিন্তু কথায় বলে, 'মানুষ কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না।' তুমি সব সময়ই এমন লোকজন পাবে যারা অসন্তুষ্ট হয়ে থাকে..."

উদ্ধতভাবে এগিয়ে গেলাম আমি, "সরকার কি তোমার কাজে বাধা দেয় না ?"

তিনি আমার কথার প্রতিধ্বনি করলেন, "সরকার ?" তারপর চিন্তিতভাবে কপালে আঙুল ঘষতে থাকলেন। হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেছে, এমনিভাবে মাথা নেড়ে শুরু করলেন তিনি, "আহ্...মানে ঐ লোকগুলোর কথা জিজ্ঞেস করছ তুমি...যারা ওয়াশিংটনে আছে ? না, তারা আমাকে বিরক্ত করে না। চমৎকার লোক ওরা...ওদের কেউ কেউ আমার ক্লাবের লোক। তবে বেশি পাত্তা পাবে না ওদের, তাই কখনো কখনো ওদের কথা বেমালুম ভুলে যেতে তুমি বাধ্য। না, তারা কোনো বাধা দেয় না।" তিনি একথা আবার বললেন। তারপর আমার দিকে বিচিত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শুধোলেন, "তুমি কি বলতে চাও যে এমনও সরকার আছে যারা লোকের টাকাপয়সা করার ব্যাপারে হাত দেয় ?"

"না" ঠাণ্ডা গলায় বললাম, "আমি ঠিক তা বলছি না...আমার মনে হয় সরকারের উচিত কখনো কখনো কখনো সরাসরি ডাকাতি বন্ধ করা..."

"রাখো, রাখো", প্রতিবাদ করে উঠলেন তিনি, "এ সব হল গিয়ে আদর্শের কথা। এমনটি এখানে চলে না। কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর কোনো অধিকার সরকারের নেই···

এই শিশুসুলভ প্রাজ্ঞতার কাছে আমি ক্রমাগতই দীন হয়ে যেতে লাগলাম।

"কিন্তু একজন যখন অনেকজনের বারোটা বাজায়, তখনও কি তা ব্যক্তিগত ব্যাপার?" নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

"বারোটা বাজানো?" দু-চোখ বিস্তারিত করে প্রতিধ্বনি তুললেন তিনি, "এটা হয় তখনই যখন মজুরির খরচা চড়া হয়ে যায়। অথবা যখন ধর্মঘট বেঁধে যায়। কিন্তু আমাদের আছে বিদেশ থেকে এখানে এসে ঘাঁটি গেড়ে বসা লোকজন। তারা সব সময়ই মজুরি কমিয়ে আনে আর ধর্মঘটীদের জায়গায় খুশী মনে ঢুকে পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের ভেতরে তাদের যথেষ্ট যোগান আছে এবং কম মজুরিতে তারা কাজ করতে রাজি থাকে, প্রচুর জিনিসপত্র কেনে—ততক্ষণ সবই চমৎকার।"

তাঁকে সামান্য একটু উত্তেজিত বোধ হচ্ছিল। তাঁকে দেখাচ্ছিল একজন বৃদ্ধ আর একজন শিশুর মিশেলের সামান্য খামতি কিছুর মতো। তাঁর পলকা বাদামি আঙুলগুলো কাঁপছিল এবং যখন তিনি বলে যেতে লাগলেন. তাঁর খস্‌খসে গলার স্বর আমার কানে ফেটে পড়ছিল, "সরকার? এটা অবশ্যই খুব আকর্ষণীয় প্রশ্ন। একটা ভালো সরকার দরকারী জিনিস। তাকে দেখতে হবে যাতে আমার প্রয়োজন অনুযায়ী দেশের ভেতর যথেষ্ট লোক মজুত থাকে এবং যা কিছু আমি বিক্রি করতে চাই কেনার লোক থাকে। আমার অভিপ্রায় মেটানোর জন্য ঠিক সে পরিমাণ বিদেশীদের যোগান থাকলেই চলবে, যতটুকু আমার দরকার। কিন্তু তার বেশি নয়! তাছাড়া কোনো সোশিয়ালিস্ট যেন না থাকে। কোনো ধর্মঘটও চলবে না। সরকার কিছুতেই চড়া ট্যাক্স বসাতে পারবে না। লোকজনকে যা দিতে হবে তার সবটুকুই আমি নিজে নেব। এ সব যে দেখবে, তাকেই আমি ভালো সরকার বলতে চাই।"

'লোকটা আকাট মুখ্যু—নিজেকে মহৎ ভাবার ভেতর দিয়েই ব্যাপারটা মালুম হচ্ছে' ভাবলাম আমি, 'লোকটা নির্ঘাৎ কোনো রাজা-গজা···'

তিনি দৃঢ় নিশ্চিত গলায় বলে যেতে লাগলেন, "আমি চাই দেশে শৃঙ্খলা বজায় থাকুক। সরকারের উচিত সব ধরনের দার্শনিকদের ভাড়া করে তাদের দিয়ে প্রতি রবিবার অন্তত আট ঘণ্টা লোকজনকে আইন মান্য করতে

শেখানো। যদি দার্শনিকরা সামলাতে না পারে, তা হলে সেনাবাহিনীকে তলব করতে হবে। পদ্ধতি নয়, লক্ষ্য রাখতে হবে ফলাফলের দিকে। ক্রেতা ও শ্রমিকদের আইন মেনে চলতেই হবে। এই হল মোদ্দা কথা।" আঙুলগুলো গুটিয়ে ফেলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

আমি ভাবলাম, 'না, এ তো বোকা নয়, একজন রাজা এ কি ভাবে হতে পারে!' তারপর প্রশ্ন করলাম,

"বর্তমান সরকারকে নিয়ে আপনি খুশি তো?"

তিনি তক্ষুণি কোনো উত্তর দিলেন না।

"যা করার ছিল, সরকার তার চেয়ে কম করেছে। আমি বলি: বিদেশ থেকে এখানে যারা আসছে, তাদের এ দেশে থাকার সময় বেঁধে দিতে হবে। আমাদের যে সব রাজনৈতিক অধিকার তারা ভোগ করে, তার জন্য তাদের দাম দিতেই হবে। তাদের প্রত্যেককে অন্তত ৫০০ ডলার করে নিয়ে আসতে হবে। যার ৫০০ ডলার আছে সে যার ৫০ ডলার আছে তার চেয়ে অন্তত দশগুণ ভালো লোক...ভবঘুরে, ভিখিরি, অসুস্থ আর আর অন্য সব নিষ্কর্মা লোকজনকে দিয়ে কোথাও কিছু কাজ হয় না।"

"কিন্তু", আমি সাহস করে বললাম, "এর ফলে বাইরে থেকে লোক আসার জোয়ারে ঘাটতি পড়বে।"

সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ।

"সময় মতো প্রস্তাব রাখব যাতে আমাদের দেশের দরজা তাদের মুখের ওপর একদম বন্ধ করে দেওয়া হয়...কিন্তু এর মধ্যে তারা প্রত্যেকেই এখানে খানিকটা করে সোনা নিয়ে আসুক...এতে দেশের পক্ষে ভালোই হবে। নাগরিকত্ব গ্রহণের প্রবেশনের সময় আরও বাড়িয়ে দেয়া দরকার। এক সময়ে আমরা এ ব্যাপারটাকে একদম তুলে দেব। যারা মার্কিনীদের জন্য কাজ করতে চায় করুক, কিন্তু মার্কিন নাগরিকদের অধিকারগুলো তাদেরও দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা কি এর মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে আমেরিকান পয়দা করি নি? এরা প্রত্যেকেই দেশের জনসংখ্যা বাড়ানোর কাজে রীতিমতো যোগ্য। এ সব কিছু সরকারের ভাবার ব্যাপার। কিন্তু সরকারকে অন্য ভাবে ঢেলে সাজতে হবে। যারা সরকারের সদস্য হবে তাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন শিল্পসংস্থার শেয়ার হোল্ডার হতেই হবে। তাহলে তারা আরো সহজে এবং তাড়াতাড়ি দেশের স্বার্থ বুঝতে পারবে। এখন আমাকে সেনেট-

সদস্যদের কিনে তাদের বোঝাতে হয় আমার এটা ওটা কি কি একান্ত দরকার।
এর আর কোনো প্রয়োজন হবে না তখন…"

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন, পা নাড়লেন এবং আরও বললেন, "কেবল সোনার চূড়োর ওপর থেকেই একজন লোক জীবনকে সঠিক ভাবে দেখতে পায়।"

তিনি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে আমার সামনে যথেষ্ট পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরার পর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ধর্ম সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

"আহ্!" তিনি তাঁর উরুতে চড় মেরে, দুচোখ উৎসাহের সঙ্গে পাকিয়ে বললেন, "এ সম্পর্কে আমার খুবই ভালো ধারণা! ধর্ম ছাড়া লোকজনের চলে না। এ আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি। এটা একটা ঘটনা যে আমি নিজে প্রত্যেক রবিবার গির্জায় ধর্মপ্রচার করতে যাই…সত্যি, এ আমি করে থাকি!"

আমি জানতে চাইলাম, "কি বলেন আপনি?"

"একজন নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টান গির্জায় যা বলতে পারে! দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন তিনি, "অবশ্যই নম্র ভাবে প্রচার করি আমি। গরীবদের সবসময় দয়ালু কথাবার্তা শোনানো আর বাপের মতো নির্দেশ দেয়া দরকার…আমি তাদের বলি…"

এক মুহূর্তের জন্য তাঁর মুখে জেগে উঠল শিশুসুলভ ভঙ্গি। তারপর তিনি তাঁর ঠোঁট দুটিকে জোর সম্বদ্ধ করলেন। তাঁর দৃষ্টি ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘরের সিলিঙে, যেখানে কন্দর্পরা সলাজ মুখে ইয়র্কশায়ারের মাদি শুয়োরের মতো বাদামি চামড়াঅলা মাংসল একটি রমণীর ন্যাংটো শরীর ঢাকার চেষ্টা করছে। বৃদ্ধটির জ্যোতিহীন চোখের ওপর সিলিঙের আলো প্রতিফলিত হয়ে ঝলসে উঠছে। তিনি শান্ত ভাবে শুরু করলেন, "খ্রীষ্টান ভ্রাতা ও ভগ্নিবৃন্দ! ঈর্ষার চতুর শয়তানের দ্বারা প্রলুব্ধ হোয়ো না, যা কিছু পার্থিব তা পরিহার করো! জাগতিক জীবন ক্ষণস্থায়ী। একজন ব্যক্তি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ভালো ভাবে কাজ করতে পারে, চল্লিশের পর তাকে আর কারখানায় রাখা যায় না। জীবন নিরাপদ নয়। কাজের সময় তোমার হাত যদি একবার ভুল করে তাহলে যন্ত্র তোমার হাড়গোড় চূর্ণ করে দেবে; গর্মি হলে তোমার দফারফা হয়ে যাবে। তোমার প্রতি পদক্ষেপে তাড়া করে ফিরছে রোগ আর দুর্ভাগ্য! গরীব মানুষ হল উঁচু বাড়ির ন্যাড়া ছাদের ওপরে বসে থাকা দৃষ্টিহীনের মতো,

যেদিকেই সে ঘুরুক না কেন, তাকে পড়ে মরতে হবে। জুডের ভ্রাতা সন্ত জেমস এ কথাই আমাদের বলেছেন। ভাই সব, পার্থিব জীবনের জন্য লালায়িত হোয়ো না, মানুষের হৃদয়ের বিকৃতি-সৃষ্টিকারী শয়তানের কাজ এই পৃথিবী। খ্রীষ্টের প্রিয় সন্তানগণ, তোমাদের পিতৃপুরুষের মতো তোমাদের রাজত্বও এই জগতে নয়, তা রয়েছে স্বর্গে। যদি তুমি ধৈর্যশীল হও, যদি তুমি এই পার্থিব জীবন নিরীহ হয়ে সহ্য করে যাও, কোনো গুঞ্জন বা অভিযোগ না তোলো, ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গে বরণ করে নেবেন এবং এই পৃথিবীতে তোমার শ্রমের দরুণ তোমাকে চির আশীর্বাদে অভিষিক্ত করবেন। এই জীবন হচ্ছে তোমাদের আত্মার শোধনালয়। এখানে যত বেশি কষ্ট ভোগ করবে, সেখানে তত বেশি আশীর্বাদ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। স্বয়ং জুড এ কথা আমাদের জানিয়েছেন।"

সিলিঙের দিকে আঙুল তুলে, এক মুহূর্তের জন্য চিন্তার পর তিনি শীতল কঠিন গলায় বলে যেতে লাগলেন, "হ্যাঁ, প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ! আমাদের প্রতিবেশী, তারা যাই হোক না কেন, তাদের জন্য এই জীবনকে যদি বিসর্জন না দিতে পারি, তবে এ তুচ্ছ আর অর্থহীন হয়ে পড়ে। ঈর্ষার দানবদের কাছে তোমাদের হৃদয় বাঁধা দিও না। ঈর্ষার কি আছে? পার্থিব আশীর্বাদ মায়া বৈ কিছু নয়, সেগুলো হল শয়তানের খেলনা। ধনী-গরীব, রাজা-কয়লাখানির মালিক, ব্যাংক মালিক, রাস্তার ঝাড়ুদার—আমাদের সবাইকেই মরতে হবে। এমনটি হতে পারে যে স্বর্গের শীতল উদ্যানে খনির মালিকরা রাজা হয়ে যাবে আর একজন রাজাকে বাগানের পথ থেকে ঝাঁট দিয়ে ফেলতে হবে ঝরা পাতা আর নিত্যিদিন যে-চকোলেট তোমরা খাবে তার ফেলে দেওয়া মোড়কগুলো। ভাইসব! এই দুনিয়ায় চাওয়ার মতো কি আছে, এই পাপের অন্ধকার অরণ্যে যেখানে হৃদয় একটা শিশুর মতো ভুল করতে থাকে? ভালোবাসা ও বিনয়ের পথ ধরে স্বর্গে চলো, তোমার অদৃষ্টে যা আছে তাকে নীরব ধৈর্যে সহ্য করে যাও। তোমার সঙ্গী-সাথীদের ভালোবাসা, এমনকি তাদেরও যারা তোমাকে অপমান করে..."

দুচোখ বুজে, চেয়ারে দোল খেতে খেতে তিনি ফের শুরু করেন, "কিছু লোকের দারিদ্র্যের সঙ্গে অন্য কিছু মানুষের সম্পত্তির প্রতিতুলনা করে যারা তোমাদের অন্তরকে ঈর্ষার অপরাধময় অনুভূতি দিয়ে উত্তেজিত করে তোলে,

তাদের কথায় কান দিয়ো না। এই লোকগুলি শয়তানের চর। ঈশ্বর তোমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি হিংসা করতে নিষেধ করেছেন। ধনীরাও গরীব, তারা ভালোবাসায় গরীব। যিশুর ভাই, গির্জার পন্টিফ জুড বলেছেন, ধনীদের ভালোবাসো, কারণ তারা ঈশ্বরের দ্বারা নির্বাচিত। সাম্যের মন্ত্র এবং শয়তানের অন্য সব উদ্ভাবিত কথাবার্তা আউড়ে যেয়ো না। এখানে, এই দুনিয়ায় সাম্যের আবার কি আছে? ভগবানের সামনে হৃদয়ের পবিত্রতা তুলে ধরার ব্যাপারে তোমাদের সমানভাবে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে। ধৈর্যের সঙ্গে তোমার দণ্ড বহন করে যাও এবং বশ্যতা তোমাদের ভার হালকা করবে। ভগবান তোমাদের সঙ্গে আছেন, আমার সন্তানেরা, তোমাদের আর কিছুরই প্রয়োজন নেই।"

বৃদ্ধ চুপ করলেন। তাঁর মুখ প্রসারিত হয়ে সোনালি দাঁতগুলো ঝলসে উঠল। বিজয়ীর মতো আমার দিকে তাকালেন তিনি।

আমি বললাম, "ধর্মকে আপনি বেশ ভালোভাবেই কাজে লাগান দেখছি।"

"নিশ্চয়ই! আমি এর কদর বুঝি", তিনি বললেন, "আমি আবার বলছি, গরীবের পক্ষে ধর্ম দরকারী জিনিস। আমি এটা পছন্দ করি। ধর্ম বলে দুনিয়ার যা কিছু আছে, সবই শয়তানের। মনুষ্যগণ, তোমরা যদি তোমাদের আত্মাকে রক্ষা করতে চাও, তাহলে এই পৃথিবীর কোনো জিনিসের প্রতি লোভ কোরো না, সেসব স্পর্শ কোরো না। মৃত্যুত্তীর্ণ জীবনের সব আনন্দ তোমরা পাবে, স্বর্গে যা কিছু আছে সবই তোমাদের। লোকজন যখন একথা বিশ্বাস করে, তখন তাদের নিয়ে নাড়াচাড়া করা বেশি সহজ। হ্যাঁ, ধর্ম হচ্ছে এক ধরনের পিচ্ছিল জিনিস। জীবনের যন্ত্রপাতিকে তৈলাক্ত করার কাজে যতই একে লাগানো যাবে ততই যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কম সংঘর্ষ হবে ও যন্ত্রচালকের কাজ সহজতর হয়ে আসবে··

"ইনি নিশ্চয়ই রাজা", সিদ্ধান্ত নিলাম আমি।

"আপনি কি নিজেকে খ্রীষ্টান বলে মনে করেন?" এক শূকররক্ষকের এই সাম্প্রতিক বংশধরকে শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবে প্রশ্ন করলাম আমি।

"আমি অবশ্যই মনে করি।" পুরো আস্থা নিয়ে উত্তর দিলেন তিনি। "কিন্তু", ওপরের দিকে আঙুল তুলে মনে দাগ কেলার মতো ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন, "একই সঙ্গে আমি একজন আমেরিকান, আর তাই একজন কড়া নীতিবাগীশ···

তাঁর মুখে এক ধরনের নাটুকে ভঙ্গি দেখা গেল। তিনি তাঁর ঠোঁটদুটো চেপে ধরলেন আর তাঁর কানজোড়া নাকের কাছাকাছি সরে এল।

গলা নামিয়ে বুঝতে চাইলাম আমি, "আপনি ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন ?"

ফিসফিসিয়ে তিনি বলেন, "এ তোমার আর আমার ভেতরের ব্যাপার··· একজন আমেরিকানের পক্ষে খ্রীষ্টকে বুঝতে পারা অসম্ভব।"

সামান্য থেমে আমি ফিসফিসিয়ে বললাম, "অসম্ভব ?"

তিনি ফিসফিসিয়ে অনুমোদন করলেন, "অবশ্যই।"

"কিন্তু কেন ?" এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জানতে চাইলাম আমি।

"কোনো বিবাহিত দম্পতি তাঁকে জন্ম দেয় নি।" বৃদ্ধ আমার দিকে চোখ টিপলেন। তাঁর দৃষ্টি ঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। "বুঝতে পারছো ? ভগবানের কথা তো বাদই দিলাম, অবিবাহিত নরনারীর সন্তান আমেরিকায় একজন সরকারী ব্যক্তিই হতে পারে না। ভদ্র সমাজের কোথাও তার কোনো জায়গা নেই। কোনো মেয়ে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না। হ্যাঁ, ভারী কড়া লোক আমরা! খ্রীষ্টকে যদি মানতে হয় তাহলে সব জারজ সন্তানদেরই আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় ভদ্রলোক বলে··· এমনকি যদি তাদের জন্ম দেয় একজন নিগ্রো আর একটি শ্বেতাঙ্গিনী। ভাবো কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! কি ?"

একটা প্যাঁচার গোল চোখের মতো বৃদ্ধটির চোখ যেরকম সবুজ হয়ে পাক খাচ্ছিল, তাতে বোঝা যাচ্ছিল, ব্যাপারটা নিশ্চয় খুব ভয়ঙ্কর। চেষ্টা করে নিচের ঠোঁটটি তুলে সেটিকে তাঁর দাঁতের সঙ্গে চেপে ধরলেন তিনি। তিনি অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে এই ভঙ্গিটি তাঁর মুখমণ্ডলের চেহারা আরও দ্রষ্টব্য ও কঠোর করে তোলে।

একটি গণতান্ত্রিক দেশের নৈতিকতার চেতনায় পীড়িত বোধ করে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি একজন নিগ্রোকে সরাসরি অস্বীকার করতে চাইছেন ?"

"কি গেঁইয়া তুমি!" করুণার সঙ্গে উত্তর দিলেন তিনি, "আরে, ওরা তো কালো! ওদের সারা শরীরে দুর্গন্ধ। যখনি আমরা জানতে পারি যে একজন নিগ্রো একটি শ্বেতাঙ্গিনীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছে, তক্ষুনি আমরা তাকে চাবকে মেরে ফেলি। বেশি ঢাকঢোল না পিটিয়ে আমরা তার গলায় দড়ি

পরিয়ে সবচেয়ে কাছের গাছে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিই। নীতির প্রশ্নে আমরা ভারী কড়া হে...”

একটা পচনশীল শবের জন্য মানুষের মনে যেটুকু সমীহ না জেগে পারে না, তিনি আমার মধ্যে সেই অনুভব জাগিয়ে তুলছিলেন। কিন্তু একটা কাজের ভার নিয়েছি এবং সেটি শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগলাম। সত্য, স্বাধীনতা, যুক্তি এবং যা কিছু অনবদ্য বলে আমি বিশ্বাস করি—সে সব কিছুকে নির্যাতন করার এই পদ্ধতিটি দ্রুততর করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলাম।

“সোশিয়ালিস্টদের সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?”

“ওরা হচ্ছে শয়তানের খোদ চাকর-বাকর,” হাঁটু চাপড়ে দ্রুত পালটা জবাব দিলেন তিনি, “সোশিয়ালিস্টরা হচ্ছে জীবনের যন্ত্রের ভেতরে বালির মতো, যে বালি সব কিছুর মধ্যে ঢুকে পড়ে, যন্ত্রকে মসৃণ ভাবে কাজ করতে বাধা দেয়। একটা ভালো সরকারের রাজত্বে কোনো সোশিয়ালিস্ট থাকতে পারে না। তবু আমেরিকাতেই পয়দা হচ্ছে তারা। এর মানে, ওয়াশিংটনের লোকজন তাদের কাজ কি তা জানে না। তাদের অবশ্যই উচিত কাজ হল সোশিয়ালিস্টদের কাছ থেকে নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়া। অন্তত এতেও খানিকটা তো হয়। আমি বলতে চাই যে একটি সরকারকে বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ রাখতে হবে। আর এটা হতে পারে, যদি তার সব সদস্যই কোটিপতি হয়। এই হল গিয়ে মোদ্দা কথা।”

“আপনি ভারী এককথার লোক,” আমি বললাম।

“হ্যাঁ, নিশ্চয়ই” তিনি মাথা ঝেঁকে সম্মতি জানালেন। তাঁর মুখ থেকে তখন শিশুসুলভ ভঙ্গি উবে গেছে এবং জোড়া গালে গভীর ভাঁজগুলো ফুটে উঠেছে।

আমি তাঁকে শিল্প বিষয়ে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলাম। “আপনার কি ধারণা...” আমি শুরু করতেই তিনি তাঁর আঙুল তুলে বলতে শুরু করলেন, “মগজে নিরীশ্বরবাদ আর পেটে পেটে নৈরাজ্যবাদ—এই হল গিয়ে একজন সোশিয়ালিস্টের পরিচয়। শয়তান তার পাগলামো আর রাগের ডানাজোড়া দিয়ে তার আত্মাকে ঢেকে ফেলেছে। সোশিয়ালিস্টদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য আমাদের আরো ধর্ম, আরো সৈন্য দরকার। নিরীশ্বরবাদের বিরুদ্ধে ধর্ম, নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সৈন্য। প্রথমেই সোশিয়ালিস্টের মগজ

খাশা চিজ। কিন্তু এক লহমায় বোঝা মুশকিল সত্যিই তাদের কোনটির বয়স কম। তারা এত সুন্দর চেহারা করে থাকে। আমি জানি—এটা তাদের জীবিকা। কখনো হয়তো তুমি ভেবে ফেললে অমুক মেয়েটা খাশা! তারপর জানতে পারলে তার বয়স পঞ্চাশ এবং তার কমপক্ষে শদুয়েক প্রেমিক আছে। এটা অবশ্যই ভারী আফশোসের ব্যাপার। অভিনেত্রীর চেয়ে সার্কাসের মেয়েরা ভালো। তারা প্রায় সব সময়ই আরো অল্পবয়সী আরো ছিপছিপে হয়ে থাকে ”

মনে হচ্ছিল তিনি এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। এমন কি আমার মতো একজন পুরোনো পাপী, সারা জীবন যে পাপের ভেতরে গড়িয়েছে, তারও ঐ ভদ্রলোকের কাছ থেকে শেখার আছে।

“কবিতা ব্যাপারটা আপনার কেমন লাগে?” আমি প্রশ্ন করলাম।

“কবিতা?” জুতোর দিকে ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করে আমার কথার প্রতিধ্বনি তুললেন তিনি। একটু ভেবে মাথা তুলে এবং দাঁত দেখিয়ে তিনি বলে চললেন, “কবিতা? ওহ, আচ্ছা! কবিতা পছন্দ করি আমি। সবাই যদি কবিতায় বিজ্ঞাপন লিখতে শুরু করে, বাঁচাটা ভারী মজাদার ব্যাপার হয়ে ওঠে।”

“আপনার প্রিয় কবি কে?” তাড়াতাড়ি আমি পরের প্রশ্নটিতে চলে যাই।

বিভ্রান্ত চোখে বৃদ্ধ আমার দিকে তাকান এবং ধীরে ধীরে প্রশ্ন করেন, ‘কি বললে তুমি?”

আমি দ্বিতীয়বার বলি।

“হুম্...ভারী মজার লোক তো তুমি!” সন্দেহের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে তিনি বললেন, “একজন নির্দিষ্ট কবিকে পছন্দ করতেই বা হবে কেন?”

“মাফ করবেন!” কপালের ঘাম মুছে বললাম, “আমি বলতে চাইছিলাম আপনার চেকবই ছাড়া আর কোন বই আপনি ভালোবাসেন...”

“আহ্! এটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার!” একমত হলেন তিনি। “আমার সবচেয়ে প্রিয় দুটি বই—বাইবেল আর হিসেবপত্রের খাতা। এ দুটো জিনিসই মনকে সমানভাবে চাঙ্গা করে তোলে। যে মুহূর্তে তুমি ওগুলোকে হাতে নেবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার মনে হবে ওতে এমন জোরালো ব্যাপার আছে যা তোমার সবকিছু প্রয়োজন মেটাতে পারে।”

“উনি আমাকে নিয়ে মস্করা করছেন!” এই ভেবে সোজাসুজি তাঁর দিকে তাকালাম। এই শিশুটির আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ করার কোনো ব্যাপার সেখানে ছিল না। ঐ তিনি চেয়ারে বসে আছেন, খোসার ভেতরে কোঁচকানো

বাদামের মতো লাগছে তাঁকে। এতে কোনো সন্দেহই নেই যে তিনি তাঁর কথার সততায় পুরোপুরি বিশ্বাস করেন।

নখ খুঁটতে খুঁটতে তিনি বলে চললেন, "হ্যাঁ। ঐ বইদুটো চমৎকার! একটা বই লিখেছেন সন্তরা, আর খোদ আমি লিখেছি অন্যটি। আমার বইয়ে তুমি খুব বেশি কথাবার্তা পাবে না। পাবে কয়েকটা অঙ্ক। সেগুলো দেখিয়ে দেবে যে একজন লোক যদি সততা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করতে চায়, তাহলে সে কি না করতে পারে। সরকারের পক্ষে ভালো কাজ হবে আমার মৃত্যুর পর আমার বইটি ছাপা। লোকজন জানুক আমার জায়গায় ওঠার জন্য কি তাদের করতে হবে।"

বিজয়ীর জয়োদ্ধত মেজাজে তিনি রাজকীয় ভঙ্গি করলেন।

আমার মনে হল, এবার সাক্ষাৎকার শেষ করা উচিত। পদদলন সমস্ত মাথা সহ্য করতে পারে না।

শান্তভাবে বললাম, "আপনি হয়তো বিজ্ঞান নিয়ে কিছু বলতে পছন্দ করতে পারেন?"

"বিজ্ঞান?" তিনি একটি আঙুল তুলে ছাদের সিলিঙের দিকে তাকালেন। তারপর ঘড়ি বের করে সময় দেখলেন, চেনটি আঙুলে জড়িয়ে, সেটিকে বাতাসে দোলাতে লাগলেন। এ সবের পর একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলতে শুরু করলেন, 'বিজ্ঞান...হ্যাঁ, জানি বৈকি! বই? সে সব বই-ই কাজে লাগে যেগুলিতে আমেরিকা সম্পর্কে ভালো ভালো কথা লেখা আছে। কিন্তু খুব কম সময়েই তুমি এ সবের ভেতর সত্যি কথা খুঁজে পাবে। এই সব...কবিরা, যারা বই লেখে, আমার বিশ্বাস তাদের রোজগারপাতি খুব কম। যে দেশে সবাই যে-যার কাজকর্মে ব্যস্ত, সেখানে কারো বই পড়ার সময় নেই...হ্যাঁ, কবিদের বইপত্তর বিক্রি হয় না বলে তারা চটে থাকে। সরকারের উচিত লেখকদের ভালোমতন টাকাপয়সা দেয়া। ভালোভাবে খেতে-পরতে যে পায়, সে সব সময়ই দয়ালু আর হাসিখুশি থাকে। আমেরিকা সম্পর্কে বই লেখা যদি আদৌ দরকারী হয়, তাহলে ভালো ভালো কবিদের ভাড়া করতে হবে। তাহলেই আমেরিকার কাজে লাগে এমন সব বই লেখা হয়ে যাবে...এই হল গিয়ে মোদ্দা কথা।"

"বিজ্ঞান সম্পর্কে আপনার ধারণা বড্ড সংকীর্ণ", আমি বললাম।

তিনি তাঁর দু চোখ বন্ধ করে ভাবনায় ডুবে গেলেন। তার পর চোখ খুলে

আবার প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে শুরু করলেন, "বেশতো, ঠিকই, মাস্টারমশায়, দার্শনিক…এও বিজ্ঞান। অধ্যাপক, দাই, দাঁতের চিকিৎসক,.. জানি আমি। উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। ঠিক আছে। এদের সবাইকে দরকার। ভালো বিজ্ঞান…যা খারাপ কিছু শেখাবে না…কিন্তু আমার মেয়ের মাস্টার একবার আমাকে বলেছিল যে সমাজবিজ্ঞান বলে কি একটা আছে…এই ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারি না। আমার ধারণা, জিনিসটা ক্ষতিকর। একজন সোশিয়ালিস্ট কখনো ভালোজাতের বিজ্ঞান তৈরি করতে পারে না। বিজ্ঞানের সম্বন্ধে তাদের কোন সম্পর্ক থাকা আদৌ ঠিক নয়। এডিসন যে সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করছে সেগুলো ক্রেজো অথবা মজাদার। গ্রামোফোন, সিনেমা—এগুলো দরকারী। কিন্তু বিজ্ঞানের ওপর গাদা গাদা বই লেখা বড্ড বাড়াবাড়ি। এমন সব বইপত্তর লোকজনের পড়া উচিত নয় যা তাদের মগজে সন্দেহ ঢোকাবে। দুনিয়ায় যেটি যেমন আছে তেমনি থাকা উচিত, বইটইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে কোন লাভ নেই।"

আমি উঠে পড়ি।

"আরে, চলে যাচ্ছ নাকি?" প্রশ্ন করেন তিনি।

"হ্যাঁ" উত্তর দিই, "তবে এখন, আমার চলে যাওয়ার আগে আপনি হয়তো আমাকে কবুল করবেন, কোটিপতি হওয়ার সত্যি কি অর্থ?"

তিনি হিক্কা তুলতে শুরু করলেন এবং উত্তর দেওয়ার বদলে তাঁর পা দুটো ঝাঁকাতে লাগলেন। বোধহয় ওটাই ছিল তাঁর হাসার পদ্ধতি।

"এ একটা ওব্যেশ!" দম টেনে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

"অভ্যাস মানে?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"কোটিপতি হওয়া…এ একটা ওব্যেশ!" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমার শেষ প্রশ্নটি করলাম, "তাহলে আপনার কথামত ভবঘুরে, নেশাখোর আর কোটিপতিদের একই গোত্রের লোক বলে ধরতে হবে?"

এই মন্তব্য নিশ্চয় তাঁকে আহত করেছিল। তাঁর চোখদুটো ছানাবড়া হয়ে গেল এবং সেখানে তাঁর ঘৃণার সবুজ রং ফুটে উঠল।

"মনে হচ্ছে তোমার জন্মের গণ্ডগোল আছে," খেঁকিয়ে উঠলেন তিনি।

"বিদায়!" বলে উঠলাম।

তিনি সৌজন্য দেখিয়ে আমাকে দেউড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন এবং নিজের

জুতোজোড়ার দিকে চোখ ঠেরে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর বাড়ির সামনের লনটি পুরু, সমান করে ছাঁটা ঘাসে ঢাকা ছিল। আমি তার ওপর দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে ভাবছিলাম এই লোকটির সঙ্গে আমার আর জীবনে দেখা হবে না। তক্ষুণি আমি পেছন থেকে কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

"আমি বলছি।"

পেছন ফিরে তাকালাম। তিনি তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

"ইয়োরোপে যত রাজা দরকার তার চেয়ে বেশি রাজা মজুত আছে?" তিনি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন।

আমায় যদি বলতে বলেন, বলি, তাঁদের দিয়ে আমাদের কোনো দরকার নেই।" উত্তর দিলাম।

তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে থু থু ফেললেন।

"আমার নিজের জন্য একজোড়া রাজা ভাড়া করার কথা ভাবছিলাম" তিনি বললেন, "এ ব্যাপারে কি বলো তুমি?"

"কিন্তু কেন?"

"ত্যাখো, ব্যাপারটা মজার হবে। আমি তাদের সরাসরি এখানেই বকসিং লড়তে হুকুম করব…" তিনি তাঁর বাড়ির সামনে উঠোনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন এবং প্রশ্নাকুল গলায় আবার শুধোলেন, "রোজ একটা থেকে দেড়টা, কি বলো? দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর আধঘণ্টাটাক শিল্পচর্চা করা ভারী তোফা ব্যাপার হবে…ভারী চমৎকার।"

তিনি আন্তরিকভাবে বলছিলেন এবং আমি বুঝতে পারছিলাম যে এই আকাঙ্ক্ষা মেটানোর জন্য তিনি সব কিছু করতে পারেন।

"কিন্তু এই কাজের জন্য আপনার রাজাদেরই বা চাই কেন?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"কারণ এ পর্যন্ত এমনটি আর কেউ ভাবে নি।" এই ছিল তাঁর ব্যাখ্যা।

"হ্যাঁ, তবে রাজারা তো অন্যদের দিয়েই নিজেদের লড়াই লড়ে থাকেন!" এই বলে হাঁটা দিলাম আমি।

"বলছি শোনো!" তিনি আবার ডাকলেন আমাকে। আবার থামতে হল। দু পকেটে হাত রেখে তিনি তখনো একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর মুখ জুড়ে এক ধরনের স্বপ্নময়তা খেলা করছিল।

এইসব আস্তিকতা

শিবশম্ভু পাল

অভাবের চেহারাটা ক্রমবর্ধমান কালকেতু।
তাদের গোড়ালিগুলো মাটির ভাঁড়ের মতো চরিত্র গুঁড়িয়ে
ছাতু করে।
তাই খেয়ে বটতলার দেহাতি সর্দার
ষণ্ডামার্ক দেহ নিয়ে আমাকে প্রায়ই টানে, টানতে চায় ওদের ডেরায়।
ওরই নাম আত্মহত্যা। আর বটতলা ?
তোমরা সবাই জানো, সময়ের কৃপাধন্য রাজার দপ্তর।

আমার নিজস্ব জোর ক্ষয়ে যায় ক্রমাগত ত্রাসে
ক্রমাগত পরাজয়ে চোখ থেকে দ্যুতি চ'লে যায়
আস্তাকুড়ে প'ড়ে থাকে পুরোনো অকেজো অস্ত্র, সম্মুখসমর
এখন চলে না, বিনামেঘে
নিয়মিত বজ্রপাত নথিবদ্ধ হয়ে আছে দৈনিক কাগজে।

ফিরে আসি বারবার। স্থায়ী অন্ধকার থেকে ঘূর্ণমান
অন্ধকারে, পরিধির কোন প্রান্তে বিশ্রামের স্মৃতিময় হাওয়া
সর্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ।
এইসব আস্তিকতা এনে দেয় অকালমৃত্যুর চেয়ে ঢের বলীয়ান
শিশুর পবিত্র ঠোঁট, ঈশ্বরনিন্দিত কণ্ঠে ডেকে ওঠা : বাপি!

আনুপূর্বিক জীবনতা

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

১

গ'ড়ে তুলব অকম্প্র এক স্তম্ভ যেন স্থির শিলা শান্তির অকৃপণ আরোগ্যের
ক্ষুব্ধ মাতাল সমুদ্র তার পায়ে পড়বে ফেটে নিবেদনের ভঙ্গিতে

জাহাজ ডুবে লক্ষ্যহীন আর দিশেহারা তার নাবিক অমোঘ ত্রাসে
প্রতিকার নেই নক্ষত্রে ওই সপ্তর্ষির শূন্যতায় ধ্রুবতারার দৃষ্টিতে
তোমার আকাশ রূঢ় এবং ভীষণ অন্ধ গভীর বন যেন
আমি দোলাব লণ্ঠন সবুজ আলোর লণ্ঠন জ্বলে উঠবে পথ
এই মতো আরোগ্য চাই তোমার ত্রস্ত মানুষ এই জেগে থাকার দুঃস্বপ্নে

২.

পরাজিতের স্বরে মগ্ন জাহাজ
চোখ থেকে খ'সে পড়ছে নক্ষত্র শর থেকে বিস্ময়
ভাবো তোমার রুদ্র দিনের পরিণাম অনিশ্চিত চলার অসীম ক্লান্তি
দিনের শুরু শোকপ্রস্তাবের রূঢ়তায়
আর সন্ধ্যা আসে নিকষ কালো পাহাড়
তার চূড়ায় হিংস্র বাজের নিথর ডানা
দিনের মাস্তুল ডুবে যাচ্ছে বসেছে তার উপর দগ্ধ পৃথিবী
আর ডুবে যাচ্ছে ক্রমশ
নেই তেমন অমোঘ শর বিদ্ধ করব তাকে আনব তুলে
বলব মানুষ এই তোমার চলার যোগ্য মাটি দিলাম ফিরিয়ে
এই ভাবেই ফিরিয়ে দেবো হারানো সব ঋতুর মদ পান করবে আকণ্ঠ

৩.

কেমন ক'রে সুস্থ হবে শরীর আমার যত্নলালিত শরীর আমার লোকায়ত দেবতা
সাড়ে তিন হাত দেহ তবু মৃত্যুকে দেয় ফিরিয়ে অবাঞ্ছিত মৃত্যুকে
এমনই তার স্পর্ধা আর এরই তো নাম পৌরুষ যেন আলোকস্তম্ভ চলমান
দোলাবে তার লণ্ঠন সব বেলাভূমির নৈঃশব্দ্যে আনুপূর্বিক শূন্যতায়
বাচাল ইতিহাসের পথে অসহ্য দিন গড়ায় চ্যুত চাকার মতন লক্ষ্যহীন
বন্ধ্যা দেশের মাটি রক্তে, বিফল শ্রমে, পরাভূত পৌরুষের গ্লানিতে নিষ্ফল
হাঁটুভাঙা মানুষ ভাঙছে প্রতিদিনের পাথর তুলছে পাহাড় চূড়ায় পাথর
করুণা তার আঙুল থেকে উধাও
দেখি মৃত শিশু শোয়ানো রাজপথে
যুবতী মা দয়া চাইছে আমার নেই সময় ট্রামে ঊর্ধ্বশ্বাস ছুটি

৪.

কি যে কখন হারিয়ে গেলো…কোথায়…আমি নিঃস্ব ফাঁকা মানুষ
কূট ষড়যন্ত্রে আমি হত্যাকারী হলাম　নবজাতক জানল না
মানুষ থেকে মানুষে আলো সঞ্চারিত হবে জেনে অটুট আশ্বাসে
পিতামহের প্রয়াণ　মিথ্যা স্বপ্ন দেখেছিলেন জেনে নিবিড় কৌতুকে
পিতাও হেসেছিলেন
　　তবু প্রসন্নতা ছিল　ঈষৎ বিষাদ ছিল　এসব কল্পকথা,
বাচাল ইতিহাসের পথে অসহ্য দিন খেঁতলে দিয়ে সত্য হয়ে গেছে

৫.

ভাবনাকে দাও রক্তরসের আঙুর　দাঁড়াক মাটিতে মেলে শিকড় হোক বৃক্ষ
লঘু পাখার নম্র দিনই তো মৃত্যু
　　　　তোমার বিশ্বক্ষুধার দহনে শুদ্ধ হোক বোধি
প্রতিদিনের জন্ম চায় গতির সুখ　অবাধ সম্প্রসারণ ব্যক্তিসত্তার
ফণিমনসার কাঁটায় বিদ্ধ জ্যোৎস্না　খণ্ড চাঁদের মাংস বিদ্ধ কাঁটায়
শরীরময় প্রতিবাদের হাজার হাত
　　　　　　দাঁড়াতে চাই আমি　বুভুক্ষু এক মানুষ
কাঁধের উপর হত্যাকারীর থাবা
　　　　　　আমার দুর্বলতার উৎস সে কি জানে ?

৬.

স্তম্ভ গড়ার ইচ্ছা পড়ছে ভেঙে
　　　　হয়তো অনালোকের ইতিহাস এই জন্ম
দাঁড়িয়ে থাকব বালির উপর　ব্যর্থতার প্রতীক　নির্বাসিতের দিনযাপন
মৃত্যুতাড়িত জাহাজ ঘুরবে ইতস্ততঃ ভয়ার্ত　আমাতে নেই আরোগ্য
ফাটা কাচের চিমনি　হু হু বাতাস কার বিলাপ সামুদ্রিক হাওয়ায়
নিমজ্জিতের কান্না　আর
　　　　পরাজিতের স্বরে অশান্ত এক মাতাল উঠছে কেঁদে
মুহুর্মুহু আমার শান্তি নষ্ট হচ্ছে　স্থির শিখার স্তম্ভ পড়ছে ভেঙে
　　　　　　লিখি অসমাপ্ত কবিতা,
যাদুঘরের ঠাণ্ডা মেঝেয় মৃতশব্দের কাঁথা বুনছে 'আত্মমগ্ন' কবি

ভূমিকা

গণেশ বসু

শনিবার। জানুয়ারির ১৮ই দিনের শুরু। ৬ : ৪৫

কিছুটা দেরিতে এলে কি ভালো হত ? অন্তত কয়েক ঘণ্টা। আরো কয়েক ঘণ্টা থাকতে বাগানে উজ্জ্বল মণির মতো, অঢেল ভালোবাসায় ভরে নিতে তোমার চেতনা, উষ্ণতায় ভরে নিতে তোমার ফুসফুস। কিন্তু ছড়িয়ে পড়লে আনন্দে, পাখির ডানায় রোদ, ছড়িয়ে পড়লে আশঙ্কায় হলুদ পাপড়ির মতো।

চারদিকে এখন অবিশ্বাসের আলোছায়া : নিরাপত্তার অভাবে কুয়াশাকুহক দিন। জংধরা টিনের মতন স্বরক্ষেপণ, জংধরা লোহার মতন এখন আত্মধিক্কার।

গিরগিটির চামড়ায় আজ প্রাণহীনতার বিচিত্র বিন্যাস, উদ্যত বর্শার মতো প্রতিকূলতা, আগাছার মতো বেড়ে-ওঠা এই জীবন; করুণামুখর ক্ষোভ; ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক্ষমা, মৃত পোকার মতো ধুলোপড়া ঝুল : ধূলিধূসর দেহ ; সব গুছিয়ে নিয়ে চেয়েছিলাম তোমার আগে, তোমার আসার আগেই চেয়েছিলাম গুছিয়ে নিতে।

সইলে না। তুমি সইলে না।

বিরুদ্ধতার ভিতরে মেললে ডানা, হাহাকারে চাপান দিলে মাটি, ঝংকার দিলে তুমি, মরুভূমির ভিতরে একটা বাগানের মতো যখন বৃষ্টি হল, বাগানের মতোই বিদ্রোহ করলে অবিশ্বাসের আলোছায়ায়।

তোমাকে তো আমিই ডেকেছি, ঋতুপর্ণা, আমরা দুজনেই বলেছিলাম : তুমি আকাশ হও, তুমি বাতাস হও, তুমি বৃষ্টি হও।

তোমাকে তো আমিই ডেকেছি, কঙ্কাবতী, আমরা দুজনেই বলেছিলাম : তুমিই সুন্দর, ধারাবাহিকতার দ্বীপ, সুভা আমার ঘর, এক ফালি জ্যোৎস্না যেন রোজা রোজা লুক্সেমবুর্গের চোখ নিষ্কলঙ্ক আকাশ।

মাঝে মাঝেই তোমার জন্যে গুছিয়ে রাখতাম ঘর, না, অস্বীকার করব না…

আমার ডাক বাঁক নেওয়া গলির মতো নয় যেখানে পাঁচিল আকাশছোঁয়া টাঙি, আমার অস্থিরতা তুলে নেয় খড়্গ, অনিশ্চয়তার মুঠোয় পড়ি ধরা।

তোমায় ডেকেছিলাম···তোমায় চেয়েছিলাম···স্বরে ভাসল মানুষ, ঠিক সেই মুখ, ঘোলাটে আকাশ, ৭১ বছরের বৃদ্ধা : এই পথেই এগিয়ে গেছে ওরা তোমার আগে···তোমার চোখের মতোই ওদের সকালে জলছিল মুক্তো···শিরীষ ফুলের চূড়া···বৃদ্ধার কণ্ঠে নাচল সূর্যাস্তের মেঘ। কণ্ঠে বাজল : ওর পূরবী, এর বিভাস··· এর জলতরঙ্গ আর ওর স্বরের মূর্ছনা···.

আমার স্রোতস্বিনী, তোমার কচি হাতের মুঠোয় এখন ঝড়ের ঝুঁটি, তোমার কচি হাতের মুঠোয় এখন মশালমুখী দিন।

আমি গর্বিত···আমি আনন্দিত···

চূর্ণি : ১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫
রবীন সুর

পা ট'লে যায় পা ট'লে যায়; পায়ের নিচে ঘূর্ণি।
আবহমান নদীর নেশা অন্তরবির সপ্তস্বরগ্রামে
ধনুকভাঙা আলোয় ডুবে গলায় কজন স্বর নি—

ধুলো উড়িয়ে রোদ চ'লে যায় বাঘ-আঁচড়া গ্রামে।

বাঘ-আছে-কি-বাঘ-ছিল না কোথায় কোন অজপাড়াগাঁর
নাম-না-জানা গন্ধে গন্ধে, সন্ধ্যে হল বিসর্জনের ঢাকে;
এখনো কে বাড়ি ফেরে নি? টেমিজ্বালানো ঘর-যে-তাকেই ডাকে;
ঘর থেকে দূর দূরে এসে নদীর নেশায় কার

পা ট'লে যায় পা ট'লে যায়, মাথায় নেশার ঘূর্ণি?

ঘর থেকে দূর দূরে এসে ইন্দ্রধনু কার
বালক বয়স ধূপ জেলে দেয়, ধূপছায়া এই নদী
প্রসঙ্গত কোথাও নেই অথচ তার গন্ধ থাকে বুকেই নিরবধি ;
স্বপ্ন বটে সত্য নয় দিন উজিয়ে পিছনে ছাখো যদি—

পা ট'লে যায় পা ট'লে যায়, পায়ের নিচে চূর্ণি ।

একুশে ফেব্রুয়ারির কবিতা

অচিন্ত্য বিশ্বাস

আজ
আমার বুকে পিঠে অশান্ত মন্দিরা বাজে—

কোন সে ফেরারী ভোর ঃ
মালাবার ঢেউ ঢেউ দিঘায় মেলেছি ছুটি পা
সবুজ ভরাট বালিয়াড়ি
হিজল শিবের-থান হরিয়াল কাঁদে—
আর কোন বিজন বিকেল ঃ
তালের ডোঙার পরে হলুদ জলের মতো
সবুজ মাছের মতো
মাছরাঙা গম্ভীর হৃদয়
অ আ ক খ মনে পড়ে বিদ্যাসাগর—

আমার দেশের সীমা ত্রিপুরা-বিহার
স্তন্যক্ষরা মুখের ভাষায় (দ্বিতীয় জননী)
হলুদ ধুলোয় আর একতারা বাউলের হাতে
মেশামেশি চায়ের বাগান
আহা, সুন্দরবন !

পুস্তক-পরিচয়

বধির রুদ্র। ধীরেন হোম / প্রাইমা পাবলিকেশনস, কলিকাতা। সাড়ে সাত টাকা

বইখানির লেখক-পরিচিতিতে বলা হয়েছে শ্রীহোম দীর্ঘদিন বঙ্গদেশের বাহিরে প্রগতিশীল সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেছেন। কয়েকটি ছোট গল্প লিখেছেন, ইংরেজি ও বাঙলায়। ইংরেজিতে লেখা তাঁর চারটি উপন্যাস "প্রগতিশীল পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে"। তাছাড়া তিনি এন. এম. যোশীর একটি জীবনীও রচনা করেছেন। 'বধির রুদ্র' তাঁর প্রথম বাঙলা উপন্যাস। তিনি ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায় এক বিপ্লবী পরিবারে জন্মেছেন।

স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিতে হবে শ্রীহোম-এর একটি রাজনৈতিক সংস্কৃতিগত দৃষ্টিকোণও আছে। বলা বাহুল্য, সমাজ-আর্থনীতিক ভিত্তিতে কোন চরিত্র কোনভাবে সত্য তাৎপর্যে গড়ে ওঠে, তা রাজনৈতিক-সংস্কৃতি-জারিত ব্যক্তির পক্ষে জানা অনেকখানিই সম্ভবপর। কিন্তু শিল্পআঙ্গিক সেই প্রকাশ-প্রয়াসকে সিদ্ধিতে নিয়ে যেতে পারে। রাজনীতির জ্ঞান যদি উপন্যাস সৃষ্টির একমাত্র বাহন হত, তবে সাহিত্যকর্মের ছড়াছড়ি হত দেশে-বিদেশে। দ্বিতীয়ত, কাহিনী চিত্রণের আরো কয়েকটি দিক রয়েছে। একদা কাহিনী বিস্তার করার কাজে লেখক নিজেই অংশ নিতেন; কাহিনী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কাহিনীতে অংশীদার হতেন এক কথক চরিত্রে। উপন্যাস বা গল্পের কুশীলবেরা তাঁদের আচরণ ও উক্তির সাহায্যে সামর্থ্যমতো সামাজিক অন্তঃসারের প্রকাশ ঘটাতেন। দ্বিতীয় যুগে দেখা গেছে মনের মধ্যেকার জগতকেই বহু লেখক বড়ো করে তুলছেন। বর্তমানে ঐ দুটি তলের দ্বন্দ্বসমন্বয়মূলক দিক, লেখকের সমাজভাবাদর্শগত দিকের সঙ্গে প্রগতিশীল লেখক সংযুক্ত করেন। অথচ লেখক থাকেন দৃশ্যত অনুপস্থিত। ফলে কোন চরিত্র কোন পরিবেশে স্ববৈপরীত্যে জটিল অথবা সমাজ-বৈপরীত্যে বিকাশমুখী, কোন তাৎপর্য তাতে অঙ্গীকৃত হচ্ছে—তার ইঙ্গিত দিয়ে যান লেখক। শ্রীহোমের 'বধির রুদ্র' মুখ্যত প্রাণ ধারার সঙ্গেই সম্পর্কিত রচনা বলা যেতে পারে।

শ্রীহোম 'বধির রুদ্র' বলেছেন কমিউনিস্টদের। শ্রীহোম বলতে চান কমিউনিস্টরা ভারতের ইতিহাস অনুধ্যানে একদেশদর্শী। তাঁর ধারণা, "তিলক, নেহেরু, সুভাষ এঁদের নেতৃত্ব ছিল গণআন্দোলন আশ্রিত। আর গান্ধীজী এর স্রষ্টা।.. এঁদের নেতৃত্বের হিসেব নিকেশ এখন ইতিহাসের হাতে। সে-বিচার যদ্দিন নির্ভুল না হচ্ছে তদ্দিন ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন কি ইতিহাস নির্ভর হতে পারে?...ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন যাঁরা করেন তাঁরা প্রায় সকলেই শ্রেণীশত্রু। বংশ দোষে। এঁদের ব্যক্তি এবং সমষ্টিগত ভূমিকা বিপ্লব-বহ করার একমাত্র উপায় বিজ্ঞান শোধিত ইতিহাস আশ্রয়। কিন্তু ইতিহাস আশ্রয় যদি বিজ্ঞানবিমুখ হয় তবে?" বলা বাহুল্য শ্রীহোম বলতে চান যে কমিউনিস্টদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংগঠক ও আত্মনিবেদিত কর্মী থাকা সত্ত্বেও ইতিহাসব্যাখ্যা বিজ্ঞানবিমুখ হবার ফলে তারা কয়েকটি মারাত্মক ভুল করেছেন। এবং এই ভুলের খেসারত সত্যিকারের জিজ্ঞাসু ও মানবিকবোধে সংযুক্ত কর্মীরা প্রাণ দিয়ে অস্তিত্ব দিয়ে দিয়েছেন। দিয়েছে দেশও। বলা যেতে পারে বইখানি কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েও একটি সমালোচনী।

সুধু স্বদেশী কমিউনিস্ট আন্দোলন নয়, বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকৃতি নিয়ে তিনি বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর একদা-কমিউনিস্ট এক চরিত্র মনে করে কমিউনিস্টরা বর্তমানে অন্ধ ক্ষমতার পূজারী। আর মানবিক মৃত্যুর সেটাই কারণ। "মার্কসকে দেবতা করে তুলেছ তাঁর মৃত্যুর বহু পরে। স্তালিনকে সে পর্যায়ে তুলতে হয়েছিল তাঁর জীবিত অবস্থায়। যেমন কিনা মাও সে-তুঙকে করা হচ্ছে বর্তমানে। আজ কমিউনিস্ট জগতে সর্বোচ্চ নেতাদের দেবতারূপে জগতের সামনে তুলে ধরার এই অবিশ্বাস্য চেষ্টা হলো তোমাদের বিচ্যুতির ফল।...তোমরা কাজে লাগাও হিংসার উত্তেজনা। তোমাদের মূলমন্ত্র হলো মারো, কাটো, জ্বালিয়ে দাও। ধ্বংসযজ্ঞে মার্কস-এর মহা-মানবিকতা তোমরা উৎসর্গ করেছ।"

শ্রীহোমের নায়ক-নায়িকারা কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে বিচ্যুতিগুলি দেখেছেন, তারই সৃষ্টিশীল প্রতিপক্ষ যে আজকের বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলন—এটা লেখকের একবারও চোখে পড়ে না। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসের পর এবং একাশিটি কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনের পর এ কথা তো স্বয়ংসত্য যে কমিউনিস্টরাই পৃথিবীতে আজ সবচেয়ে সৃষ্টিশীল, বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসু

এবং সহৃদয়। ভিয়েতনামে তারাই জাতীয় সংগ্রামে অগ্রণী; অথচ তারাই সব চেয়ে শান্তিপ্রয়াসী ও ক্ষমাশীল। বিশ্বের উত্তেজনা প্রশমনের রাজনীতিতে ব্রেজনেভ তথা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির অবদান আজ মানুষের ভবিষ্যৎ রচনার কাজে সবচেয়ে কার্যকর। ভারতের রাজনীতিতে কমিউনিস্টরাই তো সর্বংসহ হিসাবে জাতীয় বিপ্লবের পতাকাটি শত প্ররোচনার মধ্যেও বহন করছেন, মৈত্রী রচনা করছেন প্রতিক্রিয়াবিরোধী দেশপ্রেমিক সমস্ত শক্তির সঙ্গে। তাছাড়া কমিউনিস্টরা অতীতে যেসব বড় বড় ভুল করেছেন, তার জন্য খেসারত তো তাঁরাই দিয়েছেন বেশি। দেশের মূল রাজনীতি প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি তাঁদের কতটুকু ছিল? সুতরাং জাতীয় সর্বনাশের দায়িত্বই বা তাঁদের উপর কতটুকু বর্তায়? শ্রীযুক্ত হোম নকশালপন্থীদের হিংসাশ্রয়িতার কথা বলেছেন, বলেছেন স্বাধীনতার পূর্বের এবং অব্যবহিত পরের ভ্রান্তির কথা। তিনি কি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সারণীতে ভ্রান্ত চীনা রাজনীতির অনুসারকদের যুক্ত করে, সৃষ্টিশীল মূল কমিউনিস্ট ধারাটিকে অস্বীকার করছেন? শ্রীহোমের বইখানি তবু এক কমিউনিস্ট লোকসভা সদস্যকে অন্যতম নায়ক করেই লেখা—যিনি মূল কমিউনিস্ট ধারারই কর্মী। তাঁকে কেন চীনা রাজনীতির ভ্রান্তিবিলাসের জন্য দায়ী করে তোলা হবে? সৃষ্টিশীল কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এই অন্যতম চরিত্র ভাস্কর শুধু বলেন "কমিউনিস্টরা কি কখনো বলেন যে মানুষ মারতে শুরু করলেই বিপ্লব সংগঠিত হবে?" মাত্র এইটুকুতেই এঁদের পরিচয়?

শ্রীহোমের বইখানি মুখ্যত কয়েকটি চরিত্রকে বাহন করে তাঁর নিজস্ব মনোভাবেরই প্রবন্ধ-সাপেক্ষ প্রকাশ। নায়ক-নায়িকারা অনেকখানি প্রবন্ধের মতো করে কথা বলে। পুরনো দিনে শিক্ষা দেবার যে একটি উক্তি-প্রত্যুক্তি ভিত্তিক আঙ্গিক ছিল, বইখানি অনেকটা সেই ভাবেই রচিত। তবে নায়ক-নায়িকাদের ব্যক্তিগত ট্রাজেডির ছাপ তাতে উপস্থিত।

তবু ভালো, দীপক চৌধুরীরা কমিউনিস্টদের যে ভাবে দেখিয়েছেন, তার থেকে গুণগত অর্থেই ভিন্নতর করে দেখান শ্রীহোম। তাঁর কমিউনিস্টরা হৃদয়বান, দৃঢ়চেতা, সংগ্রামী, আত্মস্বার্থবিমুখ ও ভারতের গুণগত পরিবর্তন-প্রয়াসী।

তরুণ সান্যাল

বিষণ্ণ কৌতুক। অমিয় ধর। প্রাইমা পাবলিকেশনস, কলকাতা। দু-টাকা।

নিঃসন্দেহে বৈদগ্ধ্যই কবিতা নয়। কিন্তু সার্থক কবিতার ভিত্তিমূল যে বৈদগ্ধ্যের ওপর স্থাপিত—এই কথার বিরুদ্ধাচরণ সম্ভব নয়। এলিয়টের কথা নয়, তাবৎ মহৎ কবির ক্ষেত্রে এই সত্যের সাক্ষাৎ আমরা পাই।

মনে হয়েছে অমিয় ধরের মূল প্রবণতা বিদগ্ধতার দিকে। শুধু মাত্র কাঁচা অভিজ্ঞতা বা নিরাভরণ অনুভব নয়, সেই অভিজ্ঞতা ও অনুভবকে তত্ত্বের আলোয় যাচাই করে তিনি গ্রহণ করেন। আবেগপ্রবণতা এবং গীতি-কবিতার পরিবেশে আমরা বড় হই বলে আমাদের কান ও মন এক ধরনের ভাষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। বুদ্ধিদীপ্ত কবিতার প্রথম ঠোকাঠোকি লাগে সেখানে। প্রাথমিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার পর স্রোতটা তরতর করে বইতে থাকে, যদি অবশ্য নদীতে তীব্রতা থাকে।

অমিয় ধরের বুদ্ধি-প্রবণতা কিছু উদ্ধৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সুখের কথা, বুদ্ধি-প্রবণতাই তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। পূর্বাপরের দৃশ্যপটে স্থাপিত অভিজ্ঞতাকে তিনি সমৃদ্ধ করতে চান মানুষের ঐশ্বর্যভাণ্ডার থেকে। তাই আহরণ করার আগ্রহ তাঁকে নানা দিকে ছুটিয়ে বেড়ায়। যতটুকু সঞ্চয় করেন, ততটুকুই তিনি নিপুণভাবে ব্যবহার করতে চান।

কিন্তু তাঁর প্রতিমা ঐশ্বর্যে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে না। আবার, তিনি আমাদের নিয়ে যান না রুক্ষ মরুভূমিতে। বুদ্ধির সঙ্গে আবেগের হরগৌরী মিলনই যে কবিতার আত্মা, এ কথা তাঁর জানা। জানা থাকলেও সব সময় এমন সমতা রক্ষা করা হয়েছে—একথা বলা চলে না। অন্যদিকে, আবার একটা উল্টো টানও দেখা যায়।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, আমার মনে হয়েছে, বিষ্ণু দে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায় অমিয় ধরের চেতনার জগতে প্রতিষ্ঠিত। সার্থকতার কথা বাদ দিয়ে বলা যায় এই দুই কবির স্বভাব এত বিপরীত যে একই চেতনায় দুজনের সমান উপস্থিতি উপকারের চেয়ে অপকার হয়তো বেশি করে। আত্ম-আবিষ্কারের ক্ষেত্রে গ্রহণ নিশ্চয়ই অনিবার্য; কিন্তু গ্রহণ যেন আবার পূর্ণগ্রাস না হয়—সে দিকেও সচেতনতার প্রয়োজন আছে।

বুদ্ধি-প্রবণতা অমিয় ধরের কবি-চেতনার বৈশিষ্ট্য বলে তাঁর উচ্চারণ নম্র

এবং ঋজু। লক্ষ্য করা যায় প্রতিটি পংক্তিকে তিনি স্ব-নির্ভর ও সম্পূর্ণ করায় পক্ষপাতী। লোকায়ত শব্দ ও উপমার সঙ্গে পরীক্ষিত শব্দ ও উপমার অনায়াস ব্যবহারে তিনি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে চান। সক্ষমও হন।

কিন্তু যা সহজেই চোখে পড়ে তা হল কাব্য-চেতনার বিস্তার। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, 'আমি বেঁচে আছি বিষণ্ণ কৌতুকে' 'আনন্দের সূর্য তুলে আন' 'চলে যাবো' ইত্যাদি করিতায় এই ব্যাপকতর চেতনা অঙ্গীকৃত। অন্যান্য বিচারের কথা বাদ দিলেও শুধুমাত্র ভাববস্তু এবং উপস্থাপনার সাহস ও সততা যে কোনো পাঠককে মুগ্ধ করবে বলে মনে হয়। 'আমি বেঁচে আছি বিষণ্ণ কৌতুকে' বা 'আনন্দের সূর্য তুলে আন'-র মতো কবিতাকে সব দিক সামলে ঠিকঠাক একটা রূপ দেওয়া কম কথা নয়। শুধু এই প্রচেষ্টাই ধন্যবাদ দাবি করে। পাঠক মুগ্ধ হবেন আরও এই কারণে—ভাবনার দিক থেকে জটিল এই কবিতা প্রতি পর্যায়ে সুবিন্যস্ত স্তবক হয়ে ওঠে। আবেগগত সম্পদের দিক থেকে একটি স্তবক অন্য স্তবককে আলোকিত করে, গুরুত্বদান করে, পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও যায়।

যতদূর জানি 'বিষণ্ণ কৌতুকে' অমিয় ধরের প্রথম কবিতার বই। সাময়িক পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখকও তিনি নন। কিন্তু যত্নবান এই কবি পরিপাটি করে কবিতা লিখতে চান। সে দিক থেকে তাঁর আয়োজনও কম নয়। তাই আশা করা যায় আনন্দময় পরিণতির দিকে তাঁর অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে।

রাম বসু

বিবিধ প্রসঙ্গ

নতুন পর্তুগালের মুখ

বিশ্বের নিকৃষ্টতম সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অন্যতম পর্তুগালে গত বছর ২৫ এপ্রিল এক অভূতপূর্ব ঘটনার মধ্য দিয়ে সে দেশের দীর্ঘস্থায়ী ফ্যাসিস্ত শাসনের অবসান ঘটে। বামপন্থী মনোভাবাপন্ন পর্তুগালের সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ও মেজর পর্যায়ের অফিসারদের নেতৃত্বে এই অভ্যুত্থান হয়। নৌবহরের এক শক্তিশালী অংশ এই অভ্যুত্থানে বিশেষভাবে সহায়তা দেন।

সামরিক অভ্যুত্থানের পর অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক জেনারেল স্পিনোলার নেতৃত্বে সামরিক জুন্টার সরকার গঠিত হবার পর নবগঠিত সরকার একদিকে যেমন জনগণের সকল গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতিদান, সংবাদপত্রের উপর সকল সেনসরশিপ রহিতকরণ ও বন্দীমুক্তির ঘোষণা করলেন, অন্যদিকে তেমনি পর্তুগালের ফ্যাসিস্ত সরকার কর্তৃক বে-আইনী ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি ও সোস্যালিস্ট পার্টির উপর থেকে সকল নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন। দীর্ঘদিন পর পর্তুগীজ জনতা রাহুমুক্তির আস্বাদ পেলেন, আর এর পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটল ঐতিহাসিক মে দিবস পালনের মধ্যে। দীর্ঘ ৫০ বছর পর গত বছরই প্রথম লক্ষ লক্ষ পর্তুগীজ জনতা রাজধানী লিসবন শহরে গর্ব ও আনন্দের মধ্য দিয়ে মে দিবস পালন করলেন। অন্যদিকে পর্তুগাল মন্ত্রিসভার মধ্যেও তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। সোস্যালিস্ট পার্টি নেতা মারিও সোরেস পররাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে ও কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক কুনহাল দপ্তরবিহীন মন্ত্রীরূপে নতুন মন্ত্রিসভায় যোগ দেন।

কিন্তু পর্তুগীজ মন্ত্রিসভার সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিল পর্তুগালের উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার প্রশ্নটি। এই ব্যাপারে পর্তুগালের মন্ত্রিসভার মধ্যে দারুণ দ্বিধার ভাব দেখা দিল। স্পিনোলা সমেত সরকারের এক শক্তিশালী অংশ উপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা না দিয়ে সীমাবদ্ধ স্বায়ত্তশাসনদানের পক্ষপাতী ছিলেন। এই ধরনের মতামত স্পিনোলা তাঁর বিতর্কমূলক 'পর্তুগাল ও ভবিষ্যৎ' গ্রন্থে ইতিপূর্বেই ব্যক্ত করেছিলেন।

অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি উপনিবেশগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতাদানের পক্ষপাতী ছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে স্পিনোলা সরকার গিনি-বিসাউ, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক প্রভৃতি স্থানের মুক্তিসংগ্রামীদের কাছে অস্ত্রসংবরণের আহ্বান জানিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করতে চান। কিন্তু স্পিনোলা সরকারের মতিগতিতে সন্দিহান হয়ে মুক্তিসংগ্রামীরা সরকারের আহ্বানকে উপেক্ষা করে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। কারণ মুক্তিসংগ্রামের লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন, স্বায়ত্তশাসন নয়।

অন্যদিকে বামপন্থী সমরনায়কদের ক্রমাগত চাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও বামপন্থী জনতার ক্রমাগত প্রচার-আন্দোলন দেশে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। স্পিনোলা সরকারের উপরও এই পরিস্থিতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হয়। স্পিনোলা পর্তুগালের নতুন প্রেসিডেণ্ট হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক গনসালভেস-এর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় কমিউনিস্ট পার্টি ও সোস্যালিস্ট পার্টি পূর্বের মতোই অধিষ্ঠিত থাকেন। নতুন মন্ত্রিসভা পুনরায় উপনিবেশগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার উদ্যোগ নেন। এরই পরিণামে গিনি-বিসাউ ইতিমধ্যেই স্বাধীনতা লাভ করেছে। মোজাম্বিক আগামী জুন মাসে স্বাধীন হবে এবং অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতা লাভের বিষয়টি বর্তমানে আলোচনাধীন। পর্তুগাল সরকার গোয়া, দমন ও দিউ-এর উপরে ভারতের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়ে ভারতের সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

নতুন পর্তুগাল সরকারের এই সকল প্রগতিশীল কার্যকলাপ স্বদেশ ও বিদেশের প্রতিক্রিয়াশীল মহল বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মোটেই প্রীতিকর নয়। কারণ 'ন্যাটো' শক্তিজোটের জবরদস্ত সদস্যরাষ্ট্র পর্তুগালের এই অভ্যুত্থান সারা পশ্চিম ইয়োরোপের রাজনীতিতে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য, এই কারণে নতুন সরকারের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই এই সরকারকে অপসারণের জন্য বার বার চেষ্টা চলতে থাকে। গত বছর আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে পর্তুগালের প্রাক্তন ফ্যাসিস্ত সরকারের সমর্থক শক্তিগুলি যোগসাজসে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে সরকারকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু পর্তুগালের বিপ্লবী জনগণের কর্মপ্রচেষ্টার ফলে প্রতিবিপ্লবীদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।

দীর্ঘকাল ফ্যাসিস্ত শাসনাধীন পর্তুগালের জনগণের কোনো ধরনের মৌলিক অধিকারই ছিল না। সারা দেশে সার্বিক গণতন্ত্র প্রসারের জন্য ও দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য পর্তুগাল সরকার ঘোষণা করেছিলেন যে এ-বছর এপ্রিল মাসে দেশের সংবিধান তৈরির উদ্দেশ্যে কনস্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত করা হবে এবং এর জন্য দেশব্যাপী ভোট গ্রহণ করা হবে। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে তাঁরা কনস্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেম্বলির ২৪২টি আসনের সব কটিতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এই অবস্থায় গণতন্ত্রের দেশী-বিদেশী শত্রুরা মরীয়া হয়ে কঠিন আঘাত হানার চেষ্টা করবে এটা খুবই স্বাভাবিক। এই কারণেই আর কালক্ষেপ না করে সেনাবাহিনীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র এক অংশ প্রেসিডেণ্ট স্পিনোলার নেতৃত্বে ১১ মার্চ গোলাবারুদের গুদাম দখল করে প্রতিবিপ্লব শুরু করে দেয়। কিন্তু মাত্র ৬ ঘণ্টা লড়াইয়ের পরই পর্তুগালের সেনাবাহিনীর হাতে প্রতিবিপ্লবীদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। স্পিনোলা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং লাতিন আমেরিকার একটি চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র ব্রাজিল তার যোগ্য সহচর স্পিনোলাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছে।

সমরনায়ক স্পিনোলার রাজনৈতিক পটপরিবর্তন প্রসঙ্গে মিশরের ভাগ্য-বিড়ম্বিত নায়ক নাগীবের কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়বে। মিশরের বিলাসী সম্রাট ফারুক ও নাহাস পাশা-জগলুল পাশাদের শাসনে মিশরের জনগণের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এই পরিস্থিতিতে জেনারেল নাগীবের নেতৃত্বে একদল তরুণ সমরনায়ক প্রতিক্রিয়াশীল ফারুক শাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়ে মিশরে এক নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে মিশরের অগ্রগতির নানা প্রশ্নে বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের ব্যাপারে নাগীবের ভূমিকা মোটেই প্রশংসনীয় ছিল না। এরই ফলে নাগীব ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন ও এই ব্যাপারে যোগ্য নেতৃত্ব দেন কর্নেল নাসের। মিশরের পরবর্তীকালের ইতিহাস ওয়াকিবহাল মাত্রেরই জানা আছে।

পর্তুগালে স্পিনোলা পরিচালিত প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের সঙ্গে যোগসূত্র রাখার অভিযোগ করা হয়েছে পর্তুগালসহ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফ্রাংক কালুক্কির বিরুদ্ধে। বিশ্বের এই ঘৃণ্যতম সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে এ ধরনের কার্যকলাপ অবশ্য নতুন কিছু নয়। জনগণ পৃথিবী গ্রহের যেখানেই নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নির্ধারণে সচেষ্ট, সেখানেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতে

চেষ্টা করে। সৌভাগ্যের কথা, পর্তুগালের বিপ্লবী সামরিক বাহিনী আন্দোলন জনগণের সহযোগিতায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর-একটি চিলি সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিয়েছে।

পর্তুগালের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্ত বানচালের পর বিপ্লবী সামরিক বাহিনী আন্দোলনের পক্ষ থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমত ঠিক হয়েছে যে, সামরিক বাহিনী আন্দোলনের মাত্র দুটি বিধিবদ্ধ সংস্থা থাকবে—বিপ্লবী পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদ ; বিপ্লবী পরিষদের আইন প্রণয়ন এবং কার্যনির্বাহক ক্ষমতাও থাকবে। দ্বিতীয়ত, বিপ্লবী সামরিক বাহিনী আন্দোলন ঘোষণা করেছেন যে; পর্তুগালের সংবিধান পরিষদের নির্বাচন নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী আগামী ২৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। তৃতীয়ত, দেশের নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থাদির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অসমর্থ কতকগুলি ধনতান্ত্রিক ও সুবিধাভোগী পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করে তাদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই দলগুলি হল দক্ষিণপন্থী ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটস (পি ডি সি), মাওবাদী সর্বহারা পুনঃ সংগঠন (এম আর পি পি) এবং শ্রমিক কৃষক জোট (এ ও সি)। চতুর্থত, পর্তুগাল সরকার দেশের সমস্ত ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করেছে। অবশ্য সে দেশে বিদেশী ব্যাংকগুলির যে সব শাখা আছে সেগুলি এই আদেশের আওতায় পড়বে না।

পর্তুগালের সাম্প্রতিক প্রতিবিপ্লব পরাস্ত হবার পর কমিউনিস্ট পার্টি ও সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে সুসম্পর্ক পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় দু-মাস আগে পর্তুগালের ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় উভয় পার্টির সম্পর্কে চিড় ধরে। এর পূর্ণ সুযোগ নেয় প্রতিবিপ্লবী শক্তি, যা সাম্প্রতিক ঘটনায় স্পষ্ট ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।

বিপ্লবী সামরিক বাহিনী আন্দোলন ও অসামরিক রাজনৈতিক দলগুলোর আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী ভাসকো গনসালভেসের নেতৃত্বে পর্তুগালে চতুর্থ অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছে। এই সরকারে প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ মারিও সোরেস দপ্তরবিহীন মন্ত্রীরূপে স্থান পেয়েছেন। নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন এডুয়ার্দো আনতুনেস। পর্তুগাল কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আলভারো কুনহাল, পর্তুগাল ডেমক্রেটিক মুভমেণ্ট বা এম ডি পি-র পেরেইরা দ্য মোরা এবং পিপলস ডেমক্রেটিক মুভমেণ্ট বা পি ডি পি-র জোয়াকুইম জোর্গে মোতা দপ্তরবিহীন মন্ত্রীরূপে মন্ত্রিসভায় আছেন। নতুন মন্ত্রিসভার লক্ষণীয়

বৈশিষ্ট্য হল আর্থনীতিক বিষয়াদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক মন্ত্রীপদ সৃষ্টি। নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ২১ এবং এর মধ্যে বিপ্লবী সামরিক বাহিনী আন্দোলনের লোক ৭ জন।

পর্তুগালের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সকলেরই আবার মনে পড়বে পর্তুগাল কমিউনিস্ট নেতা কুনহালের কথা। এপ্রিল বিপ্লবের পরই কুনহাল ঘোষণা করেছিলেন, "পর্তুগালে আর-একটা চিলি ঘটাবার চেষ্টা হবে। তার নায়ক হবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং অর্জিত সাফল্য রক্ষার জন্য গণতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের ঐক্য সতর্কতা আর দৃঢ়তা মুহূর্তের জন্যও শিথিল করা যাবে না।" পর্তুগালের চলতি ঘটনাবলী এই কথার সত্যতা প্রমাণ করেছে।

সাম্রাজ্যবাদ ও তার বেনামদারেরা নতুন অবস্থা ও পরিবেশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে, কোথাও ধূর্ত কৌশলে অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য ও সংহত করে ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত করছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অজস্র চক্রান্ত সত্ত্বেও আজ সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের অন্তিম লগ্ন সমাগত। দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও কাম্বোডিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট পুতুল সরকারের চূড়ান্ত পরাজয় এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎবাণী আজ সত্য প্রমাণিত হচ্ছে। মহান অক্টোবর বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থার ফলে পৃথিবীর সকল পরাধীন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে নতুন গতিবেগ সঞ্চার হয়েছে, তার ফলেই সম্ভব হয়েছে পরাধীন দেশগুলির একের পর এক স্বাধীনতা অর্জন—উপনিবেশবাদ-ফ্যাসিবাদের কবর রচনা। এই কাজ ইতিপূর্বে ঘটা সম্ভব ছিল না। বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের নির্ভুল রণকৌশলের ফলে আজ পৃথিবীর যে রূপান্তর সাধিত হতে চলেছে, তার গুরুত্ব তাই অপরিসীম।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের পতনের ফলে এক নতুন সভ্যতার উন্মেষ হচ্ছে। সেই সভ্যতার দিকনির্দেশক নিঃসন্দেহে সমাজতন্ত্র—সাম্রাজ্যবাদ নয়। এই কারণেই পর্তুগালের ঘটনাবলীর গুরুত্ব কেবল জাতীয় সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ নয়, এর গুরুত্ব আন্তর্জাতিক।

ফ্যাসিবাদ, নয়া-ফ্যাসিবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদ—সকল পাশব শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবাসী চিরদিনই সক্রিয় ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছে। এই কারণেই পর্তুগালে সাম্রাজ্যবাদ ও তার বেনামদারদের পরাজয়ে ভারতবাসী মাত্রেই আনন্দ প্রকাশ করে পর্তুগালের বিপ্লবী জনতার

সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব ও সংহতি জানাবে। এরই সঙ্গে সঙ্গে নয়া-ফ্যাসিবাদের চক্রান্ত সম্পর্কে আরও সজাগ, আরও সচেতন হয়ে উঠবে। কারণ জয়প্রকাশ নারায়ণ আজ 'দলহীন গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার নামে ভারতবর্ষে এক প্রতিক্রিয়াশীল সরকার প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে ভারতের সকল প্রতিক্রিয়াশীল ও উগ্র-বামপন্থী দল। জয়প্রকাশ নারায়ণের রণকৌশল আর বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের রণকৌশল মূলত এক ও অভিন্ন। আজ উভয়েরই আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ভারতের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা, উভয়েরই প্রধান উপজীব্য উগ্র সোভিয়েত-বিরোধিতা। এই কারণেই জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তকে পরাস্ত করার জন্য ভারতের সকল প্রগতিকামী গণতান্ত্রিক মানুষের তৎপর হওয়া এই মুহূর্তের সব থেকে জরুরী কর্তব্য। পর্তুগালের নতুন মুখও আমাদের সেই হুঁশিয়ারিই দিচ্ছে।

কমল সমাজদ্বার

কয়েকটি আলোচনাচক্র

ভারতের অন্যতম প্রধান রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কলকাতায় বারো মাসে তেরো পার্বণের মতো নানা বিষয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আঞ্চলিক, রাজ্যভিত্তিক, পূর্বভারতীয় এমন কি সর্বভারতীয় স্তরেও সম্বচ্ছর নানা রূপ নানা বৈচিত্র্যের এই সেমিনারগুলি অনুষ্ঠিত হয়। এমনই কয়েকটি বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

ভেষজশিল্পে

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হল 'ভেষজ শিল্পে স্বয়ম্ভরতা ও পরিপ্রেক্ষিত' নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় রসায়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী, কয়েকজন সংসদ সদস্য এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞান-সাধকেরা। সম্মেলন থেকে সারা ভারত ভিত্তিতে ওষুধ-শিল্পে স্বয়ম্ভরতা এবং পূর্বভারতে, বিশেষত পশ্চিম বাঙলায়, ভেষজ শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ গৃহীত হয়েছে। ১৭টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের বিপুল পরিমাণ উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যবহার এবং সরকারী ব্যবস্থায় এই সব ওষুধ সুদূর গ্রামগুলিতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করা হয়েছে। বিদেশী ওষুধ সংস্থাগুলিকে দেয়া বিশেষ সুযোগ-সুবিধেগুলি বাতিল করা, এ দেশ থেকে

তাদের মুনাফা লোটা বন্ধ করা ও দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের জন্যও এ সম্মেলন থেকে কয়েকটি সুপারিশ রাখা হয়েছে।

এ ছাড়া পূর্বভারতে কয়লা-ভিত্তিক রসায়ন শিল্পের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য দুর্গাপুরে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের প্রসার, বনৌষধি শিল্প (ফাইটো-কেমিক্যাল) গড়ে তোলার জন্য উত্তর বাঙলায় সরকারী অথবা যৌথ মালিকানায় শিল্প স্থাপন এবং কলকাতায় সরকারী ওষুধ তৈরির সংস্থা আই ডি পি-এর একটি কেন্দ্র স্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে।

ভোজ্য তেল উৎপাদনে

বৃক্ষজাত তৈলবীজ থেকে তেল উৎপাদন সম্পর্কে আহূত একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বভারতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী জগজীবন রাম।

ভোজ্য তেল উৎপাদনে ভারত স্বয়ম্ভর নয়। ঘাটতি মেটাতে প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রায় ২০ লক্ষ টন ঐ তেল আমদানি করতে হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে এই আমদানি প্রায়ই বাড়াতে হয়। সর্বোপরি সাবান তৈরির কাজে ভোজ্য তেলের ব্যবহারের দরুনও এই ঘাটতি বাড়ে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন স্বাস্থ্যসম্মতভাবে মাথাপিছু দৈনিক যত তেল ব্যবহৃত হওয়া দরকার, আমাদের গরীব দেশের সাধারণ মানুষ অর্থাভাবে তা ব্যবহার করতে পারেন না। পারলে ঘাটতি আরও বাড়ত এটা বলাই বাহুল্য মাত্র।

ভোজ্য তেলের এই ঘাটতি বনজঙ্গল ও পথপ্রান্তরের বৃক্ষজাত তৈলবীজ থেকে তৈরি তেলে কমানো সম্ভব। সাবান, ওষুধ, মোমবাতি, রঙ প্রভৃতি তৈরির কাজে ঐ তেল ব্যবহার করলে ভোজ্য তেলের ওপর চাপ কমবে। খৈল থেকে সার এবং পশুখাদ্যও হতে পারবে।

এইসব বৃক্ষজাত তৈলবীজের মধ্যে প্রধান হল—শাল, মহুয়া, পলাশ, করঞ্জা, নিম, সীতা ফল, রয়না, কুসুম প্রভৃতি। এই তেল প্রতি বছর এখন ৫০ থেকে ৫৫ হাজার টন উৎপন্ন হয়। সম্মিলিত ও কার্যকরী প্রচেষ্টা হলে এই উৎপাদন অচিরেই বাড়িয়ে দু-লক্ষ টন করা সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হল বন-বাদার থেকে ঐ বীজ সংগ্রহ, ভাঙানো ও প্রয়োজনীয় পরিবহণের ব্যবস্থা করা।

বলা হয়েছে বন সংলগ্ন আদিবাসীদের সমবায় এই কাজে প্রভূত সহায়ক হতে পারবে।

নন-ডেসট্রাকটিভ টেসটিং নিয়ে

সম্প্রতি নন-ডেসট্রাকটিভ টেস্টিং সম্পর্কে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। নন-ডেসট্রাকটিভ টেস্টিং সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া-আয়োজিত এই সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল 'নন-ডেসট্রাকটিভ টেস্টিং অব বয়লার অ্যাণ্ড প্রেশার ভেসেল'।

কোনো জিনিসের ক্ষতি না করে তার গুণ, কার্যকারিতা ও মান সম্পর্কে পরীক্ষা করাকে বলে নন-ডেসট্রাকটিভ টেস্টিং।

যেমন, ইস্পাতের পুরো চাদর দিয়ে তৈরি হল একটি তৈলবাহী জাহাজের তলা। প্রয়োজনীয় গুণসম্মত ইস্পাত ব্যবহার করা হয়েছে কি না, চাদরের ঘনত্ব ঠিক আছে কি না, ঝালাই ও চাদরের মধ্যে কোনো ফাটল বা ফুটো রয়েছে কি না...ইত্যাকার পরীক্ষা করতে হবে। এই জন্য জাহাজটি তো আর ভাঙা যায় না। সে-কারণেই দরকার নন-ডেসট্রাকটিভ টেস্টিং। একস-রে, গামা-রে, আলট্রাসনিক সাউণ্ড, ম্যাগনেট এবং সর্বোপরি ইলেকট্রনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে এই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।

প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হলেও সম্প্রতি দেশের নানা জায়গায় বিরাট বিরাট কল-কারখানা, বাঁধ, ব্রীজ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছে বা হচ্ছে। এই সব কেন্দ্রে প্রকল্পের স্থায়িত্ব, মানুষের প্রাণের নিরাপত্তা বিধান, সর্বোপরি জাতীয় উন্নয়নকে কার্যকর করার জন্যই এই পরীক্ষা দরকার।

বয়লার ও উচ্চচাপ-সমন্বিত গ্যাস সিলিণ্ডার সম্পর্কে সেমিনারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

সংবিধান-সংশোধন সম্পর্কে

১৯৫০ সালে ভারতের জাতীয় সংবিধান গৃহীত হয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে দেশের প্রয়োজন ও পরিপ্রেক্ষিত বদলেছে অনেক। ২৫ বছরে সংবিধানেরও ৩৬টি সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। এই পটভূমিতেই ১৯৭৫ সালে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা।

সেই সূত্রেই মার্চের শেষে কাউন্সিল ফর পলিটিক্যাল স্টাডিজ-আয়োজিত সংবিধান-সংশোধন সম্পর্কিত একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হল। সেখানে রাজনীতিবিদ, প্রাক্তন বিচারপতি, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মীগণ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেন। সংবিধান সংশোধন বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত হিসেবে সেমিনারটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অতীন সরকার

'সোনার কেল্লা'

সত্যজিৎ রায়-এর 'সোনার কেল্লা' দেখতে দেখতে এই কথাই মনে হল, তিনি ফিল্মকে যেমন চিত্রগুণসম্পন্ন ভাবেন, তেমনি ভর্বল স্ট্রাকচার হিসাবেও গণ্য করেন। কেবল যে বিভিন্ন দৃশ্য বা শটের এলিম্যাণ্টারি ইউনিট তাঁর ছবিতে লভ্য তা নয়, প্রোজ ফিকশনের সরল বাক্যের প্রাথমিক উপাদানগত এককও তাঁর সংলাপে খুব মূল্যবান। সত্যজিৎ 'সোনার কেল্লা'র থীমটিকে চলচ্চিত্রের ভাষায় এগিয়ে-পেছিয়ে-সমান্তরালে প্রকাশ করেছেন। সেটিকে ভাঙলে এই সার অংশটুকু পাওয়া যায় : মুকুল নামক একটি ছেলের পূর্বজন্মের স্মৃতি ; সোনার কেল্লার জন্য আকুলতা, ময়ুর-উট ইত্যাদির ছবি আঁকা। মধ্যবিত্ত পিতামাতার আশংকা ও জন্মান্তর নিয়ে গবেষণারত ডঃ হাজরার কাছে তাদের যাওয়া। এই সময় মুকুলের একটি সাংবাদিক ইণ্টারভিউ কাগজে প্রকাশিত হওয়া, মুকুলের কথার ইঙ্গিত বাড়িয়ে গুপ্তধনের কথা লেখা। সঙ্গে সঙ্গে ছবিটির ভিলেন দুজনের ছবিটির কনটেণ্টে আসা, তারা ভুল করে ঐ পাড়ারই আর-একজন মুকুলকে হরণ করে, আবার ছেড়ে দেয়। মুকুলের বাবা ভীত হয়ে ফেলুদার শরণাপন্ন হয়। ওদিকে ডঃ হাজরার সঙ্গে মুকুল রাজস্থানে চলে গেছে, এ খবরও ভিলেন দুটি পেয়ে যায়। ফেলুদার প্রবেশের সঙ্গে ছবিতে আর-একটি নতুন স্তর যুক্ত হয়। এরপর তিনটি স্তরে বিষয়টি বিস্তৃত হয় : ডঃ হাজরা-মুকুল, ভিলেন দুজন, ফেলুদা-তপশে-লালমোহন। পরে পাল্টে হয় ডঃ হাজরা, মুকুল-ভিলেন দুজন, ফেলুদা-তপশে-লালমোহন। মাঝে মাঝে দুটি স্তর মিশে যায়। শেষে মুকুল-তপশে-ফেলুদা-ডঃ হাজরা-লালমোহন একত্রে কলকাতায় ফেরে। ভিলেন দুজনের একজন গাড়ি থেকে পড়ে যায়, আর-একজন পুলিশের হেপাজতে যায়। থীমটি যথেষ্ট জটিল, প্রচলিত গোয়েন্দা কাহিনীর মতোই। আপাতদৃষ্টিতে 'সোনার কেল্লা'য় গোয়েন্দা কাহিনীর সব উপাদানই উপস্থিত : ভিলেন, গোয়েন্দা, ছোট ছেলেকে হরণ করে নিয়ে যাওয়া, দুবার হত্যাপ্রচেষ্টা, গোয়েন্দার শারীরিক পটুতার উদাহরণ রাখা, গোলাগুলি ছোঁড়া, একজন ব্যক্তির ছায়ার মতো অনুসরণ···সবই আছে। হলিউডের এই জেনরের ছবির ঢঙও মাঝে মাঝেই ব্যবহৃত—বুকচাপা পরিবেশে কমিক-রিলিফ হিসাবে লালমোহন গাঙ্গুলি। অথচ তথ্য গোপন করে গোয়েন্দা কাহিনীর যে রহস্য জমে ওঠে, তা গোড়া থেকেই পরিত্যক্ত। সোজাসুজি সব কিছুই প্রকাশ্যে দেখানো হয়েছে : ভিলেন দুটির চরিত্র পরিকল্পনায় যেমন

অ্যান্টি-ভিলেন কিছুটা লঘু পর্দার আমদানী করা হয়েছে, তেমনি ট্রেনের সেই শ্বাসরোধী দৃশ্যকে ভেঙে ফেলা হয়েছে তিন মাস ফাঁসির কথা বলে। ভিলেনদের লুডো খেলার লঘুতাকে উল্টোদিকে সাপলুডোর সর্পিল মনোভাবের ইঙ্গিতে সামলে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ফিল্মটিতে নানা ধরনের প্রচলিত বাদী-বিবাদী কনভেনশনের সমন্বয় করা হয়েছে সারফেস স্ট্রাকচার পেরিয়ে ডীপ স্ট্রাকচারে যাবার জন্য।[১]

ছবিটির কেন্দ্রবিন্দু সোনার কেল্লা ও তার অন্বেষণ। একটি গোয়েন্দা-অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর মোড়কে সত্যজিৎ রায় জাতিস্মরের স্মৃতি বা সামূহিক স্মৃতির টানেই হয়তো এক রূপক গড়ে তুলতে চান। ব্যাপারটার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন যখন তপশের "সোনার কেল্লা কি সোনার তৈরি" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি সোনার ছেলে, সোনার বাঙলা, সোনার ফসলের কথা ফেলুদার মুখ দিয়ে বলান। এরা তো সকলেই হারিয়ে গেছে, জাতিস্মরের পূর্বজন্মের স্মৃতির মতো এক স্মৃতিতেই শুধু তা জ্বলে। একটি অসামান্য মুহূর্তের সৃষ্টি করেন, যখন ডঃ হাজরাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ভ্যানিশ করে একজন ভিলেনই মুকুলের সামনে ডঃ হাজরা হয়ে যায়, কেবল "আরও মুকুল আছে"র প্রতি-উত্তরেই "হাজার হাজার হাজরা আছে" বাক্যটি বাজতে থাকে। এই ডঃ হাজরার মুখোশ পরা, সরল মুকুলকে প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই প্রতারণা করা সোনার কেল্লা দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে—এতে বাঙলাদেশের ইতিহাসই কি কিছুটা প্রছন্নে এসে যায় না! বার বার ঐ ভিলেনরাই তো প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু আসলে ওরা ঠগ, জোচ্চোর, খুনী, লোভী। এই রূপকের টানেই ময়ূর দেখে লালমোহন ওরফে জটায়ু "ন্যাশনাল বার্ড" বলে চীৎকার করে ওঠে, ঐ ন্যাশনাল বার্ডের প্রতিরোধই ভিলেন ডঃ হাজরা প্রথম পায় সোনার কেল্লায় মুকুলের গত জন্মের বাড়ির গুপ্তধন খোঁজায়—আর ঐ ময়ূরকে মারবার সূত্রেই মুকুলের চৈতন্য-উদয় হয়, নকল হাজরাই দুষ্টু লোক। অন্যদিকে প্রত্যক্ষভাবেই আসেন সত্যজিৎ সাধারণ মানুষের ইমেজে: দুটি সঙ্গীতের প্রায় মৌলিক ভারতীয় দৃশ্যে। আর কোট-প্যান্ট ত্যাগ করা ভীষণ ভাবে আহত বিকৃত আসল ডঃ হাজরা—যিনি সোনার কেল্লা খুঁজতে গিয়ে বিধ্বস্ত মুকুলকে খুঁজে

---

১. ফিল্মের পরিবেশ সৃষ্টির কাজে পরিচালক সাময়িকতাকে কেমন চমৎকার কাজে লাগান: আর-এক মুকুল যখন তার হরণ হওয়ার কথা বলে তখন লোড শেডিং, মোমবাতি জ্বলছে, আর এই আঁধোছায়াই তখন অব্যর্থ।

বেড়ান—মহিলাটি গান গাইছে এমন এক পরিবেশেই মুকুলকে কাছে পান ; কিন্তু মুকুলের, আমাদের, মোহ তখনও কাটে না ; সে 'দুষ্টু' লোকের কাছ থেকে ভয়ে পালায় নকল হাজরার কাছে। আর সত্যজিৎ রায় আসল হাজরাকে দাঁড় করিয়ে দেন একটি দীর্ঘ বৃক্ষের গোড়ায়, ইচ্ছা করেই বৃক্ষটিকে একটু বেশিক্ষণ পর্দায় ধরে রাখেন—ঐ মহিলাটির অপূর্ব সঙ্গীতের আকুতি ও চেহারা-ভঙ্গীর নির্বিশেষ ভারতীয়ত্বর সঙ্গে বৃক্ষের আড়ালে আসল হাজরার দেখা মিলে যায় একই সূত্রে। গভীর রাত্রে নকল হাজরার সহকারীও ধরা পড়ে সাধারণ মানুষদেরই এক গানের আসরে। এই সঙ্গে রাজস্থানের মরুভূমি ও উটের ভিস্যুয়াল সৌন্দর্য—মরুভূমির মাঝখানে সোনার কেল্লা খোঁজা আমাদেরই জীবনের প্রতিচ্ছবি, আর সেই সোনার কেল্লার হদিশ পাওয়া যায়, কারিগরের বাটি-গেলাস দেখে তখন ব্যাপারটি অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। সোনার কেল্লা দেখে, তার শূন্যতায় মোহভঙ্গ ঘটে মুকুলের, তার কান্নায় তা ধরা পড়ে। সেও বাস্তবে ফেরে, আর ময়ূর-উট নয় : আমি-ফেলুদা-তপশেদা : ছবিটির এই ব্যঞ্জনাতেই ফিল্ম শেষ হয়। সত্যজিৎ একই সঙ্গে রূপক ও সোজা অথচ জটিল গল্পকে হাজির করেছেন। রূপকটি না বুঝলেও গল্পটি উপভোগে কোনো বাধা নেই। 'গুপী গাইন'-এর মতোই 'সোনার কেল্লা' জনপ্রিয় হয়েছে। চূড়ান্ত রুচিহীনতার মধ্যে এই সুস্থ এণ্টারটেনমেণ্টের মূল্য নিশ্চয়ই আছে।

তবে সত্যজিৎ রায়ের কাছে আমাদের দাবি আরও অনেক বেশি : এই লঘুচাল, সীমাবদ্ধ কনটেণ্ট, প্রচ্ছন্ন রূপক একটা স্তর পর্যন্ত নিশ্চয়ই ভালো লাগে। কিন্তু চতুর্দিকে নরকে, যখন আমাদের জ্যেষ্ঠ কবি বলছেন নরক প্রকাশ্য হোক, তখন এ সমস্ত প্রচেষ্টাই একটু সৌখীন লাগে, পরিচালকের অনন্য দক্ষতা এবং রঙের ব্যবহারে অসামান্য মুন্সীয়ানা সত্ত্বেও। সবই যে গুরুগম্ভীর হতে হবে তা নয়, কিন্তু তিনিই তো 'পরশপাথর' তুলেছেন। 'সোনার কেল্লা'কে কি আরও তীক্ষ্ণমুখ করা যেত না, এর উপভোগ্যতা বজায় রেখেও? আর-একটি কথা : ছবিটির সব চরিত্রের অভিনয় চালচলন চরিত্রানুযায়ী, কিন্তু ফেলুদা? সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তো প্রায় অসহ্য। অভিনেতা হিসাবেই তিনি সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী। তার ওপর কণ্ঠস্বর—এত দুর্বল ও ব্যক্তিত্বহীন যে সত্যজিৎ রায়ও তাঁকে এ ধরনের চরিত্রে রক্ষা করতে পারেন নি।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপ্লববাদ থেকে সাম্যবাদ

শ্রীযুক্ত সুনীল সেন 'পরিচয়'-এর বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮১ (মে-জুলাই ১৯৭৪) সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধটিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে দুজন বিপ্লবী শ্রীনলিনী দাস ও শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের দুটি গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন।

সমালোচনার শেষের দিকের কয়েকটি মন্তব্য সম্পর্কে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন—"প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বা তার পর তাঁরা দেশব্যাপী কোনও অভ্যুত্থান সংগঠিত করতে পারেন নি বা বিপ্লবীদের কোনও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীও ছিল না।" তবে, তাঁদের আন্দোলনের একটি ফল হচ্ছে "বিপ্লবীদের মধ্য থেকে বার হয়ে এসেছে ভারতীয় বামপন্থী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীর দল।"

আমার মনে হয়েছে যে ইতিহাসের ছাত্র শ্রীসেন ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বিপ্লবীদের বিচার করেন নি, বর্তমান পরিস্থিতি দিয়েই তাঁদের মূল্যায়ন করেছেন। ইংরাজরা এ দেশে শাসনব্যবস্থা কায়েম করার পর জনসাধারণের অবস্থা কী ছিল? তারা তো তাকে মেনেই নিয়েছিল, আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী তো সহযোগিতাই করেছিল—তবেই না বৃটিশ শাসন এত দৃঢ় ভিত্তিতে গেড়ে বসেছিল। বাঙলাদেশের ও অন্যান্য জায়গার তৎকালীন এবং তারও আগের সামাজিক আর রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করলে কেন এমন হয়েছিল তার হদিশ মিলতে পারে। এক কথায় ব্রাহ্মসমাজ কিছুটা বিদ্রোহ দেখালেও তা সমাজসংস্কারেই নিবদ্ধ থাকে, একটা প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তাঁরা কল্পনাই করতে পারেন নি। এ ব্যাপারে বস্তুত তাঁরা যে ভীত ছিলেন—সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ও উপন্যাস পড়লে তা বোঝা যায়। কিন্তু ১৯০৩ সাল থেকেই অসন্তোষ ধূমায়িত হয়েছে এই শক্তিশালী শাসকদের বিরুদ্ধে। বাঙলা ও পাঞ্জাবে, কিছুটা উত্তর প্রদেশে, তা বেশ ব্যাপক হয়েছিল। অন্যান্য প্রদেশে ততটা হয় নি—তারও কারণ আছে। সেই সাহস, আদর্শবাদ ও নীতিবোধ, ত্যাগ করার মনোবৃত্তি বিপ্লবী কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করে অসমসাহসিকতার সঙ্গে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। সেই অবস্থায় স্বাধীনতা ছাড়া অন্য লক্ষ্য তাদের চোখে আসে নি, কারণ রুশ বিপ্লবের ফলাফল জানতে ও বুঝতে ১৯২৭-৩০ সাল লেগে গিয়েছিল। কাজেই তখনকার জনগণকে জাগরিত

করা (সীমিত ভাবে হলেও)…তাঁরা তা পেরেছিলেন বলেই তো মনে হয়। অপর দিকে এখনকার বিপ্লবীদলের কর্মীদের মধ্যে ঐ সব আদর্শের ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর খুবই অভাব দেখা যায়।

কিছু বিপ্লবী বামপন্থী আন্দোলনে এসেছেন বটে, কিন্তু বহু বিপ্লবীই আসেন নি। অপর দিকে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন নি (সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলে) এ রকম অনেক কেন বেশি সংখ্যক কর্মীই আজ বামপন্থী দলগুলির নেতা। অতীত যুগের আন্দোলনের সঙ্গে বা তার ফলশ্রুতি হিসাবে বর্তমান বামপন্থী বা সাম্যবাদী দলগুলি গঠিত হলে (ভিয়েতনামের মতো) যে ঐতিহাসিক পটভূমিকা তৈরি হত বা বিপ্লবী আন্দোলনের ধারাবাহিকতা থাকত—তা হয় নি, ফলে আজও বামপন্থীদলের কর্মীদের বোঝাতে হয় লেনিনের "জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের তাৎপর্য" ও বুর্জোয়াদের মধ্যে কারা বামপন্থী বা সাম্যবাদীদের বন্ধু, বোঝাতে হয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব কি! কাজেই সাম্যবাদী আন্দোলনে আসাটাই প্রাক্তন বিপ্লবীদের পক্ষে গৌরবজনক হয়েছে বা বামপন্থী আন্দোলন তাতে লাভবান হয়েছে—ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে একথা সত্য হলেও সমগ্র আন্দালনের পক্ষে তা বাস্তব ঘটনা নয়। এত বছর পরেও সাম্যবাদী দলগুলির অবস্থা কি?

তাড়াতাড়ি লিখলাম। বোধহয় আমার কথাটা পরিষ্কার হল না। তবে, আমি তো একটা তাত্ত্বিক প্রবন্ধ লিখছি না। দরকার হলে পরে লিখব।

জাড়োয়া

'পরিচয়'-এর ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮০ (মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৪) সংখ্যায় জাড়োয়াদের সম্পর্কে দিনেশচন্দ্র রায়ের একটি সুন্দর প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটিতে জাড়োয়াদের দূর ও নিকট অতীত সম্পর্কে প্রচুর মূল্যবান তথ্য থাকায় অনেক কিছুই জানা গেল। কিন্তু তার সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোকপাত থাকলে প্রবন্ধটি আরও বেশি সম্পূর্ণ হত।

এইসব উপজাতি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে তাদের আশপাশের সমাজের ও প্রকৃতির সম্পর্ক এক জায়গায় থেমে থাকে না—বিশেষত যাতায়াতের সুবিধার দরুণ আধুনিক মানুষ যেখানে অনবরত প্রবেশ করছে, সেখানে অনেক স্থলেই দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। তার ফল খারাপও হয়, ভালোও হয়। আমাদের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের উপজাতি গোষ্ঠী সম্পর্কে বেশ কিছু দিন ধরে যে প্রচেষ্টা,

চলেছে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার মাওয়ারী উপজাতি গোষ্ঠী সম্পর্কে ঐ দেশের হাইকমিশনার একাডেমি হলে যে-প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন, তাতেও এই কথা প্রমাণিত হয় যে সে রকম সদিচ্ছা ও চেষ্টা থাকলে ঐ গোষ্ঠীদের বৈশিষ্ট্য নষ্ট না করেও তাদের বর্তমান জীবনযাত্রার আওতায় আনা যায়। কারণ উপরোক্ত দুই স্থানেই উপজাতিরা সংখ্যায় বাড়ছে ও পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।

কিন্তু আন্দামানের প্রধান তিনটি গোষ্ঠী সম্পর্কে এ কথা বলা বা এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া কষ্টকর। এ পর্যন্ত 'ওঙ্গি'দের সম্পর্কেই আমরা বেশ কিছু জানি। তাদের সঙ্গে মেলামেশাও হচ্ছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা কমতির দিকে। কেন—তার অবশ্য বিশ্লেষণ হয় নি।

'জাড়োয়া'রা এতদিন অবধি তাদের প্রতিবেশী 'সেন্টিসিলিজ'দের মতোই hostile ছিল—গত জানুয়ারি অবধি দেখে এসেছি তারা সভ্য মানুষের সম্পর্ক পরিহার করতে চায়, কেউ ভুলে সভ্যসমাজে এসে পড়লে তাকে সমাজচ্যুত করে, সভ্য মানুষকে তারা শত্রু বলে মনে করে।

কিন্তু নৃতত্ত্ববিদরা বা ছাত্ররা চেষ্টা ছাড়েন নি—তাঁরা বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই মে মাসে রঘুবীর সিং বলে একজন নৃবিজ্ঞানের ছাত্র নৃতত্ত্ব বিভাগের হলে (মিউজিয়াম) তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বললেন ও তাঁর তোলা ছবি দেখালেন। তাতে দেখা যায় তাঁরা 'জাড়োয়া'দের সঙ্গে মেশবার প্রাথমিক বাধা দূর করেছেন—কারণ এরা ভাত ডাল খেয়েছে, একসঙ্গে নৌকায় ঘুরেছে ও অন্যান্য স্থানেও গেছে। অবশ্য আর-একটি hostile উপজাতি 'সেন্টিসিলিজ'দের সঙ্গে এখনও সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় নি।

সব উপজাতি গোষ্ঠীরই (যারা এখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি) অতীত ও বর্তমান অবস্থার বিশদ বিবরণ দেওয়া হলে প্রবন্ধগুলি অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের পক্ষে খুব লাভজনক হয়।

আশা করি এই ধরনের লেখা 'পরিচয়'-এ আরও দেখতে পাব।

কমলা মুখোপাধ্যায়

১৪. ৯. ৭৪

'বাঁধনাপরব' প্রসঙ্গে

গত ১৩৮০ কার্তিক সংখ্যায় বিনয় মাহাতো লিখিত 'বাঁধনাপরব' প্রবন্ধটির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রবন্ধটির পরিপ্রেক্ষিতে আরও কয়েকটি কথা জানাতে চাই। শ্রীমাহাতো যাকে বাঁধনাপরব বলছেন, চলতি কথায় তাকে গোপার্বণ বলা হয়। সীমান্ত-বাঙলা কেন গোটা বাঙলাতেই এই উৎসব পালিত হয়। তবে শ্রীমাহাতো যে বর্ণনা দিয়েছেন তার তুলনায় হুগলি বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় তা একটু কাটছাঁট আকারে পালিত হয়। লেখক-বর্ণিত উৎসবের তুলনায় এখানকার মানুষের ঐ উৎসবটি খুবই ছোট কিন্তু উপভোগ্য। নিম্নশ্রেণী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাঁওতাল-আদিবাসীদের ভিতর এই উৎসব খুবই ব্যাপক। এই উৎসবকে ওরা বলে 'সোরহাই'। প্রথমে এই উৎসবকে আহ্বান জানানো হয় এইরূপ গানের মধ্য দিয়ে, যেমন :

অহিরে কোন্ ইতে আনয়ে
লতা না পতারে—
কোন্ ইতে আনয়ে
কাদা লেহারে।
মৈসিনী আনে ভালা
লতা নো পতারে
কাঁড়া ইতো আনে
কাদা লেহারে
কপিলা আন্‌হে
বাঁধনা পরবে
পরব তো ভগবতী
সেবারে।

অর্থাৎ বাঁধনাপরব উৎসবটি নিয়ে আসে গো-মহিষ। কারণ বর্ষার কাদা থেকে এবার গো-মহিষ সেবার জন্য আসছে। এই রকম গানের ভিতর দিয়ে আহ্বান করা হয় বাঁধনাপরবকে। লেখক শ্রীমাহাতো লিখেছেন মহুয়া তেল ছাড়া অন্য কোনো তেল ব্যবহৃত হয় না গরুর শিঙে লাগাবার জন্য। কিন্তু এদিককার মানুষ এই উৎসবে সরিষার তেল ব্যবহার করে দেখেছি। লেখক যে মহুয়ার তেল বলছেন তা হয়তো সত্য, কিন্তু ঐ তেলকে বলা হয়ে থাকে 'কুজুরিকা' তেল।

কারণ ঐ তেলটি রচিত গানের ভিতরেই প্রকাশিত। গানটি এইরূপ :

আশ্বিনো বাইরাতে
কার্তিকো মাসাতে।
কার্তিক মাসে লাগে অমাবস্তে—
না কেঁদো না খিজু
শিরোমণি গয়া
গুলিনেতো দিবে দুবো ধান,
তোরই যে গুলিন বাবা
এম্‌নো পাপীরে
নাহি জোটে কুজুরিকা তেল।

সুতরাং কুজুরিকা তেলই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কুজুরিকা তেলই কি মহুয়া তেল? উক্ত গানটিতে ব্যবহৃত খিজু কথার অর্থ জানি না, তবে গুলিন অর্থে মনিবকে বুঝায়। অর্থাৎ মনিব এমনই পাপী যে নিজের গরুর শিঙে দেবার জন্য তার কুজুরিকা তেলও জোটে না। এতদ্‌অঞ্চলে গরুকে বরণ করা হয় শ্রীমাহাতো যেমন বর্ণনা দিয়েছেন ঐভাবেই। কিন্তু অনুষ্ঠানের সূচী অনেক ছোট। উৎসবের দিন দুপুরে গরু-মহিষকে স্নান করানোর পর বিভিন্ন রঙের গেরু মাটিতে নারিকেলের মালা কলকে প্রভৃতি দ্বারা ছাপ মেরে গরুকে সাজানো হয়। তারপর গরু-মহিষকে খুব ভালোভাবে খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়। ঐদিন অপরাহ্নে আরম্ভ হয় বাড়ি বাড়ি গরু-মহিষ জাগানোর পালা। বাড়ি বাড়ি গরু জাগানো হয় এবং চাল সংগ্রহ করা হয়। এই সময় যে-গানগুলি গাওয়া হয় তার একটি এইরূপ :

এতদিন যে দিলে বাবা
ভাত ও ভিখারীরে
আজও তো মাগেরে ধাঙড়—।
ধাঙড়কে দিলে বাবা
নাহি জলে পড়িবে
যুগে যুগে নাম
রহি যাবে রে—।

যে-রাত্রিতে গরুকে জাগানো হয় তার পরদিন গরু-মহিষকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। তার পরদিন গরু-মহিষকে নিয়ে যাওয়া হয় ফাঁকা মাঠে। তারপর মজবুত

করে খুঁটিতে বাঁধা হয়। তার পরেই ধামসা মাদল টিন্‌নিয়ে প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র দ্বারা আরম্ভ করা হয় গরু খেলানো, তবে সবাই মিলে এক সঙ্গে গান জুড়ে দেয় না। প্রথমে গরু নাচানো দলের একজন নেতা সুর ধরে গান আরম্ভ করে, তারপর সবাই স্বর মিলিয়ে গান শুরু করে। এই উৎসবে বিভিন্ন পর্যায়ের গান আছে। পালাগান আকারেও গান গাওয়া হয়। একটি গান উল্লেখ করলাম:

অহিরে কতদূরে আসিছে
নয়নোসুন্দর বর।
কতদূরে আসিছে বরযাত্রী—
কতদূরে আসিছে হাতি না ঘোড়ারে।
কোথায় বা রাখিব
নয়নোসুন্দর বর
কোথায় বা থুইব
বরযাত্রীরে
কোথায় বা রাখিব
হাতি না ঘোড়ারে
কি দিয়ে বধাব বরযাত্রীরে
কি দিয়ে বধাব নয়নোসুন্দর বর
কি দিয়ে বধাব ঘোড়া না হাতিরে
কন্যা দিয়ে বধাব নয়নোসুন্দর বর
ডালে ভাতে বধাব বরযাত্রীরে
ঘাসে পালায় বধাব
হাতি না ঘোড়ারে।

গরু-মহিষের গলায় ঘণ্টা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে দিয়ে যখন নাচানো হয় সে দৃশ্য খুবই উপভোগ্য। এই গরুনাচ অনুষ্ঠান দেখবার জন্য বেশ দর্শক সমাগম হয়, তবে এই উৎসবটি নিম্ন এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভিতরই বেশি। তবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ যোগদান করে থাকে। আর গরুবরণ, গো-পূজা সব শ্রেণীর মানুষই পালন করে। এটা খুবই দুঃখের বিষয় বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে এই উৎসবে ভাটা পড়েছে, যেটুকু পালন না করলে নয় সেটুকুই গ্রাম-বাঙলা এখন পালন করছে। উৎসবটির গানের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হয় আনন্দ বেদনা আর আধ্যাত্মিকতা।

চঞ্চল সিংহরায়

পরিচয়

১৯৫৬ সালে সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ভারতীয়; ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলি-৭

৪। প্রকাশক—ঐ, ঐ ঐ

৫। সম্পাদক—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয়; ৬১২/১, ব্লক-ও
নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩

তরুণ সান্যাল, ভারতীয়; ৩১/২, হরিতকী বাগান লেন, কলি-৬

৬। পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর যে-সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিকারী, তাঁদের নাম ও ঠিকানা :

১। গোপাল হালদার, ফ্ল্যাট ১৯, ব্লক এইচ, সি. আই. টি. বিলডিংস, ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪ ॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ৭৩ এল, মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-৯ ॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ৮, একডালিয়া রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা-১৭ ॥ ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫বি, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১/৩, ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১/১/১, নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-১২ ॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭/৪, যাদবপুর সেনট্রাল রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১২। সত্যজিৎ রায়, ১/১ বিশপ লেফরয় রোড, কলকাতা-২০ ॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায় (মৃত), ৪২/৭এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯এ, কবির রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২বি, সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯ ॥ ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুসুমিকা', গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, শান্তিনিকেতন, বীরভূম ॥ ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত), ৯/১, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১৯। নিবেদিতা দাশ, ৫৩বি, গরচা রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (মৃত), ৩সি, পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ২১। দেবীপ্রসাদ

চট্টোপাধ্যায়, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতা-২০॥ ২২। শান্তা বসু, ১৩/১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৬॥ ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬২, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাত-২৯॥ ২৪। ধীরেন রায়, ১০/৬, নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া॥ ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩॥ ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি, ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লী॥ ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০, রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬॥ ২৮। সুনীল সেন, ২৪, রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩॥ ২৯। দিলীপ বসু, ২০০ এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬॥ ৩০। সুনীল মুন্সী, ১/৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯॥ ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২, প্রাম প্লেস, কলকাতা-১৯॥ ৩২। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯॥ ৩৩। শিপ্রা সরকার, ২৩১এ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪৭॥ ৩৪। অচিন্ত্যেশ ঘোষ, রোড, টি. নগর, মাদ্রাজ-৭॥ ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ, ১৯, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯॥ ৩৬। রণজিৎ মুখার্জি, পি ২৬, গ্রেহামস লেন, কলকাতা-৪০॥ ৩৭। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, পি ৫, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-২৯॥ ৩৮। অমল দাশগুপ্ত, ৮৬, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৫॥ ৩৯। প্রদ্যোৎ গুহ, ১এ, মহীশূর রোড, কলকাতা-২৬॥ ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ৪০, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭॥ ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, পি ৫, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-২৯॥ ৪২। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬১২/১, ব্লক-ও, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৫৩॥ ৪৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২॥ ৪৪। নির্মাল্য বাগচি, ফ্ল্যাট বি সি ৩, পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯॥ ৪৫। তরুণ সান্যাল, ৩১/২, হরিতকী বাগান লেন, কলকাতা-৬॥ ৪৬। বিদ্যা মুন্সী, ১/৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯॥ ৪৭। বেদুইন চক্রবর্তী, ফ্ল্যাট ২, ১০, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬॥ ৪৮। অমিয় দাশগুপ্ত, ২, যদুনাথ সেন লেন, কলকাতা-৬॥ ৪৯। অজয় দাশগুপ্ত, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২॥ ৫০। সুরেন ধরচৌধুরী (মৃত), ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২॥

আমি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য।

(স্বাঃ) অচিন্ত্য সেনগুপ্ত
১০. ৩. ৭৫

তিন যুগের তিন কণ্ঠস্বর ?

১ 'আমার মাথা নত করে দাও হে
তোমার চরণ ধূলার তলে'
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ 'বল বীর চির উন্নত মম শির'
—কাজী নজরুল ইসলাম

৩ 'একমাত্র মাথা তুলবে সে
যে রণাঙ্গনের নিয়মে নিজেকে করেছে স্বেচ্ছাবন্দী'
—???

গোলাম কুদ্দুসের

স্বেচ্ছাবন্দী

পড়ে দেখুন যুগে যুগে কণ্ঠস্বর কেন বদলায়

দাম : চার টাকা

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৩/৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

7 JUL 1975

নিজস্ব সংগ্রহে রাখার ও উপহার দেবার মতো

সদ্য প্রকাশিত কয়েকটি বই

ন হন্যতে ২০·০০

ঃ মৈত্রেয়ী দেবী

স্মৃতি বিস্মৃতি ও দূরস্মৃতি ১·০০

ঃ পাবলো নেরুদা

অনুবাদক ঃ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

কমিউনিস্ট পরিবার ও অন্যান্য গল্প ১২·০০

ঃ সৌরি ঘটক

তরী হতে তীর

ঃ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মনীষা গ্রন্থালয়

৪/৩-বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
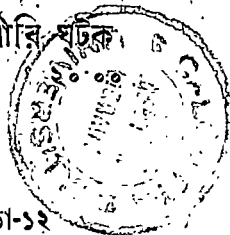
Adsol
IS ALWAYS
THE BETTER
PASTE

Adsol...
THE SUPERIOR ADHESIVE
FOR OFFICES & HOMES

SULEKHA WORKS LTD. * CALCUTTA * GHAZIABAD

SW-13/71

পরিচয়

বর্ষ ৪৪ । সংখ্যা ৮-৯ । ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮১ । মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৫

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : অজয় গুপ্ত

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য । হিরণকুমার সান্যাল । সুশোভন সরকার
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র । গোপাল হালদার । বিষ্ণু দে । চিন্মোহন সেহানবীশ
সুভাষ মুখোপাধ্যায় । গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তরুণ সান্যাল

পরিচয়

বর্ষ ৪৪ । সংখ্যা ৮-৯ । ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮১ । মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৫

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত্রিশের দশকের এক অধ্যায়

[তৃতীয় পর্ব]

ধরণী গোস্বামী

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দৃষ্টিতে

১৯৩০ সালের ৫ই জুলাই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ষোড়শ কংগ্রেস-অধিবেশনে কমরেড মলোতোভ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটিতে আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রদান করেন। এই রিপোর্টটি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটিতে প্রেরিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর পক্ষে তাদের কাজের বিবরণ। এই রিপোর্টেই মলোতোভ ত্রিশের দশকে ভারতের পরিস্থিতির উপর বিশদ আলোচনা করেন।

ত্রিশের দশকের অগ্নিগর্ভ দিনগুলিতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে বিপুল বৈপ্লবিক জাগরণ, কৃষকশ্রেণীর উত্থান ও জনগণের সর্বস্তরে ব্যাপক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাবলী সম্বন্ধে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটিতে যে আলোচনা, মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল মলোতোভ তাঁর রিপোর্টে সেই সমস্ত বিবরণ উপস্থাপিত করেন। এই বক্তব্যে ভারতের বিশেষ স্থান ছিল।

মলোতোভ বলেন, "সাম্প্রতিক" কালে ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলন এক প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছে। গভীর আর্থনীতিক সঙ্কটের চাপের প্রতিফলনরূপে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর জীবন-জীবিকার উপর তীব্র আঘাত পড়েছে এবং

সামগ্রিকভাবে জনগণের জীবনযাত্রার দ্রুত ক্রমাবনতি ঘটছে এবং পরিস্থিতি দেশের সর্বত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামকে জোরদার করে তুলছে। বিশ্ব-আর্থনীতিক সঙ্কটের আঘাতে[১] ভারতের কৃষিসঙ্কট অধিকতর মাত্রায় তীব্র হয়ে উঠেছে।

এর ফলে ভারতের শিল্পোন্নয়নের কাজে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী এখনও ভারতের গ্রামাঞ্চলের নিকৃষ্টতম প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততন্ত্রের অবশেষগুলিকে জিইয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর। তার অর্থ হল এই যে, শ্রমজীবী মানুষের উপরে দ্বৈতশাসন প্রথাটি বজায় রাখা এবং যুগপৎ একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ও অপরদিকে সামন্ত-প্রভুদের দ্বারা শোষণকে অব্যাহত রাখা। এই প্রভুত্ব ইতিপূর্বেই ভারতের বুক রক্তের দাগে চিহ্নিত করে রেখেছে—যা কখনও মুছে যাবে না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছরের মধ্যেই ভারতের আট কোটি মানুষের অনাহারে মৃত্যু ঘটেছিল, সরকারী রিপোর্টেই একথা স্বীকৃত হয়েছে। এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে জনগণের মধ্যে এই ব্যাপক অসন্তোষই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের শক্তি জোগাচ্ছে। এই অসন্তোষ বর্তমানে ক্রমসম্প্রসারিত বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে প্রকটিত হচ্ছে।

সম্প্রতি বিগত কয়েক বছরের মধ্যে ভারতে ধর্মঘট-আন্দোলন বিপুল আকার ধারণ করেছে, এবং সেগুলি এমন বৈপ্লবিক রূপ নিচ্ছে যে দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। ১৯২৮ সালে এইরূপ ধর্মঘটে অংশীদারদের সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ সাত হাজার, আর ১৯২৯ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল পাঁচ লক্ষ একত্রিশ হাজারে। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক সংগঠনও গড়ে উঠছে এবং লাল সংগঠনের (Red Trade Unions) সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা এখন প্রায় এক লক্ষের মতো।[২]

শ্রমিকাঞ্চলগুলিতে ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী বৈপ্লবিক মিছিল সঙ্ঘটিত

---

১ ১৯২৮-২৯ সালে আমেরিকার ব্যাঙ্ক-বিপর্যয়ের ফলে সারা বিশ্বে দীর্ঘস্থায়ী গভীর আর্থনীতিক সঙ্কট ছড়িয়ে পড়েছিল, ভারতের উপরে এর আঘাত জনজীবনকে দুঃসহ করে তুলেছিল।—লেখক।

২ ১৯৩১ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস দ্বিতীয়বার দ্বিধাবিভক্ত হয়। ঐ সময় কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে রেড ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত হয় এবং মস্কোস্থিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা (RILU)-র সঙ্গে এ-আই-টি-ইউ-সি-কে যুক্ত (affiliate) করা হয়।—লেখক।

হচ্ছে। শুধু শ্রমিকাঞ্চলেই বৈপ্লবিক আন্দোলন প্রবহমান তা নয় সম্প্রতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পেশওয়ারে এক সশস্ত্র বৈপ্লবিক উত্থান (insurrection)[১] সংঘটিত হয়ে গেছে। এই বৈপ্লবিক উত্থানকারীর প্রতি দেশীয় সৈন্যবাহিনীর সমর্থন প্রদানের ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে আন্দোলন ক্রমশই জনতার বিভিন্ন অংশকেও আকর্ষণ করছে।

মলোতোভ ১৯৩০ সালের ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের ঘটনাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে আন্দোলনের মধ্যে দুর্বল বুর্জোয়া নেতৃত্বের ভূমিকাটি উল্লেখ করে বলেন যে, জাতীয় কংগ্রেস-নেতৃবর্গ আন্দোলনের বৈপ্লবিক ক্রমাগ্রগতির রাশ টেনে ধরছেন এবং এর মোড় ফেরাতে চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নেতৃত্বের উদারনৈতিক ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও এই আন্দোলন জনগণকে এক বিরাট ও ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রামের পক্ষে নামিয়েছিল।

আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা

মলোতোভ মন্তব্য করেন, "শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের দিন এখন ক্রমশই অতীতের বিষয়বস্তুতে পরিণত হতে চলেছে।" এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি ভারতের এই বৈপ্লবিক পরিস্থিতির যুগে শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বল নেতৃত্বের ভূমিকা সম্বন্ধেও উল্লেখ করেন এবং বলেন, "এই আন্দোলনের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনের (কৃষকশ্রেণীর কথা বাদই দিলাম) মান এখনও অত্যন্ত দুর্বল।" কমিউনিস্ট পার্টির সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেন যে, **"আজ পর্যন্ত ভারতে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠল না, যদিও এই সময়ে এরূপ একটি পার্টি-সংগঠনের পক্ষে উপকরণ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে।"**[২]

১ ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় পেশোয়ার শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণের এক বৈপ্লবিক উত্থান হয় এবং প্রায় ১২ দিন পর্যন্ত সমগ্র শহর জনগণের নিয়ন্ত্রণে থাকে। শহরে মোতায়েন গাড়োয়াল সৈন্যবাহিনী নিরস্ত্র জনতার উপর ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের গুলিবর্ষণের আদেশ অমান্য করে এবং জনতার সারিতে এসে দাঁড়ায়। গাড়োয়াল সৈন্যবাহিনীর নেতা চন্দ্র সিং-কে সামরিক আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। গান্ধীজীর হস্তক্ষেপের ফলে পরবর্তীকালে তিনি মুক্ত হন এবং মুক্তজীবনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।—লেখক।

২ ১৯২৯ সালে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতৃবর্গের গ্রেপ্তারের ফলে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং শ্রমিক আন্দোলনও দুর্বল এবং নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে।—লেখক।

এম. এন. রায়ের ভূমিকার সম্বন্ধে উল্লেখ করে মলোতোভ বলেন, "এম. এন. রায়ের মতো ব্যক্তি, যিনি এখন জাতীয় বুর্জোয়াদের দলে ভিড়ে গেছেন এবং তাদের সঙ্গে মিতালি করে একটি ব্লক (bloc) সংগঠনের নীতির সাফাই গাইছেন এবং দক্ষিণপন্থী 'রেনিগেত'দের (renegades) ক্যাম্পে আসন নিয়েছেন—তাঁর দ্বারা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত হতে পারে না।"[১]

মলোতোভ বলেন, "ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর নেতারা এখন জন্ম নিচ্ছেন বৈপ্লবিক ঘটনা-স্রোতাবর্তের মধ্যে এবং বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিক-শ্রেণীর শীর্ষ নেতৃত্বের (hegemony) ভূমিকা গ্রহণের সংগ্রামের মধ্যে।... এইরূপ ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পোড় খেয়ে গড়ে উঠবে।"

প্রসঙ্গক্রমে মলোতোভ ত্রিশের দশকে সংগঠিত বিপ্লবী যুব সংগঠনগুলির ভূমিকা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "আজ বিপ্লবী গণসংগঠন ও ক্রমাগ্রসর যুবলীগগুলির[২] সক্রিয় ভূমিকার মধ্য দিয়ে হাজার হাজার দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামী বিপ্লবীর জন্ম হচ্ছে। এইরূপে ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই **ভারতের কমিউনিস্ট সংগঠনও রূপায়িত হতে চলেছে।**"

মলোতোভ অবশ্য তাঁর রিপোর্টে এ কথারও উল্লেখ করেন যে, "ভারতে সম্প্রতি একটি **কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের পথে পা বাড়িয়েছে**।"[৩] তিনি হুঁশিয়ারী দিয়ে এ কথাও বলেন যে, "এই সংগঠন একটি প্রকৃত পার্টি সংগঠনের কাঠামোতে পরিণত হতে পারবে একমাত্র তখনই যখন তা ভারতের শ্রমিক-শ্রেণীর একটি সত্যিকার বলশেভিক অগ্রগামী (Bolshevik Vanguard) নেতৃত্বের ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে—আগামী দিনগুলিতে তা সংগ্রামের ক্ষেত্রে বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হবে।"

---

১ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর (১৯৩১) এম. এন. রায় ভারতে আসেন এবং কংগ্রেস দলে ভিড়ে যান।—লেখক।

২ ১৯২৯-৩০-৩১ সালে কলকাতা এবং বাঙলার বিভিন্ন জেলায় ইয়ং কমরেডস লগে (Young Comrades League) সংগঠিত হয়েছিল এবং বোম্বাইতে শ্রমিক-যুব-ছাত্র লীগ সংগঠিত হয়েছিল—কৃষক আন্দোলনে ইয়ং কমরেডস লীগের সক্রিয় নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল—'পরিচয়', ডিসেম্বর, ১৯৭৪ দ্রষ্টব্য।—লেখক।

৩ ১৯৩০-৩১ সালে কলকাতায় একটি কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের প্রাথমিক উদ্যোগ চলছিল। 'পরিচয়', অক্টোবর (শারদীয়) ১৯৭৩ ও ডিসেম্বর ১৯৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।—লেখক।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটিতে ভারতের আন্দোলনের মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটির একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে (মার্চ-এপ্রিল, ১৯৩১) ভারত, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের পরিস্থিতি ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণআন্দোলন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়, থিসিস-সিদ্ধান্তাদি গৃহীত হয় এবং ঐ দেশগুলির কমিউনিস্টদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্ধারিত হয়। ভারতের ত্রিশের দশকের পরিস্থিতি সম্বন্ধে মূল্যায়নে বলা হয়ঃ

"ভারতে সম্প্রতি শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর আন্দোলনের অগ্রগতির ফলে সেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বৈপ্লবিক গণআন্দোলন ব্যাপকতর ও গভীরতর আকার ধারণ করছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর আপোষ-সমঝোতার ও জোট বাধার উদ্যোগের ফলে এই আন্দোলন বরং আরো শক্তি সঞ্চয়ই করছে। এই বৈপ্লবিক গণআন্দোলনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ নতুন নতুন শ্রমিক-কৃষক এবং শহরের গরীব জনতা শামিল হচ্ছে এবং জনগণ ক্রমেই বৈপ্লবিক নীতিবিরোধী গান্ধীবাদের প্রভাব মুক্ত হচ্ছে, এমনকি আন্দোলন প্রকাশ্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপ ধারণ করছে। জনগণ পুলিশ ও সৈন্যদলের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষের মুখোমুখি হচ্ছে (দৃষ্টান্তঃ পেশোয়ার ও শোলাপুরের বিদ্রোহ; বেরার ও ব্রহ্মদেশের কৃষক উত্থান; ১৯৩০-এ কিশোরগঞ্জের কৃষক উত্থান।—লেখক)। এমনকি জাতীয় কংগ্রেস ও গান্ধীজীর নেতৃত্বের বিরুদ্ধেও গণবিক্ষোভ ও মিছিল সংগঠিত হচ্ছে।"

এই পরিস্থিতিতে ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এক প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "ভারতে বিপ্লবের বিজয়ের জন্য বৈপ্লবিক মুক্তিআন্দোলনের পুরোধায় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সম্ভাবনাও বর্তমানে রয়েছে। কারণ, শ্রমিক জনতা ক্রমবর্ধিত শক্তিতে জাতীয় সংস্কারবাদী প্রভাব বিশেষত এর নামধারী বাম নেতৃত্বের প্রভাবকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। আরো বিশেষ কারণ এই যে বর্তমানে সেখানে (ভারতে) একটি কমিউনিস্ট পার্টিও সংগঠিত হতে চলেছে।"[১]

---

১ *Marxist Miscellany* No 6, 1974-এ লিখিত কমরেড রণেন সেনের প্রবন্ধ ও সোমনাথ লাহিড়ীর প্রবন্ধ 'অন্ধকার থেকে আলো'—শারদীয় 'কালান্তর', ১৯৭৪ দ্রষ্টব্য। —লেখক।

প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে যে, "ভারতের শ্রমিকশ্রেণী আশু যে কর্তব্যগুলির সম্মুখীন হয়েছে সেগুলি হল এই : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনগণের বৈপ্লবিক ক্রিয়াগুলিকে সংহত করা, শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করা এবং একটি শক্তিশালী **সারা ভারত কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত করা** ; বড় বড় রেড ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করা এবং একটি রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুতি করা।"

উক্ত রিপোর্টে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিভাগীয় উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, এই পার্টি একটি বৈপ্লবিক সংগ্রামী কর্মসূচীর (Programme) ঘোষণা করেছে। (সম্ভবত ১৯৩০-৩১ সালের কর্মসূচী সম্বন্ধে উল্লেখ। —লেখক)।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের একাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে কমরেড ম্যালিনিস্কির ভাষণেও ঐ সময়কার ভারতের পরিস্থিতির মূল্যায়ন করা হয়েছে। ম্যালিনিস্কি বলেছেন, ১৯৩০ সালের আন্দোলনে শুধু যে নতুন নতুন স্তরের শ্রমিক জনতাই যোগদান করেছে তা নয়, শহরের অগণিত নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষও (Petty bourgeois) ক্রমবর্ধিত হারে যোগদান করেছে এবং কৃষকশ্রেণীও যোগদান করেছে। তিনি বলেছেন যে, জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন গান্ধীবাদের বেড়া ভেঙে বেরিয়ে আসছে। জাতীয় কংগ্রেসের বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘটে নেমে পড়ছে এবং ঘন ঘন শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত হচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর ঘন ঘন সংঘর্ষ বাঁধছে। (বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, করাচি প্রভৃতি স্থানের ঘটনার দৃষ্টান্ত)।[১]

তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, "এমন অভূতপূর্ব এক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের জোয়ার এসেছে যা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিপ্লবী দলগুলিও কংগ্রেসের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসছে ; সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহী জনতার সংগ্রামে সারিবদ্ধ হচ্ছে (পেশোয়ার) এবং শ্রমিকনেতৃত্বে যোগ দিচ্ছে। এ সমস্ত ঘটনাগুলি থেকে দেখা যায় যে জনসাধারণ ক্রমশ উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ের সংগ্রামের পথই বেছে নিয়েছে।"

ম্যালিনিস্কি তাঁর ভাষণে বাঙলা এবং বেরারের কৃষক উত্থানের দৃষ্টান্ত তুলে

---

১ ১৯৩০-এর কলকাতার গাড়োয়ান ধর্মঘট, কিশোরগঞ্জের কৃষক উত্থান উল্লেখ্য। —লেখক।

ধরেন এবং বলেন যে, কৃষক জনতার আন্দোলন ক্রমাগ্রগতিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কৃষিবিপ্লবের (Agrarian Revolution) রূপ ধারণ করছে। ইংল্যাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি (যেমন রক্ষণশীল, উদারনৈতিক ও লেবর পার্টি প্রভৃতি) কর্তৃক ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে জোট বাঁধার দৃষ্টান্তও তিনি তাঁর ভাষণে তুলে ধরেন। ত্রিশের দশকের ভারতের আন্দোলনের দুর্বলতার দিকগুলির উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর কারণ শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর সংগ্রামের ক্ষেত্রে অনৈক্য, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অযোগ্য সংগঠন —অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়নগুলির জাতীয় সংস্কারবাদী নেতৃত্বে অবস্থান। আর সবচেয়ে মুখ্য কারণ হিসেবে তিনি বলেন, "**ভারতের এখনও একটি কমিউনিস্ট পার্টি'র সংগঠনের অভাব।**"

ম্যানুইলস্কি অতঃপর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে (অবশ্যই যখন সংগঠিত হবে—লেখক) যে সমস্ত কর্তব্য পালন করতে হবে সে বিষয়ে বলেন :

(ক) পার্টিকে শক্তিশালী করতে হবে এবং তাকে একটি বিধিসঙ্গত কেন্দ্রীভূত সর্বভারতীয় পার্টিতে পরিণত করতে হবে।

(খ) জাতীয় ও সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে বৈপ্লবিক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতে হবে এবং শক্তিশালী করতে হবে।

(গ) বর্তমানে অবস্থিত রেড ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আরো জোরদার করতে হবে। এইরূপ নতুন নতুন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করতে হবে।

(ঘ) কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং নির্ভীকভাবে কৃষিবিপ্লবের শ্লোগান প্রচার করতে হবে।

(ঙ) সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে স্বাধীন নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে এর "নামধারী বাম-অংশ" ("Left Varieties")-এর বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

কমিউনিস্ট পার্টির অনগ্রসরতা

উক্ত রিপোর্টে পুনরায় হুঁশিয়ারী দিয়ে বলা হয়েছে যে আমাদের স্বীকার করতেই হবে, এই দেশগুলিতে (ভারত, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি—লেখক) কমিউনিস্ট পার্টিগুলির অনগ্রসরতা এবং গণ-বৈপ্লবিক আন্দোলনের উন্মাদনার পেছনে ছোটাই (লেজুড়পনা : "Tailism") হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপজ্জনক ব্যাপার —যা কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সঙ্কটাপন্ন করে তুলছে। দশম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনেও

হুঁশিয়ারী দিয়ে এই কথাই বলা হয়েছিল। কমিউনিস্টরা গণআন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে পা ফেলে চলতে অসমর্থ হচ্ছে, তারা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন-গুলির বাম-মোড় ধরার সম্ভাবনাকে ছোট করে দেখছে। গণআন্দোলন অনেক সময় কমিউনিস্টদের মাথার উপর দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। কিন্তু তারা আন্দোলনের নেতৃত্ব না দিতে পেরে তার লেজুড় হয়ে চলছে। এই প্রসঙ্গে **ভারতের নব কমিউনিস্ট পার্টির** আলোচনাটি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। সেখানে কিছু কমরেড আছেন যাঁরা ভারতের তরুণ ট্রেড ইউনিয়নগুলির দুর্বলতার উদাহরণ দেখিয়ে বর্তমানে কমিউনিস্ট পার্টিকে মুখ্যত ট্রেড ইউনিয়নগুলির আর্থনীতিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি রেখে নিজ শক্তি নিয়োগ করতে বলেছেন। তাঁরা "স্বতন্ত্র" শ্রমিক আন্দোলন গড়ার নাম করে গণ-রাজনৈতিক ধর্মঘটের বিরোধী স্লোগান তুলতে বলছেন। এই সমস্ত ব্যাপার ঘটছে এমন একটি দেশে যে দেশ এখন বিপুল বৈপ্লবিক আন্দোলনের আবর্তে নিমজ্জিত, যার সঙ্গে ব্যাপকতার মাপকাঠিতে দেখতে গেলে ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের তুলনা করা চলে। কিন্তু ভারত এমন একটি দেশ যার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমরা লেনিনের উক্তিগুলির প্রয়োগ করে বলতে পারি যে, "মাত্র কয়েক ডজন বা কয়েকশত একনিষ্ঠ বিপ্লবী যাঁরা বিশ্বস্ততার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর আদর্শের (cause) জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন, লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত মানুষের মর্মবেদনার ভাষা দিচ্ছেন তাঁরাই।"

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনেও ভারত সম্পর্কে পুনরালোচনা হয় এবং ভারতের পরিস্থিতির ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপিত হয়। এই আলোচনায় বলা হয় যে, ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনে সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা—যার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীকে এখনও নড়াতে পারা যায় নি। অপরদিকে ভারতের শ্রমিক-শ্রেণীও এখনো পর্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে নি এবং শ্রেণীসচেতন হয় নি। জাতীয় সংস্কারবাদী আন্দোলন এখনও শ্রমিকশ্রেণীর এক বৃহত্তম সংখ্যাকে তাদের সঙ্গে যুক্ত রাখতে সমর্থ হচ্ছে। সর্বোপরি কথা হল এই যে **ভারতে এখনও একটি কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনের** অভাবের জন্যই ভারতের বৈপ্লবিক সঙ্কট একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে উন্নত হওয়ার পক্ষে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

[সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহী কমিটির দ্বাদশ প্লেনাম বা পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে—মিঃ জুওসিনেন (C. Guusinen) প্রদত্ত রিপোর্ট]

উক্ত দ্বাদশ পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আশু কর্তব্য সম্বন্ধে নিম্ন সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়ঃ

১ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে রাজনীতিগত ও সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করতে হবে।

২ বলশেভিক কর্মী (cadre) তৈরি করতে হবে।

৩ সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চালাতে হবে।

৪ ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মোর্চা সংগঠিত করতে হবে।

৫ জনগণকে জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব মুক্ত করতে হবে।

৬ সাধারণ ধর্মঘটের লক্ষ্যে প্রচার ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি-আন্দোলন চালাতে হবে।

৭ কৃষক আন্দোলনকে সম্ভাব্য সকল রকম সহযোগিতা দিতে হবে— ট্যাক্স, খাজনা ও ঋণশোধ বন্ধের জন্য এবং কৃষিবিপ্লব সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে মূল স্লোগান ও কর্তব্যগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে।[১]

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মুখপত্রে আলোচনা

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও পার্টি সংগঠন সম্পর্কে পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ১৯৩৩-৩৪ সালে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মুখপত্র 'ইনপ্রেকর'-এ পর পর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমার লেখা পূর্বের দুটি প্রবন্ধে ('পরিচয়', শারদীয় সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৭৩ ও ডিসেম্বর ১৯৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য—লেখক) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঐ সময়টি ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পুনর্গঠনের কাল। ১৯৩১ সালে সংগঠিত কলকাতা কমিটির সহযোগিতায় ও প্রধানত মীরাট মামলা থেকে সদ্যমুক্ত নেতা ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী ও পূরণচাঁদ যোশীর উদ্যোগে এলাহাবাদ বোম্বে ও কলকাতায় কয়েকটি বৈঠক হয়। এই সম্বন্ধে সম্প্রতি প্রকাশিত 'মার্কসিস্ট মিসেলেনী'র ৬নং সংখ্যায় (*Marxist Miscellany* No. 6, 1974) কমরেড রণেন সেন কর্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধে কিছু নতুন তথ্যের উল্লেখ আছে। কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী লিখিত একটি পুরানো প্রবন্ধেও ('কালান্তর', ১৯৭৪ শারদীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এই সময়কালে ভারতের

---

১ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত দলিল— *Reports & Resolutions of the Communist International—* 1930-35."

কমিউনিস্ট পার্টির পুনর্গঠনের উদ্যোগপর্ব সম্বন্ধে কিছু তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। উভয়ের তথ্যের মধ্যে কিছু কিছু গরমিল নজরে পড়ে, যদিও তাঁরা একই সঙ্গে পার্টি পুনর্গঠনের কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন বলে লিখেছেন।

এই উদ্যোগপর্বের সময়কালে—১৯৩১ সালে—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নামে একটি 'খসড়া কর্মসূচী' (Draft Platform of Action) রচিত ও প্রচারিত হয়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দপ্তরেও এই খসড়া কর্মসূচীটি প্রেরিত হয়েছিল এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মুখপত্র 'ইন্‌প্রেকর'-এর ১০নং. সংখ্যায় ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩১ সেটা প্রকাশিত হয়েছিল (*Inprecorr* No X, December 18, 1931)। আমার পূর্বের প্রবন্ধ দুটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই সময় ভারতের কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির মধ্যে বিবাদ ও বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। আন্তর্জাতিকের পক্ষ থেকে এর আশু মীমাংসার জন্য ও একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টি সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চলছিল। ১৯৩২ সালে এই লক্ষ্যেই বিখ্যাত তিন পার্টি-দলিল অর্থাৎ চীন, জার্মানি ও গ্রেট ব্রিটেন-এর কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নামে একটি যুক্ত আবেদন অভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য এবং একটি সুসংবদ্ধ ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় পার্টি সংগঠিত করার জন্য আসে। চীনের পার্টি কর্তৃক পরবর্তী এক সময়ে এককভাবেও একটি আবেদন ঐ একই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিল।

কমরেড ভি. বসাকের প্রবন্ধ

ত্রিশের দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নানা বিভ্রান্তি, বৈষম্যাদির অবসানের লক্ষ্যে ভি. বসাক (ছদ্মনাম) নামে জনৈক আন্তর্জাতিক কমরেড 'ইনপ্রেকর'-এ ক্রমপর্যায়ে তিনটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৩৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর 'ইনপ্রেকর'-এর ৪১নং সংখ্যায় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে কমরেড ভি বসাক উক্ত খসড়া কর্মসূচীর উল্লেখ করেন এবং মন্তব্যে বলেন যে, "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মসূচীটি ভারতের বিপ্লবের চরিত্র ও চালিকাশক্তির এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ভূমিকা সম্বন্ধে একটি সঠিক বলশেভিক বিশ্লেষণ করেছে।" তিনি এই প্রবন্ধে একথাও বলেন যে, "কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণী একমাত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এই কাজ সম্পন্ন করতে পারে। এবং তাদের জনগণের সামনে কার্যত এরূপ দৃষ্টান্ত

রাখতে হবে যে কমিউনিস্টরাই হচ্ছে একমাত্র শক্তি যারা বিপ্লবী জনগণকে বিজয়ের পথে পরিচালিত করতে সক্ষম।"

ভি. বসাক তাঁর প্রবন্ধে চীনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেছেন যে, "সহস্র সহস্র চীনা কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদী জেনারেলদের ও কুওমিংটাং-বিশ্বাসঘাতকদের দ্বারা নির্মিত অন্ধকারাচ্ছন্ন কুঠরিগুলিতে আবদ্ধ অবস্থায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। এবং এভাবেই তারা শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর সংগ্রামের ক্ষেত্রে তাদের নেতৃত্ব (hegemony) ও কর্তৃত্ব (leadership) প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল।"

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তখনকার অবস্থার পর্যালোচনা করে তিনি বলেছেন যে, "দুঃখের বিষয় ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে এখনও গণআন্দোলন সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণা রয়েছে—দুই ধরনের বিচ্যুতি (deviation) পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক পক্ষ শুধু গোপন কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথাই ভাবছেন। তাঁরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণের এবং জনগণকে নিজেদের প্রভাবে টেনে আনবার কর্তব্যের পরিবর্তে এইরূপ ধারণার বশবর্তী। যে সমস্ত কমরেড এরূপ পথ বেছে নিচ্ছেন তাঁরা সঙ্কীর্ণতার পথ ধরেই চলেছেন। তাঁরা সংস্কারবাদীদের দ্বারা পরিচালিত গণসংগঠনগুলির মধ্যে তাঁদের কর্তব্য পরিহার করেছেন। তাঁরা এই সঙ্গে আইনী ও আধা-আইনী —দুই ধরনের কাজেরই সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন।

"আর দ্বিতীয় ধরনের বিচ্যুতিটি হল ঠিক এরই বিপরীতধর্মী ঝোঁক। এটি হল এই মুহূর্তেই একটি গোপন কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অজ্ঞতা। এই দুই ধরনের বিচ্যুতিই হল অত্যন্ত মারাত্মক, এবং অচিরাৎ এই দুই ধরনের বিচ্যুতিরই মূলোচ্ছেদ করতে হবে।"

গণসংগঠন ও সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির কাজের ধারা

ভি. বসাক তাঁর আলোচনায় কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতিতে কাজের ধারা সম্বন্ধে বলেছেন, "কমিউনিস্ট পার্টির দৈনন্দিন ট্রেড ইউনিয়নের কাজের সঠিক বলশেভিক ধারণার সঙ্গে রাজনৈতিক সংগ্রাম, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং গোপন গণ-কমিউনিস্ট সংগঠনের কাজগুলিকে পরিত্যাগ করার কোনো সম্পর্ক নেই।" এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৩১-৩২ সালে, বোম্বের কমিউনিস্টদের মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল এবং মতদ্বৈধতার চরম পরিণতিতে কমিউনিস্টরা দুটি বিরোধী গ্রুপে বিভক্ত হয়ে

গিয়েছিলেন—এ সম্বন্ধে পূর্বে 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ দুটিতে আলোচনা করা হয়েছে। আইন অমান্য আন্দোলন চলা কালে একটি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়ার প্রশ্নের উপর তীব্র মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হয়েছিল। কমরেড ভি. বসাকের প্রবন্ধেও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়। তিনি উক্ত প্রবন্ধে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, "এইরূপ একটি সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিতে হবে একমাত্র ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে—এর জন্য প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন হলেই এবং ফ্যাক্টরি কমিটিগুলি সংগঠিত হলে পরেই।"

অতঃপর তিনি পূর্বোক্ত তিন পার্টির চিঠির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেই চিঠির নির্দেশগুলি অনুসরণ করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, "ভারতের কমিউনিস্টদের বর্তমানে অবশ্যকর্তব্য হল কারখানায় কারখানায় কমিটি সংগঠন করা, ট্রেড ইউনিয়নের শাখা সংগঠন করা, নির্বাচিত ফ্যাক্টরি ট্রেড ইউনিয়নগুলির পরিচালনা কমিটির কাজ শুরু করা এবং শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে গণ সদস্য সংগ্রহের কাজ চালু করা এবং সমস্ত সংগঠনে কমিউনিস্ট 'ফ্রাকসন' সংগঠিত করা। এই কাজগুলি প্রতিদিনকার কাজ হিসাবে চালিয়ে যেতে হবে এবং যুক্তফ্রন্টের কৌশল অবলম্বনেই এ কাজ চালাতে হবে। এবং যথাসম্ভব অ-পরিকল্পিত ও বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষগুলি (action) পরিত্যাগ করে সূতাকলের শ্রমিকদের (বোম্বের) সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তার লক্ষ্যেই এই পদ্ধতিতে কাজে এগিয়ে যেতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমেদাবাদ, শোলাপুর এবং অন্যান্য কেন্দ্রে শ্রমিকদের সংগঠিত করতে হবে—অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যেও সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতির কাজ চালাতে হবে। এই পদ্ধতিতেই একটি সাধারণ ধর্মঘটের জন্য ডাক দেওয়া সম্ভব। ভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে সাধারণ ধর্মঘট থেকে শুরু করে অবশেষে বৃহত্তর সাধারণ ধর্মঘটে যেতে হবে—এটাই হচ্ছে আমাদের লাইন।"

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্বহীনতা

ভি. বসাক তাঁর উক্ত প্রবন্ধের ক্রমানুসরণ করে আরেকটি প্রবন্ধ লেখেন ১৯৩৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর, 'ইনপ্রেকর'-এর ৪২ সংখ্যায়। এই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ১৯২৮-৩০ সালে ভারতে একটি কমিউনিস্ট পার্টির সম্পূর্ণ অনবস্থিতির ফলেই ঐ সময়ে বোম্বের ধর্মঘটের অ-সাফল্য ঘটেছিল।[১]

১ কমিউনিস্ট পার্টির একেবারে অস্তিত্ব ছিল না তা নয়। তবে কোনো সুসংগঠিত কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না—এই সম্বন্ধে 'পরিচয়'-এ পূর্বে লিখিত লেখকের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—লেখক।

এই ঘটনার থেকে এই বাস্তব সত্যই বেরিয়ে আসছে যে জাতীয় সংস্কারবাদীদের সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবী অংশের পৃথকীকরণ থেকেই ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এবং জাতীয় সংস্কারবাদীরাই এই বিভেদের ইন্ধন জুগিয়েছে।" এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯২৯ সালে নাগপুর অধিবেশনে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রথম দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং পরে ১৯৩১ সালে কলকাতা অধিবেশনে পুনরায় দ্বিধাবিভক্ত হয়।

ভি. বসাক উক্ত প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ট্রেড ইউনিয়নগুলিই পার্টির স্থলাভিষিক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এইভাবেই ট্রেড ইউনিয়নগুলির কর্মক্ষেত্রের অস্তিত্ব বজায় ছিল এবং সেগুলির মধ্যে আদর্শগত ও গণসংগঠনগত সংস্কারবাদীদের থেকে কমিউনিস্টদের পৃথকীকরণ ক্রিয়া সংগঠিত হচ্ছিল। কমিউনিস্টরা এটা বুঝতে পারছেন না যে সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অর্থ মোটেই একথা বোঝায় না যে, গণসংগঠনগুলিকেও বিভক্ত করে ফেলতে হবে।

রেড ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন সম্বন্ধে প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, যেখানে যেখানে পরিস্থিতি অনুকূল সে সমস্ত স্থানেই রেড ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করাটা আদৌ কোনো বিরোধিতার কাজ তো নয়ই, বরং তা সঠিক কাজ। রেড ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের উদ্যোগ গ্রহণ সংস্কারবাদী গণ ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে বিরোধিতার কাজ নয়, বরং ঐ সমস্ত সংস্কারবাদী নেতৃত্বে পরিচালিত ইউনিয়নগুলিতে কাজের পূর্ব শর্তরূপেই তা সঠিক বলে বিবেচিত। ট্রেড ইউনিয়নগুলি থেকে হাত গুটিয়ে নেওয়ার সংকীর্ণতাবাদী নীতি দ্বারা বুর্জোয়াদের অবস্থানকেই শক্তিশালী করা হয়েছে। প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছে :

অপর পক্ষের কমিউনিস্টরা একই সঙ্গে একথা বুঝতে অক্ষম যে সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে কাজ করাটা অথবা জাতীয় সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করার অর্থ (এমনকি এই কাজ এখনও আমরা পরিত্যাগ করব না) এই নয় যে তাদের নেতাদের কাজের সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনার গতি মন্থর করা। তাতো নয়ই, বরং সংস্কারবাদিতার বিরুদ্ধে এবং কমিউনিস্ট নীতির জন্য আমাদের স্লোগান ও প্রস্তাবাদির জন্য এই কাজকে আরো জোরদার করতে হবে এবং পরিচ্ছন্ন ভাবে তা চালিয়ে যেতে হবে।

প্রবন্ধে আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, যেখানে যেখানে সম্ভব হবে সেখানে সেখানে ট্রেড ইউনিয়নের সংযুক্তি সাধনও (amalgamation)

করতে হবে। অবশ্যই সর্বদা কমিউনিস্টদের স্বাধীন ভূমিকা বজায় রেখে চলতে হবে। এখানে তিনি কমিউনিস্টবিরোধীদের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, "কাণ্ডালকার ও অন্যান্য তথাকথিত "বাম" নেতাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার অর্থ সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা নয় এবং যুক্তফ্রন্টের কৌশল পরিত্যাগ করাও নয়, এবং এমনকি জাতীয় সংস্কারবাদী গণ ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে রেড ট্রেড ইউনিয়নগুলির একীভূতকরণও পরিত্যজ্য নয়।"

"আমাদের মধ্যে পার্টিপ্রীতি (Spirit) ও পার্টিশৃঙ্খলা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে"

কমরেড ভি. বসাক তাঁর ধারাবাহিক প্রবন্ধের শেষ পর্যায়ে ('ইনপ্রেকর,' সেপ্টেম্বর ২৪, ১৯৩৩, সংখ্যা ৪৩) লিখেছেন যে, "আমাদের জানা সমস্ত ঘটনাবলী থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে ভারতীয় কমিউনিস্টদের মধ্যে এখনও বহু ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি রয়েছে, এবং এখনও দৈনন্দিন ব্যবহারিক কর্মক্ষেত্রে বাস্তব বলশেভিক পদ্ধতি অবলম্বনের মনোভাবের অভাব রয়েছে। অথচ দৈনন্দিন ব্যবহারিক কর্মক্ষেত্রের মধ্য দিয়েই কমিউনিস্টদের সংগঠনকে গড়ে তুলতে হবে এবং আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক শ্রমিক আন্দোলনের থেকে বিরাট ব্যবধানের পরিস্থিতির মধ্যেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও লাইন অনুসারেই উক্ত ধারায় কাজ চালিয়ে যেতেও হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সর্বপ্রকারে তাদের বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সহযোগিতার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।" প্রবন্ধে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, "আমাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলি থেকে এবং তুলনামূলক বিচারে ভারতের অগ্রগামী শ্রমিকশ্রেণীর উচ্চমানের চেতনার নিদর্শন:দৃষ্টে আমাদের পক্ষ থেকে ভারতের কমিউনিস্টদের সম্মুখে জোরের সঙ্গেই কয়েকটি কাজের কথা তুলে ধরতে সাহস পাচ্ছি। সেগুলো হল এই :

১ পূর্ব বৎসরগুলিতে কাজের শিক্ষাগুলির সম্বন্ধে মোটামুটি একটি হিসাব-নিকাশ (পর্যালোচনা) করা।

২ সমস্ত রকমের বিভ্রান্তিগুলি বিলুপ্ত করা এবং অতীতের যাবতীয় দুর্বলতা ও ভুল ভ্রান্তিগুলির খোলাখুলিভাবে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করা, আমাদের সমস্ত সাধারণ সদস্যকে একত্রীভূত করা এবং একটি সাধারণ বলশেভিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে তাবৎ কমিউনিস্টদের ঐক্যবদ্ধ করা। এই লক্ষ্যেই ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর একটি **স্বাধীন বৈপ্লবিক পার্টি—কমিউনিস্ট পার্টি—সংগঠিত**

করা।” ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সম্মুখে সুস্পষ্ট কর্তব্য হল নির্ভুলভাবে পরিস্থিতিগুলির মূল্যায়ন করা এবং একটি নির্ভুল কৌশল অনুসরণ করা যাতে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তিকে জয় করা যায়।

কোনো কমিউনিস্ট পার্টি রাতারাতি গড়ে ওঠে না এবং একটি বলশেভিক পার্টিতেও পরিণত হতে পারে না। ভারতীয় কমিউনিস্টরা যদি প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে গণ-কর্মতৎপরতার পরিচয় না দেন ; এবং সর্বোপরি একই সঙ্গে পূর্বোক্ত দুর্বলতাগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে না যান ; তাঁরা যদি তাঁদের পুরানো কর্মপদ্ধতিগুলি সংশোধন না করেন এবং একটি সঠিক কমিউনিস্ট লাইন অনুযায়ী তীব্র সংগ্রাম না করেন ; তাঁদের কর্মসূচী (Platform of Action) অনুসারে যদি তাঁরা কাজ না করেন এবং তিন কমিউনিস্ট পার্টির খোলা চিঠিতে লিখিত নির্দেশগুলি পালন না করেন—তাহলে, প্রবন্ধকারের মতে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো যাবে না।

সকল রকমের বিচ্যুতি-বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে অবশ্য পরিচালিত এই সংগ্রামের ধ্বনি হবে, “একটি মাত্র ঐক্যবদ্ধ পার্টি সংগঠনের জন্য সংগ্রাম।” “প্রতিটি শহরে ছড়িয়ে পড়া গ্রুপগুলিকে একটি মাত্র লোক্যাল পার্টি সংগঠনে একত্রীকরণের সংগ্রাম” এবং “সমস্ত লোক্যাল সংগঠনগুলিকে একটি পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সংগ্রাম।”

“প্রত্যেক কমিউনিস্টকেই সর্বদাই এটা মনে রাখতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে যে, আমরা কখনও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নির্দেশগুলিকে উপেক্ষা করে পার্টির কাঠামোকে ভাঙতে পারি না, উপদল গঠন করতে পারি না এবং বলা নিষ্প্রয়োজন যে আমরা কখনো পার্টিসংগঠনকে বিভক্ত করতে তো পারি-ই না।”

প্রবন্ধের উপসংহারে ভি. বসাক মীরাট মামলায় কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তারের পরবর্তী যুগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে মতাদর্শগত বিভ্রান্তি ও বিরোধের উদ্ভব, বিশেষত বোম্বাইতে পার্টির দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যাওয়া, পাঞ্জাব ও বাঙলায় এক-একটি বা একাধিক কমিউনিস্ট গ্রুপের সংগঠন ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতার ঝোঁকের সম্বন্ধে পর্যালোচনা করেছেন। এই যুগে আভ্যন্তরিক বিবাদ ও তার ফলে পার্টিতে যে দুর্বলতাগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছিল, সেগুলি অচিরাৎ সংশোধন করে একটি সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় পার্টি সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেছেন :

“বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো একটি কমিউনিস্ট গ্রুপেরও নিজেদের

কমিউনিস্ট গ্রুপ বলে পরিচয় দেওয়ার অধিকার নেই—যদি না এই গ্রুপগুলি দ্বারা তাদের পূর্বানুসৃত রীতিনীতিগুলি পরিত্যক্ত হয় এবং অবিলম্বে তারা একটি বলশেভিক নীতির ভিত্তিতে নিজ নিজ গ্রুপগুলিকে পুনঃসংগঠিত করতে সক্ষম হয়। এই মুহূর্তেই তাদের নিজ নিজ শহরে শহর-কমিটি ইত্যাদি সংগঠিত করতেই হবে। আমরা শুধু ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে পার্টি ফ্রাকশানের সদস্যদের ডেকে এনে আমাদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না। এরূপ কাজ মোটেই সঠিক নয়।

"দৃষ্টান্ত স্বরূপ—যেমন পাঞ্জাবের কমরেডরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন, 'পাঞ্জাব কমিউনিস্ট পার্টি' নামে, এরূপ করাটা সঙ্গত নয়। এই নাম অবশ্যই পাল্টাতে হবে এবং নামকরণ করতে হবে এরূপ, 'পাঞ্জাব প্রাদেশিক কমিটি—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।' এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলিকেও পুনঃ-সংগঠিত করতে হবে। সমস্ত শহরগুলিতে শহর-কমিটি সংগঠিত করতে হবে—কমিটি নামটির প্রচলন করতে হবে। এই পদ্ধতিটি সমস্ত প্রদেশেই চালু করতে হবে—বিশেষ করে বোম্বাইতে এই কাজ অবশ্যই চালু করতে হবে।"

এই প্রসঙ্গে কলকাতার কাজের সম্বন্ধে প্রবন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, "একমাত্র কলকাতাতেই কমরেডরা 'কলকাতা কমিটি' সংগঠিত করেছেন। যদিও আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এমনকি সেখানেও কোনো অঞ্চল কমিটি (Section Committee) সংগঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয় নি (যেমন মেটিয়াবুরুজ, গার্ডেনরিচ প্রভৃতি এলাকায়)[১] এবং কারখানাগুলির মধ্যেও কোনো প্রাথমিক সংগঠন নিউক্লিয়াই (Nuclei) সংগঠিত করা হয় নি।"

অতঃপর পুনরায় পার্টি কমিটি সংগঠনের ও একটি মাত্র ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় পার্টি সংগঠনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, "কমিউনিস্ট গ্রুপগুলিকে অবশ্যই পার্টি কমিটি সংগঠিত করতে হবে এবং ঐক্যবদ্ধ পার্টি সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। কমিউনিস্ট গ্রুপগুলির বিভিন্ন শহরে বিচ্ছিন্নতার অবস্থানের বিলোপ করতে হবে এবং গ্রুপগুলির মধ্যে নিজ নিজ 'সারা ভারত

---

১ কমরেড রণেন সেন লিখেছেন, ক্যালকাটা কমিটির উদ্যোগে মেটিয়াবুরুজ, গার্ডেনরিচ লোক্যাল কমিটি সংগঠিত হয়েছিল—*Marxist Miseellany* No 6, 1974. সম্ভবত এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। —লেখক।

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠনের' প্রবণতাকে পরিত্যাগ করতেই হবে।" তিনি মন্তব্য করেছেন যে এই ধরনের "বুর্জোয়া কংগ্রেসী রীতিনীতির বিলোপ করে বলশেভিক নীতির পথ অনুসরণ করতে হবে। আমাদের **একটি ঐক্যবদ্ধ সারা ভারত কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে।**

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় সংগঠনের নবউদ্যোগ

এই প্রবন্ধের পূর্ব পরিচ্ছেদগুলিতে আলোচিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ষোড়শ অধিবেশন প্রদত্ত কমরেড মলোতোভের রিপোর্ট, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্য-নির্বাহী কমিটির দশম ও একাদশ পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে ভারতে ১৯৩০ এর দশকের পরিস্থিতি সম্বন্ধে পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও নীতি-নির্ধারক সিদ্ধান্ত এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মুখপত্র 'ইনপ্রেকর'-এ (১৯৩৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যা ৪১, ৪২, ৪৩) পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত কমরেড ভি. বসাকের[১] তিনটি প্রবন্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সংক্রান্ত বিশদ আলোচনার মধ্যে বারংবার এ কথাই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ যুগে ভারতে প্রকৃতপক্ষে কোন সুসংগঠিত ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় পার্টি গড়ে না ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশের দশকের ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণী কোন সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে নি এবং বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলন ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারে নি। 'পরিচয়'এর পূর্বের দুটি সংখ্যায় (শারদীয় সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৭৩ ও ডিসেম্বর সংখ্যা ১৯৭৩) এই সম্বন্ধে দুটি প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করেছি। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে একমাত্র ১৯৩৩ সালের শেষের দিক থেকেই এবং মীরাট মামলার দুইজন নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী ও পি. সি. জোশীর হাইকোর্টের রায়ে এলাহাবাদ থেকে মুক্তিলাভের পর থেকেই এবং প্রধানত তাঁদেরই উদ্যোগে সর্বভারতীয় ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীর পার্টি সংগঠনের কাজ আরম্ভ হয়।

এই উদ্যোগ পর্বে কলকাতা, পাঞ্জাব ও বোম্বের কমিউনিস্ট নেতৃবর্গও ঐকান্তিক সহযোগী ছিলেন (কমরেড সোমনাথ লাহিড়ীর প্রবন্ধ 'অন্ধকার থেকে আলো,' 'কালান্তর,' শারদীয় সংখ্যা ১৯৬৪ দ্রষ্টব্য)। অতঃপর ১৯৩৩-৩৪ সালে পুনঃ সংগঠিত ভারতের অস্থায়ী (provisional) কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক রচিত

[১] ['পরিচয়'-এর মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৪ সংখ্যায় রণেন সেন কর্তৃক লিখিত "ভিভম্যাক" বিকৃত নাম।—লেখক]

তৃতীয়বারের) কর্মসূচীর ভিত্তিতেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অঙ্গ হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সুযোগের অছিলায় ওৎ পেতে অপেক্ষা করেছিল। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের স্বীকৃতি লাভের পর মুহূর্তেই ১৯৩৪ সালেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তৎকালীন ভারত সরকার কর্তৃক বে-আইনী ঘোষিত হল। বোম্বাইতে তখন সমস্ত সুতা কলের ধর্মঘট চলছিল এবং সাধারণ ধর্মঘটের রূপ নিচ্ছিল। কমিউনিস্ট নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ কিংবা অন্তরীণে আটক করা হল। ফলে, কমিউনিস্ট পার্টি গোপন সংগঠনের মাধ্যমেই কাজ করতে বাধ্য হল। আর প্রকৃতপক্ষে এখন থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে অন্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

ঘরের খেয়ে বনের মোষ…

আশীষ বর্মণ

অফিসে ধরই প্রথম অভিনন্দন জানালেন। কথাটা সবে বড় সাহেবের সেক্রেটারিকে ছুঁয়ে বাতাসে ছড়াচ্ছে, এমন সময় কেবিনের দরজা খুলে ধর ঢুকলেন। সহাস্যমুখ, ডান হাত সোজা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "Heartiest Congratulations"।

নির্মল উঠে দাঁড়িয়ে ছিল, ধরের হাতে হাত দিয়ে উষ্ণ করমর্দন করতে করতে বলল, "থ্যাঙ্কস এ লট…বসুন, একদিন celebrate করা যাক।"

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আমি আছি দিন পাঁচেক…।"

"তারপর, চণ্ডীগড়ে ফিরছেন ?"

"অগত্যা ! এখন তোমার স্টারই তুঙ্গে !"

"I am sorry……সত্যি ধর সাহেব।"

"What for ? আরে শোনো শোনো……আমি নয় কলকাতায় ফিরতে চাই…। তোমার হল পদোন্নতি, and you deserve it"।

"অনেক ধন্যবাদ…কি বলব আপনাকে !"

"নতুন ফ্ল্যাটে কবে যাচ্ছ ?"

"শনিবার।"

"Wish you best of luck."

"Thanks."

ধর যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন, নিশ্চিত নির্ভার পদক্ষেপ আর এক মুখ হাসি নিয়ে। বেশ লোক, চণ্ডীগড়ের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। কলকাতায় আসতে চান। নির্মলের থেকে অনেক সিনিয়রও। মিছিমিছি ওঁকে ডেকে আনাল কর্তারা। হয়তো কোনো দাবার চালেই, কেননা সবাই জানত ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিসনের প্রডাক্ট ম্যানেজারিতে ওঁর কোনোই উৎসাহ ছিল না। আসলে প্রডাক্ট ম্যানেজারির লড়াইটা হল তার আর বটব্যালের মধ্যে, দুজনেরই চান্স ছিল, শিকে ছিঁড়ল নির্মলের। ধর সাহেবের আশা ছিল অন্য, কেননা সেলস ম্যানেজারি নিয়েও অফিসে কোল্ড ওয়ার চলছে। তাই ওঁর আন্তরিক অভিনন্দনে নির্মলের মনটা বেশ ভরে গেল। খবরটা কানে আসা

অবধিই ভিতরে ভিতরে চাপা উত্তেজনা ছিল তার, ওঁর সহৃদয় সংস্পর্শে তা মোলায়েম তাপের মতো ছড়িয়ে গেল গভীরে। আত্মগত হাসির আভাস ফুটল নির্মলের মুখে। "And you deserve it" কথাটা যেন তার কানে বেজে উঠল।

আবার দরজায় টোকা পড়ল, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফের ধর সাহেব ঢুকলেন। কেবিনে পা দিতে দিতেই বললেন "Sorry, may I add something··· ?"

"Sure···বসুন, চা আনাই।"

"না বসব না···but don't have illusions youngman।"

"কি সম্বন্ধে ?"

"এই শালাদের বিষয়···এরা শুধু লুটে নিতে এসেছে···ব্যস।"

"নিশ্চয়ই" নির্মল হাসল, বলল, "নইলে বিদেশে ব্যবসা ফাঁদে !"

"Right···জীবনে তিনটে বিদেশী ফার্ম দেখলুম, বুঝলে···সব শালার এক-রা···বিচ্ছু··· !"

"পাবলিক সেক্টারের কথা ভেবেছেন···ওখানে ওপনিং··· ?"

"ভেবেছি ব্রাদার ভেবেছি—নেক্সট জানুয়ারী পর্যন্ত দেখব···হয় সেলস ম্যানেজার হচ্ছি, or I quit।"

"হিন্ট দিয়েছেন ?"

"পরিষ্কার", ধর সিগারেট এগিয়ে দিলেন। মুচকি হেসে বললেন, "এখন ভাবনা চিবোক দুমাস।"

সিগারেট ধরাল দুজনেই, ধর লাইটার এগিয়ে দিলেন। নিজে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, "যাক ও কথা। তুমি ফ্ল্যাটটা পাবে দারুণ··· ম্যাগনিফিসেন্ট ভিউ ওখানে···।"

"কিন্তু ফ্যামিলির সংজ্ঞাটা···।"

ধর হাত উঁচু করে বাধা দিলেন, বললেন "শুয়োরের বাচ্চা।" মুখটা আরো এগিয়ে এনে গলা নিচু করে উনি যোগ দিলেন "এদের বাচ্চা শুয়োর বলাও ভুল।"

কথা শুনে, ওঁর ভঙ্গীতে, নির্মল হো হো করে হেসে উঠল, মনটা হাল্কা লাগল। ধরও হাসলেন ওঁর স্বভাবসিদ্ধ খোলামেলা আনন্দে। তারপর নির্মলের কাঁধে এক চাপড় বসিয়ে, যাবার মুখে বললেন,

"Another thing···বটব্যাল ব্যাটা যে হড়কাল, তুমি রেস জিতলে, এটাই আমার পুলক !"

নির্মল কিছু বলতে পারল না, হঠাৎ তার আচমকা কোথায় যেন বাঁধল। ধর অবশ্যই ওর উত্তরের ধারও ধারেন নি। হাসিটি মুখে নিয়ে নিজের খেয়ালেই বেরিয়ে গেছিলেন। যাওয়ার ভঙ্গীতে সেই সাবলীল নিশ্চিতি, হাল্কাভাব।

নির্মলের মনটা কিন্তু আবার ভার হয়ে এল। ধর সাহেব যাবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরটা শ্লথ লাগল, অবসাদে ভারাক্রান্ত। মনের চাপা অস্বস্তিটা চক্রাকারে তলায় তলায় ভেসে উঠল। প্রথমে ভেবেছিল কম্পানির ফ্ল্যাটে না গেলেও চলবে, কিংবা তেমন তাড়া নেই। আগের এম. ডি. গীল প্যাট্রিক অন্তত বর্মণকে এ নিয়ম থেকে ছাড় দিয়েছিলেন। পরে শুনল তখন নাকি কম্পানির ফ্ল্যাটই ছিল কম। তাছাড়া, রায় বলেছিল, হালের বাঘ এই হুঁতকো রাঙামূলো আর সিলভারস্টোন, সিলভার না হোক স্টোন তো বটেই। সিধে সাউথ অ্যাফ্রিকা থেকে নাকি এসেছে।

কম্পানির ফ্ল্যাটে যেতে এমনি কারুরই আপত্তি নেই, আপত্তি পরিবারের সংজ্ঞায়। ফ্যামিলি নাকি শুধু স্বামী-স্ত্রী ও অ্যাণ্ডা বাচ্চা; অন্যরা বানের জলে ভেসে এসেছে। কম্পানির ফ্ল্যাটে তাদের স্থান নেই।

মন ভার নিয়েই নির্মল ফোন করেছিল চিত্রাকে। অথবা ঠিক তাও না, তখন উত্তেজনাই ছিল বেশি। ফোনে কথা কয়েই মনটা যেন মুষড়ে গেল। প্রডাক্ট ম্যানেজারির কথা শুনেই চিত্রা উচ্ছ্বসিত হয়েছিল; তখুনি অন্য সংবাদ নির্মল দিতে পারে নি। চিত্রা পুলকের তোড়ে সে-সুযোগই দেয় নি, কথার স্রোতেই লেঙ্গি দিয়েছিল মিসেস বটব্যালকে। তার কথার ঈষৎ ছেদ পড়লে তবেই নির্মল বলছিল, "কিন্তু একটা গোলমাল হয়েছে।"

"গোলমাল?"

"হ্যাঁ, আমাদের কম্পানির ফ্ল্যাটে যেতে হবে।"

"আমাদের মানে?"

"তুকি-আমি-দোদো···

"বাবারা?"

"যেমন আছেন···আলাদা আলাদা থাকা···।"

"সে কী!"

চিত্রার কী-ই-ই-টা টানা প্রতিবাদের মতো শুনিয়েছিল। তারপর আর ওরা কথা চালাতে পারে নি। নির্মল "পরে কথা হবে" বলে শেষে টেলিফোন রেখে দিয়েছিল।

সেন ঢুকেছিল সেই সময়। সব শুনে বলেছিল, "So what? চিন্তার কি আছে...এ ফ্ল্যাট তো তোমার ভ্রাতা রাখছেই...হেল্প হিম।"

"সেটা সমস্যা নয়।"

"তবে?"

"বাবা আমাদের আট-নয় বছর থেকে মানুষ করেছেন...ছেলেবেলাই মা মারা যান।"

"উনি নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বুঝবেন...I tell you Nirmal...গোড়ায় একটু মন খচখচ করলেও, পরে ব্যবস্থাটা ভালোই লাগে। I mean নিঝ'ঞ্ঝাট, নিজের মতো থাকা...।"

সেন যতক্ষণ কথা বলল নির্মল স্থির ওর চোখের মধ্যে তাকিয়ে ছিল, তারপর এক পলক থেমে বলেছিল, "তুমি তাহলে এ নিয়মটা অর্থহীন, স্টুপিড মনে করো না?"

"Not at all...আমি স্টেটসে ইউরোপে দেখেছি...।"

"আমি এ-দেশের কথা বলছিলুম!"

নির্মলের অচঞ্চল চাউনি আর গলার স্বর হঠাৎ সেনকে স্তব্ধ করে দেয়। এক নিমেষ কিংবা তারও অল্প সেনের মুখ অভিব্যক্তিহীন, নির্দাগ দেখায়। ঈষৎ শক্তও। তারপর একটা চাপা হাসির আভা তার চোখে ছড়িয়ে পড়ে, সে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, "Anyway, প্রবলেমটা ভাই ব্যক্তিগত...আশা করি কিছু মনে করোনি?"

"কী আশ্চর্য—না না!"

"আর।" সেন এবার দরজার দিকে যেতে যেতে থমকাল এক পলক, চোখের চাপা হাসিটা মুখে ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল, "National chauvinism আমায় টানে না...honestly!"

সেন বেরিয়ে যাওয়ার পরও কেবিনের দরজার দিকে নির্মলের দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল। প্রথমে তার চাউনিতে ছিল বোধের আভা; কয়েক নিমেষ বন্ধ দরজাটার পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কিন্তু সে-দৃষ্টি হয়ে এল ছায়াচ্ছন্ন, অন্যমনা। আত্মগতভাবেই সে একটা সিগারেট ধরাল, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পেন্সিল হাতে নিল। নোটপ্যাডে, অন্যমনস্ক, সিগারেট চাপা আঙুলের চেটো কপালে ঠেকিয়ে আঁকিবুকি কাটতে লাগল। কিম্ভূতকিমাকার নারীর ও মুখ হল একটা, কিংবা তার অপটু আভাস মাত্র। শেষে, প্যাডের একেবারে তলায়

লিখল : রাধা রাধা রাধা

না একেবারে গাধা ?

লেখাটা দেখে হঠাৎ ওর মুখে হাসি এল। তারপর ঘড়ি দেখল সে। এবং অবশেষে উঠে পড়ে পোর্টফোলিও সাজাল চাপা শিষ দিতে দিতে। সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে চেপে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে, দরজাটা ঠেলে দিতেই শুনতে পেল দোদোর মিহি চীৎকার, "বাবা-বাবা···বাবা এসছে।"

ছুটে এল ছেলে। মুখ লাল ও ঘর্মাক্ত, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, বলল, "আমায় দাও আমায় দাও।"

পোর্টফোলিও ওর হাতে এগিয়ে দিয়ে নির্মল বলল, "কোথায় গেছিলে ?"

"পার্কে···ওই দাদুভাই।··· হেরো···হেরে গেছে !"

নির্মল ফিরে দেখল অদূরে বৃদ্ধ সৌম্য নীলরতনবাবু। পরণে খাদি ধুতি, লম্বা কোর্ট ও জামা, পায়ে চটি। আশৈশব যে পোষাকে নির্মল দেখে আসছে বাবাকে। দোদো তখনও চ্যাচাচ্ছে, "হেরে গেছে হেরে গেছে, এ-মা !"

"তুমি যে অলিম্পিকের রানার, বাবা।" নীলরতনবাবু বলেন।

"অলিম্পিক কি ?"

"মস্ত রেস···বিরাট।"

"রানার ?"

"রেসে যারা দৌড়োয়···তুমি।"

নির্মল তাড়া দিল এবার, "নে চল।" হেসে বলল, "পোর্টফোলিওর ভারে তো বেঁকে গেছিস।"

"ধেৎ !" বেঁকেবেঁকেই বোঝা হাতে ঢুকে গেল দোদো। তার ছ-বছরের দৈর্ঘ্যে পোর্টফোলিওটা থেকে থেকে মেঝেতে ঘষে যায়। নীলরতনবাবু ছেলের দিকে চাইলেন, বললেন, "কি হল আজ ?"

পাশাপাশি বাড়ির ভিতর যেতে যেতে নির্মল বলল, "আমারই হল··· ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিসনের প্রডাক্ট ম্যানেজার।"

"যাক···তোমাদের টেনশান কাটল।"

"কিন্তু বাড়িছাড়া করে···senseless !"

নীলরতনবাবু হঠাৎ ল্যাণ্ডিংটায় দাঁড়িয়ে পড়লেন, নির্মলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তার মানে ?"

"কম্পানির ফ্ল্যাটে যেতে হবে···ওদের আবার ফ্যামিলির সংজ্ঞা··· ।"

কথাটা নির্মল শেষ করার আগে থেমে গেল। বাবার মুখে দেখল অধরা হাসির আভাস, চোখে কৌতুক কিংবা প্রচ্ছন্ন শ্লেষ। দরজার দিকে পা ফেলে উনি শুধু বললেন, "এখনো সেই সাম্রাজ্যের কেতা চালিয়ে যাচ্ছে!"

"স্বচ্ছন্দে··· ।"

"তোমরা করো কি?"

"আমাদের কেউ কেউ এতে খুশীও ।"

উনি জবাবে কিছু বললেন না, মুখে শুধু এক নৈর্ব্যক্তিক হাসি ফুটল। নানান অভিজ্ঞানে যা আর আশাভঙ্গের আভাসও নয়, এক রকম নির্বিকার ঔদাসীন্যই। উপেক্ষা ঠিক নয়, কিন্তু যা দেখছেন যা ভাববেন নি সে সব কিছু শুধু স্বীয়ব্যক্তিত্বে বর্জন করা। এই ব্যক্তিত্বের জোরেই উনি চার বছরের নির্মলের মাথায় হাত বুলিয়ে ঋজু মহিমায় পুলিশের গাড়িতে উঠে গেছিলেন উনিশ শ বিয়াল্লিশে, শেষবার। তার আগে তো নির্মল জন্মায় নি, ঠাকুমার মুখে কেবল গল্প শুনেছে।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই নির্মল টাইটা খুলে ফেলেছিল। চিত্রা ছিল বোধহয় ওদের খাবার আয়োজনে। পিছনে পিছনে ঢুকল সে। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বলল, "তোমার টেলিফোনের কথা কিন্তু বাবাকে বলিনি।"

"আমি বলেছি।"

"কখন?"

"এই-ই···দরজার গোড়ায়।"

চিত্রা এখুনি কোন কথা পেল না বলার, স্বতই মুখে যে প্রশ্নটা এসেছিল তার, স্বামীর চেহারা নজরে পড়ায় তা গুলিয়ে গেল। বলল, "তোমার কি শরীর খারাপ?"

"না।"

নির্মল জুতো খোলার জন্যে চেয়ারে গিয়ে বসল।

চিত্রা বলল, "আমি খুলছি।"

ততক্ষণে ফিতের ফাঁস খুলছে নির্মল, বলল, "কি দরকার··· ।"

চিত্রাই কিন্তু কাজটা সারল, সামনে বসে অন্য পায়ের জুতো খুলতে খুলতে, আবহাওয়াটা হাল্কা করার প্রয়াসে বলল, "বাবা, বস বলে কথা!"

"বস হল আর সিলভারস্টোন, আমরা চাকর।"

"ও হতভাগা চুলোয় যাক।"

এবার নির্মলের মুখে হাসি এল। চিত্রা জুতো নিয়ে সরলে সে উঠে কোণায় গিয়ে চটি পায়ে গলায়। চিত্রা ওর কোটটা খোলায় সাহায্য করে, সেটা নিয়ে হ্যাঙ্গারে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করে, "বাবা কি বললেন?"

"বলবেন আর কি···।"

"কিছুই না?"

"অবাক হলেন বোধহয়।"

"অবাক?"

"আজো এই কলোনিয়াল নিয়ম কানুন··· !"

"সত্যি, বেচারী···ভাবো দিকি···এখন দোদোই ওর অবলম্বন···দিন রাত দাদুভাই আর দাদাভাই···ও না থাকলে যে···।"

খুট করে লাগোয়া বাথরুমের দরজার আওয়াজ হল। চিত্রা ফিরে দেখে নির্মল দরজা দিয়েছে। হয়তো তার শেষ কথাগুলো শোনেই নি। তার নিজের মনও কেমন ভার হয়ে আসে। দুপুরে, অফিস থেকে নির্মলের ফোন পাওয়ার পর, ঠিক এমনটা হয় নি। খারাপ-ভালোয় মিশে গেছিল অনুভূতি; বরং ভালোটাই ছাপিয়ে ছিল মনের চাঞ্চল্য। বটব্যাল ওকে, আর মিসেস তাকে অনেককাল জ্বালিয়েছে। তবু মিছরির ছুরি সদৃশ হাসি সহ বটব্যালকে যদি বা সহ্য হয়, অন্তত সৌজন্যের স্তরে; মিসেসকে চিত্রার অসহ্য। এ-হেন উচ্চকণ্ঠী, বাক্‌বহুল, কর্মহীন মহিলা সচরাচর চোখে পড়ে না; এবং সে জন্যেই সম্ভবত দুপুরে চিত্রার আত্মপ্রসাদের উপলব্ধিই ছিল প্রখর। এখন নির্মলের মুখ দেখে বিচ্ছিন্ন কথায়, পরিবেশের চাপা ভারে, অকস্মাৎ দোদোর মুখ মনে আসে। তার উদাত্ত "দাদুভাই" ডাক কানে আসে না বটে, কিন্তু হঠাৎ সেই দীপ্র অবয়ব জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো চৈতন্যে ঝলসে যায়।

রাত্রে, খাবার টেবিলেও পরিবেশটা থমথমে থাকে। দোদোর পাট সারা, সে আপন মনে একাগ্র অভিনিবেশে, জিভের আগাটুকু বের করে, পাশের ঘরে ছবি আঁকছে। কমল, ইকনমিক্সের অধ্যাপক, নির্মলের ভাই, খেতে খেতে দু-একবার অন্য প্রসঙ্গ পেড়েছিল, কিন্তু আলাপ এগোয় নি। সে এমনিতেই প্রাণখোলা, হাস্যময়, জীবন্ত; তার বোধহয় দম বন্ধ হয়ে আসছিল এই রুদ্ধ পরিবেশে। হঠাৎ সে নির্মলের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই এতো ভাবছিস কেন?"

"না ভাবব আর কি।"

"বলরাম বৌদির থেকে ভালো রান্না করে," কমল চোখ টিপে বলল, "কি করে না ?"

চিত্রা হাসে, বলে, "তা করে।"

"তবে, বাবার-আমার কোনো অসুবিধে হবে না।"

"না না অসুবিধে কি ?" নীলরতনবাবু চোখ তুললেন, বললেন, "তাছাড়া ফ্ল্যাটও কাছে···এইট-বি রুটের ওপরই।"

"আপনার জন্যে গাড়ি পাঠাব।" চিত্রা বলল।

"মিছিমিছি," নীলরতনবাবু রুটি মুখে দিয়ে বললেন, "আমি টাইম ধরে যাব-আসব নাকি··· ?"

"না তা না···বলছি ভিড়টিড়ে···গাড়ি থাকলেই আসবে।"

"ওটা কোনো প্রবলেমই নয়।" নির্মল খেতে খেতে, মুখ নিচু রেখেই বলল।

"কোনোটাই প্রবলেম না", কমল বলল, "তোকে তো ট্রানস্ফারও করতে পারত !"

"নিশ্চয়ই।"

"তবে ?"

"এ নিয়মটাই অর্থহীন···হিউমিলিয়েটিং···।"

"নিও-কলোনিয়ালিজিমের নানা চেহারা", কমল জলের গেলাস টেবিলে নামিয়ে কথা শেষ করল, "এও একটা ফ্যাসেট।"

"তোদের ইকনমিক্সের কথাগুলো সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

"শুধু ইক্‌নমিক্স বলিসনে, ইতিহাস, সোশিওলজি, জার্নালিজম···সবেতেই···।"

"জীবনেরই আষ্টেপৃষ্ঠে গেঁথে আছে," হঠাৎ নীলরতনবাবু বললেন, "বইয়ে তো থাকবেই···।"

কথা আচমকা বন্ধ হয়ে গেল। এমন কি কমলও তৎক্ষণাৎ কিছু বলতে পারল না। বাবার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামাল। মনোযোগ সহ খেতে থাকল। চিত্রা নীরবে শ্বশুরকে ক্যাসটার্ড-এর পাত্রটা এগিয়ে দিল। কাঁচের প্লেটে রাখা, পাশে চামচ।

কমল এবার হঠাৎ বলল, "এটাই জাতীয় আন্দোলনের ব্যর্থতা ··।"

"তোদের না ?" নীলরতনবাবু সোজা ছেলের দিকে তাকালেন, তাঁর নরম দৃষ্টি অপলক, বললেন, "আমরা এটা ঠিক বুঝিনি।"

কমল অকস্মাৎ অগোছালো হয়ে গেল, শুধু ভিতরে ভিতরে নয়, বাহ্যতও। সে চোখ নামিয়ে ক্ষীণ হাসার চেষ্টা করল কেবল। কিন্তু একেবারে সিঁটিয়ে গেল নির্মল এবং তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে এল। নুনের জায়গাটা তার কনুই-এ লেগে টেবিলে উল্টে পড়ে।

ঠিক তখুনি ঝড়ের বেগে ঢুকল দোদো, উর্ধ্ব হাতে পতাকার মতো সাদা কাগজ, কণ্ঠে চীৎকার, "দ্যাখো দ্যাখো দ্যাখো!"

কমল হেসে ফেলল, হাত বাড়িয়ে বলল, "দেখি?"

"না তুমি না···দাদু ভাই।"

"আমি আগে।"

"ককখনো না,...দাদুভাই।"

"বাঃ···খুব ভালো।" নীলরতনবাবু তাড়াতাড়ি বললেন।

"না দেখেই বলছ তুমি...ওদিকে না এদিকে... ।"

"এই তো···হল?"

"এইটা এই··· ।"

"এবার, ঠিক দেখছি?"

"হ্যাঁ···আমাদের নতুন বাড়ি··· ।"

"সুন্দর, সুন্দর এঁকেছ দাদাভাই···দেখি একটা টুকি দি।"

দুপায়ের আঙুলে অল্প উঁচু হয়ে দোদো ঠাকুর্দার পানে নিজের গাল এগিয়ে দেয়, বলে, "কাকাকে দেখাব না।"

কমল বলল, "বয়ে গ্যালো···ও বাড়িতে দাদুভাই-আমি কেউই যাব না।"

"হ্যাঁ যাবে···দাদুভাই যাবে।"

"বল্লেই হল!"

'যাবে যাবে যাবে···তুই যাবি না ·· ।"

"বোকা ক্ষেপেছে রে!"

"লাথি মারব... ।"

"ফের!" চিত্রা ধমকে উঠল।

"কাকাটা বজ্জাত...শালা!"

"ছিঃ!"

কমল হাসতে থাকে, মুখ বাঁকায়, বলে, "দাদুভাই আমার বাবা...আমরা বাপে-পোয়ে থাকব এখানে।"

"তুই থাক্‌…কামড়ে দেবো কিন্তু… !"

"জিজ্ঞেস কর না—হুঁতকো সাহেব নো করে দিয়েছে।"

"ওকে ঘুঁসি মারব…।"

বড়রা হেসে ফেলে। নীলরতনবাবু এবার বলেন, "কি হচ্ছে কমল !" নাতিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে যোগ দেন, "দাদাভাই বড্ড চটে যাচ্ছে !"

দোদো কেমন থমকে যায়। সস্নেহ আবেষ্টনে তার উচ্ছ্বসিত রাগ শুধু মুখে গনগন করে। কিন্তু বাক্য সরে না, অনুকম্পার ছোঁয়ায় অকস্মাৎ তার মন বিস্রস্ত হয়ে পড়ে। তপ্ত মুখে সে দাদুর দিকে তাকায়, দুচোখ চক চক করে, জড়িত গলায় বলে, "সত্যি তুমি যাবে না ?"

"কেউ তো এখনো যায় নি বাবা।"

কমল ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়। হাত ধুতে উঠতে উঠতে বলে, "আমার ঘরে একটা জিনিস আছে…কে নেবে ?"

দোদো তাকাল কিন্তু নড়ল না। জমাট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দাদুকে সেঁটে। উনি ফিস ফিস করে বললেন, "ছাখো গিয়ে দাদাভাই।"

"মিথ্যে কথা।"

"সত্যি বলছি" বেসিনে হাত ধুতে ধুতে কমল বলল, "দেখে যা।"

দোদো নীলরতনবাবুর পানে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, "সত্যি বলছে ?"

"হ্যাঁ ভাই, সত্যি।"

"তুমি দেখেছ ?"

নীলরতনবাবুর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন, হাসিমুখ ওর কানের কাছে নামিয়ে এনে কি বললেন। অমনি দোদোর মুখ ঝলমল করে উঠল, বলল, "ঠিক ?"

"এক্কেবারে।"

দোদো সঙ্গে সঙ্গে "পিস্তল-পিস্তল, পিস্তল কৈ" চীৎকারে দৌড়ুল কাকার ঘরের দিকে। এঁরাও উঠলেন।

শুতে যাবার আগেই বিদ্যুৎ গেল। দোদো ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত ছেলের জামা খুলে দিল চিত্রা। গেঞ্জি গায়ে থাক ; মাঝে মাঝে হাওয়া করতে হবে। অবশ্য এতো রাতে বেশিক্ষণ বিদ্যুৎ যায় না। ওর 'কট'টা চিত্রার খাটের সঙ্গে লাগানো ; আগে উঠে চেঞ্জ করতে হত প্রায়ই, বিছানা

ভেজাত। এখন শীতকালেই মুস্কিল, গায়ে কম্বল রাখে না; লাথি মেরে সরিয়ে দেয়।

দরজা বন্ধ, দক্ষিণের জানলা দুটো খোলা। জানলা পেরিয়েই খোলা পার্ক। গুমোট না থাকলে হাওয়া আসে। চিত্রা নিজেও জামা কাপড় ছাড়ল, পরল পাতলা হাল্কা গোলাপী নাইটি। ভিতরে তার ফর্সা গায়েও ফিকে আভা ছড়িয়ে পড়ে। বিছানায় উঠতে উঠতে বলল, "তুমি এখন পড়বে?"

বেড ল্যাম্পটা জ্বেলে নির্মল খাটে উঁচু হয়ে এলিয়ে পত্রিকা ওল্টাচ্ছিল; খালি গা, স্লিপিং স্যুটের পাজামাটা শুধু পরণে। সে একবার তাকায়, বলে, "চোখে আলো লাগছে?"

"না তেমন না", চিত্রা উঠে বসল, ব্রা-টা খুলতে খুলতে বলল, "বেশ গরম··· কখন আবার পাখা আসে!"

ওর নম্র, ঈষৎ ঢালু স্তনের আভাস স্পষ্ট চোখে পড়ল; কিন্তু নির্মলের দৃষ্টি অন্যমনস্ক। চিত্রা ব্রা বালিশের তলায় গুঁজে শোবার আগেই সে পত্রিকায় চোখ ফেরায়। চিত্রা বলল, "যাই বলো, এ-ঘরটা মিস করব।"

"হুঁ।"

"ও-ফ্ল্যাটটা এমনিতে ভালো···তাই না?"

"চমৎকার।"

চিত্রা এক মুহূর্ত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর গুছিয়ে শুতে শুতে বলল, "মিছিমিছি পড়ার চেষ্টা করছ···!"

নির্মল কিছু বলল না। কাগজটা রেখে দিল মাথার দিকের টেবিলে। জলের গেলাস তুলে জল খেল। অতঃপর আলো নিভিয়ে সেও শুয়ে পড়ে। চিৎ হয়ে থাকে মাথার পিছনে একটা হাত রেখে। চিত্রা ঘেঁষে আসে, এক হাতে ওর বুকটা বেষ্টন করে বলে, "আর চিন্তা না···ঘুমোও।"

"হুঁ।"

"ভালোভাবে শোও দিকি···।"

নির্মল ঈষৎ হড়কে এসে পাশ ফিরল। চিত্রার নিশ্বাস ওর নাকের কাছে লাগে; ও মাথা আর একটু উঁচু করে। গলার কাছে চিত্রার মুখটা আসে, সে মুখ গুঁজে দেয়। ওর শ্বাস-প্রশ্বাস নির্মলের গলার তলায়, বুকের ওপর পড়ে। নির্মল এক হাত ওর বালিশের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য হাতে স্ত্রীকে জড়ায়। চিত্রার মাথায় আলতো চুমু খায়; চিত্রাও তাকে সাপটে থাকে। সেই

আবেষ্টনের আড়ালেই কখন ঘুমিয়ে পড়ে চিত্রা। মানসিক উৎকণ্ঠা তাকে অচিরে কাবু করে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না, হঠাৎ তার ঘুম চোট পেল। প্রথমটা কিসে ঠিক ঘুম টুটল টের পায় নি, পরে বুঝল নির্মল সিগারেট ধরিয়েছে। সম্ভবত দেশলাইয়ের আলো ও আওয়াজেই তার ঘুম ভাঙে। জেগে সে গোড়ায় নিশ্চুপই শুয়ে ছিল। দেখল নির্মল একমনে সিগারেট টেনে যাচ্ছে, এবং, পাছে তার অসুবিধে হয় তাই ও-পাশ ফিরে আলোর আভাটুকু হাতের তালুর আড়ালে রেখেছে। কয়েক মুহূর্ত পর, আস্তে আস্তে চিত্রা স্বামীর মাথায় বিলি কাটতে শুরু করে। নির্মল ক্ষণকাল ও-পাশ ফিরেই নীরবে সিগারেট খায়। এক পলক শুধু স্তব্ধ হয়েছিল সে, যখন চিত্রা ওর মাথায় হাত দিল প্রথম। শেষে কনুইয়ের ভরে অল্প উঁচু হয়ে সিগারেটটা ছাইদানিতে ঘষে রাখতে রাখতে বলল, "Sorry···ঘুম ভেঙে গেল?"

"তুমি তো জেগেই আছ।"

"ঘুম আসছে না।"

নির্মল পাশ ফিরল, আর চিত্রা ওর ঘাড়টা টানল কাছে। নির্মল রাস্তার আলোর আবছায়ায় স্ত্রীর শুভ্র গ্রীবায় আলতো আঙুল বোলাল; আঙুল টেনে টেনে আনল ওর কানের কলির কাছে। তখনই হঠাৎ চিত্রা ওর মুখ নামিয়ে নিয়ে চুমু খেতে লাগল। তার ঠোঁট দুটো যত আল্গা হতে থাকল, ততোই ধীরে নির্মলের জিভ ঢুকে যেতে থাকল তার মুখে। শেষে, বদ্ধনিশ্বাস দুজনের দাঁতে দাঁত ঠেকে গেল। আর শ্বাসরুদ্ধ আবেগেই নির্মলের হাত ওর নাইটির টিপকল খুলে নগ্ন স্তন নিল মুঠোয়। এবং সেই ঘনিষ্ঠ, প্রতপ্ত আশ্লেষে ওরা ক্ষণকালেই অভিন্ন, একাকার হয়ে যায়।

শনিবার ওদের মালপত্র চলে গেল আগে। মালও তেমন কিছু নয়, ভারী জিনিস প্রায় নিতেই হয় নি। সবই যেমন এখানে সাজানো ছিল তাই রইল। দেখে বোঝাই যায় না ওরা অন্যত্র চলেছে। এ-বাড়ির নিজস্ব শ্রী প্রায় অটুট, জিনিসপত্র টানা-হ্যাঁচড়ানোর কোনো চিহ্ন নেই। ও-ফ্ল্যাটে ফ্রিজ থেকে ফার্নিচার সবই কম্পানির।

কমল হেসে বলেছিল, "জামাকাপড়ও দিলে পারত!"

চিত্রা বলে, "কিছু বাসন-কোসনও।"

"উনুন আছে তো ?"

"গ্যাস··· ।"

"দিব্যি আছ তোমরা, সত্যি !"

"শুধু ভালোটাই দেখলে···এদিকে যে·· ।"

চিত্রা কথা শেষ করার আগেই ঘরে এল নির্মল। রওনা দেওয়ার জন্যে তৈরি। স্ত্রীকে বলল, "তোমার কদ্দূর ?"

"হয়ে গেছে···গাড়ি এল ?"

"আসছে।" ভাইয়ের দিকে তাকায় নির্মল। বলে, "এদিকে একটু খেয়াল রাখিস।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ···তুই অত ভাবিস না তো !"

"বাবা বড্ড একা হয়ে গেলেন।"

"রোজই তো যাবেন ওখানে।"

"তবু তুমি এবার বিয়ে করো" চিত্রা বলল, "ওঁর একটা···।"

"বিয়ে তো আমায় করতে বলছ !"

"আজ্ঞে !' চিত্রা বলে, "বড্ড চালাক হয়েছ !"

কমল হেসে উঠল। বাইরে গাড়ির হর্ণ বাজে।

নির্মল বলল, "এবার ছেলেকে সামলাও।"

"কী করি বলো তো" চিত্রার গলা অসহায় শোনায়। বলে, "ও তো দাদু ভাইয়ের জিনিস গোছাচ্ছে।···ওঁর ঘরেই।"

"ভ্যাখো না গিয়ে !"

"এই দেখে এসছি।"

"আঃ !" নির্মল হঠাৎ তিক্ত হয়ে ওঠে।

"দাঁড়াও দাঁড়াও" কমল বলে, "তোমাদের না যাওয়াই ভালো···আমি দেখি।"

কমল বেরিয়ে গেলে নির্মল একটা সিগারেট ধরায়, আঙুলটা ঈষৎ কাঁপে তার। সিগারেটে দু-একটা টান দিয়ে সে বলে, "কমল ওকে সরাতে পারলে তুমি প্রণামটা সেরে নিও।"

"তুমি যাবে না ?"

"আমি এই ঘুরে এলুম।"

"উনি বোধহয় বাইরে আসবেন না

"না, দোদো আছে যে।"

ঠিক তখুনি করিডোরে দোদোর উত্তেজিত কলকণ্ঠ পাওয়া গেল। সে নৃত্য করতে করতে আসছে আর বলছে, "এ-মা, কাকা রেডি নেই রেডি নেই, যাবে না যাবে না !"

ওরা দরজার গোড়ায় এসে দেখল কাকার হাত ধরেই, উজ্জ্বল মুখে দোদো এগোচ্ছে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে বাবা-মাকে বলল সে, "শিগগির চলো··· কাকা রেডি হয়ে যাবে যে !'

কমল চোখের ইসারা করল হাসি চেপে। নির্মল বলল, "হ্যাঁ, গাড়িতে গিয়ে বোসো তুমি, আমরা আসছি।"

দোদো ওদের পেরিয়ে গেলে ওরা নীলরতন বাবুর কাছে বিদায় নিতে এল। উনি বললেন, "তোমরা আর দেরি কোরো না, এগোও।"

"আপনার জন্যে বিকেলে গাড়ি আসবে···।" চিত্রা প্রণাম করতে করতে বলল। তার মন ভার হয়ে এসেছে। উনি মাথায় হাত ছোঁয়ালেন, বললেন, "আমার জন্যে ভেবো না।"

"বলরামকে সব বলেছি···কমলও দেখবে।" চিত্রা ওঁর দৃষ্টি এড়িয়ে বলে।

"তুমি দাদাভাইয়ের দিকে নজর রেখো।"

"আপনি রাত্রে ওখানেই খাবেন।"

"এবার এসো তোমরা···এখুনি ছেলে ছুটে আসবে।"

চিত্রা মুখ ঘোরাল। আর তাকাতে পারল না ওঁর দিকে। বাষ্পাকুল নয়নে দ্রুত গাড়ির কাছে চলে এল। তখন সব ঝাপসা। কারুর মুখই তার কাছে স্পষ্ট নয়। শুধু বুঝল ড্রাইভারের পাশে বসেছে দোদো ; আর বাইরে, পিছনের সীটের দরজার কাছে ভুভাই কথা বলছে। ও এগিয়ে এলে কমল দরজা খুলে দাঁড়াল, বলল, "দেখো, সামলে বৌদি···।"

বসতে গিয়ে চিত্রা একটু হোঁচট খেয়েছিল,—কিন্তু কমলের কথার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভিতরটা হঠাৎ উথলে উঠল। চাপা কান্না আচমকা মুখ চোখ কাঁপিয়ে থরথরিয়ে বোবা গোঙানিতে ভেঙে পড়ল। আর নির্মল গাড়িতে ঢোকার আগেই, অকস্মাৎ সচকিত দোদো চীৎকার করে উঠল, "দাদুভাই কৈ, দাদুভাই ?"

নির্মল তখন প্রায় লাফিয়ে ঢুকল। ড্রাইভারও তৎক্ষণাৎ স্টার্ট দেয়, কিন্তু চক্ষের নিমেষে দোদো দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ে। তারস্বরে ডাকে, "দাদুভাই, এসো দাদুভাই··· ।"

তার কণ্ঠে শঙ্কা ও আর্তি। সে দাঁড়াল না। কেউ হাত বাড়ানোর আগেই দোদো বাড়ির ভিতরে দৌড়ুলো, চ্যাঁচাতে থাকল, "দাতুভাই গাড়ি যাচ্ছে গো…।"

ও ভিতরে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্মলের মুখ গুটিয়ে গেল। দেখতে দেখতে শক্ত, চাপা। গাঢ় গলায় সে বলল, "যা, ধরে আন তো কমল…জোরে থাপ্পড় লাগাবি একটা।"

কমল সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ুল। নির্মল সিধে তাকিয়ে রইল বাইরে। বাড়ির ভিতর থেকে কচি গলার রোষ, চীৎকার এবং শেষে কান্না তার কানে আসে। শুনতে শুনতে সামনে তাকিয়ে থাকা নির্মলের চাউনি আবছা হয়ে যায়। প্রথমে সব কিছু লাগে অস্পষ্ট, পরে তার অপলক দৃষ্টি কেঁপে উঠল। সে তখন চশমা খোলে চোখ থেকে, রুমালে কাঁচ মোছে।

ঠিক সে সময়ই নীলরতনবাবু বেরোলেন। একহাতে একটা ছোটো পুঁটলি, অন্য হাত ধরে এগোচ্ছে দোদো। দোদোর চোখ সজল, নাকের ডগা লাল, গালে অশ্রুর দাগ; কিন্তু মুখে লেগে আছে অনিন্দ্য, সলাজ, সঙ্গোপন হাসির রেশ।

ড্রাইভারের পাশে দোদোকে উনি তুলে দিলেন, তার ছোট্ট কোলের ওপর রাখলেন তাঁর হাতের পুঁটুলি, আজেবাজে কাগজে-কাপড়ে ভর্তি। অতঃপর গলা নামিয়ে সতর্ক ভঙ্গীতে বললেন, "দেখো, এটা কিন্তু তোমার কাছেই রাখবে!"

"মাকে বলব?"

"না না, মা-বাবা কাউকে না…আমাদের গোপন কথা…। বিকেলে যাব।"

"আস্তে!" দোদো ফিসফিস করে বলল, "কাকা শুনতে পাবে!"

"ইস!" নীলরতনবাবু নিজের ঠোঁটে আঙুল চাপালেন। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছাড়ল, দোদো হঠাৎ ঝাঁকুনিতে দুলে উঠে ছোট্ট পুঁটলিটা জোরে জাপ্টে ধরে, চীৎকার করে বলে, "টা-টা দাতুভাই…।"

"টা-টা।"

গাড়িটা মোড় ঘুরল, নীলরতনবাবু শেষ পর্যন্ত হাত নাড়লেন। তারপর মন্থর পায়ে ঢুকলেন বাড়ির ভিতরে। নৈঃশব্দ্য যেন মুচড়ে উঠল। দরজা বন্ধ করে এক পলক উনি দাঁড়ালেন, ডুবে গেলেন নিঃসাড় স্তব্ধতার মধ্যে। তারপর হঠাৎ তাঁর কানে ঝনঝন করে উঠল দোদোর নিম্নকণ্ঠ, "সত্যি, কাকা ঘুমোলেই পালিয়ে আসবে?"

উপন্যাস পাঠের প্রস্তুতি

গোপাল হালদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঐতিহাসিক রোমান্সের পর্ব : স্কট

'শিল্প বিপ্লব' (Industrial Revolution 1761-1815) ইংলণ্ডে মধ্যবিত্ত বণিকের স্থলে প্রধান করে তুলল কলকারখানার মালিকদের—গ্রামের কৃষকদের উৎখাত করে পাঠাল শহরে কলকারখানার মজুর হতে। ভারতবর্ষেও শাসন ও শোষণের ঔপনিবেশিক ক্ষেত্র এ সময়েই বিস্তৃত হয়। অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লবের ও নেপোলিয়নীয় যুগের প্রবল আঘাতে কালটা সাহিত্য-মনের মুক্তির, স্বপ্নোল্লাস ও স্বপ্নভঙ্গ—দুয়েরই কাল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটস ও বায়রনের যুগ। বায়রনই সমস্ত ইয়োরোপের প্রেরণা—উদ্দাম মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আমাদের দেশে সাহিত্যে ইংরাজী সাহিত্যের ঘাত-প্রতিঘাত এসে পড়ে কিছু পরে, ১৮৩০-এর দিকে। বায়রন কবিতায় কিছু উন্মাদনা জাগিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব আচ্ছন্ন হয়ে যায় আত্মমুখিতায় (subjectivism—বিহারীলাল)। কিন্তু স্কটের (Sir Walter Scott) ঐতিহাসিক উপন্যাসই বাঙালী গদ্য-স্রষ্টাদের হৃদয়-মন কেড়ে নিলে। স্কটের 'ওয়েভার্লি' (Waverley) নভেলসমূহ একদিকে ঐতিহাসিক রোমান্স, অতীতের রোমান্স রসে তা উদ্বুদ্ধ, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনালেখ্য হিসাবে তা আবার কতকটা বাস্তবতা-সচেতন—ঐতিহাসিক রোমান্স কিন্তু নিছক রোমান্স নয়—সাধারণ জীবনকেও দেখে। আমরা দেখেছি ইংরাজী নভেলের মুখ্য ধারা বস্তুবাদী ধারা, কিন্তু সে ধারায় এই রোমান্টিক নভেলেরও একটা ক্ষুদ্র ধারা এসে মিলেছে। নভেল বস্তুবাদী হয়েও বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনাকে নিজের অঙ্গীভূত করে নিতে পারে—এইটিই স্কটের নভেলের দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হল।

এইখানে আমাদের থামতে হয়—কারণ, ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকে। বাঙালীর মনের পটভূমিতে ১৮৫০-এর সময়ে শেকস্পীয়ার-মিল্টনের সঙ্গে বায়রন-স্কটের মূর্তি

উজ্জ্বল হয়ে ফোটে বাঙলা নভেলের জন্মকালীন সময়ে। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ-শেলির অপেক্ষাও স্কটের ঐতিহাসিক রোমান্সের প্রভাব বাঙালীর মনে প্রবল—রিচার্ডসন, ফিল্ডিং প্রভৃতি অষ্টাদশ শতকের বাস্তববাদী নভেল-স্রষ্টাদের আকর্ষণও দুর্বল। ইংরাজী সাহিত্যে অবশ্য ১৮৪০-এর পরেই নভেলের মনস্তত্ত্বমুখী (Psychological) গভীরতর বাস্তব রূপ ক্রমশ প্রবল হয়, বুর্জোয়া যুগের মূল্যমানে আস্থা কমতে থাকে। দুশ বৎসর পরে হলেও সেই উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী নভেল বাঙালীর শ্রেষ্ঠ কথাকারদের দৃষ্টিতে পড়ার কথা ডিকেন্স-থ্যাকারের সময়ে। কিন্তু হেনরী জেমস থেকে টমাস হার্ডি পর্যন্ত ইংরাজী নভেলের সেই বিভিন্ন নূতন ধারা সমসাময়িক বাঙালী লেখক ও ঔপন্যাসিকদের দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে কতটা প্রভাবিত করত, তা বোঝা যায় না। তবে ডিফো থেকে স্কট পর্যন্ত ইংরাজী নভেলের ধারা দিয়ে বাঙলা উপন্যাসের পটভূমি প্রথমে রচিত হয়েছিল। বাঙলা উপন্যাস পাঠের ভূমিকায় এই কথাটাই প্রথম লক্ষণীয়। ডিকেন্স, থ্যাকারে, মেরিডিথ-আদির সঙ্গে জেন অস্টেন (Jane Austen), জর্জ এলিয়ট (George Elliot) ইংরাজী উপন্যাসে সার্থকতা দান করেন। সাধারণ ইংরাজের পক্ষে ডিকেন্স থেকেই স্বপ্নভঙ্গের-জীবন—বুর্জোয়ার বৈষম্যের তলায় পিষ্টক্লিষ্ট জীবন। হাস্যোজ্জ্বল বেদনাক্লিষ্ট অনুভূতিসমৃদ্ধ চিত্রে ডিকেন্স নভেলে তার আভাস দান করেন। জর্জ এলিয়ট ফুটিয়ে তুললেন 'inner man'—অন্তরস্থিত মানুষকে। হার্ডিতেও বাস্তববাদ কাব্যাশ্রয়ী, কিন্তু নৈরাশ্যপীড়িত। এঁরা সকলেই নভেলের ধারাকে পরিপুষ্ট করেন। কিন্তু এই সব সমকালীন ইংরাজী (বা ফরাসী) নভেলিস্টদের স্পষ্ট ছায়া বাঙলা উপন্যাসে উনবিংশ শতকে বিশেষ নেই (হুগোর কিছু ছিল কি ?)। তবে বিংশ শতকে ইংরাজী বাঙলা দুই সাহিত্যের কালগত ব্যবধান কমতে থাকে। ইংরাজী সাহিত্যের এবং ইংরাজী ভাষার সহায়তায় ফরাসী, জার্মান, রুশ, স্কাণ্ডিনেভীয় প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমকালীন ও সহযোগী হবার জন্য বাঙালী লেখক ক্রমশ উন্মুখ হয়ে পড়েন। আমাদের বাঙলা নভেলের আলোচনার দিক থেকে তাই আমরা সাধারণভাবে একটা সীমারেখা টানতে পারি। কিন্তু তা চূড়ান্ত নয়। বাঙলা নভেলের পর্বান্তর 'চোখের বালি'-তে। বিংশ শতকের গোড়া থেকেই তার সূচনা—রবীন্দ্রনাথ যখন মধ্য গগনে প্রবেশ করেছেন। সমসাময়িক পাশ্চাত্য সকল ভাষার নভেলের ধারার তখন থেকেই আমরা আস্বাদন লাভ করতে চেষ্টা করি। তাই সে সকল ভাষার প্রথম দিকের নভেলের সঙ্গে দৃষ্টিতে

ও সৃষ্টিতে আত্মীয়তা অনুভব করি। ফরাসী ফ্লবেয়ার, স্তাঁদাল না হলেও তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, তুর্গেনেয়েফকে জানতে পারি। দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে—বঙ্কিমচন্দ্রে ডিকেন্সের ছায়াও দুর্লভ—হুগোর ছায়া আছে কিনা কে জানে! কিন্তু আজকের বাঙলা সাহিত্যে কি জেমস জয়েস অজ্ঞাত, কিম্বা তাঁর ছায়া দুর্লক্ষ্য? দস্তয়েভস্কি-গর্কি থাক, কাম্যু-সার্ত্র?

তাই বাঙলা নভেল পাঠের ভূমিকায় স্কটের রোমান্সের রূপান্তরের আগের রূপ ('দুর্গেশনন্দিনী') গ্রহণ করতে না করতেই 'বিষবৃক্ষ' ছাড়িয়ে আমাদের আসতে হয়—অযৌক্তিক ভাবেই—'চোখের বালি'-তে—প্রায় নভেলের প্রধান ধারায়। এজন্য স্কট ছাড়াতেই লক্ষ্য করতে হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে, ডিকেন্স থেকে হেনরী জেমস পর্যন্ত ইংরাজী নভেলের ধারা। বুঝতে হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যন্ত্রশিল্পের দুঃসহ পরিবেশে নভেল বা যুগের নিজস্ব art-form কী গতিপ্রকৃতি লাভ করলে। এজন্য এখানে এই উপক্রমণিকা ভাগে প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত নভেলের প্রধান পরিবর্তন ধারার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ প্রয়োজন। বিশেষ করে দেখতে হয় ইংরাজী সাহিত্যে নভেলে ডিকেন্স-থ্যাকারে, জেন অস্টেন-জর্জ এলিয়ট, শার্লট ও এমিলি ব্রন্টি, হার্ডি পর্যন্ত ধারা; এবং তারপর তার কালান্তরের আভাস দেখি হেনরী জেমস-এ। আর পরে জেমস জয়েস, কনরাড, ডি. এইচ. লরেন্স, ভার্জিনিয়া উলফ প্রভৃতি আমাদের স্মরণীয়। অন্যদিকে ফরাসী সাহিত্যে স্তাঁদাল, বালজাক, ফ্লবেয়ার, হুগো, গোঁকুর, জোলার সাক্ষ্য, শেষে বিংশ শতাব্দীর আনাতোল ফ্রাঁস, আঁদ্রে জিদ এবং প্রুস্ত, কামু, সার্ত্রের কথা একটু না একটু মনে রাখতে হয়। রুশ সাহিত্যের মোটামুটি পুশকিন, গোগোল, তুর্গেনেয়েফ, দস্তয়েভস্কি, তলস্তয়, গর্কি, আলক্সি তলস্তয়, শলোকভ, পাউস্তোভস্কি প্রভৃতির কৃতিত্ব নিশ্চয়ই গণনীয়। অন্যান্য সাহিত্যে টমাস মান প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পী। মার্কিন ফকনার প্রভৃতির দান নভেলের কালান্তরের গণনায় একভাবে না একভাবে উল্লেখযোগ্য। মোটামুটি নভেলের প্রতিষ্ঠা ইংরাজী নভেলে অষ্টাদশ শতকে। নভেলের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা হয় ডিকেন্স থ্যাকারে স্তাঁদাল বালজাক ও রুশ ঔপন্যাসিকদের সৃষ্টিতে। কালান্তরের সংকটে নভেলে অমনি এসেছিল রূপান্তরের দাবি। জেমস জয়েস থেকে তার প্রায় Permanent revolution চলেছে। কারণ, নভেল সর্বাধিক সমৃদ্ধিশালী শিল্পরূপ, যুগের সামগ্রিক জীবনের শিল্পরূপ বা art form তার হওয়া চাই। তাই নভেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত নেই। নিশ্চয়ই সব সার্থক

পরীক্ষা নয়, কিন্তু বাঙলা উপন্যাস পাঠের ভূমিকায় নভেলের এই ক্রমবিস্তার্যমান ক্রমবিকাশশীল গতিপ্রকৃতির এ পরিপ্রেক্ষিত মনে রাখা দরকার।

নভেল কী

বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিভ্রান্ত না হতে হলে স্থির বোঝা প্রয়োজন—মোটামুটি নভেল তবে কী, কী তার রূপ, কীই বা তার চরিত্র। একটা আভিধানিক সংজ্ঞা দেওয়া যাক: নভেল মোটামুটি এক বা একাধিক খণ্ডের কল্পনামূলক গদ্য কাহিনী—যাতে ধারাবাহিক আখ্যানবিন্যাস (প্লট), বাস্তব-জীবনের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র (ক্যারেক্টার), কর্ম (অ্যাকশন, ঘটনা) অঙ্কিত হয়।*

মোটামুটি নভেলের এ সংজ্ঞায় প্রধান রূপের কথা বলা হয়েছে, তার বেশি নয়। যথা, নভেলের প্রধান অঙ্গ প্লট বা কাহিনীবিন্যাস, চরিত্রাঙ্কন এবং ঘটনার বা কর্মকাহিনীর বর্ণনা; অথবা পরিবেশ (মিলিউ), প্লট, চরিত্র, সংলাপ, ভাষারীতি এসব নভেলের অঙ্গ; কিম্বা সংক্ষেপে প্লট, চরিত্র ও প্রকাশরীতি—এ বললেও চলে। এ সংজ্ঞাকে আরও পূর্ণতর করা যেতে পারে নভেলের নানাবিধ রূপের বর্ণনার থেকে। তাতে নভেলের স্বরূপ কতটা বোঝা যেতে পারে, কে জানে? নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ নয়। পরে তা আমরা দেখতে পারব। আপাতত নভেলের নানা ভাগ-বিভাগের কথা অভিধানকাররা যা বলেছেন, তা মনে করলেই বুঝব—রূপের থেকেও স্বরূপ নিগূঢ়তর ও বিচিত্রতর হবার কথা।

---

* Fictitious prose narrative of sufficient length to fill one or more volumes, portraying characters and actions, representative of real life in continuous plot." (*Concise Oxford Dictionary*). মার্কিন '*New Standard Dictionary*'-এর (Sds. Frank and Wagnall) সংজ্ঞাও প্রায় এরূপই। পার্থক্য, এই বলা হয়েছে, "character and action" হবে "typical" এবং প্লট হবে "more or less intricate". কিন্তু মার্কিন সংজ্ঞায় 'নভেল'-এর সঙ্গে 'রোমান্স'-এর পার্থক্য, নভেলের নাটকীয়তা এবং নভেলের চার জাতীয় বিভাগের কথাও বলা হয়েছে। রোমান্সের আবেদন অদ্ভুত রসের অস্বাভাবিক ঘটনার আবেদন—নভেল বাস্তব সাধারণ জীবন বা স্বাভাবিক জীবন ও ঘটনার ও মানুষের চরিত্রকাব্য। বর্ণনায়, নাটকীয় বৃত্তান্তে, প্লটের বিন্যাসে তা বিবৃত হয়। যথার্থ নভেল তাই রোমান্স নয়। রোমান্স ছিল প্রধানত মধ্য যুগের কথাকাব্য, নভেল আধুনিক যুগের।

নভেল কত রকমের? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, যথার্থ বললে চার রকমের, তবে নানা রকমের আছে নভেলের জাতি-উপজাতি।* এ সব জাতি-উপজাতি কিরূপ?

১। ঘটনাপ্রধান নভেল—যেমন, (ক) অ্যাডভেঞ্চারের নভেল, (খ) জীবনীমূলক নভেল, (গ) সৈনিক জীবনের বা খেলাধূলার কথা।

২। কৌশলপ্রধান নভেল—যেমন, (ক) ডিটেকটিভ নভেল, (খ) অজ্ঞাত ও অসম্ভব বিষয়কে যা সম্ভব করে ফুটিয়ে তোলে, (গ) রহস্য কাহিনী, ভয়-ত্রাস-অনিশ্চয়তা প্রভৃতি ভাবচক্রান্তের সূত্রে উৎপাদন যার উদ্দেশ্য।

৩। সাধারণ বাস্তব জীবনের নভেল—যেমন, (ক) উদ্দেশ্যপ্রধান নভেল, নীতি প্রচার ও মতবাদ প্রতিপাদন যার উদ্দেশ্য, (খ) বাস্তববাদী নভেল।

৪। অনিবার্যতা প্রতিপাদিক নভেল—যেমন (ক) কার্যকারণ সূত্রে যাতে (কোনো ঘটনা বা অবস্থা) অনিবার্য প্রতিপাদিত হয়, (খ) বিশ্লেষণাত্মক নভেল বা চরিত্রপ্রধান নভেল, যাতে ঘটনা বা কর্ম একমাত্র চরিত্রের বিবর্তনের দিক থেকেই বিবৃত হয়।

এ তালিক নিশ্চয়ই বহুস্বীকৃত। তবে বিশেষ করে নভেলের বাইরের রূপই এ তালিকায় বিবেচিত হয়েছে। তাই এ তালিকা নভেলের সিরিয়াস ছাত্রের পক্ষে শেষ কথা নয়। সেই বাইরের হিসাবে একই নভেলে এই চতুঃশাখার একাধিক শাখার লক্ষণ দেখা যেতে পারে, যেমন—জীবনীপ্রধান নভেল কিন্তু

* "[1] The Novel of incident including (a) The Novel of adventure, (b) The biographical Novel, and (c) The naval, military and reporting Novels [2] The Novel of artifice, dependent on the cleverness of action, (a) The detective novel, (b) The Novel of mystery, (c) The Novel of unknown in which apparent impossible conditions are so treated as to seem actual, (d) The Novel whose motif is fear, intrigue etc., [3] The Novel of ordinary life including the novel of purpose which paints a moral or explains a theory, the realistic novel. [4] The Novel of the inevitables dealing with the inescapable sequences of cause and effect, including (a) Problem Novel, and (b) The analytical Novel or Novel of character which considers novel really in this relation to and their effect upon character." (*New standard Dictionary.*)

চরিত্রপ্রধান নভেল হতে পারে। আবার 'বাস্তব জীবনের নভেল'-এরই বা 'চরিত্রপ্রধান নভেল' হতে বাধা কি? এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আমরা সকলেই মনে করতে পারি। তা ছাড়া নভেলের আরও বহু পরিচিত বিভাগ আছে—যেমন 'ঐতিহাসিক নভেল', 'সামাজিক নভেল' কিম্বা 'আঞ্চলিক নভেল' ইত্যাদি। এ ভাবে সে সবকে বাদ দিয়ে এমন কোন লাভ হচ্ছে? অন্যদিকে মনস্তাত্ত্বিক নভেল, সামাজিক নভেল এবং বিশেষ করে এ শতাব্দীর 'চেতনাপ্রবাহের নভেল' এ সবের স্থান এ তালিকায় আছে কি? থাকলে তা মোটেই স্পষ্ট নয়, আর না থাকলে এই কথাই মনে হয়: ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাবে নভেলের প্রাণ সত্যই এরূপ তালিকায় অবজ্ঞাত। নভেল জন্মসূত্রেই যে যুগচেতনা ও যুগজীবনের সঙ্গে গাঁথা তার ইঙ্গিতও নেই। তাই নভেল যে যুগের art form, যুগজীবনের মতোই বিকাশমান ও বিবর্তমান, নব নব বিকাশের সম্ভাবনা যে নভেলের আছে, —এরূপ গণনায় তা থেকে যায় উহ্য বা অগ্রাহ্য। এবং আরও যা বড় কথা, নভেলের কেন, সকল সৃষ্টিরই যা মর্মবাণী—জীবনসত্যের ও মানবসত্যের প্রকাশ —নভেলের সেই তাৎপর্য (significance) এ গণনায় একেবারেই অবজ্ঞাত।

নভেলের অঙ্গ ও প্রতিমা

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—পরিবেশ, প্লট, চরিত্র, সংলাপ, ভাষারীতি এ সব নভেলের অঙ্গ। পাঁচও গণনা করতে পারি, যেমন করা হয়েছে; অথবা তিনও করতে পারি, যেমন আমরা করতে চাই—পরিবেশ প্লটকে একসঙ্গে ধরে বলতে পারি 'বিষয়বস্তু'—কথাবস্তু (story) ও 'ভাব-বস্তু' (theme) তার দুই দিক। দ্বিতীয় অঙ্গ চরিত্র এবং তৃতীয় অঙ্গ 'প্রকাশপদ্ধতি' (সংলাপ, বর্ণনা এবং ভাষারীতি যার নানা দিক)। তিনই ধরি বা পাঁচই ধরি নভেলের অঙ্গ, এ সব অবলম্বন করে নভেল রূপ লাভ করে আর সেই রূপ নিয়েই আসলে কিন্তু নভেল এক ও অখণ্ড—তিনে মিলে এক, পাঁচ মিলেও এক। প্লট চরিত্র প্রকাশপদ্ধতি স্রষ্টার মনের ও ধ্যানের মধ্য দিয়ে মিলে একটা সমগ্রতা লাভ না করলে রূপ ধরে না, অঙ্গহানি হয়। এই রূপ যত অখণ্ড, ততই সেই সৃষ্টি রসোত্তীর্ণ, তাতেই শিল্প সার্থক ও সম্পূর্ণ। কথাটা তাই দাঁড়াচ্ছে—খণ্ডভাবে বিষয়বস্তু চরিত্র ও প্রকাশপদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতনতা যেমন নভেল পাঠে অপরিহার্য, তেমনি শিল্পরূপ সামগ্রিক হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা, নাকি ছাড়া ছাড়া রয়ে গিয়েছে—পাঠকের এই মনস্কতাও অপরিহার্য। নিটোল পরিকল্পনা-প্রতিমা বা প্যাটার্ন রচনাতেই এই শিল্পরূপের

সার্থকতা। সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্ত করে সেই প্যাটার্ন।

কিন্তু এই কি সব? না, আরও একটি কথা থাকে: নভেলখানা কোনো গভীরতর সংজ্ঞার (awareness) বা উপলব্ধি কিনা—সমগ্রতাবোধের পরেও তা জানবার কথা। কারণ, প্যাটার্ন জীবনসত্যের বাণীরূপ। সেই চৈতন্য না জাগলে শিল্পসার্থকতায়ও নভেলের সম্পূর্ণতা লাভ হয় নি বুঝতে হবে। বুঝতে হবে, শত কৃতি-কৌশলেও নভেলের স্বরূপ বা তাৎপর্য তা হলে অপরিস্ফুট। আসলে, বরং এ কথা বলা ঠিক—বিশেষ জীবনবোধের প্রয়োজনেই গড়ে ওঠে বিশিষ্ট প্যাটার্ন, শিল্পরূপ। জীবন-সত্যের যে বিশেষ উপলব্ধি লেখকের স্বকীয়, সেই উপলব্ধির প্রকাশ-নিয়মেই রচিত হয় পূর্ণাবয়ব সেব বিশিষ্ট প্রতিমা; প্লট-চরিত্র সম্বলিত প্যাটার্ন, প্রকাশপদ্ধতি সেই সমগ্র অভিজ্ঞতারই প্রয়োজনীয় ত্রিকাণ্ড। প্রকাশপদ্ধতি—রূপ ও ভাবের একাত্মতাতেই সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়।

নভেলের তাৎপর্য

সকল রকম শিল্পসাহিত্যের সম্বন্ধেই আমরা আজ জানি মূল তাৎপর্য significance হল "interpretation of life।" ম্যাথ্যু আর্নল্ডের পর কবিতাকে "criticism of life" বলে সকলেই মেনে নিয়েছি এবং সেই সূত্রেই এই কথাটাও বুঝি—শিল্পসাহিত্যের বাইরের কর্ম যদি হয় লোকরঞ্জন, মানুষকে খুশি করা, শিল্পীকবিদের নিগূঢ়তম ধর্ম তাহলে জীবনের অর্থ প্রকাশ। জীবনসত্যের মানব-সত্যের বিশিষ্ট রূপায়ণ—তত্ত্বব্যাখ্যা নয়, জীবনের আলেখ্য রচনা, pattern of life ধরা। তাই এই সংজ্ঞাটা মামুলী শোনালেও সত্য "Novel is the interpretation of the human life by means of fictitious narrative in prose।" জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে interpretation of the human life সকল সাহিত্যেরই ধর্ম, শুধু entertainment বা লোকরঞ্জনই শিল্পসাহিত্যের কর্ম নয়। লোকরঞ্জন নানা ভাবেই হতে পারে—শিল্পসাহিত্য কেন, ভোজ্যে পেয়ে আফিমে নানা ভাবে। কিন্তু জীবনের সত্যানুধাবন সে সব প্রক্রিয়ায় সম্ভব নয়। জীবনসত্য থেকে পলায়নই তার উদ্দিষ্ট ফল।

জীবনের ব্যাখ্যা কবিতায় গানে নাটকেও হত, হয়েছে, এবং এখনো হয়। কিন্তু নভেলে তা হয় উদ্ভাবিত গদ্যকথা দিয়ে। কিন্তু কেন? গদ্যে না হলে এখন আর নভেলের বিষয়বস্তু বা কাহিনীর উদ্ভাবন সম্ভব না কেন? মহাকাব্য, কাব্য, নাটক জীবনের কথাবস্তুকে সাজাত। তাতে ছন্দোবদ্ধ বাক্য ছিল

সমুচিত পন্থা। কিন্তু সভ্যতা বাস্তব জীবনকে আজ এতই সন্নিকট ও এমনভাবে প্রত্যক্ষ করে তুলেছে যাতে আগেকার মতো পদ্যরূপের মধ্যে জীবনকে বাঁধা যাচ্ছে না—আরও নিকট করে, সঠিক ভাবে, আরও খুঁটিনাটি শুদ্ধ জীবনকে পাবার জন্য এখন মানুষের আগ্রহ। তাই বাস্তবের সম্বন্ধে তার কৌতূহল বেড়েছে, বাস্তব জীবনের বিশেষ মূল্য সে অনুভব করে, তাই তার এত তীব্র জীবনাগ্রহ। সভ্যতার আবর্তনে বিবর্তনে এই বাস্তব জীবন মানুষকে পেয়ে বসেছে। তার আগ্রহ, তার জিজ্ঞাসা, দিন থেকে দিন তার জীবন অভিযান তাই প্রবলতর হয়ে উঠছে। গদ্য ছাড়া এই বস্তুর আকুলতার ভাষা নেই, কথাকাব্য ছাড়া তার পদ্ধতি নেই। সেই কথাকাব্য এখন সার্থক হতে পারে একমাত্র বাস্তবপ্রধান উদ্ভাবিত কথায়—যার নাম নভেল বা উপন্যাস।

নভেলের প্রকৃতি ও গতিপ্রকৃতি

বাস্তবপ্রধান উদ্ভাসিত কথা—একেই বলা যায় নভেলের মূল প্রকৃতি। রোমান্সের কল্পলোক বা তার চমকপ্রদ চমৎকারিত্ব নভেলের গ্রাহ্য পদ্ধতি নয়। অথচ নভেল এ কথাও জানে, জীবনে চমৎকারিত্ব আছে, দৈনন্দিনতা বা বাইরের উপকরণপুঞ্জে বাস্তব সীমাবদ্ধ নয়। সে সব আপাত বাস্তব বা দৈনন্দিনতার আবরণ ছাড়িয়ে আবিষ্কার করতে হয় বাস্তবের প্রাণসত্তা—যা সামান্যের মধ্যে অসামান্য, আর অসামান্যের মধ্যেও আবার সামান্য। নভেল দু-ধারারই অস্তিত্ব স্বীকার করে। এজন্য নভেলের প্রকৃতি স্থূল বাস্তববাদী নয়, তা বাস্তবপ্রধান জীবননিষ্ঠা। সে জীবননিষ্ঠা ভাবে-ফোলানো রোমান্টিকতা নয়, কিন্তু সময় মতো রোমান্টিক কল্পনার ও কাব্যদৃষ্টিরও উপন্যাসের প্রয়োজন, আবার পর্যবেক্ষণ ও বিচারও তার প্রয়োজন—বাস্তব থেকে নভেলের উদ্ধার করতে হয় জীবনসত্য ও মানবসত্য। সেই প্রয়োজনেই শিল্পী তার শিল্পকর্মের পদ্ধতি ও শিল্পকৌশল স্থির করেন। কারণ, জীবনাগ্রহ থেকে যেমন নভেলের উৎপত্তি, জীবননিষ্ঠাও তেমনি নভেলের প্রকৃতি। জীবনাগ্রহ ও জীবননিষ্ঠাতেই নভেল প্রসারিত ও বিকশিত হচ্ছে যুগচেতনার সঙ্গে জীবনচেতনার প্রসারে ও বিবর্তনে। জীবন-চেতনা যেমন বিচিত্রতর জটিলতর প্রকাশপদ্ধতিতে সেই চেতনার রূপায়ণে প্রবৃত্ত হয়।

কালান্তরের রূপ

নভেলের গতিপ্রকৃতি তাই যুগ ও যুগজীবনের মতো বিকাশমান। ঊনবিংশ

শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই এই বাস্তবচেতনা ও জীবনচেতনায় জটিলতা ও বৈচিত্র্য আসে। বুর্জোয়া সভ্যতার সংকট ঘনাতে থাকে, কালান্তরের ছায়া ঘন হয়ে দেখা দেয়। তার পরে সহজ বাস্তবকে আর তত সত্য মনে হয় না। মানুষের মন বদলাল, না, মানসিকতা বদলাল—ফ্রয়েড-ইয়ুং-এর মনোবিকলনের পরে তা বলা অসম্ভব। এখন পরাবাস্তব (surrealism), অন্তঃবাস্তব (post impressionism) প্রভৃতি শুদ্ধ 'অ-চেতন' ও 'মগ্নচৈতন্য' জীবন-নিষ্ঠার বিশেষ বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠল, মন দিয়েই মানুষের প্রধান পরিচয়, এমনকি একমাত্র পরিচয় !

যুগসংকটের যন্ত্রণা ও নভেলের রূপান্তর

কালান্তরের দিনে নভেলের বিশেষ জিজ্ঞাসা এখন মানুষ ততটা নয়, যতটা মন। একমাত্র সোভিয়েত নভেলে এখনো তলস্তয়ী আদর্শ, সেখানে বাস্তবতা ও মানবতার প্রাধান্য এখনো অক্ষুণ্ণ। পাশ্চাত্য দেশে মানুষে আর বিশ্বাস নেই। দুই-দুইটা বিশ্বযুদ্ধের পরে কে শুনবে এ কথা "মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ" ? মানুষই যখন পাপ, জীবনই যখন 'absurd' অর্থহীন যুক্তিহীন, অস্তিত্বের একটা গ্লানি ছাড়া জীবনের যখন আর কোনো রূপ নেই—তখন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানসিক মন্থনের মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য অন্য শিল্পের মতো নভেলও নূতন শিল্পরূপ, নূতন জটিল রীতি উদ্ভাবনে ব্যস্ত। সাম্প্রতিক নভেলের নূতন রীতিতে নভেলের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়ে চলেছে। লেখকরা বাস্তববাদের সাথেই পরিচিত বাস্তবকে অতিক্রম করে যাচ্ছে নূতন বাস্তবের সন্ধানে—যে নূতন বাস্তব আসলে শূন্যতা, জীবনসত্যের ও মানবসত্যের নেতিসূচক মুখ। ফরাসী প্রুস্তের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজীতে এই নূতন রীতির প্রতিষ্ঠা জয়েসের 'ইউলিসিস'-এ স্পষ্ট হয়। সাধারণভাবে এ রীতির নাম 'চৈতন্যপ্রবাহ' (Stream of consciousness)-এর রীতি। তার বিশেষ কলাকৌশল একান্তালাপ (internal monologue), স্মৃতিসংক্রমণ, ঘটনাবিবরণে চলচ্চিত্রের প্রথায় কথাবস্তুর ক্রমভঙ্গ ও বিপরীত বিন্যাস (flash back)। স্থান-কালঘটনাচরিত্রের সকল পূর্বপরিচিত ধারার ক্রমভঙ্গ গদ্যে ও পদ্যে এই ভাঙনের যুগের একটা বড় কৌশল। সেই সঙ্গে আছে অর্ধোক্তির সঙ্গে অস্পষ্টোক্তি, অর্ধস্পষ্ট ভাবের সঙ্গে অর্ধস্পষ্ট অন্যভাবের আনুষঙ্গিক ভাবপ্রবাহ (free association) বহু কৌণিক ও বহুস্তরীয় দৃষ্টিভঙ্গী (multiple view), 'ক্লোজ-আপ', 'বহুকুণ্ঠিক

ভাষণ' (polyphonal)। অবশ্য আর যা জয়েসের কৌশল—শব্দের ভাঙাগড়া, ভাবের অনুগামী শব্দনির্মাণ ভাষানির্মাণ ইত্যাদি—তা অনেকে গ্রহণ করে নি। কিন্তু প্রকাশপদ্ধতিতে গদ্যে লিরিকাল-এপিকাল-ড্রামেটিক গুণসমষ্টির সৃষ্টি নভেল শ্রেষ্ঠ কাব্যসৌন্দর্যও আয়ত্ত করে নিয়েছে। জয়েসের 'ইউলিসিস', ভার্জিনিয়া উলফের 'দি ওয়েভস', 'দি ইয়ার্স', 'দি অ্যাকটস' প্রভৃতি সেরূপ আশ্চর্য কৃতিত্বের প্রমাণ। ফরাসী যাঁরা জানেন তাঁরা অবশ্য প্রুস্তকেই এ ধারার প্রথম পুরোধা বলেন। আর বলেন, প্রুস্ত আসলে স্বতন্ত্র, তিনি অননুকরণীয় যুগনির্মাতা। স্মৃতির মধ্য দিয়ে চেতনাসূত্রে অতীতকালের পুনরুদ্বোধন—অতীতের পুনরুদ্ধারে কালের অনিত্যতাকে কালহীন নিত্যতায় আয়ত্তীকরণ, বাস্তববাদী ধারায় পরিবর্তন বিবর্তন, প্রভৃতি সমস্ত কিছুকে শিল্পের অবাস্তব নিত্যতায় খণ্ডন করা—প্রুস্তের এসব অদ্ভুত তত্ত্ব; ততোধিক তাতে তাঁর অদ্ভুত কলাকৃতিত্ব; আবার সমসাময়িক পচা-ধরা ফরাসী উচ্চশ্রেণীর বাস্তববাদী রূপায়ণ আর নভেলের ভাষারীতির দিক থেকে শান্ত নিরাসক্ত নির্মায়িক শিল্প-সাধনার অভূতপূর্ব নিদর্শন।

অথচ এরই বিপরীত প্রান্তের আর একজন স্রষ্টা ডি. এইচ. লরেন্স, যিনি আসলে নভেলেও কবি। ভাববস্তুর দিক থেকে তিনি রুশো ওয়ার্ডসওয়ার্থের সমগোত্রীয়। লরেন্সের জীবনাগ্রহ প্রাকৃতিক-পরিবেশমুক্ত জীবনেই দেখে জীবনের সিদ্ধি, অথবা সামাজিক কৃত্রিমতামুক্ত জৈব জীবনেই মানুষেরও সার্থকতা, বিধিনিষেধমুক্ত সঙ্গম রভসে চিন্তাজ্বরবিমুক্ত মানবাত্মার আত্মলাভ। এ তত্ত্বের মধ্যে যা মিথ্যা আছে তা লরেন্সের জীবনেই ধরা পড়েছিল। কিন্তু এই জৈব প্রাণচেতনা তাঁর নভেলে যে অনস্বীকার্য শিল্পসাফল্য লাভ করেছে, তা অভূতপূর্ব। এ কলাকৌশল কাব্যরীতিকে আশ্রয় করে নি। এই প্রকৃতিপ্রণয়ী লরেন্সের অকৃত্রিম স্বপ্নমায়া, তা ইংরাজী নভেলকে কাব্যসুষমা দিয়েছে। বলা উচিত 'লেডি চাটার্লির প্রেমিক'-এও তা আছে, কিন্তু সে নভেল লরেন্সের শ্রেষ্ঠ কীর্তি নয়—তবে সে নভেল বহু পাঠকের পরিচিত। কারণ, তা যতটা প্রকৃতি-প্রশস্তি, তার চেয়েও বেশি সঙ্গম-প্রশস্তি।

লরেন্সের এই কৌশল ছাড়া আরেক কৌশল নূতন না হলেও ভাবনা ও কল্পনার সুতীব্র অকৃত্রিমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা পেয়েছে কাফকার (Kafka) সৃষ্টিতে। 'প্রতীক' বা 'সিম্বল' ব্যঞ্জনায় শিল্পকে পরমোৎকর্ষ দেয়, এ নূতন কথা নয়। কিন্তু নভেল ছিল বাস্তব মানুষের বাস্তব চরিত্রের রূপায়ণ। কিন্তু যতই জীবনসত্য

সূক্ষ্ম হয়ে উঠতে লাগল ততই মনে হল শুধু রঙে শুধু রূপে সত্যকে ধরা যায় না— 'সিম্বলিজম' বা প্রতীকের প্রয়োগের দ্বারা তার ব্যঞ্জনা সম্ভব। "প্রদীপ নিবিয়া গেল" ('কপাল কুণ্ডলা') এই একটি সিম্বল ছাড়া বিশেষ ক্ষণে বিশেষ মানুষের এমন ব্যঞ্জনা কিসে সম্ভব হত? কিন্তু কাফকা ক্যামুদের হাতে মানুষের সমস্ত জীবন (The Trial), সমস্ত একটা পরিস্থিতি (The Plague) এক-একটি প্রতীকে মূর্ত। সার্ত্র-এর প্রতীকে প্রয়োজন নেই। কিন্তু সজীব জীবন-দর্শনেরই রূপক তাঁর নভেল। ক্ষতি কী!

নভেলের প্রকৃতি ছিল বাস্তববাদী, বাস্তবানুগ কল্পনার মধ্য দিয়ে জীবন-সত্যের ও মানবসত্যের প্রকাশ। রূপকের মধ্য দিয়ে কি সেই কল্পনা বাস্তবানুগ পথে সত্যকে রূপায়িত করতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে—'গ্যালিভার্স ট্রাভলস' কি রূপক নয়? আর রবীন্দ্রনাথের একটা যুক্তি মেনে বলতে পারি—"রূপক—ম্যাকবেথ কি রূপক নয়?" তা হলে, প্রশ্ন ওঠে—নভেলের প্রকৃতি যেরূপ বাস্তববাদী ছিল—নভেলের গতি-প্রকৃতি তাকেই কি এক পদ এগিয়ে দিয়ে নিয়ে গেল রূপকের দিকে? না 'রূপক' নামক কলাকৌশলকেই ঔপন্যাসিকরা একালের সূক্ষ্মতার দাবি মতো জীবননিষ্ঠ ব্যঞ্জনায় বিশিষ্ট এক কৌশল করে তুললে?

নভেল পাঠের ভূমিকার এই উপক্রমণিকা এখানে শেষ করি। নভেলের যেই রূপ বঙ্কিম থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত আমাদের পরিচিত, তারও রূপান্তর ঘটেছে। যুগের সঙ্গে জীবনাগ্রহকে রূপ দিতে দিতে নভেলের রূপান্তর এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবনিষ্ঠা ক্রমশ তার রূপ লাভ করছে। নূতন নূতন প্রকাশপদ্ধতি, নূতন চেতনা, নূতন ভাবনা, নূতন জীবনবোধ, মানবতার নূতন মহিমা ও যন্ত্রণা—নিজের প্রয়োজনানুরূপ শিল্পরূপ দাবি করে। নভেলের এই আধুনিক পরিচয়ও বাঙলা নভেলে দেখা দিয়েছে, যা বঙ্কিম থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত আমাদের ঔপন্যাসিকরা দেখেন নি। যথা—[১] প্লট এখন নভেলে গৌণ হয়ে পড়েছে। [২] মানব সত্যের রূপায়ণে সূক্ষ্মস্থূল আচরণধৃত 'চরিত্র'র প্রয়োজন কমছে। [৩] হেনরি জেমস-এর পরে জয়েস-এ এসে 'চৈতন্যপ্রবাহ'-প্রধান মন 'চরিত্র'র স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে প্রকাশপদ্ধতিতে—(ক) ক্রমভঙ্গ করে (খ) বাক্যভঙ্গ করে (গ) আত্মোক্তিতে-অর্ধোক্তিতে জড়িয়ে পড়ে (ঘ) অন্তর্ভাবনা, শুদ্ধ কবিতা-নাটক-মহাকাব্য সকলের ধর্মকে অঙ্গীভূত করে নেয় নভেল—স্মৃতিস্বপ্নে (প্রুস্তের মতো) সত্যকে জীইয়ে তোলে সার্থকতর রূপে (ঙ) গহন গভীর কামরহস্যকে বা প্রাণরহস্যকে ধরে (লরেন্সের মতো)

প্রাণ-স্পন্দনময় স্থির ভাষার মধ্য দিয়ে (চ) মানব-ভাগ্যকে প্রত্যক্ষ করে রূপকের সার্থক ব্যবহারের দ্বারা। বলা বাহুল্য, এ যুগের নভেল পাঠের ভূমিকায় এই নূতন রীতির কথা তাই স্মরণীয়। এবং আবার লক্ষণীয়, এই নূতন নূতন রীতি তথাপি আধুনিক কালে নভেলের একমাত্র রীতি নয়—তলস্তয়, ফিল্ডিং, স্তঁাদাল বাতিল হন নি। বাতিল হবার মতো নয় তাঁদের অবলম্বিত নভেলের সেই মুখ্য প্রকৃতি—বাস্তববাদিতা। [৪] নভেলের প্রধান অঙ্গ পরিবেশ, চরিত্র, প্রকাশ-পদ্ধতি—এ সবও সাধারণ সত্য, গূঢ়তর সত্য। নভেলের প্রকৃত তাৎপর্য জীবনত্য ও মানব সত্যের রূপায়ণে। (৫) নভেলের গতিপ্রকৃতি যুগ-প্রকৃতির সঙ্গে এখনো ঘাতপ্রতিঘাতে বিকাশমান। নভেল পাঠের ভূমিকায় এই ঐতিহাসিক সত্যকেও তাই অনুধাবন করা যায়—নভেল আধুনিক যুগের মুখপাত্র।

জীবনের চিত্রবহা

এসব নভেল লেখকদের শিল্পলোক সমসাময়িক কবিতা-চিত্রশিল্পের সঙ্গে কতকটা পাশাপাশি রেখেও দেখা আমাদের আলোচনায় প্রয়োজন। তার অর্থ প্রায় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই সোয়াশত বৎসরের পাশ্চাত্য শিল্পসাহিত্যের একটা সিংহাবলোকন—যা আমাদের সাধ্যাতীত সত্যই, তবু তা প্রয়োজন এবং সত্যই তা আমাদের সাধ্যাতীত। এই বুঝেও দেখার চেষ্টা করতে হয়। বাঙলা উপন্যাসের দিক থেকে আমরা নভেলের ধারার প্রথম বাঁক ঠিক করেছিলাম স্কটের 'ওয়েভার্লি নবেলস' অবধি। ইংরাজী নভেলের জন্ম (ডিফো) ও প্রতিষ্ঠার হিসাব যতটা সম্ভব গ্রহণ করেছি। বুঝে দেখতে চেয়েছি যুগশিল্পকলা রূপে নভেল গড়ে উঠতে উঠতে কী স্থির রূপ লাভ করেছে। কী কী প্রধান অঙ্গ (Features) নিয়ে সেই রূপ। অবশ্য সেই সঙ্গেই স্মরণ করেছি ঠিক তখনই ইংরাজীতে ডিকেন্স থেকে হার্ডি পর্যন্ত নভেলিস্টদেরও সমসাময়িক ফরাসী-রুশ নভেলিস্টদের বিশিষ্ট সৃষ্টি থেকে উপন্যাস সাহিত্যের কী বিশেষ বিবর্তন আমাদের বাঙলা লেখকদের লক্ষণীয় হতে পারত। অথচ তা হয় নি।

এরপরে নূতন বাঁক হল সমসাময়িক কাল। বিংশ শতকের প্রথম দিকে নভেলের কী বিবর্তন হল এটি এখন লক্ষণীয়, সমসাময়িক সম্প্রতিকার বাঙলা উপন্যাসের পটভূমি জানার প্রয়োজনে। এই নূতন পর্বটা যেন নভেলের কালান্তর। সে কালান্তর পাশ্চাত্য সমালোচকরা ভার্জিনিয়া উলফ-এর প্রসিদ্ধ

রীতিবিভাগ* অনুসরণ করে ধরেন ১৯১০-এর পরে ১৯১৪-এর থেকে (W. Allen)। আমাদের সাহিত্যের কথা মনে রাখলে আমরা বলতাম এ কালান্তর আসে ১৯৩০-এর পরে। কিন্তু সত্যই এ পটভূমি পাশ্চাত্য উপন্যাস সাহিত্যের দিক থেকে রচিত হয়েছে হেনরি জেমস ও জয়েস থেকে—কনরাড, জয়েস, প্রুস্ত, ভার্জিনিয়া উলফ, ডরোথি রিচার্ডসন, ডি. এইচ. লরেন্সদের নিয়ে। নভেলের ইতিহাসে সে কালান্তরেরও পর্বান্তর চলেছে কাফকা, কাম্যু, সার্ত্র প্রভৃতিদের দিয়ে একেবারে ফরাসী এ্যান্টি-নভেল ধরে।

এই প্রবহমান পরিবর্তমান ধারা মনে রেখে এখন তাই জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে—নভেলের স্বরূপ কী? ডিফো থেকে ডিকেন্স-থ্যাকারে-হার্ডি পর্যন্ত যা চিনি তা নভেলের প্রতিষ্ঠার রূপ বা ক্লাসিক নভেলের রূপ। নভেলের 'কালান্তর', 'নভেলের স্বরূপ' বলতে তার কী বোঝায়? জীবনের মতোই তার আবর্তন-বিবর্তন, রূপ থেকে নভেলের রূপান্তর? কারণ নভেল জীবনসত্যের ও মানব-সত্যের চিত্রবহা।

[ক্রমশ]

* "On about December 1910 human nature changed". V. W

বিষ্ণু দে ঃ পটভূমি

অরুণ সেন

পটভূমি ঃ সমাজ ও রাজনীতি গত

"Literature for some sixty years has to be constantly on the alert. As for example, Gandhiji's political movements and tragic death stirred one into writing poetry, as did Jawaharlal's Hamlet-like greatness. And of course, I was inspired by Lenin's Russia, Stalin's USSR. And who could remain unmoved by the heroism and struggle of the Vietnam people, or the Bangladesh movement ?"

[Speech of / Shri Bishnu Dey / the award-winner. Bharatiya Jnanpith, 1973]

১৯১৯ সাল সারা পৃথিবীর পক্ষেই একটি স্মরণীয় বছর—ঐ বছরই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। ভারতবর্ষ এবং বাঙলাদেশের পক্ষে তার চেয়েও বেশি, প্রায় ঐ বছর থেকেই আমরা রাজনীতি অর্থনীতি বা নিছক সংস্কৃতি বা সাহিত্যের দিক থেকেও নতুন এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়লাম। ঠিক ঐ বছরটিতেই বিষ্ণু দে-র বয়স ছিল দশ। এবং তারপর, তাঁর নিজের জবানি অনুসারেই, যদি ধরা যায় 'ছন্দমিলের পালাকীর্তন' শেষ করে, নিজের সংকট-কালকে অতিক্রম করে ১৯৩৫-৩৬ সালের মধ্যেই তিনি রীতিমতো যাত্রা শুরু করেছেন—তবে বিষ্ণু দে-র বালকোচিত বা বয়ঃসন্ধিগত বা তারুণ্যনির্দিষ্ট এই পনেরোটি বছরকে তাঁর বিকাশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে গ্রহণ করতেই হবে। ১৯১৯-২০ থেকে ১৯৩৫-৩৬ পর্যন্ত এই পনেরোটি বছর।

নানা বৈপরীত্যে চিহ্নিত এই সময়। একে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাল এবং রবীন্দ্রবিরোধিতারও কাল, গান্ধীজীর আবির্ভাবের কাল এবং সঙ্গে সঙ্গে

গান্ধী-বিরোধী বা গান্ধী-বিযুক্ত মনোভাব ও সক্রিয়তারও কাল, যে মনোভাব বা সক্রিয়তা সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল এই বাঙলাদেশেই ; শ্রমিক-কৃষক-সাম্যবাদী আন্দোলনের সূত্রপাতের কাল এবং সেই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ক্রমবর্ধমান তীব্রতারও কাল ; অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনার কাল, অর্থনৈতিক মন্দারও কাল।

অবশ্য এই বৈপরীত্যের পেছনেও কোনো-না-কোনো ভাবে রয়েছে আমাদের ইতিহাসের আরো এক দীর্ঘস্থায়ী বৈপরীত্য বা বিচ্ছেদ—উনিশ শতকী ইংরেজি শাসন ও ইংরেজি শিক্ষার ফলে যে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে শহরবাসী ও গ্রামবাসীর মধ্যে, ইংরেজি-শিক্ষিত মানুষ ও ইংরেজি-বর্জিত মানুষের মধ্যে, সেই বিচ্ছেদ। আজ যে ইংরেজি-শিক্ষিত শহুরে মানুষের মুখের বাঙলা, আর গ্রামের নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষের বাঙলা আলাদা হয়ে গেছে, আলাদা হয়েছে তাদের ধ্যানজ্ঞানকর্ম, সেই অনৈক্যের জন্ম উনিশ শতকী 'রেনেসাঁস'-এরই গর্ভে। আর তারই জের কি বাঙলাদেশের শহুরে রাজনীতিতে, ইংরেজি শিক্ষার রেনেসাঁসে পুষ্ট কলকাতায় ভাষা পায় নি সন্ত্রাসবাদে কিংবা চিত্তরঞ্জন দাশের জনপ্রিয়তায়, স্বরাজ্য পার্টির উত্থান-পতনে? আর সেজন্যই কি সারা ভারতবর্ষে গান্ধীর পদযাত্রা চিত্তজয়ী হলেও বাঙলাদেশ খুব সহজেই সংকুচিত হয়ে ওঠে না গান্ধীজীর প্রতি বিমুখতায়?[১] অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মতো বৈজ্ঞানিক চিন্তার মানুষ যে সাড়া দিতে পারেন না উভয়তই, সন্ত্রাসবাদ বা চিত্তরঞ্জন দাশেও নয়, গান্ধীজীর মধ্যযুগীয় গ্রামীণ সংস্কারাচ্ছন্ন রাজনীতিতেও নয়, সেই নিরুপায় পরবাসীর কথাও উঠবে বারবার এই প্রসঙ্গে।

কিংবা আরো অনেক প্রসঙ্গেই এই বৈপরীত্যের উৎস ও পরিণামের চিত্র দেখা যেতে পারে। যে-কোনো কারণেই হোক ইংরেজি শিক্ষা থেকে যে মুসলমানেরা নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল এবং তার ফলে নিজেদেরই বঞ্চিত করেছিল মানসিক এবং বৈষয়িক উভয় প্রকার সুখ ও সুবিধা থেকে, সেই বঞ্চনা যদি ক্রমশ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার বাঁকা পথ নেয়, তবে তাও কি সেই বিচ্ছেদেরই পরিণাম নয়?

ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে এই সময়টাতেই যেন দীর্ঘকালের চাপা-দেওয়া রোগ হঠাৎ গুটি হয়ে বেরোতে লাগল। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল নৈরাশ্য, বিষাদ ও অসহায়তা। একেকবার কর্মোদ্যমের বা পরিত্রাণের সম্ভাবনার ঢেউ উঠেই মিলিয়ে যায়। একবার ১৯২০-২১ সালে, আর-একবার ১৯২৮-৩০ সালে উৎসাহের

সঞ্চার হয়েছিল, অন্তত রাজনীতিতে। কিন্তু এর আগে-পরে-মাঝে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। সর্বগ্রাসী নৈরাশ্যের মধ্যে যতিচিহ্নের মধ্যে জেগে থাকে কিছু কিছু ক্ষণস্থায়ী কর্মপ্রেরণা। এই অন্ধকারের মধ্যেই সোনালি রেখার মতো শুধু আভাস পাওয়া যায় ভবিষ্যতের নতুন এক শক্তির আবির্ভাবের—শ্রমিক-কৃষকের রাজনীতি ও সমাজনীতির সূত্রপাতের।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যে পরিবর্তন অনুভব করা গিয়েছিল, সেই পরিবর্তনের হাওয়া অবশ্য বইতে শুরু করেছিল আরো আগে থেকে, হয়তো ১৯১৪ সালে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার বছরটিতেই। ১৯১৫ থেকে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে ও তিলক প্রভৃতির সমর্থনে 'হোমরুল' আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যখন কংগ্রেসের চিরকালের নরমপন্থী বনাম চরমপন্থী সংঘর্ষ তীব্র হল এবং ক্রমশই অন্তত বাঙলাদেশে আপোষপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে যৌবনোদ্ধত মনোভাব স্পষ্ট ভাষা পাচ্ছিল, ঠিক তার আগের বছরটিতেই, অর্থাৎ ১৯১৪ সালেই প্রমথ চৌধুরী 'সবুজপত্র' প্রকাশ করলেন, সেই তারুণ্যের জয়ঘোষণার পত্রিকাটি যা রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত চঞ্চল করে তুলেছিল। 'সবুজপত্র'র জন্যই তিনি গল্প লিখলেন 'স্ত্রীর পত্র'., নাকি আমাদের দেশের 'ডলস হাউস্' এবং তখনই লেখা চলেছে 'বলাকা'র কবিতাগুলি একে একে।

তার এক বছর বাদেই, ১৯১৫ সালে গান্ধীজী এলেন ভারতবর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এবং গান্ধী-রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিখ্যাত সাক্ষাৎকারটি ঘটল। রবীন্দ্রনাথ লিখে চলেছেন 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ' বা 'বলাকা'-র কোনো কোনো কবিতা, গ্রহণ করছেন ইংরেজের খেতাব 'সার' উপাধি।

অন্যদিকে ১৯১৫ সাল নাগাদই সন্ত্রাসবাদী রাজনৈতিক হত্যা ও ডাকাতি তুঙ্গে উঠেছে বাঙলা দেশে, ঠিক যেমন ভারতের বাইরেও নানারকম অবাস্তব বিপ্লবী প্রচেষ্টা চলেছে, যার পরিণতি ইন্দো-জর্মান সোসাইটি বা বার্লিন কমিটির আশাভঙ্গে। বরং হোমরুল আন্দোলনের তীব্রতা ব্রিটিশকে ভীত করতে পেরেছিল এবং প্রবল বিক্ষোভ সত্ত্বেও প্ররোচিত করেছিল অ্যানি বেসান্তের গ্রেপ্তারে।

পরের বছরগুলিতে একদিকে চলছে গান্ধীজীর ধীর প্রস্তুতি (চম্পারণ বা আহ্মেদাবাদের ঘটনাকে সেই প্রস্তুতিরই উদাহরণ বলা চলে), অন্যদিকে জোর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। পরন্তু কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের যে

বিরোধ, তার জন্য চমৎকার উপযোগী এই বাঙলা দেশের মাটি—যা তীব্র হয়ে উঠল ১৯১৮ সালে শাসনসংস্কার বিষয়ে মণ্টাগু-চেমসফোর্ড-এর রিপোর্ট প্রকাশে (যে রিপোর্টে দ্বৈত শাসনের সুপারিশের আড়ালে ছিল নিছক ছলনা) এবং কংগ্রেসের অন্তর্কোলাহলে (যার ফলে কংগ্রেসের বিভেদ হয়েছিল সম্পূর্ণ)।

এই সময় ১৯১৯ সাল এল আরো তীব্র সংঘাত ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নিয়ে। রাজনীতি-সমাজনীতি সব দিক থেকেই একটা টালমাটাল অবস্থা। "নেতাদের চিন্তাধারা যাই হোক না কেন, তখন দেশে অসন্তোষ বেড়ে চলছিল। স্বরাজ-লাভের কামনাকে আর সরকার স্তোকবাক্য দিয়ে দমন করে রাখতে পারছিল না। যুদ্ধের সময় অল্প কয়েকজন ব্যবসাদার খুব টাকা লুটেছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোকের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠছিল। মুনাফালোভীদের যথেচ্ছ ব্যবহারে জিনিষপত্রের দাম আগুন হয়ে পড়ছিল। আর যুদ্ধের শেষে গরীব ভারতবাসী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ব্যাধির কবলে পড়ল, সারা দেশে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোক মারা গেল। এই সময়ে যে তাই পঞ্জাবে 'গদর দলে'র প্রতিপত্তি বাড়বে, মাঝে মাঝে মাঝে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ হবে, দেশের সর্বত্র যে অসন্তোষ প্রকট হয়ে উঠবে, সন্ত্রাসবাদকে যে কিছুতেই সম্পূর্ণ দাবিয়ে রাখা যাবে না—এ ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক। সরকার নিজের কোট বজায় রাখার জন্য বিলাতের এক জজ রাওলাট সাহেবকে এনে এখানকার বিপ্লবী আন্দোলন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করাল আর দমননীতি কায়েম করার জন্য নতুন অনেকগুলো প্রস্তাব হাজির করল।"[২]

সিডনি রাওলাটের সুপারিশের বিরুদ্ধে চারদিকে প্রতিবাদ, হরতাল—বিশেষত পঞ্জাবে। জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা তারই পরিণতি। মর্মান্তিক-ভাবে ক্ষুব্ধ হলেন গান্ধীজী, 'সার' উপাধি ত্যাগ করলেন রবীন্দ্রনাথ। সমস্ত দেশ একটা প্রচণ্ড সম্ভাবনা ও প্রত্যাশায় অধীর। এই অবস্থাতেই ১৯২০-তে তিলকের মৃত্যু এবং গান্ধীজীর সর্বভারতীয় নেতৃত্ব লাভ ঘটল একই সঙ্গে।

শুরু হল গান্ধীবাদী আন্দোলনের প্রথম ধাপ : প্রথম অসহযোগ আন্দোলন[৩], যার সঙ্গে প্রধানত গান্ধীর উৎসাহেই যুক্ত হয়েছিল মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গিগত মতপার্থক্যের সূচনাও হল এ সময় থেকেই, যদিও শ্রদ্ধায় ও বিরোধিতায় উভয়ের সম্পর্ক তখন থেকেই অসরল—কোনো মতেই তা উচ্চার্য ছিল না বাঙলা দেশের 'বিজলী' পত্রিকার অসহিষ্ণুতার সঙ্গে। তাই তো রবীন্দ্রভক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঐ পত্রিকার গান্ধীবিরোধী মনোভাবকে ঠাট্টা করে লিখলেন : "দিনে দীপ জ্বালি, ওরে ও

খেয়ালী, কি লিখিস হিজিবিজি / শহরের পথে রোল ওঠে শোন গান্ধীজী গান্ধীজী !"

সত্যিই সময়টা ছিল গান্ধীজীর জনপ্রিয়তার কলরোলের মুহূর্ত।[৪] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কিছুতেই সায় দিতে পারছেন না এই মত ও পথের সঙ্গে। তারই প্রতিক্রিয়াতেই কি তিনি চলে যেতে চান বার বার বিদেশ ভ্রমণে—যদিও খেতাব-বর্জনের প্রতিক্রিয়ায় সেখানে ছিল না সরকারি সমাদর! যখনই দেশে ফেরেন, অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বেল দেশ, সাক্ষাতে-পত্রে-প্রবন্ধে তাঁকে জানাতেই হয় মতভেদ। হয় মতভেদ, না হয় কবিতা বা গানের সৃজনের স্বধর্মে নিমগ্ন হতে দেখি বারবার এ-সময়ে—ফলে দেশবাসীর নিন্দেও সইতে হয় তাঁকে।

শান্তিনিকেতনেও গান্ধীর জনপ্রিয়তার ঢেউ পৌঁছয়—এমনই পরাক্রান্ত সেই জনপ্রিয়তা। সেই প্রেরণার আবহে এমন কি চিত্তরঞ্জন দাশ ও গান্ধীজীর ঐক্যও রচিত হয় অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রে।

আন্তর্জাতিক পটভূমিটাও ছিল তীব্র, সংঘাতময়—ব্যর্থতা ও সম্ভাবনায় অস্থির। সবচেয়ে বড় ঘটনা ছিল ১৯১৭-র সোভিয়েট বিপ্লব ও সোভিয়েট অভিজ্ঞতা। সবচেয়ে বড় এবং আশাপ্রদ ঘটনা। এমনকি কল্পনাবিলাসী বিপ্লবীরা, যাঁরা এতদিন জর্মানির সাহায্যের স্বপ্ন দেখতেন, তাঁরাও প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে স্বপ্নজগৎ হিসেবে গ্রহণ করলেন সোভিয়েট ইউনিয়নকে। পাশাপাশি সম্পূর্ণ বিপরীত এক তিক্ত অভিজ্ঞতা—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশের ভাগবাঁটোয়ারা ও জর্মানদের প্রতি প্রতিহিংসামূলক আচরণ।

একদিকে প্রত্যাশা, অন্যদিকে মোহভঙ্গ। দুয়েরই ঝাপটা এসে পড়ছে পরাধীন ভারতবর্ষে—যে ভারতবর্ষ ইংরেজের অত্যাচারে জর্জর এবং কখনো অসহযোগ আন্দোলনের মন্থর ব্যাপকতায়, কখনো সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের রোমাঞ্চকর তীব্রতায় প্রতিবাদমুখর। পরাধীন জাতির এই আত্মপ্রকাশের তাগিদ সমর্থন খুঁজে নিচ্ছিল আরো নানা আন্তর্জাতিক ঘটনা থেকে—যেমন আইরিশ গেরিলাদের সংগ্রাম, মিশরের স্বাধীনতালাভ ও আরো পরবর্তীকালে কামাল পাশার আবির্ভাব কিংবা এমনকি চীনে জাপানি জিনিষের বয়কট ঘোষণার আন্দোলন।

প্রবলভাবে আরো যে একটি ঘটনা আমাদের স্পর্শ করেছিল, তা হচ্ছে মহাযুদ্ধের জের হিসেবে বিজিত তুর্কীস্থানে খলিফাদের দমন, যা থেকে পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে শুরু হয় খিলাফৎ আন্দোলন এবং যাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাতের স্বপ্ন দেখেন অনেকেই এবং বস্তুত তা ঘটেও ছিল কিছুটা।[৫]

তবে বলাই বাহুল্য, রুশ বিপ্লবের প্রভাবের ব্যাপারটি ছিল সবচেয়ে সুদূর-প্রসারী। শুধু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের নিছক কল্পনাবিলাসেই নিঃশেষিত নয়, সোভিয়েট বিপ্লবের প্রেরণায় এদেশে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী চিন্তাও দানা বাঁধতে শুরু করেছে তখন থেকেই। বিদেশে জন্মলাভ করেছে ভারতের সাম্যবাদী দল—১৯২০ সালের দ্বিতীয় কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালে লেনিন ও মানবেন্দ্র রায়ের দলিলের মাধ্যমে নতুন কর্মোদ্যোগের সম্ভাবনা স্বীকৃতিও লাভ করেছে।

এমনকি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তখন প্রত্যাশা ও সম্ভাবনা দেখা দিতে শুরু করেছে, বস্তুত অনেক আগে থেকেই। বলা যায়, বিশ শতকের গোড়াতেই ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের অগ্রগতিতে একটি নতুন পর্ব শুরু হয়েছিল। পূর্ব ভারতে চা, পাট এবং কয়লা শিল্পের যথেষ্ট অগ্রগতি হল, যদিও তা ব্রিটিশ পুঁজিকে আশ্রয় করে। পশ্চিম ভারতে কিন্তু বস্ত্রশিল্পের প্রসারের মধ্য দিয়েই ভারতীয় শিল্পপতিদের অভ্যুত্থান ঘটছিল। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের মূল প্রেরণার সঙ্গে স্বভাবতই পশ্চিম ভারতের ঐ দেশী শিল্পপতিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সমন্বয় ঘটেছিল এবং ফলে ভারতের জাতীয় আন্দোলন নতুন পরিপ্রেক্ষিত লাভ করল বলা চলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে এই পথেই শিল্পায়নের অগ্রগতি ঘটতে থাকে। যুদ্ধকালীন সময়ে এই শিল্পোদ্যোগের সংখ্যা ও ক্ষেত্র আরো বেড়ে গেল। কারণ ব্রিটিশ আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, পরন্তু যুদ্ধের প্রয়োজন মেটাতে দরকার হয়েছিল ভারতীয় শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি। ফলে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের বেশ খানিকটা প্রসার ঘটেছিল—সুযোগ ও উৎসাহ পেলে ভারতীয় অর্থনীতির প্রগতি কতখানি ঘটতে পারে তা বুঝতে পারল ভারতীয়রা—ভারতীয় শিল্পপতিরা বিপুল মুনাফা ও সমৃদ্ধির স্বাদ পেল প্রথম।[৬]

ভারতীয় পুঁজিপতিদের মনে জাগল আশা, ১৯১৬ সালের শিল্প কমিশন সে আশাকে আরো প্রশ্রয় দিল।

অবশ্য পাশাপাশি অর্থনীতির পুরো চিত্রটি মোটেই আশাপ্রদ নয়, ঔপনিবেশিক শোষণের আওতায় তা হতেও পারে না।[৭] শিল্পজাত দ্রব্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে হু হু করে, কিন্তু কৃষিজাত দ্রব্যের অবস্থা খুবই খারাপ। ইস্পাত ও তুলাজাত দ্রব্যে মুনাফা হচ্ছে প্রচুর, কর্মসংস্থানও বাড়ছে কিছুটা, কিন্তু অধিকাংশ জনসাধারণের কাছে তা পৌঁছুচ্ছে না। তা ছাড়া যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা না থাকায় শিল্পপতিরাও সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে নি এবং যুদ্ধের সময় জাহাজী ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হওয়ায় যুদ্ধের শেষাশেষিই উৎপাদন দ্রুত গেল কমে—কারখানাগুলো বন্ধ হতে লাগল কিছু কিছু এবং বেকারিও শুরু হয়ে গেল। ইতিমধ্যে নিত্যব্যবহার্য জিনিষপত্তরের দাম হয়েছে আকাশছোঁয়া। ১৯১৪ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে কলকাতাতেই খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েছিল ৯৩%। সাধারণ মানুষের দুঃখের অন্ত ছিল না, করভারে জর্জর কৃষকদের অবস্থা তো হয়ে উঠল আরো শোচনীয়।[৮] সুতরাং প্রথমে যেটা মনে হয়েছিল অর্থনৈতিক অগ্রগতি, তা কিন্তু ভারতীয় জীবনে কোনো সুরাহাই আনে নি।

এই স্বতবিরোধী অবস্থাটা মহাযুদ্ধের পরেও অটুট। এমনকি আরো মৌলিক প্রশ্ন ওঠার কারণ ঘটল। প্রথমাবস্থায়, অর্থাৎ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই, ভারতীয় শিল্পপতিরা কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল। "শিল্পপতিরা ভেবেছিল যুদ্ধকালীন সেবার বিনিময়ে তারা আনুকূল্য পাবে। কিন্তু যুদ্ধের পরে অবস্থা হল আরো খারাপ। জিনিষপত্রের দাম আরো চড়ল। আবার বৈদেশিক জিনিষে ছেয়ে গেল বাজার, বিদেশী পুঁজি ব্যাপকভাবে লগ্নি হতে শুরু করল। ভারতীয় শিল্পপতিদের অর্থনৈতিক উদ্যম বিপর্যস্ত হয়ে গেল, ভারতীয় শিল্পগুলি একে একে বন্ধ হতে লাগল।"[৯]

ইংরেজ সরকার বুঝেছিল অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো দরকার অচিরে। ভারতবর্ষকে উপনিবেশ হিসেবে যদি রাখতেই হয়, তবে এখানে উন্নত শিল্পের ভিত কিছু কিছু তৈরি করতেই হবে।[১০] তা ছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও তার অগ্রণী ভূমিকা হারিয়ে ফেলেছিল এবং জাতীয় আন্দোলন ও পুঁজিবাদের বিকাশের নতুন নতুন ক্ষেত্রও প্রস্তুত হচ্ছিল। জাতীয় বুর্জোয়াজি যেমন অর্থনীতির দিক থেকে শক্তিশালী হতে চাইছিল, তেমনি জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বও দিতে শুরু করেছিল। এই নতুন পরিস্থিতিতে ইংরেজ

শাসন শিল্পনীতির পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য। একটা বড় দৃষ্টান্ত তার, ব্রিটিশের সুবিখ্যাত দুর্বলতা বাজারের অনিয়ন্ত্রণ ঝেড়ে ফেলে এবার শিল্পে সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন হল। এর ফলে ভারতীয় শিল্পপতিরা উৎসাহিত হয়েছিল নিশ্চয়ই।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও শিল্পায়নের প্রকৃত অগ্রগতি ঘটে না। তার বড় কারণ ঔপনিবেশিক দেশের ক্ষেত্রে যা স্বাভাবিক, সেই পরস্পরনির্ভরশীল শিল্পগুলির অসমবিকাশ ও পরমুখাপেক্ষিতা। ফলে, আদমসুমারির সাক্ষ্য অনুসারে, ১৯১১ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে শিল্পনির্ভর মানুষের সংখ্যা গেছে কমে, কৃষিনির্ভর মানুষের সংখ্যা গেছে বেড়ে। সুতরাং এই সময়টাকে ভারতের শিল্পোন্নয়নের যুগ বলা হবে, না, বলা হবে শিল্প-অবনয়নের যুগ?[১১] আসলে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সংরক্ষণব্যবস্থা হাল্কা শিল্পকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গেল বটে, কিন্তু সেই অগ্রগতির মাথা নীচে, পা ওপরে।

অর্থাৎ সংরক্ষণের এই ব্যবস্থায় ভারতীয় শিল্পপতিদের পক্ষে সম্ভব হল আরো পুঁজির সংগ্রহ, অথচ বিনিয়োগের সম্ভাবনা বা ক্ষেত্র রইল খুবই সীমিত। ভারতীয় ও বিদেশী বুর্জোয়াজির মধ্যে দ্বন্দ্বটা হয়ে উঠল তীব্র।[১২] দুই মহাযুদ্ধের মধ্যকালীন সময়ের শিল্পবিকাশে এইভাবে নানা পরস্পরবিরোধী উপাদানের বড় রকমের প্রভাব পড়েছে।[১৩] এই হল ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতি ও শিল্পবাণিজ্যের পরিস্থিতি—তার পর থেকেই ১৯২৯-৩০ সালের ইওরোপীয় বাজারের অর্থনৈতিক মন্দার চাপ এসে পড়ল ভারতবর্ষের মাটিতেও। সে অন্য ইতিহাস।

যে-শিল্পায়ন শুরু হয়েছিল এই শতকের গোড়ায়, শোষণের প্রয়োজনেই সেই শিল্পায়নকে করে রাখা হল সীমিত ও পঙ্গু। এমনিতেই সাধারণ মানুষ ধনতান্ত্রিক বিলিব্যবস্থায় বঞ্চিত থাকে—তার ওপর নতুন পরিস্থিতিতে তাদের দুঃখ ও নৈরাশ্য সীমাহীন। মধ্যবিত্তদের মধ্যে নৈরাশ্যসচেতনতাও তীব্র—তার প্রতিফলনও ঘটেছে নানা কর্মে, যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে। গান্ধীজী যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেছিলেন ১৯২০-২১ সাল নাগাদ, সে আন্দোলনের জনপ্রিয়তা ও চারিত্র সত্ত্বেও নব্যপন্থীদের মনে কিন্তু ঘনিয়ে এসেছে নৈরাশ্য আর সন্দেহ। আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তিনি হয়তো বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বা আবেদন-নিবেদন করলেন, কিংবা তার চেয়েও সাংঘাতিক, উত্তর প্রদেশের ছোট

চৌরি-চৌরা গ্রামের হিংসাত্মক কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়ায় পুরো আন্দোলনটাই প্রত্যাহার করে নিলেন।১৪ তারপর চলল গান্ধীর উপবাস ও আত্মশুদ্ধি। এ সমস্তই ১৯২১ সালের ঘটনা। বলা বাহুল্য, বঙ্গীয় নব্য তরুণদের মধ্যে এ সবের একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এমনকি জওহরলাল নেহরুর মতো অনুগ্র স্বভাবের বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিজ্ঞের মনেও কী যন্ত্রণাদায়ক দ্বিধা ও প্রশ্নাকুল প্রতিবাদ ঘনীভূত হয়েছিল, তার সাক্ষ্য আছে তাঁর আত্মচরিতে।১৫

গান্ধীর সিদ্ধান্তে প্রতিবাদী, কিন্তু কংগ্রেসের বাকি অংশও আত্মকলহে দিগভ্রষ্ট। ১৯২২-এর গয়া অধিবেশনে 'পরিবর্তনকামী' ও 'পরিবর্তনবিরোধী'দের বিবাদ শেষপর্যন্ত জন্ম দিল স্বরাজ পার্টির, চিত্তরঞ্জন দাশ ও মোতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে। বাকিরা হয় একে, না হয় ওকে সমর্থন করে পরিস্থিতিকে মাত্র ঘুলিয়ে দিচ্ছে। আর মুষ্টিমেয় কিছু লোক সমস্ত ব্যাপারটিতেই অসুখী বোধ করছিলেন। যেমন, জওহরলাল।

কিংবা যেমন রবীন্দ্রনাথ। গান্ধীর সঙ্গে মতপার্থক্যসূচক খোলা চিঠি লিখছেন বটে, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে শ্রদ্ধা অনড় এবং স্বরাজ-রাজনীতির বিষয়েও কোনো উৎসাহ নেই। বরং তার চেয়ে তিনি স্বধর্মে নিমগ্ন হতে চেয়েছেন কলকাতার বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে বা বক্তৃতাসূত্রে ব্যাপক ভারত ভ্রমণে, এবং সবচেয়ে বড় কথা বিশ্বভারতীর গ্রামসংস্কারের কাজে। ১৯২২ সালের এ রকম নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতেই রবীন্দ্রনাথ লিখে চলেছেন 'মুক্তধারা' নাটক বা 'লিপিকা'র গদ্যপদ্য রচনা। সমস্ত পরিবেশের বাধাকে অগ্রাহ্য করে অজর প্রতিভার ঝলক।

ঐ বছরই বাঙলা সাহিত্য বা কাব্যে নতুন পথসন্ধানের ইঙ্গিতও যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ইতস্তত। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র মৃত্যু ঘটল বটে ১৯২২-এ, কিন্তু একই সঙ্গে নজরুল তাঁর 'অগ্নিবীণা' প্রকাশ করলেন, তার ঠিক এক বছর আগে মোহিতলাল মজুমদারের 'স্বপন-পসারী' বের হয়েছে। অন্যদিকে 'প্রবাসী' পত্রিকার দ্বিতীয় যুগ শুরু হয়েছে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়।

১৯২৩-এও রাজনৈতিক পরিস্থিতি একরকম : সেই গান্ধী বনাম স্বরাজ পার্টি। রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ সমর্থনও কি পেল স্বরাজ দল? আসলে তিনি সৃষ্টিকর্মে সমান ব্যাপৃত—তাঁর সৃষ্টিশক্তি দুর্বার, অম্লান। তিনি লিখে চলেছেন অনেক গান, 'যক্ষপুরী' বা 'রক্তকরবী' নাটক, 'পূরবী'র কবিতা। উত্তরসূরী-

দেরও আহ্বান জানাচ্ছেন বিপুল প্রত্যাশায়। কিছু একটা ঘটুক এই বন্ধ্যা রাজনীতি ও বন্ধ্যা পরিস্থিতিতে। নজরুলকে উপহার দিলেন 'বসন্ত' গীতিনাট্য।

এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতেই কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে নতুন ঘটনা ও নতুন পথ তৈরি হচ্ছে। দু-এক বছরের মধ্যেই এসেছেন মোহিতলাল ও নজরুল এবং ১৯২৩-এ আবির্ভূত হলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর 'মরীচিকা' নিয়ে। আর ঐ বছরই বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহী পত্রিকা 'কল্লোল'-এর ১ম সংখ্যা বেরোল (বৈশাখ ১৩৩০)।

১৯২৪ থেকে এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে আবার নতুন একটি মাত্রা যুক্ত হল: হিন্দুমুসলমানের বিরোধ ও দাঙ্গা। দাঙ্গা চলেছিল দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে। গান্ধীর মর্মক্ষোভ, অনশন বা ঐক্যপ্রচার কোনোটাই শেষ-পর্যন্ত এই দাঙ্গাকে রুখতে পারে নি। এদিকে আইনসভায় প্রবেশ বা বর্জন নিয়ে রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের মধ্যে মতভেদ চলছেই এবং তারই ফাঁকে নির্বাচনে স্বরাজ পার্টির জয়।

তীব্র ক্ষোভে নজরুল লিখে চলেছেন 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান'। রবীন্দ্রনাথকে বাহ্যত মনে হচ্ছে যেন তিনি এদেশেরই কেউ নন—নিজের সত্তার শৃঙ্খলা রক্ষা করাই তাঁর কাজ। তিনি লিখছেন 'পূরবী'র কবিতা। বিদেশ ভ্রমণ করছেন—চীন, দক্ষিণ আমেরিকা, পেরু, আর্জেণ্টানিয়া। চলছে ওকাম্পো-পর্ব।

১৯২৫-এ দেশে ফিরে দেখলেন রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনেও চরকা প্রবেশ করেছে। তিনি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন না চরকার রাজনীতি—তাই গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎকার শেষ হয় ব্যর্থ আলোচনায়। তিনি আরো নিমগ্ন হন 'গীতিচর্চা'য়। এরই ফাঁকে প্রবেশ করে বিশ্বভারতীর প্রতি মুসোলিনির 'বদান্যতা'। নজরুল লিখে চলেছেন 'পূবের হাওয়া', 'সাম্য-বাদী', 'চিত্তনামা'।

চিত্তরঞ্জন দাশ বাঙলাদেশকে প্লাবিত করেছেন—আইনসভায় স্বরাজ পার্টির সঙ্গে নরমপন্থী ও হিন্দুমুসলিম সাম্প্রদায়িকদের ঐক্য ঘটছে। লাজপৎ রায়, মদনমোহন মালব্য প্রভৃতিরা স্বভাবতই বিরোধী। আর গান্ধীজী তখন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে চরকা ও খদ্দর, হিন্দুমুসলিম ঐক্য

এবং অস্পৃশ্যতা-বর্জনের জন্য নিরলস প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।— ঠিক এরকম সময়ই চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু ঘটল ১৯২৫-এর জুন মাসে।

১৯২৬-এও যেন পূর্বের বছরেরই অনুবৃত্তি। হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা আরো তীব্র হয়ে উঠছে—কলকাতায় যে কোনো অছিলাতেই দাঙ্গা পাকিয়ে উঠছে বারবার। বিশ্বপরিস্থিতিও খুব ঘোরালো। রবীন্দ্রনাথ কি ফ্যাশিস্টদের খপ্পরে পড়লেন? মুসোলিনি-র ইটালিতে গিয়ে তিনি বিভ্রান্তিকর ভাষণ দিচ্ছেন। অবশ্য অচিরেই ক্রোচে ও রেঁালার মধ্যস্থতায় তাঁর সে মোহ ভঙ্গ হল। তখন চলল আবার সেই ব্যাপক বিদেশ ভ্রমণ। ১৯২৭-এ দ্বীপময় ভারতে ভ্রমণ।

১৯২৭-কে বলা হয়েছে 'নৈরাশ্যের বছর'। অবশ্য আলাদা করে বলার কোনো অর্থ হয় না।[১৬] বস্তুত গান্ধীর প্রথম অসহযোগ প্রত্যাহারের পর থেকেই, অর্থাৎ ১৯২১ থেকেই, এই নৈরাশ্যের কাল শুরু হয়েছে। ১৯২৭-এও চলল আগেকার ঘটনারই জের—সেই ভারতবর্ষব্যাপী দাঙ্গা, রাজনীতিতে যে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে নবীনপন্থী ও প্রাচীনপন্থীদের বিরোধ, আর গান্ধীজীর একক মহান কিন্তু ব্যর্থ কর্মসাধনা। রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার অস্থিরতাটাও বোঝা যায় তাঁর এসময়কার জীবনযাত্রার ইতিহাস লক্ষ্য করলে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে শিল্পসাহিত্যের নব নব সৃষ্টিতে তিনি তখনও অপ্রতিহত। ১৯২৭-এও তিনি লিখেছেন তাঁর আশ্চর্য উপন্যাস 'তিনপুরুষ' বা 'যোগাযোগ'।

আর এই নৈরাশ্যের পরিস্থিতিতেই আয়োজন চলছে নতুন সাহিত্য-সৃষ্টির। আগের বছরেই নজরুল লিখেছেন একদিকে 'ঝিঙেফুল', অন্যদিকে 'সর্বহারা'; মোহিতলাল লিখেছেন 'বিস্মরণী'। আর ১৯২৭-এই আবির্ভূত হল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় সে যুগের অভিজাত পত্রিকা "বিচিত্রা'। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখলেন 'মরুশিখা'। বিষ্ণু দে-র কাব্য-রচনার শুরুও এই নৈরাশ্যের বছরগুলিতেই। ১৯২৬-এ-ই তিনি লিখছেন 'মন-দেওয়া-নেওয়া' নামক 'চোরাবালি'-র কবিতাটি, যার আদি নাম ছিল 'আধুনিক প্রেম'।

১৯২৮-এ রাজনৈতিক পরিস্থিতি হঠাৎ যেন মোড় নিল, নৈরাশ্যের ও নৈষ্কর্ম্যের মেঘ যেন কেটে গেল। ভারতবর্ষের চিন্তার ও কর্মের জগৎ

ঘটনাবহুল হয়ে উঠল। সাইমন কমিশনকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীর আত্মমর্যাদাবোধ ও ঐক্যস্পৃহা দানা বেঁধে উঠল। ১৯২৮-এর ৩রা ফেব্রুয়ারি বোম্বাইতে ধ্বনি উঠল, "গো ব্যাক, সাইমন।" সেই ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল সারা ভারতে। বয়কট আন্দোলনে পুলিশের আঘাত পেয়ে শেষপর্যন্ত মৃত্যু ঘটল লাজপৎ রায়ের। সমস্ত ভারতবর্ষ বেদনায় ও ক্রোধে অস্থির। নবীনদের চাপে পূর্ণস্বরাজের দাবি স্বীকৃত হল কংগ্রেসে।

গান্ধীও বার্দোলিতে ফেব্রুয়ারি মাসেই শুরু করলেন দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ আন্দোলন—এবার আরো জোরালো আন্দোলন। খাজনাবর্জনের ডাক দিলেন তিনি। সমস্ত ভারতবর্ষ অধীর আবেগে ও সম্ভাবনায় যেন কাঁপছে।

অন্যদিকে ভারতবর্ষের মাটিতে নতুন ঘটনাও ঘটতে চলেছে—শ্রমিক ও কৃষকদের সংহতির আন্দোলন। শুরু হয়ে গেছে শ্রমিক ধর্মঘট, সাম্যবাদী পত্রপত্রিকার প্রকাশ, বিভিন্ন স্থানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। ভগত সিংহের আবির্ভাব পঞ্জাবে—তাঁর সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন ও চমকপ্রদ বৈপ্লবিক কীর্তি।

এমনকি কংগ্রেসের মধ্যেও সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর-র নেতৃত্বে বাম-ঘেঁষা কংগ্রেসীরা শক্তিশালী হচ্ছেন। সাইমন কমিশনের বয়কটকে উপলক্ষ করে জন্ম হল ছাত্র ফেডারেশনের—ছাত্রদের মধ্যেও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারিত হল আশ্চর্য দ্রুততায়।

সর্বোপরি বড় ঘটনা কমিউনিস্ট পার্টির আত্মবিকাশের। ১৯২৮-র ঐ একটি বছরেই ভারতবর্ষে ২০৩টি ধর্মঘটের ঘটনা ঘটল। ১৯২৯-এ তা বেড়েই চলল। ঐ বছরই ঘটেছিল বিখ্যাত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। কমিউনিস্টদের সম্পর্কে সকলেই সচেতন হলেন। ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা প্রচারিত হল সর্বত্র।

অবশ্য অনৈক্যের ও বিভ্রান্তির কোনো ঘটনাই ছিল না, তা তো হতে পারে না। চরমপন্থী বনাম নরমপন্থী, ডোমিনিয়ন স্টেটাসপন্থী বনাম পূর্ণ স্বরাজপন্থী, গান্ধী-মোতিলাল বনাম জওহর-সুভাষ এসব বিরোধ তো ছিলই, বিশেষত লর্ড অরউইনের ঘোষণাকে কেন্দ্র করে। কংগ্রেসের নীতিতে মূলত উদারপন্থী ও অহিংস ঝোঁক থাকায় বিশেষত বাঙলা দেশে সন্ত্রাসবাদের পুনরুত্থান ঘটতে চাইছিল বারবার।

কিন্তু তার পাশাপাশি সমগ্র দেশ বোধহয় প্রতীক্ষা করছিল নতুন ঘটনার জন্য। তাই ১৯২৯-এর ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি জওহরলাল যখন স্বাধীন ভারতের পতাকা তুললেন, তখন সেই প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশাই যেন ভাষা পেল।

সমস্ত শৈথিল্য, নৈরাশ্য ও বিভ্রান্তির মধ্যেও এই প্রতীক্ষা। শৈথিল্য ও বিভ্রান্তির কারণে বুদ্ধিজীবীর মন বারবার প্রশ্নসঙ্কুল ও তির্যক ব্যঙ্গপ্রবণ হয়ে উঠতে চায়, কিন্তু তার কাছেও প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশার ঘটনাটি সত্য হতে কোনো বাধা নেই। ঠিক যেমন আমাদের আলোচ্য কবি বিষ্ণু দে এই সময়কার কৈশোরক ব্যঙ্গ পরিহাসময় কবিতা রচনা দিয়ে শুরু করেও অনিদ্রাতাড়িত মুহূর্তে লিখে ফেলেন 'জন্মাষ্টমী'-র প্রতীক্ষাসূচক দশটি লাইন, "স্বয়ংক্রিয় লিখনভঙ্গিমায়।"

সময়টা রবীন্দ্র-পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যেরও একটা সৃষ্টিময় কাল। রবীন্দ্রনাথ তো লিখছেনই ঃ 'যোগাযোগ'-এর শেষাংশ, 'শেষের কবিতা', 'মহুয়া', 'রাজা ও রাণী'র রূপান্তর 'তপতী'। চলছে বিদেশ ভ্রমণ। নতুন ঘটনা ঃ ছবি-আঁকা শুরু করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে রুটিন কাজ চলছে—বিশ্বভারতীর পরিচালনা, শ্রীনিকেতনের কাজকর্ম ইত্যাদি। বিচিত্রকর্মা প্রতিভা এ বছরগুলিতে যেন আরো সক্রিয় হয়ে উঠলেন, ঋজু সৃষ্টিশীলতায়।

'কল্লোল', 'বিচিত্রা' 'প্রগতি' প্রভৃতি আধুনিকতার ধ্বজাধারী পত্রিকাগুলো বের হচ্ছে প্রবল আত্মবিশ্বাসে ও সমারোহে। বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী বা জীবনানন্দ দাশের লেখাও দেখা যাচ্ছে বহু আধুনিক পত্রিকার সংখ্যায়, কারো কারো প্রায় প্রতিটি সংখ্যায়। বিষ্ণু দে-র কবিতাও একটির পর একটি এইসব পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩০ সাল একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। গান্ধীর আপোষচেষ্টা সত্ত্বেও অরউইনের কার্যকলাপ ও সংস্কার বিষয়ে অনমনীয় মনোভাব যখন এমনকি কংগ্রেসের নরমপন্থীদেরও ক্ষুব্ধ করল, ১৯৩০-এর জানুয়ারিতে তিনিও 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর পক্ষে মত দিলেন। তখনও কোনো প্রোগ্রাম নেই, গান্ধীর উপর সব ছেড়ে দেওয়া হল পূর্ণ আস্থায়। ২৬শে জানুয়ারি আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবে—পূর্ণ স্বরাজ-এর পক্ষে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর পড়ল।

এমনকি তখনও গান্ধীজী আপোষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, অরউইনকে চিঠি লিখছেন। অরউইন নারাজ। গান্ধীজীর এবংবিধ আচরণে নেহরু প্রমুখ

নেতারা ক্ষুব্ধ এবং বিস্মিত। তরুণেরা প্রায় ক্রুদ্ধ। অবশেষে গান্ধী আইনঅমান্য আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্তে মত দিলেন।

১২ই মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে গুজরাটের ডাণ্ডী-তে অভিযান হল—লবণ আইন অমান্য আন্দোলন। গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলেন। তারপর সরোজিনী নাইডু। প্রচুর স্বেচ্ছাসেবকের উপর গ্রেপ্তারি ও অত্যাচার চলল। এইসব সংবাদে সারা দেশ উদ্বেল! তারই প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন স্থানে স্ট্রাইক, হিংসাত্মক কাজ, ট্যাক্স বর্জন—বাঙলা দেশে বিদেশী কাপড় বর্জন। সারা ভারতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল, তবে বিভিন্ন পন্থায়।

আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কিন্তু উপেক্ষিত হল—যেমন বিভিন্ন স্থানে কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন—বিশেষত যে 'নো ট্যাক্স' প্রচারাভিযানে ছিল কিষানসভা তৈরির সূত্রপাত। তা ছাড়া বাঙলা দেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও যেন নতুন করে মাথা চাড়া দিল। বিনয়-বাদল-দীনেশের বিখ্যাত ঘটনা এ বছরই। কিংবা এ বছরই ঘোষিত হল ভগত সিংহের ফাঁসি।

তীব্র পুলিশী অত্যাচার ও দমননীতির মধ্যে কংগ্রেস লণ্ডনের ১ম গোল টেবিল বৈঠক বর্জন করল বটে, কিন্তু আন্দোলনের দুর্বলতা ইতিমধ্যেই দেখা দিতে শুরু করেছে। মুসলিম লীগ এই আন্দোলনে সায় দিল না। তদুপরি 'সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স ক্যাম্পেন' নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে দেখা দিল গভীর মতভেদ। গান্ধীর মতানুসারে, শুধু বয়কট? না, সুভাষচন্দ্র বসু প্রস্তাবিত বিকল্প সরকারের চেতনা? দ্বিতীয়টির বিষয়ে গান্ধীর প্রবল আপত্তি।

গান্ধীর দ্বিধা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল পরের বছর—১৯৩১ সালে তিনি যখন দিল্লীতে আবার আলোচনা শুরু করে দিলেন অরউইনের সঙ্গে। বন্দীদের মুক্তি দিলে সত্যাগ্রহ আন্দোলন নাকি তুলে নেবেন গান্ধী। জওহরলাল ও বামপন্থীরা মর্মাহত। কংগ্রেসে তীব্র মতভেদ। এই নৈরাশ্য কি সারা দেশব্যাপী, তাই ঐ বছরই ভগত সিংহ, যাঁর জনপ্রিয়তা কারো কারো মনে হয় তখন গান্ধীর চেয়েও বেশি, তাঁর ফাঁসির ঘটনা সারা দেশকে অমন প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গেল?

করাচী কংগ্রেসে গান্ধী সন্ত্রাসবাদীদের দেশপ্রেমকে স্বীকার করে নিলেন বটে, কিন্তু অনেক 'কিন্তু' করে। পাশাপাশি গ্রহণ করলেন দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের আমন্ত্রণ, যদিও সে বৈঠকও ব্যর্থতাই এনে দিল মাত্র। ঐ বছরই

ইংরেজরা তাদের প্রকৃত মনোভাব বুঝিয়ে দিল হিজলী জেলের বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে, যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ মনুমেণ্টের পাদদেশে জানালেন মর্মক্ষোভ ও ধিক্কার।

কিন্তু গান্ধীজী আর এগোতে রাজি নন। গোল টেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা, ভারতের সর্বত্র ব্যাপক অত্যাচার—এই সময়ে আবার সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হতে পারে এই ভয়েই নাকি গান্ধী ৮০ হাজার লোক নিয়ে গ্রেপ্তারি বরণ করলেন। আসলে, তাঁর ভয় অসহযোগ আন্দোলন এই পরিস্থিতিতে হিংসাত্মক রূপ নেবেই। তাই গান্ধীজী প্রচার করতে চাইলেন 'ব্যক্তিগত অসহযোগ আন্দোলন'। কিন্তু চিঁড়ে বিশেষ ভিজল না।

গান্ধীজীর আচরণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সারা দেশেই পরিব্যাপ্ত, বাঙলা দেশে তো বটেই। গান্ধীর নিষ্ক্রিয়তা যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল, সেই শূন্যতাকে পূরণ করল সন্ত্রাসবাদীরা। ১৯৩২-৩৩ সাল নাগাদ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের 'শেষ' কামড় যেন টের পাওয়া গেল। ১৯৩২-এ সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা এবং ১৯৩৩-এ সূর্য সেনের ফাঁসি।[১৭] ১৯৩৩-এ কলকাতায় কংগ্রেস বসবে—কিন্তু তার আগেই স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেসের মিছিলের উপর পুলিশের নির্বিচার গুলি বর্ষিত হল, সভাপতি মালব্য গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু দেশের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা তখন শীর্ষে। দেশপ্রিয়-র নেতৃত্বে পূর্ণস্বরাজ ঘোষিত হল কলকাতার কংগ্রেসে।

গান্ধীজী কিন্তু ক্রমশই যেন সরে যাচ্ছেন এ সব থেকে। আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত হয় নি বটে—কিন্তু দেশের এই অস্থির নেতৃত্বহীন মুহূর্তে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বোধহয় অবসর নিতে চাইলেন। তিনি এসময়ে মূলত হরিজন আন্দোলন নিয়েই ব্যস্ত—হিন্দু-মুসলমান বা উচ্চবর্ণ-হরিজন এ ধরনের বিভেদের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই চালাতে চান, মগ্ন হতে চান অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ বা হরিজনসেবা বা কুষ্ঠরোগীর সেবার সমাজহিতকর কাজে।

গান্ধীর রাজনীতি ও ধর্মের যে সমগ্রতা, তার দিক থেকে এই আচরণ খুবই সংগতিপূর্ণ সন্দেহ নেই এবং বৃহত্তর ভারতের সমস্যার দিক থেকে দেখলে এর বাস্তবতাও হয়তো অস্বীকার করা যাবে না, কিন্তু যে নাগরিক তারুণ্য অস্থির হয়ে উঠেছে যুগপরিবর্তনের তাগিদে, তাকে

নৈরাশ্যের অন্ধকারে ছুঁড়ে দিল এই গান্ধী-রাজনীতি। তাই ১৯৩৪-এ যখন সরকারি ভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল, তখন অনিবার্য জেনেও কারাবাসী জওহরলালের মতো অন্য নেতারাও বিস্ময় ও বেদনায় বিমূঢ়। সারা দেশে আবার ছড়িয়ে পড়ল হতাশা। ঠিক সমানই বিস্ময়কর ও প্রতিবাদযোগ্য মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলালের, যখন গান্ধীজী বিহারের ভূমিকম্প বিষয়ে অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন্তব্য সারা দেশের উপর চাপিয়ে দিতে চাইলেন। এই নৈরাশ্যের পরিবেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যে বাঙলা দেশে আবার ফিরে আসতে চাইবে তার নতুন শক্তি নিয়ে তাতে আর আশ্চর্য কী! আর গান্ধী প্রচার করে চললেন "স্বেচ্ছামূলক দারিদ্র্যবরণের ও আত্মনিগ্রহের সৌন্দর্য"।

এর মাঝখানে আশা গড়ে উঠেছিল বরং কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি-র জন্মে, কিংবা রেড ফ্ল্যাগ ট্রেড ইউনিয়নের ফেডারেশনের কাজকর্মে। এই কর্মকাণ্ড নিশ্চয়ই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল ইংরেজ সরকারের চোখে—তা না হলে ১৯৩৪-এই বে-আইনী ঘোষিত হবে কেন কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা? সমানই আশ্বাসজনক অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভূমিকা। কংগ্রেসের মধ্যেও সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসার ঘটছে ব্যাপকভাবে।

যদিও ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল ১৯২১-২২ সালেই এবং কমিউনিস্টদের ধরপাকড়ও শুরু হয় তখন থেকেই, কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম গঠনতন্ত্র রচিত হয় ১৯২৭ সালে এবং ১৯২৭ থেকেই তাঁরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে বিশেষ স্থান অধিকার করেন। ১৯২৮ সালে তাঁদেরই নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন লড়াকু রূপ নেয়। জন্ম থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ণ স্বাধীনতালাভের প্রশ্নটিকেই দেশের সামনে তুলে ধরেছে এবং ১৯২২ থেকেই কংগ্রেসের অধিবেশনে কমিউনিস্টরাই বারবার ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব করে কোনো কোনো কংগ্রেসী নেতাদের এমনকি বিরাগভাজনও হয়েছেন। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে যে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, অনেকের মতে তার পেছনে কমিউনিস্টদেরও পরোক্ষ প্রভাব ছিল। ইতিমধ্যে অবশ্য কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়েছে ঐ বছরই। "সে সময়ে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা ও লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার প্রভাব দেশে এত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল যে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ না করে কংগ্রেসের

নেতৃত্বের গত্যন্তর ছিল না।"১৮ এইভাবে সামান্য মাত্রায় কাজ করতে করতেই ১৯৩০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশ্য ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যরা বেশির ভাগ সাংগঠনিক কাজ করতেন তখনকার ওয়ার্কর্স অ্যাণ্ড পেজেণ্টস পার্টির মঞ্চ থেকে। মীরাট মামলাই কমিউনিস্টদের বরং সারা ভারতে পরিচিত ও জনপ্রিয় করেছিল। ১৯৩৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ও কৃষক শ্রমিক দল বেআইনী ঘোষিত হয়।

বলা বাহুল্য কংগ্রেসী রাজনীতির এই দ্বিধাগ্রস্ততা ও বন্ধ্যাত্বের সামনে দাঁড়িয়ে যে-সব আত্মসচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবক সন্ত্রাসবাদের আত্মহত্যায় রাজি নন, তাঁরা যে কমিউনিস্টদের কর্মকাণ্ডের ও একাগ্র সততার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হবেন, এটাই বোধহয় ইতিহাসের সবচেয়ে স্বাভাবিক ঘটনা। অবশ্য সকলের জীবনেই স্বাভাবিক ঘটনা ঘটে এমন বলা চলে না।

তা ছাড়া শিল্পীসাহিত্যকদের মতো অনুভূতিজগতের মানুষদের স্বাভাবিক পরিণাম অন্য নানাভাবেই অতিক্রান্ত হয়। কিন্তু বহু শিল্পীসাহিত্যিককেই আমরা এসময়ে পেলাম, যাঁদের আত্মসচেতনতা খুব সহজ স্বাভাবিকভাবে, পিকাসো-র ভাষায় নদী যেমন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে তেমনি ভাবে, সাম্যবাদী রাজনীতিকে নিজেদের সাহিত্যজিজ্ঞাসার পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করল। বিষ্ণু দে তাঁদেরই একজন।

দুই বিশ্ব মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক নৈরাশ্য ও প্রত্যাশা উভয়েরই পশ্চাদপট রূপে কাজ করেছে ভারতবর্ষের শোচনীয় অর্থনৈতিক সংকট, যা আসলে বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটেরই পরিণাম। এই সংকটই সচেতন বুদ্ধিজীবীকে বুঝিয়ে দিল, ভারতীয় সমস্যা ও সমাধানের নিরবলম্ব কোনো চেহারা নেই, তার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা আছে বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির।

যাকে বলা হয় 'বিশ্ব অর্থ নৈতিক সংকট' বস্তুত তার সূত্রপাত হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরে পরেই। তার একটা বড় লক্ষণই ছিল বেকারিবৃদ্ধি —যুদ্ধের কৃত্রিম প্রয়োজনে যে কাজের চাহিদা হয়েছিল, তার উপর কুঠারাঘাত পড়ল। তবে অর্থ নৈতিক সংকট তুঙ্গে উঠেছিল ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ সালের

মধ্যে। এই অর্থনৈতিক সংকট তো বস্তুত অতি-উৎপাদন সংকটেরই অন্য চেহারা। তাই বলা হয়েছেঃ "১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ এর সময়টায় ভারতের অর্থনীতি অতি-উৎপাদন-সংকটের জটিল ও পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতির মধ্যে গিয়ে পড়ল—এই সংকটটা প্রসারিত ছিল সমগ্র পুঁজিবাদী জগতে এবং এই সংকট গড়েও উঠেছিল পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের অবস্থাতেও। অতি-উৎপাদন-সংকট বিশ্ব অর্থনীতি সম্পর্কের সূত্রে গ্রথিত পুঁজিবাদী জগতকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো চাইল সংকটের এই বোঝা পরাধীন ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির ঘাড়ে চাপাতে—ফলে এখানে শ্রমজীবী মানুষের উপর শোষণের মাত্রা গেল বেড়ে। ভারতবর্ষে বিশ্ব অতি-উৎপাদন-সংকটের চাপ আরো তীব্র হল তার নিজের কৃষি সংকটের ফলে, যে সংকট তার অর্থনীতিকে করেছিল আরো অবনমিত।"[১৮ক]

সমস্ত শ্রেণীর মানুষই এর সাংঘাতিক কোপে পড়েছে, তবে তার মাত্রাটা ছিল হয়তো কারোর সামান্য বেশি কারোর সামান্য কম—যেমন শিল্পশ্রমিকদের তুলনায় কৃষকদের উপর আঘাতটা আরো সোজাসুজি। মধ্যবিত্তদের, ভারতের তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের, দুর্দশা হল অপরিমেয় ('তৎকালীন' বলে বোঝাতে চাইছি না যে সেই শিক্ষাব্যবস্থার সামান্যতম পরিবর্তন আজও হয়েছে)। বেকারির যন্ত্রণা বোধহয় সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভব করল তারাই।

অবশ্য এরকম একতরফা ছবি তো সমাজের পুরো চেহারা হতে পারে না। তাই পাশাপাশি বৈভবের নতুন ছবিও তৈরি হচ্ছিল। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে একদল মানুষ প্রায় রাতারাতি বড়লোক হয়ে উঠেছিল। অর্থনৈতিক মন্দার দিনেও টাকা খাটিয়ে আরো বড় হবার ফিকির তাদের জানা।[১৯] তাদের ড্রইংরুম-সংস্কৃতির নানা উপসর্গ দেখা দিল শহুরে শিক্ষিত সমাজে—বিকৃত, উঁচ্‌কপালে ইংরেজিয়ানা বা সংস্কৃতিপনার শুরু তখন থেকেই। বহু আধুনিক কবিতার শুরুও এই পরিবেশকে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণে জর্জরিত করে।[২০]

কিন্তু কলকাতার এই দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন বৈভবে কি সারা দেশের চেহারা ঢাকা পড়ে? ১৯২৯-৩০ সালের বিবরণেই ধরা পড়েঃ "কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় যুক্ত প্রদেশের কৃষকদের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে ওঠে।"[২১] কিংবা "বোম্বাই কমিটির অনুসন্ধানে জানা যায়, সংখ্যার দিক থেকে সমাজের যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সবচেয়ে (বেকারির দ্বারা) আহত, তারা হচ্ছে ২৭ বছরের

তলাকার যুবক, বিশেষত যাদের ব্যুৎপত্তি বিশুদ্ধভাবেই পুঁথিগত এবং যারা ইঙ্গ-ভার্নাকুলার উচ্চশিক্ষায় অগ্রসরমান।"২২

পরে এই সংকট আরো ঘনীভূত হতে থাকে এবং ১৯৩৪-৩৫ সালের পূর্বেই অর্থনৈতিক বিপর্যয় আমাদের গভীরভাবে স্পর্শ করে। "সরকারী দমননীতি, বিশ্বব্যাপী মন্দা, কৃষিদ্রব্যের মূল্যহ্রাস ও সাধারণের অর্থকষ্ট প্রভৃতি নানা কারণে দেশবাসীর মনে অবসাদের ছায়া পড়ে।"২৩

দেশের রাজনৈতিক অসন্তোষের আসল কারণ যে পরিব্যাপ্ত অর্থনৈতিক দুর্দশা—সর্বত্র বেকারি, ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদি ঘটনা, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। "মহাত্মা গান্ধীর অপরিম্লান ব্যক্তিত্ব দেশে যে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল, এ ঘটনা (গান্ধীকে গ্রেপ্তারের ফলে দেশের চাঞ্চল্য) তার একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ হলেও ভারতব্যাপী আলোড়নের পিছনে ছিল পুঞ্জীভূত অসন্তোষ, নিপুণতম নেতৃত্বও সে-অসন্তোষের চেহারাকে একেবারে বদলাতে পারে নি। ১৯২৯-৩০ সালের জগৎজোড়া অর্থনৈতিক সংকটের ছায়া এদেশেও বেশ পড়েছিল। কৃষিজাত দ্রব্যের দাম প্রায় অর্ধেক পড়ে গেছ্‌ল। রূপোর দর কমাতে চাষীর সামান্য সঞ্চয়ে ঘা লেগেছিল। টাকার দর এক শিলিং ছয় পেনীতে বেঁধে দেওয়ার ফলে সরকারী দেনা শতকরা এগারো টাকা বেড়ে গেছ্‌ল। অসন্তোষ তাই ছড়িয়েছিল সর্বশ্রেণীর মধ্যে।"২৪

সুতরাং ১৯১৮-য় ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত থেকে শুরু করে ১৯৩০-৩৪ সালের আইন অমান্য আন্দোলন পর্যন্ত ভারতের জাতীয়তা বিকাশের ইতিহাসে যাকে 'চতুর্থ পর্ব' বলা হয়েছে, তার মোটামুটি ফলশ্রুতি এই।

'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সামাজিক পটভূমি'র লেখক এ. আর. দেশাই-কে অনুসরণ করে আমরা এই সময়কার অভিজ্ঞতা শেষবারের মতো সূত্রাকারে স্মরণ করে নিতে পারি।

[ক] সবচেয়ে বড় কথা বোধহয় এই যে, জাতীয় আন্দোলন এই সময়ে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্তদের সংকীর্ণ আওতা থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল—প্রত্যক্ষ গণ আন্দোলন একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হল।

[খ] "যুদ্ধের পরের বছরগুলিতে জাতীয় জাগরণের কারণ হিসেবে আরো অনেকগুলো উপাদান ছিল। যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক সংকট, সরকারী প্রতিশ্রুতি

বিষয়ে নৈরাশ্য এবং রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান পীড়ন—এগুলো কৃষকশ্রমিক সহ সমস্ত মানুষকেই গভীরভাবে আলোড়িত এবং বিক্ষুব্ধ করেছিল।”

[গ] নানা আন্তর্জাতিক ঘটনা, যেমন ইওরোপের বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক বিপ্লব কিংবা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, গভীরভাবে ভারতীয় জনগণের চেতনাকে নাড়া দিয়েছিল—ঠিক যেমন তাদের রাজনৈতিক চেতনা প্রসারিত হয়েছিল যুদ্ধকালীন ‘হোমরুল’-কেন্দ্রিক বিক্ষোভে।

[ঘ] যুদ্ধের ফলে শিল্পবিস্তারের কারণে যে ভারতীয় পুঁজিপতিরা অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়েছিল, তারা এখন থেকে আরো সক্রিয়ভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন জোগাল—কারণ স্বদেশী আন্দোলন বা বয়কট আন্দোলন তো তাদেরই কাজে লেগেছিল। ১৯১৮ থেকেই ভারতীয় শিল্পপতি বুর্জোয়ারা কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনের রূপরেখা নির্দেশে খুব বড় ভূমিকা নিয়ে নিল।

[ঙ] এই পর্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে, দেশে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী গোষ্ঠী বা দলের বিকাশ। ১৯২৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯২৮ সালের মধ্যেই এই গোষ্ঠীগুলো রাজনৈতিক বা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে স্বাধীনভাবে অংশ গ্রহণ করেছিল—সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা প্রচারে ও কর্মসূচি রূপায়নে পরোক্ষ কাজও করে যাচ্ছিল।

[চ] এই সময়-সীমার মধ্যেই জাতীয় কংগ্রেস ‘স্বরাজ’-এর অস্পষ্টতা থেকে ‘পূর্ণ স্বাধীনতা’-দাবির স্পষ্ট বাস্তবতায় উপনীত হল।

[ছ] অবশ্য এই সব অগ্রগতির পাশে পাশে প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তিও সংগঠিত হয়েছিল—তার প্রমাণ এই পর্বেই ঘটেছিল অসংখ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা।

[জ] এই পর্বের চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল—গান্ধীর নেতৃত্বে ‘সিভিল ডিস-ওবিডিয়েন্স মুভমেণ্ট’ (১৯৩০-৩৪)—ভারতীয় জাতীয়তার ইতিহাসে দ্বিতীয় গণ-আন্দোলন।

“এই পর্বে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রধান লাভ হচ্ছে গণভিত্তির অর্জন, লক্ষ্য হিসেবে ‘স্বাধীনতা’কে গ্রহণ, আন্দোলনে স্বাধীন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীর একাংশের প্রবেশ, বিভিন্ন যুব লীগের বিকাশ এবং আন্দোলনে কৃষকদের ব্যাপক অংশ গ্রহণ। আন্দোলনের ক্ষেত্রে পিছুটানের যে

প্রভাবগুলি ছিল, তার উপাদানগুলো প্রধানত হল এই ঃ গান্ধীর মধ্যে রাজনীতি ও ধর্মের মিশ্রণ, যার ফলে জাতীয় চেতনা হয়ে পড়ে কুয়াশাচ্ছন্ন এবং জাতীয় আন্দোলন বিভ্রান্ত; কংগ্রেস সংগঠনের উপর পুঁজিবাদীদের আধিপত্য, যার ফলে জাতীয় অগ্রগতি নয়, তাদের শ্রেণীস্বার্থের কারণেই কর্মসূচি ও নীতির হয় সুরপরিবর্তন এবং সাম্প্রদায়িক অনুভূতির তীব্রতার বৃদ্ধি।"২৪ক

রাজনীতির ও অর্থনীতির এই চেহারাটা সাহিত্যকেও যে কি রকম প্রভাবিত করেছিল, তা আমরা বুঝতে পারি, যখন দেখি কি পরিস্থিতিতে বাঙলা সাহিত্যের আঙিনায় ইংরেজ কবি টি. এস. এলিঅটের প্রবেশ ঘটল। বিষ্ণু দে বর্ণনা করেছেন সেই ঘটনাকে এইভাবে ঃ "সেই এলিঅটের প্রবেশ বাংলা সাহিত্যের আঙিনায়…। …জ্ঞানে হলুম গেরোনশন থেকে ওয়েস্টল্যাণ্ড-এ উপনীত। তাই থেকে এল মীরাট যুগে এরিএল কবিতাবলী, ভদ্র অসহযোগের নৈরাশ্যে এল অ্যাশ্‌ ওএডনেস্‌ডে, যন্ত্রণার মুঠিতে এল আস্থা আর হাজার কাটাকুটিতে আঁকা আশা।"২৫ আবার ঃ "প্রতীকী রীতির নিহিত স্বাধীনতার বশেই রাজর্ষিদের যাত্রার মতো ক্রিষ্টিয়ান কবিতা গান্ধীজীর দ্বিতীয় আন্দোলনের স্মৃতিতে অনুবাদ সম্ভাব্যতা পায়, কোরিওলান পায় ইন্‌টেরিম সরকারের কালে, গেরোনশন হঠাৎ এসে যায় অবলম্বনঅনুবাদের মিশে যাওয়া গোধূলিতে যখন কলকাতার উন্মাদ হত্যার বিরুদ্ধে গান্ধীজি অভিযান করছেন অনশনে এবং ছেলেমেয়েরা প্রাণ দিয়ে শোভাযাত্রায়।"২৬ এ শুধু বিষ্ণু দে-র নিজস্ব প্রভাব বা অনুবাদ-অভিজ্ঞতার বিবরণ মাত্র নয়, বাঙলা সাহিত্যের সমকালীন জগতটাও কিছুটা এতে পরিস্ফুট হয়। কারণ সামগ্রিকভাবেই আধুনিক কবিরা এই আবহে বাস করতেন, যার বিবরণ বিষ্ণু দে নিজেই দিয়েছেন। সেই সময়ে যে-সব পত্রিকা আধুনিক সাহিত্যিকদের মুখপত্র হিসেবে বেরোত, তার পাতাতেও সাক্ষ্য আছে এই সময়কার রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক অভিজ্ঞতার।

রবীন্দ্রনাথ যথারীতি বিদেশ ভ্রমণ করে যাচ্ছেন—কখনো তাঁর সঙ্গী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কখনো অমিয় চক্রবর্তী, কখনো কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, কখনো-বা পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী। পারী-তে আমেরিকার চিত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। ম্যুনিকে প্যাশন প্লে দেখে তিনি লিখলেন 'দি চাইল্ড', পরে বাঙলায় 'শিশুতীর্থ'। দেশের খবরে উদ্বেল হয়ে উঠছেন।

১৯৩২-এ গান্ধীর জন্মদিনে বক্তৃতাও দিলেন। আর এই পরিবেশে লেখা চলেছে 'কালের যাত্রা' নাটক বা 'পুনশ্চ'-র গদ্যকবিতা। 'রাশিয়ার চিঠি' ইতিপূর্বেই বেরিয়ে গেছে, অর্থাৎ ১৯৩০ সালে।

নজরুল বা যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত লিখছেন বটে (নজরুলের 'প্রলয় শিখা' এবং যতীন্দ্রনাথের 'মরুমায়া' ১৯৩০-এ), কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ এক নতুন পরিবেশ তৈরি হচ্ছে—১৯৩১ সালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র 'পরিচয়' (বাঙলা সাহিত্যের 'ক্রাইটেরিঅন' বলে কেউ কেউ চিহ্নিত করেছেন যাকে) পত্রিকার প্রকাশে এবং কয়েক বছর বাদ দিয়ে ১৯৩৫ সালে বুদ্ধদেব বসু-র 'কবিতা' পত্রিকার আবহে।

সর্বগ্রাসী নৈরাশ্যের মুখে এলিঅটের কবিতা যেমন বাঙালি কবির মনেও আশা জুগিয়েছে, তেমনি এই পত্রিকাগুলির প্রকাশও বাঙালি সাহিত্যিকদের অপরাজেয় সৃষ্টিক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করেছে সেই যুগে। বিষ্ণু দে-র কবিতা বা প্রবন্ধ এই পত্রিকাগুলিতেই প্রধানত বেরোতে থাকল একে একে।

সূত্রনির্দেশ ও টীকা

১ "As the Non-Co-operation Movement gained force elsewhere, it was not at first greeted with adequate enthusiasm in Bengal. When Gandhi's programme of non-violent non-co-operation was placed before the country, the response of Bengal was a lukewarm kind. The programme appeared too negative, or too much charged with moralistic considerations to be popular. / ... When Gandhi initiated his civil Disobedience in 1930, there was, during the first few weeks of April, a lack of adequate response from official Congress headquarters in Bengal." (Nirmal K. Bose, *Modern Bengal*. বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ১৯৫৯। পৃ ৮৫-৮৬)। এই গ্রন্থেও লেখক শহর ও গ্রামের মানসিকতার পার্থক্যের সূত্রেই রাজনীতি-সমাজনীতি বা সংস্কৃতির চরিত্র বিচার করেছেন। পরে দেখিয়েছেন, গান্ধী-রাজনীতি শহরে অর্থাৎ শহর-কেন্দ্রিক নেতৃত্বের কাছে জনপ্রিয় না হলেও, গ্রামাঞ্চলে অনেকটাই ছড়িয়ে পড়েছিল কিছু কিছু গ্রামসেবকের চেষ্টায়।

২ হীরেন মুখার্জী, 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন'। ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৪৩। পৃ ৪৯।

৩ "১৯২০ থেকে তিনি (গান্ধী) যে দেশে অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রচার চালিয়েছেন, তা হল ক্রমাগত আশাভঙ্গের ফল।" (ঐ, পৃ ৪৯)

৪ "১৯২০ সালে যে গান্ধীজী অসহযোগের বাণী প্রচার করলেন, দেশের অবিসম্বাদী নেতা হয়ে অগণিত জনগণের চিত্ত জয় করলেন, তার কারণ শুধু গান্ধীজী বা কোনো ব্যক্তি বা দলবিশেষের বিদেশী শাসনের অসহনীয়তা সম্বন্ধে আকস্মিক অনুভূতি নয়। কারণ প্রধানত এই যে গান্ধীজীর মতো স্বভাবসিদ্ধ জননেতার কান থাকে সর্বদা দেশের মাটিতে, তাই সেখানে ভূমিকম্পের লক্ষণ দেখে তিনি সংগ্রামশীল কার্যক্রম গ্রহণে সঙ্কোচ করলেন না। দেশের লোকের নাড়ীর খবর তাঁর জানা ছিল, তাই জনগণ যখন খুবই চঞ্চল হয়ে উঠল, তখন উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে তিনি নারাজ হলেন না। ১৯২০ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত যে বিরাট গণ-জাগরণ ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে একটা অদ্ভুত স্পন্দন এনেছিল, তার স্রষ্টা হচ্ছে দেশের জনগণ। গান্ধীজীর মতো পুরুষোত্তমকে পুরোধা হিসাবে স্বভাবতই তারা বরণ করে নিয়েছিল।" (ঐ। পৃ ৫১-২)

আলোচ্য প্রবন্ধে গান্ধীজী, জওহরলাল ও রবীন্দ্রনাথ যে বারবার উল্লিখিত হচ্ছেন, তা ব্যক্তিগত সূত্রে ততটা নয়, যতটা তাঁদের মধ্য দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ বা বিভ্রান্ত বুদ্ধিজীবী কিংবা শিল্পসাহিত্যের কালজয়ী অস্তিত্বকে।

৫ "সরকারী রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে তখন দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে অটুট ঐক্য, তাতে আমলাতন্ত্র দেশে ভয়ে কম্পমান হয়ে উঠেছিল।···দিল্লীতে হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মসজেদ জুম্মা মসজেদের বেদী থেকে বক্তৃতা করেন। যা কেউ কখনও কল্পনা করতে পারে নি, এমনই ঘটনা তখন দৈনন্দিন হয়ে পড়ছিল।" (ঐ। পৃ৫৩)

"১৯২০-২১ সালে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে এসেছিল আশ্চর্য মৈত্রী। ধনীদরিদ্র-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মধ্যে এ মৈত্রী ছড়িয়ে পড়েছিল।" (ঐ। পৃ ৬৯)

৬ প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পরের বছরগুলিতে বাঙালির শিল্পোদ্যম ও কর্মপ্রেরণার যে-সূত্রপাত হয়েছিল, তার অত্যন্ত সোৎসাহ ও আশাবাদী বর্ণনা আছে বিনয়কুমার সরকারের সমকালীন রচনায়। "বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের এই চার-পাঁচ বৎসরের ভিতর আমাদের দেশের যাঁরা করিৎকর্মা লোক—কেহ এঞ্জিনিয়ার, কেহ রসায়নবিদ্, কেহ ব্যাঙ্কার, কেহ

ব্যবসাদার—তাঁরা এক-একটা বড়গোছের দাঁও মারিয়াছেন। সেই সুযোগে আমরা অনেক জিনিষ কিছু-না-কিছু করিয়া তুলিয়াছি। ১৯২৭ সনে সেই শক্তির কথা ভুলিয়া গেলে আমরা বর্তমানের কিছুই বুঝিতে পারিব না।" (বিনয়কুমার সরকার, 'আর্থিক জীবনে পরের ধাপ', 'বাংলায় ধনবিজ্ঞান, প্রথম ভাগ (১৯২৫-১৯৩১)'। চক্রবর্তী চ্যাটার্জি, ১৯৪০। (পৃ ৮৪)

"বাংলা দেশে যাঁহারা চাষ চালাইতেছেন, ব্যাঙ্ক বা বীমা চালাইতেছেন, তেল তৈয়ারী করিতেছেন, পাটের দালালিতে মোতায়েন আছেন, মাল আমদানি-রপ্তানি করিতেছেন, সেই সকল বাঙালীর চিন্তা ও অভিজ্ঞতাই ধনবিজ্ঞানের মশলা। নাই-নাই করিতে-করিতেও এই শ্রেণীর 'ধন-স্রষ্টা' বাঙালী সমাজে আছেন অনেকে।"

(ঐ, 'বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব'। পৃ ৩। রচনাকাল ১৯২৪)

৭ আমরা অনেক লেখাতেই যুদ্ধোত্তর বাঙলা দেশের অর্থনীতির দুই বিপরীত চিত্র পাই। সমকালীন রচনার মধ্যে এ ব্যাপারে প্রকৃষ্ট উদাহরণ বিনয়কুমার সরকার ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। উগ্র বাঙালিয়ানার দিক থেকে উভয়ের মিল আছে বটে—কিন্তু বিনয়কুমার সরকারের রচনায় আমরা যেমন পাই শিল্পবাণিজ্যের অর্থনীতির বিষয়ে বিপুল প্রত্যাশা, তেমনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সংগতকারণেই নৈরাশ্য প্রকাশ করেন আমাদের কেরাণীতৈরির শিক্ষাব্যবস্থায়, আমাদের আলস্য ও উদ্যমহীনতায়।

৮ Bipan Chandra, Amales Tripathi, Barun Dey, *Freedom Struggle*. National Book Trust, 1972। পৃ ১২১-২। অনুবাদ বর্তমান লেখকের।

৯ ঐ, পৃ ১২২। দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন বাঙলার অর্থনীতি বিষয়ে বিনয়কুমার সরকারের আশাবাদী বর্ণনার সঙ্গে পরবর্তী ঐতিহাসিক আলোচনার যে বিরোধ, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সে যুগের প্রত্যাশা ও ব্যর্থতার আসল চেহারাটা।

১০ ইংরেজের নিজের শাসনের স্থায়িত্বের জন্যই "ভারতবর্ষকে আর্থিক হিসাবে কিছু মজবুদ" করা প্রয়োজন। "অর্থাৎ ভারতবাসীকে এঞ্জিনিয়ার হিসাবে, রাসায়নিক হিসাবে, যন্ত্রবীর হিসাবে, চাষী হিসাবে চলনসই ওস্তাদ করিয়া তোলা চাই। ব্যাঙ্ক-বীমার পরিচালনায় ভারতসন্তানকে খানিকটা প্রশ্রয় দেওয়া চাই।" (সূত্র ৬, পৃ ৮৬)

১১ R. Palme Dutt, *India today and tomorrow*. P.P.H, 1955. পৃ ৬০-৬১।

১২ ১৯২৪ সাল থেকেই দেখা যাচ্ছে 'স্বদেশী পুঁজি' ও 'বিদেশী পুঁজি'-র মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং সমন্বয়ের প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছে। দ্র বিনয় কুমার সরকার, 'সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্ম্মকৌশল'। ('সূত্র ৬। ১৯২৪ সালে লিখিত)।

১৩ G. K. Shirokov, *Industrialisation of India*. Progress Publishers, 1973. পৃ ২৩-২৬।

১৪ ১৯২১ সালে আন্দোলন ঠিকমতো শুরু হওয়ার আগেই বস্তুত আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল। তার পরের বছরগুলিতে চৌরি-চৌরার পর দেশে দারুণ অবসাদ এবং ১৯২৪ সালে গান্ধীজী যখন জেল থেকে শারীরিক কারণে ছাড়া পেলেন, তখন ইতিমধ্যেই অসহযোগ আন্দোলন নিঃশেষিত।

১৫ ১৯২০-২২ সালের বিপুল জনজাগরণের কথা ভাবলে সত্যই মনে হবে যে পর্বত মূষিক প্রসব করল।" (সূত্র ২, পৃ ৬৪)

১৬ "বার্দোলি সিদ্ধান্তের পর পাঁচ বছর দেশ যেন অবসাদে ঘুমিয়েছিল।" (সূত্র ২, পৃ ৬৯)

১৭ "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের খবর আর গান্ধী মহারাজের 'ডাণ্ডী' সত্যাগ্রহ আলাদা জাতের কাণ্ড হলেও বোঝা যায় যে সব-কিছু মিলে মিশে একটা ভূমিকম্প-গোছের কিছু ঘটেছিল।" (হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'তরী হতে তীর'। মনীষা, ১৯৭৪। পৃ ২২৪)

১৮ নরহরি কবিরাজ, 'স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা'। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬১। পৃ ২৪৫।

১৮ক V. V. Balabushevich, A. M. Dyakov *ed.*, *A Contemporary History of India*. P.P.H. পৃ ১৭৫।

১৯ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেই প্রথম ব্যাপকভাবে চালু হল 'দালাল', 'ফড়িয়া', 'ভেজাল', 'কালোবজারী', 'তেজারতি' ইত্যাদি শব্দগুলি [দ্র বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের গবেষকগণ কর্তৃক লিখিত '"আর্থিক উন্নতি"-র তিন বৎসর'। 'আর্থিক উন্নতি', বৈশাখ ১৯৩৬। সূত্র ৬, পৃ ৫১৪-৪৬]।

২০ এই সময়ের প্রত্যক্ষ ছাপ পড়েছে বিষ্ণু দে-র এমন বহু কবিতাই 'চোরাবালি' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। যেমন, ১৯২৫-৩০ সালে রচিত 'গার্হস্থ্যাশ্রম', ১৯২৮ সালে 'প্রথম পার্টি', ১৯৩২ সালে 'কবিকিশোর', ১৯৩৩ সালে 'শিখণ্ডীর

গান', ১৯৩৪ সালে 'বেকার বিহঙ্গ' ইত্যাদি।

২১ যোগেশচন্দ্র বাগল, 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'। এস্ কে মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১ম সং ১৩৪৭। পৃ ৪৩৯।

২২ G. B Jathar & S. G. Beri, *Indian Economics.* OUP. পৃ ৫১৬। অনুবাদ বর্তমান লেখকের।

২৩ সূত্র ২১, পৃ ৪৬২।

২৪ সূত্র ২, পৃ ৭৮।

২৪ক এই অংশটির যুক্তিক্রম ও উদ্ধৃতির উৎস A. R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism.* Popular Prakashan, Bombay. পৃ ৪৩৬-৪৩৮। অনুবাদ বর্তমান লেখকের।

২৫ বিষ্ণু দে, 'টমাস স্টার্ন্স্ এলিঅট', 'এলোমেলো জীবন ও শিল্প-সাহিত্য'। ইস্ট এণ্ড কোম্পানী। পৃ ৮১।

২৬ ঐ। পৃ ৮৭।

"And Mr Eliot reached this very British India about 25 years ago. He came to be an influence, felt a fruitful, perhaps in the late twenties....And then came the impact of his poetry and his criticism. It came at the right time of the happy though hollow twenties, before the fruit had turned bitter. It came at the right time, even in India. And it came at the peak of a nervous exultation and was followed by the late Beethoven.... The impact of the *Ariel* poems grew out of that, as did that of *Ash Wednesday*, like Mahatma Gandhi's civil disobedience with some 90,000 political prisoners, and faith in torture and hope with a hundred qualifications...The Eliotites were a minority even among that minority who could understand Gandhiji's pendulous ethics or Tagore's open-air belief nurtured in strong seclusion."

(Bishnu Dey, 'Homage to T. S. Eliot', *In the Sun and the Rain.* P.P.H. p. 172-3).

সমান্তরাল চলচ্চিত্র

গুরুদাস ভট্টাচার্য

১: প্রস্তাবনা

দিল্লীতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবের সঙ্গে দুদিনের একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। আলোচ্য বিষয় ছিলঃ 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র'। চলচ্চিত্র-সাংবাদিক-পরিচালক-সমালোচক এবং ফিল্ম-সোসাইটি প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে তাঁদের সামনে একটি সংক্ষিপ্ত সঠিক প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। তার ভিত্তিতে তাঁরা স্ব-স্ব বক্তব্য লিখে পাঠিয়েছিলেন এবং পরে সভায় আলোচনা করেছিলেন।

মূল প্রস্তাবটি ছিলঃ প্রত্যেক দেশেই চলচ্চিত্রের রীতি-নীতিগুলির থেকে থেকে পুনর্মূল্যায়ন হয়। এতদ্বারা চলচ্চিত্রকারেরা জানতে পারেন, এই শিল্প-মাধ্যমটি সমাজে কোন জাতীয় ভূমিকা পালন করছে অথবা কোনো ভূমিকাই তার নেই। একথা সর্ববাদীসম্মত যে চলচ্চিত্রের দায়িত্ব দ্বিবিধ—দর্শককে সমাজ-সচেতন করে তোলা এবং চলচ্চিত্র-শিক্ষিত করে তোলা। এবং দুই ক্ষেত্রেই এমন এক শিল্পানন্দের স্বাদ দেওয়া যা মানুষকে ভুলিয়ে দেয় না, দুলিয়ে দেয়। তাই বারে বারে নতুন পথের সন্ধান জরুরী হয়ে পড়ে, নতুন চ্যালেঞ্জ-গ্রহণের, যার মোকাবিলা প্রতিষ্ঠিত কমার্শিয়াল চলচ্চিত্রের সীমান্তে থেকেই সম্ভব। বাণিজ্যিক ছবির ছকবাঁধা প্রমোদ-ফর্মুলা পরিত্যাগ করে বাস্তবে অবগাহনরত যে সাম্প্রতিক ভারতীয় ছবি, তাকেই বলা হচ্ছে 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র'। কেউ বলেন 'নব্য' বা 'অন্য' সিনেমা। এরই আওতায় আজ আবির্ভূত নতুন কৃতীর দল, নয়া শিল্প ও শৈলী, নবীন মেজাজ ও কাজ। অধিকাংশ ছবি সরকারী, কয়েকটি বেসরকারী প্রযোজনায় তৈরি, কিছু দর্শক-সম্বর্ধিত, বেশ-কিছু এখনও মুক্তির অপেক্ষায়। এই ছবিগুলিকে এবং তাদের সমস্যাবলীকে কেন্দ্র করেই নির্ধারিত হবে আলোচনাচক্রের বিচারধারা সমকালীন-পরিবর্তমান সমাজে কি-ধরনের ছবি হওয়া উচিত, চলচ্চিত্রকার কেমন ছবি করবেন। এছাড়া

এসরের উৎপাদন-পরিবেশন-প্রদর্শন বিষয়ক জটিলতাও বিবেচনা করে দেখো হবে।

এবার, প্রেরিত পেপারগুলির অতিসংক্ষিপ্তসার একে-একে :

২. প্রবন্ধ-সংকলন

চার্লস কুপার :

আদিম প্রশ্নটা হচ্ছে, "সমান্তরাল চলচ্চিত্রের সত্যিই কি কোনো প্রয়োজন আছে?" আমার বরাবরই বিশ্বাস আছে। এ-ধরনের ছবি প্রসঙ্গে আমার অভিজ্ঞতাও আছে। অনেক দেশে এ ছবির এখনও শৈশবাবস্থা। বিভিন্ন দেশের সমজাতীয় ছবির বিনিময়-ব্যবস্থা থাকা উচিত। তাতে পরস্পরকে অতি সহজে জানা যায়; যেমন জানি পোল্যাণ্ডকে আন্দ্রেই ভাইদার মাধ্যমে, বা ভারতের গ্রাম-শহরের জীবনকে সত্যজিৎ রায়ের মাধ্যমে। এতদ্দ্বারা বিশ্ব-সংস্কৃতিরও উন্নতি ঘটে। এবং উন্নত হয় সাধারণ দর্শকের ছবি ও মান, যাকে দাবিয়ে রেখেছে মার্কিনী ওয়েস্টার্ন-ক্রাইমথ্রিলার। তার জন্যে চিত্রকারকে স্বাধীনতা দিতে হবে সমাজ-সমালোচনার। তাতে সমাজেরই হিম্মত প্রমাণিত হবে।...সমান্তরাল চলচ্চিত্রের এলাকায় বড় ছবি বেশি হতে পারে না, তাতে খরচ বেশি। ছোট ছবির মদত তাই বেশি দরকার। তথ্যচিত্রও এর শামিল হতে পারে। টেলিভিশন একটা বড় সহায়। এবং ১৬ মি. মি. ছবি। নিবেদিতপ্রাণ শিল্পীকে সমবেত অর্থসাহায্য দেওয়া যেতে পারে। সরকারও এগিয়ে আসবেন। এ-ধরনের ব্যাপার ব্রিটেনেই ঘটছে। কিছু সৎ সমালোচক আছেন, কয়েকটা চিত্র-গৃহ, এবং ৬৮০ ফিল্ম সোসাইটি আছে, যারা সমান্তরাল চলচ্চিত্রকে জনগণের সামনে আনার দায়িত্ব পালন করে। ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্সটিটিউট পরিচালিত পার্ট-টাইম চিত্রগৃহগুলি তো আছেই। আসলে দরকার সংগঠন, সামষ্টিক প্রচেষ্টা, হয়তো চিত্রগৃহের লাগোয়া একটা থিয়েটার বা আর্ট গ্যালারি বা রেস্তোরাঁ। তাতে দর্শক ভিড় করবে। 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র' অবশ্যই প্রয়োজন, যাতে জাতি আপন মুখ-মুখোশ বা মুখশ্রী দেখতে পাবে।

ফিরোজ রংগুনওয়ালা :

যখনই বলা হচ্ছে 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র', তখনই একটা লেবেল মেরে দেওয়া হচ্ছে। চলচ্চিত্রের মতো এমন একটা শিল্পকে এভাবে লেবেল

এঁটে শ্রেণীবিভক্ত করে দেওয়ার কোনো অর্থ হয় না, প্রয়োজনও নেই। তার চেয়ে বলা ভালো—'ভালো' বা 'ভালোতর চলচ্চিত্র'। এদিকে মেনে নিচ্ছি, চলচ্চিত্র একটা জন-মাধ্যম, ওদিকে তার একটা উপ-স্রোতকে সরিয়ে নিতে চাইছি জনতা থেকে। তা কেন হবে? 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র' কি চিরটাকাল ছোটটি হয়ে থাকবে? প্রতিপালিত হবে? নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে না? গণমুখী হবে না? আমার মতে, একে এভাবে আলাদা না রেখে মূল স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া উচিত। তাতে কমার্শিয়াল সিনেমাও যেমন ভালোতর হতে চাইবে, আলোচ্য ছবিও অধিকতর দর্শকের কাছে পৌছবে। দর্শক তথা সমাজের কথা মনে রেখে চিত্রকার ছবি তুলবেন; ছবির মধ্যে আত্মদর্শন করে দর্শকও ক্রমে শিক্ষিত হয়ে উঠবে। এ না হলে, কোনো লেবেল দিয়েই কোনো ছবিকে বাঁচানো যাবে না। ভারতীয় ছবির ঐতিহ্য বাষট্টি বছরের। বারো হাজার ছশোরও বেশি ছবির, এবং সাড়ে বত্রিশ ভাজার মিশাল দেওয়া চিত্ত-বিনোদনের। হরেকরকমবা দর্শকও জানে না, ঠিক কোনটি তার চাহিদা। সামাজিক শক্তির টানাপোড়েন নিয়ে তার মাথাব্যথা থোড়াই। ঠিক এই বিন্দু থেকেই নতুন ছবি-করিয়েদের যাত্রারম্ভ করতে হবে এবং পরিবর্তনের সূচনা করতে হবে। একেবারে বিপরীত বিন্দুতে গিয়ে বসে থাকলে কোনো ফল হবে না। নন্দনতত্ত্ব বা স্টাইলের মেঘবাহন ছেড়ে তাঁদের নেমে আসতে হবে কঠিন মাটিতে, জনগণের মাঝখানে। বক্তব্য যদি একটা থাকে, নিরীক্ষা-নবীনতা আপনিই এসে যাবে। ছবি যদি আকর্ষণীয় হয় দর্শক আসবেই। তখন আর ক্রাচের দরকার হবে না। তখন দরকার হবে চিত্রগৃহের—ছোট, আধা-স্থায়ী, কাজচলা-গোছের হলেই চলবে। উৎপাদন পরিবেশনের একচেটিয়া বৃত্তিকে ভাঙার জন্যে দরকার হবে সরকারী সহায়তার। শেষত, চলচ্চিত্র-সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থা করতে হবে—ইতিহাসচর্চা আলোচনার মাধ্যমে। চলচ্চিত্র এবং জনগণ—কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

বাসু চ্যাটার্জি :

সমাজ ও শিল্পের প্রতি চলচ্চিত্রের যেমন একটা দায়িত্ব আছে, তেমনি আছে দাদন-দেওয়া অর্থের প্রতিও। চলচ্চিত্রের মতো ব্যয়বহুল শিল্পের মধ্যে বাণিজ্যের উপস্থিতির কথাটা ভুললে চলবে না। দেওয়া-

টাকা ফেরৎ না পেলে এফ.এফ.সি-ও টাকা দেবে না। কাজেই নতুন ধারার ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করাটাই হবে প্রথম কাজ। তার জন্যে চাই আর্ট থিয়েটার যতগুলো সম্ভব; নতুবা অন্তত প্রতি শহরে একটা করে। এই চার বছরে মাত্র একটাই করা হয়েছে। আমি একথাও বলব, এফ.এফ.সি. নতুন ছবির জন্যে টাকা দেওয়া বন্ধ করুক, এবং আর্ট-থিয়েটার গড়ার চেষ্টা করুক। এগুলি আর্ট-ফিল্মের উপযোগী যেমন, তেমনি সমঝদার দর্শকও পাওয়া যাবে। বড় চিত্রগৃহে তা সম্ভব হবে না। আর একটা সমস্যা—কেমন ছবি তৈরি করা হবে? তার লক্ষ্য কী হবে? স্রষ্টার আত্মসন্তোষ অথবা দর্শকের চিত্তানুশাসন? এসবই বিতর্কিত বিষয়। আমার মত—শিল্প যদিও সর্বজনীন, ছবি হবে স্বদেশের জন্যে, তাহলেই সে হবে সর্বজনের। আমাদের স্বাধীনতা থাকবে, সেই সঙ্গে আন্তরিকতা। পরিচালককে মনে রাখতে হবে তাঁর সামাজিক দায়িত্ব এবং বাণিজ্যিক দায়িত্বের কথা।

কুমার শাহানী:

স্বাধীনতালাভের অল্প পরেই আমাদের দেশে যে প্রথম চলচ্চিত্র-উৎসব হয়, তার প্রভাব আজও মুছে যায় নি। নব্য বাস্তবতার সেইসব দৃষ্টান্ত ভারতীয় ছবিতেও দেখা দিল নিছক প্রাকৃতিক বাস্তবতার চিত্রগ্রহণে, যার সঙ্গে মিশে ছিল অতিনাটকীয়তা, অন্তর্দ্বন্দ্বের আতিশয্য। আপাত-দৃষ্টিতে বাস্তব, আসলে ছায়ার মায়া, জীবন থেকে পলাতক। প্রগল্‌ভ কমার্শিয়াল ছবি থেকে এরা খুব দূরে নয়। যেমন ডিটেলস-এর বাস্তবতা—যার অর্থ সমাজসত্যকে, শ্রেণীসম্পর্ককে এড়িয়ে যাওয়া। দর্শকের বিচার-বুদ্ধি জাগাবার চেষ্টা না করে সেই সনাতন রীতিতে নায়ক-এর সঙ্গে তার একাত্মীভবন! সচেতন শিল্পবোধের অভাবে কারিগরী কৌশলের ব্যবহার, যা দেখে আমাদের মতো অনুন্নত দেশের লোকেরা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, লজ্জায় লাল হয়ে ওঠেন সত্যিকারের চলচ্চিত্রমনস্কগণ। আমাদের সুপরিচিত চলচ্চিত্রকারদের কেউ কেউ বোধির কথা উচ্চারণ করেন। তার অর্থ, চিন্তার-ধারণার-বক্তব্যের খাম্‌তি। বিবৃত কাহিনীই হয়ে ওঠে সর্বব্রহ্ম! নান্দনিক শৃঙ্খলা হয়ে ওঠে শূন্যবাদী! ফলত, সেই আবেগের মোক্ষণ, সেই আত্মিক পলায়ন, সেই চেতনার সুষপ্তি! ধন-বাদী সমাজে আর সবকিছুর মতো চলচ্চিত্রও বাণিজ্যদ্রব্য, স্রষ্টা ও ভোক্তা

উভয় কোটিই-অমানবীকৃত। এই অবস্থার অবসান ঘটানো দরকার। 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র'র দায়িত্ব এইখানেই, তার স্বগত সংস্কৃতির নির্মাণে, ঔপনিবেশিক ও সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা থেকে বেরিয়ে নতুন ভাষার সৃষ্টিতে। যেমন করেছেন ঋত্বিক ঘটক, আদিম মাতৃকা-চেতনাকে ধর্ম-বিরহী আধুনিক রূপ দিয়েছেন। নির্মাণশৈলীর উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে বক্তব্য উদ্‌ঘাটনী ভাষার দৃষ্টান্ত হাংগেরীর জ্যান্‌স্‌কো এবং ফ্রান্সের ব্রেসঁর কাজ। সম্প্রতি এদেশেও এর আভাস ফুটে উঠছে। বস্তুত, অ-প্রদর্শনই সমান্তরাল চলচ্চিত্রকে আক্রমণের লক্ষ্য করে তুলেছে। বাজারী হয়ে ওঠার চেষ্টাতেই এফ.এফ.সি-র মৃত্যু অবধারিত। এটাও তখন হবে আর একটা ব্যাঙ্ক মাত্র। অন্যপক্ষে জনগণের রুচিকে ছবি দেখিয়ে ও শিখিয়ে উন্নত করার চেষ্টা চালাতে হবে। ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের হৃত-হত বোধ-বুদ্ধিকে।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত :

তথাকথিত সমান্তরাল চলচ্চিত্র সুবিধাভোগী শ্রেণীর চিন্তার দ্বারা অধিশাসিত এবং পাশ্চাত্যের ব্যতিক্রমধর্মী ছবির দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত। অথচ ভারতের ও পাশ্চাত্যের বাতাবরণ একেবারে আলাদা। ওদেশে চলচ্চিত্রের স্রষ্টা এখন শিল্প-বিশেষজ্ঞ, দর্শক শিক্ষিত-রসিক, প্রদর্শনীস্থল আর্ট-থিয়েটার, ফিল্ম-সোসাইটি, বিশ্ববিদ্যালয়। মুভী ক্যামেরা হাতে-হাতে। টেলিভিশনের অভিঘাতে ছবিও এখন আর নিছক গল্প বলে না। ভারতে টেলিভিশনের ক্ষেত্র যতই বাড়ুক, তার গণ-মাধ্যম হতে এখনও অনেক দেরি। একটা সেটের তুলনায় সিনেমা-টিকিটের দাম শস্তা। সবার ওপর, টিভিতে চলচ্চিত্রের দাপট ক্রমেই বর্ধমান। এবং এ-অবস্থা চলতেই থাকবে। চলচ্চিত্রের বিবর্তনে এর প্রভাব পড়বেই। হলিউডে যেমন চলচ্চিত্রিক শিল্প ও বাণিজ্যের মণিকাঞ্চন-যোগ বারবার ঘটেছে, ভারতে তা হয় নি কেন? কেন এখানে নতুন নতুন যান্ত্রিক উপকরণ ও শৈল্পিক উপাদান গড়ে ওঠে নি? বিশ্ব-চলচ্চিত্রে নতুন কোনো অবদান রাখে নি কেন? ভারতীয় চলচ্চিত্র অচল-চিত্র কেন? কেন সে আজও বিচিত্রানুষ্ঠান মাত্র? এসবের একটাই কারণ—ওদেশে সকলে কারিগরী বিজ্ঞানের আবহাওয়ায় বাস করে। আর ভারত কৃষি-প্রধান। অর্থাৎ, একটি বিজ্ঞান-অন্যমনস্ক সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে একটি বিজ্ঞানসম্মত মাধ্যম। সেই কারণেই, হলিউডের সমানবয়সী এবং স্থূলাংগী হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব-চলচ্চিত্রের মূল ধারা থেকে

ভারতীয় ছবি বহুদূরবর্তী। স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতে কারিগরী বিজ্ঞানের বিবর্ধন, এবং কে না জানে, এর ফল ভোগ করে সুবিধাভোগী শ্রেণী, জনগণ থাকে বঞ্চিত। দেশ ধনী হয়েছে, সাধারণ মানুষ দরিদ্রতর। অনুসন্ধান-কমিটি করেও দেশীয় ছবির অবনতি ঠেকানো যায় নি। শুধু একটা-দুটো ইতস্তত দৃশ্যে নয়, প্রগল্‌ভতা এখন তার সর্বাঙ্গে। যত সব নয়াধনী, অশিক্ষিত, কালোবাজারী, লুমপেন প্রলেতারিয়েত এর উপভোক্তা। গণ-চলচ্চিত্রের গণিকা-বৃত্তির শিকার ফুটপাথের শিশু ও কিশোরের দল। তথাকথিত সমান্তরাল চলচ্চিত্রও সাধারণ মানুষের কথা ভাবে না, সমাজসত্যকে দারিদ্র্যকে চোখ মেলে দেখে না, দেখায় না। তারা প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে আমাদেরও আন্তনিওনি-ব্রেসঁর অভাব নেই! সে কারণেই সমান্তরাল চলচ্চিত্রের অনেক ছবিতে বড়-বড় ভাণ, বিদেশের অনুলিপি। এদিকে কারিগরী বিজ্ঞানের প্রতাপ বেড়ে চলেছে দেশের মধ্যে, জনগণের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে, যার নেতৃত্ব দিতে পারে একমাত্র চলচ্চিত্র। সমান্তরাল চলচ্চিত্র তখন হয়ে উঠবে জন-চলচ্চিত্রের বীক্ষণাগার, নব নব ভাবের ও আঙ্গিকের। তখনই সে ফুটে উঠবে স্বরূপে ও স্বমহিমায়, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী সমভাবে, আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

আদূর গোপালকৃষ্ণ :

আমার মনে হয়, 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র' নামটা বেঠিক। এতদ্দ্বারা একে যেন অস্পৃশ্য হরিজন বলে চিহ্নিত করা হয়। মনে হয়, এমন এক জাতের ছবি, যা অদর্শকস্পর্শ্য! চিত্রকররা ব্যর্থতাবোধে আক্রান্ত। অনেকে ভাবেন, এই অস্পৃশ্যতাই বুঝি শুদ্ধ চলচ্চিত্রের গুণ! অন্যরাও ভাবে, এসব শুধু কতিপয় মস্তিষ্কেরই যোগব্যায়াম মাত্র! এভাবে কোনো আন্দোলন হয় না, ত্রিকোণের একটা কোণ না থাকলে বাকি দুটোরও অস্তিত্ব থাকে না। আমি তাই বলব 'নিউ সিনেমা'—যে স্বাধীন, প্রথামুক্ত, নতুন রীতিতে জীবনটাকে দেখতে আগ্রহী। স্বভাবতই, অন্য-ছবিতে-অভ্যস্ত-দর্শকের ভালো লাগে না। তবু একে ব্যর্থ বলব না। এ থাকতেই এসেছে। এখন দেখতে হবে, চলচ্চিত্রের মূল ধারার মধ্যে এ কতটা অনুপ্রবেশ করেছে। যেমন করেছে ফ্রান্সে বা আমেরিকায়। সেক্ষেত্রেও দর্শকের ভূমিকা অনন্য। এদেশে নতুন ছবি তারা দেখতেই পায় না। ফলে, প্রভাবের অবকাশও মেলে না। তাছাড়া, এর নিজস্ব সমস্যাও আছে—আর্থিক, সামাজিক, কারিগরী কৌশলগত। দর্শককে শিক্ষিত করে

তোলার ব্যাপারও আছে। ফিল্ম-সোসাইটির অবদান অসাধারণ, তবু তাদের কাছে বেশি প্রত্যাশার অবকাশ নেই। কমার্শিয়াল ছবির ভেঁপু চলচ্চিত্র-সাংবাদিকদের কাছেও কিছু আশা করা মূঢ়তা। অন্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর যখন চলচ্চিত্র-চর্চায় মুখর, আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের অনীহা ও অজ্ঞতা তখন পাহাড়প্রমাণ। এসব না দূর করলে নব্য চলচ্চিত্র আন্দোলন এগোতে পারবে না। আর, একে এগোতে হবে নিজের জোরে, স্ব-তন্ত্র পথে, আত্মিক শক্তিতে।

কিরণময় রাহা :

হিন্দী কমার্শিয়াল ও তস্য অনুগামীদের প্রসার-প্রতাপ-প্রভাব সকলের জানা। সচেতন ব্যক্তি তাই এর বাইরে 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র'-র কামনা করে, যা বেচা-কেনার জন্যে নয়। আবার, শিল্পনিষ্ঠ চলচ্চিত্রেরও চাই সহৃদয় তথা সমান্তরাল দর্শক। এটা বেশ শক্ত কাজ। কারণ, যে নামই দেওয়া যাক না কেন, এ জাতীয় ছবির শুধু নেতিবাচক গুণ থাকলেই হবে না, ইতিবাচকতাও থাকা দরকার। একদিকে রায়-সেন-ঘটকের কারনাড-সথ্যু-বেনেগালের জন-প্রিয় ছবি, অন্যদিকে মণি কাউল এবং কুমার শাহানীর ব্যক্তিগত চলচ্চিত্র—এ দুটোর মধ্যে কোনটি গ্রহণীয়, তা বেছে নিতে হবে। বুঝে নিতে হবে, কোন পথে রূপ নেবে চলচ্চিত্র-সংস্কৃতি। এখনও সে সময়-সুযোগ আসে নি। অন্য দেশের সমজাতীয় ছবির দৃষ্টান্তও কোনো কাজে লাগবে না; যেহেতু, আমাদের সামাজিক-বৌদ্ধিক পরিস্থিতি আলাদা। এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে বিচার করলে তবেই 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র' বিষয়ক আলোচনা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করি।

রাজন নারায়ণ :

আমি জানি না, 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র'র ওপর মূল প্রস্তাবনাটি কে তৈরি করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি ওটাকে আপত্তিকর বলে মনে করি। নব-তরঙ্গের স্বরূপ ওতে ফুটে ওঠে নি, পালাবদলের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয় নি। আমি বিশ্বাস করি, চলচ্চিত্র বিবর্তনের সহায়ক, এবং ভারতীয় ছবির বণিকরা সজ্ঞানে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চায়। আমি মনে করি, চলচ্চিত্র একটি গণশিল্প, কোনো নান্দনিক তত্ত্ব দিয়েই একে খণ্ডন করা যায় না। চলচ্চিত্র যাঁদের কাছে আত্মলীলা, ইতিহাসে তাঁদের স্থান নেই—যেমন নেই মণি কাউল, বা এমনকি, সত্যজিৎ

রায়েরও। এঁরা নতুন কোনো চলচ্চিত্রনীতি নিয়ে আসতে পারেন নি। ভারতীয় চলচ্চিত্রের মূল ধারার সঙ্গে এইসব নবীন সাহসী জেহাদীদের মৌলিক পার্থক্য—সৃষ্টি ও দর্শকমনস্কতা, দুক্ষেত্রেই। বি. আর চোপরার স্মরণীয় ঘোষণা —চলচ্চিত্র "রণ্ডিকা পেশা"! এঁদের কাছে সাবান বা দেহ বেচা এবং ছবি তৈরি, একই ব্যাপার। এ থেকেই এর যাবতীয় চরিত্রহীনতা। নবতরঙ্গর শিল্পীদের কাছে চলচ্চিত্র জীবনকে দেখানোর একটা মাধ্যম, বাস্তবকে নতুন প্রেক্ষিত দানের। এখানে ছবি হয়—তারকা-প্রথায় নয়—মূল বক্তব্যের বা পরিচালকের স্ক্রীপট-এর অনুগমনে। এসবই নতুন দিগদর্শন। তাই বলে, সেই অহংকারে আভিজাত্যের স্বাতন্ত্র্যবোধ যেন না জাগে। দর্শকচিত্তের সীমাবদ্ধতার কথাও যেন মনে থাকে। হঠাৎ নতুন একটা-কিছু করা ঠিক হবে না। তাই, প্রস্তাবনার সংজ্ঞাকে আমি মেনে নিতে পারছি না। যে-পরিবর্তন গত কয়েক বছরে ভারতীয় চলচ্চিত্রে দানা বাঁধছে, তাকে আমি 'সন্ধিক্ষণের ছবি' বলতে চাই, যেখানে বাণিজ্যিক ছবির ভাষায় সত্যকার সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক ছবি হয়। যেমন 'দুসরী সীতা', 'কোরা কাগয', 'নমক হারাম', যার চূড়ান্ত রূপ 'অংকুর', 'গরম হাওয়া', '২৭ ডাউন'। বাণিজ্যপাড়ার ফ্যাণ্টাসি-চক্র থেকে ভিন্ন এক ধরনের নব্য-বাস্তবতা, যা দর্শককে ভাবায়। এই পালাবদলের ব্যাপারটা এফ. এফ. সি ধরতে পারে নি। তাই তার একদিকে মণি কাউল ও কুমার শাহানীর দল, অন্যদিকে 'দস্তক', আর মাঝখানে 'গ্রহণ' কি 'ডাক বাংলা'র মতো রদ্দি ছবি। আঞ্চলিক ছবিগুলোর তো কোনো মূল্যই নেই। 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র' নামকরণ থেকেই এফ. এফ. সি-র দোদুল্যমান মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ, মূল প্রশ্ন হল—চলচ্চিত্র ইণ্ডাস্ট্রীকে কিভাবে ভেতর থেকে বদলে দেওয়া যায়, তার ধারে বসে বীজ বোনা নয়। তার জন্যে চাই একটা সুবিহিত নীতি। এবং ছবিগুলো দেখানোর সুব্যবস্থা। তবেই দর্শকের রুচি-বদল ঘটবে। সেটা ইতিমধ্যেই ঘটছে। 'রজনীগন্ধা' বা 'অংকুর'-এই তা প্রমাণিত। একে উৎসাহ দিয়ে বাড়াতে হবে, তার জন্যে দর্শক-মনস্তত্ত্বের সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহ ও গবেষণারও দরকার হবে, নোংরা প্রগল্ভতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে নেমে আসতে হবে ধূলিধূসরিত জমিনের ওপর।

এন. ভী কে. মূর্থী :

'সমান্তরাল চলচ্চিত্র' অর্থে কেবলমাত্র বকস-অফিস-ছক-বিরোধী স্বল্প ব্যয়ে তৈরি ছবি নয়। এরও আরও শ্রেণী রূপ আছে। যেমন : (১) আঞ্চলিক

ছবি (২) শিল্পমণ্ডিত এবং আত্মপ্রকাশ-মুখর ছবি (৩) প্রতিবাদের ছবি। আঞ্চলিক ছবি বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ হয়েই সর্বজনীনতার অভিমুখী। যেমন, সত্যজিৎ রায়ের বা কন্নড় বা মালয়ালী ছবি। শৈল্পিক ছবির আবেদন, স্বভাবতই, খুব সীমিত। প্রতিবাদের ছবির আবেদন খুব বেশি, সামাজিক ভূমিকাও। এগুলির প্রদর্শনী অত্যন্ত জরুরী, সামাজিক দায়িত্বও বটে। এতদ্বারা দর্শকের শিল্পবোধ এবং জীবনচেতনা উন্নত হবে।

জগ মোহন :

ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন, ফিল্ম ইনসটিটিউট, ফিল্ম আর্কাইভ, ফিল্ম ফিনান্স করপোরেশন, একদল সাহসী ছবি-করিয়ের আগমন, এঁদের স্বাক্ষরিত ছবি, সেই সব ছবি দেখানোর আন্তরিক প্রচেষ্টা—ইত্যাদি কার্যকারণে ভারতীয় 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র'র আবির্ভাব সম্ভাবিত হয়েছে। এ-আবির্ভাব সাময়িক নয়, স্থায়ী। সেই স্থায়ী আসন দখলের জন্যে এবং বিশ্বের তাবৎ নবীন সিনেমার সমস্তরে ওঠার জন্যে এখনও কিছু সময় লাগবে। প্রয়োজন নিরলস চেষ্টা এবং প্রগতিশীল দৃষ্টি। একদিকে এর শেকড় থাকবে গভীরে, অন্যদিকে চলবে রদবদল, নবীনতার সঞ্চার। উপযুক্ত ছবি দিয়েই তা করতে হবে, দর্শকের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দিতে হবে। এই কাজই বর্তমানের ছবিকারদের; আগামীরা রিলে-রেসে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। শেকড়ের সঙ্গে যোগ রাখতে হলে, প্রথমত, আমাদের প্রাচীন 'রস' ও 'ধ্বনি' তত্ত্বের দিকে মুখ ফেরাতে হবে; দ্বিতীয়ত, মানুষের, তার জীবনের মধ্যে ডুব দিতে হবে, তাদের হৃৎ-স্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে; দেশের মধ্যে যে বাহ্যিক-আন্তরিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে, তাদের তুলে ধরতে হবে। আজকের চলচ্চিত্রকে হতে হবে ভারতীয় সংস্কৃতির, জাতির, জাতীয় সামষ্টিক চেতনার দর্পণ-অঙ্গ-ব্যাখ্যাস্থল। তৃতীয়ত, চলচ্চিত্র যে দর্শনীয়, দর্শকের সহযোগিতা-ধন্য, একথা মনে রাখতে হবে; সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগবে এই চেতনা থেকেই। শেষত, আমলাতন্ত্রকেও এর যোগ্য হয়ে উঠতে হবে।

গ্যাসটন রোবের্জ :

নতুন-একটা কিছু হলেই তার গায়ে লেবেল লাগানো কোনো কোনো শিল্পসমালোচকের বাতিক। এতদ্বারা, সেই শিল্পটির বৈশিষ্ট্যগুলি নজর এড়িয়ে যায়। যেহেতু কয়েকটা ছবি জনপ্রিয় বাণিজ্যিক ছবি থেকে একটু আলাদা

হয়েছে, অমনি তাদের 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র' বলে আখ্যাত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। মৃণাল সেনের ইদানীংকালের ছবিগুলি তো বাণিজ্যিক ছবি থেকে আলাদা, তা বলে সেগুলিকে আর 'সমান্তরাল' বলা হয় না। আসলে, যে ছবি কমার্শিয়াল ফরমূলা ত্যাগ করে অন্য নান্দনিক নিয়মকে গ্রহণ করে, কিংবা যে-ছবি সরকার-বিরোধী বা ধর্ম-বিরোধী জাতীয় কোনো মতামত প্রকাশ করে, একমাত্র তাদেরই 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র' বলা যেতে পারে। প্রথমটি অবহেলিত হয়, দ্বিতীয়টি বাজেয়াপ্ত। অতএব, প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে, এ-ধরনের বিরোধী ছবিকে এসট্যাবলিশমেণ্ট কতদূর পর্যন্ত সাহায্য করতে পারে? যেহেতু, এই সাহায্য না পেলে কোনো চলচ্চিত্র দাঁড়াতেও পারে না। এবং কমার্শিয়াল ছবির সমান্তরালে স্থিত চলচ্চিত্র প্রযোজকদের নিছক আত্মসুখেরই কারণ, অর্থাৎ অভিজাত চলচ্চিত্রই, হতে পারে। এটা কি অর্থের অপচয় নয়? তার চেয়ে, মূল ধারার মধ্যে থেকেই ভালো ছবি তৈরির ব্যবস্থা উচিত নয় কি? যেহেতু, সমান্তরাল নয়, গোটা বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রটাই বদলানো দরকার। এটা করতে পারেন তাঁরাই, যাঁদের সৃষ্টি 'পথের পাঁচালী', 'চেমীন', 'ববী'। আবার, বদলাতে গিয়ে দর্শকের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটানোটাও কোনো কাজের কথা নয়। সরকার, ইণ্ডাষ্ট্রি, জনগণ, তিনে মিলেই চলচ্চিত্রের বিবর্ধন সম্ভব। এবং শুধু ভালো ছবি তৈরি করলেই হবে না, তার উপভোগের জন্যে সমর্থ দর্শকও চাই। দর্শকের সামর্থ্য বাড়ে চলচ্চিত্র-শিক্ষায়—ফিল্ম-সোসাইটির প্রসারণ এবং শিক্ষায়তনে চলচ্চিত্র বিভাগের মাধ্যমিকতায়। তাদের শেখাতে হবে, এবং দেখাতে হবে এইসব ছবি। তার পরিণামে, তথাকথিত 'কমার্শিয়াল' ছবি সত্যিকার চিত্ত-বিনোদিনী হয়ে উঠবে। তারই জন্যে চাই ইণ্ডাষ্ট্রি-সরকার-দর্শকের ঘনিষ্ঠতা ও সহযোগিতা।

বি. ভি. ধরপ:

ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক ডি. জি. ফাল্কে এবং শিল্প-চিত্রের প্রজাতা সত্যজিৎ রায়ের মধ্যে কয়েকটা বিষয়ে মিল আছে—দুজনেই স্ত্রীর গয়না বিক্রি করেছেন, বীমা-পত্র বাঁধা দিয়েছেন! এবং 'পথের পাঁচালী' থেকে যে 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র' প্রজাত হল, দেশে দেশে তার বিভিন্ন নাম-রূপ। মূলত, নিরীক্ষামূলক, ব্যক্তিগত। 'দিল'-এর নয়, সত্যজিৎ রায় যেমন বলেছিলেন, 'দিমাগ'-এর। অর্থাৎ একমুঠো লোকের। এবং ভারতের মতো সংখ্যাগুরু অশিক্ষিত লোকের দেশে সেই সংখ্যালঘুত্বও অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া

বোঝা যায় না। এই বিপুল অশিক্ষিত-অদীক্ষিতের রুচি আর্ট-ফিল্ম দেখে বদলে যাবে—এটা বড্ড বেশি প্রত্যাশা। চারপাশের লড়াইকে ভোলবার জন্যেই তারা ছবি দেখতে আসে। তাও, লোকসংখ্যার তুলনায় কতজন? সে-কারণেই, প্রচুর ঢাকঢোল পেটানো সত্ত্বেও 'স. চ'-র কোনো প্রভাব পড়ে নি—না ছবি তৈরির, না দর্শক-রুচির ক্ষেত্রে। লোকপ্রিয় ছবি দেখে আশি লক্ষ লোক। আর, এফ. এফ. সি-র চোদ্দ বছরে নটা ভাষায় তোলা ছিয়াশিটা কাহিনীচিত্রের মধ্যে বেশির ভাগই ডিব্বায় পচছে। তারা না পেরেছে দর্শক গড়তে, না একটা আর্ট-থিয়েটার—আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। এই বাস্তব অবস্থা প্রসঙ্গে অজ্ঞতার জন্যেই সমালোচকরা লোকধন্য ছবিকে—যার অন্য নাম 'বাণিজ্যিক ছবি'—গাল দেয়। অথচ, এরও অবস্থা টালমাটাল। 'স. চ.'-র সঙ্গে আমাদের কোনো ঝগড়া নেই। কিন্তু এর গুণাবলী অনর্থক বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। লোকপ্রিয় ছবির ষাট বছরের ইতিহাসে সমাজ-সচেতন ছবি কম ওঠেনি। যেমন, 'শারদা', 'বালবিধবা', 'টাইপিস্ট গার্ল,' 'দেবদাসী,' 'হরিজন'—দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, শোষণ, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এগুলি বিশের দশকের। সবাক ছবির ক্ষেত্রে প্রভাত, বোম্বে টকীজ, নিউ থিয়েটার্স—যারা শিল্পের তাবৎ ক্ষেত্রের প্রতিভাকে একত্রিত করেছিল—সমকালীন সমস্যা নিয়ে ছবি করেছে। তারা বকস অফিসও পেয়েছে। যথা: 'দেবদাস'-'চণ্ডীদাস'-'অছুৎকন্যা'-'প্রেসিডেণ্ট'-'তুনিয়া ন মানে'-'বিদ্যাপতি'-'আদমী'-'দহেজ'-'দো বিঘা যমিন'। 'পলাতক ছবি' আসলে যুদ্ধোত্তর ফসল—যার ফলে চলচ্চিত্রে মুনাফা অ-স্থির, দর্শকও বদলে পাঁচমিশালী, প্রমোদকরও হু-হু করে বেড়ে গেল। প্রযোজকরা হল মহাজনদের কৃপার্থী। এফ. এফ. সি-র চোদ্দ বছরে ইণ্ডাষ্ট্রি তৈরি করেছে ৪৮৬৭ খানা ছবি, পাঁচশো কোটি টাকার বিনিময়ে। এ টাকাটা এসেছে মহাজনদের কাছ থেকে, যারা চড়া সুদে ধার দেয়। সাদা টাকা পাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়ে সরকার কি কালো টাকার খেলাকে মদত দিচ্ছেন না? এবং এই শোচনীয় অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্যেই কি প্রযোজককে আকর্ষণীয় ফরমূলার, তারকা-প্রথার, বিচিত্রানুষ্ঠানের আশ্রয় নিতে হয় না? তবুও তো শতকরা আট খানার বেশি সুপারহিট হয় না। প্রতি বছরই, শতকরা সত্তরজন প্রযোজক, সেই সঙ্গে পরিবেশক, উধাও হয়ে যায়। তার ওপর, চিত্রগৃহের শোচনীয় অভাব। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ—এটা একটা উপকথা। লাভের কড়ি

গোনে স্বয়ং সরকার। এ সত্ত্বেও ইণ্ডাস্ট্রি সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক ছবি সমানে তৈরি করে যাচ্ছে—'আনন্দ', 'গুড্ডি,' 'কোশিশ', 'পরিচয়', 'অংকুর,' 'অনুভব', 'রজনীগন্ধা', 'আবিষ্কার,' ইত্যাদি। এরা জন-সম্বর্ধিতও বটে। 'স. চ'-কে তাই উদ্দেশ্যমূলক হতে হবে, নিছক 'আর্ট-ফিল্ম' নয়। এবং জাতীয় চলচ্চিত্র গড়ে তুলতে হলে সরকারকে খামখেয়ালী ছেড়ে দিয়ে দুটো তদন্ত-কমিটির সুপারিশ চালু করতেই হবে।

গুরুদাস ভট্টাচার্য :

কিশোর চিত্তে চলচ্চিত্রের নেতিমূলক প্রভাবকে তুলে ধরে ১৯২০ সালের 'পাঞ্চ'-এ একটা কার্টুন বেরিয়েছিল। সেই প্রভাবের পুরো ছবিটা পাওয়া গেল ১৯৬১-তে, ইউনেসকোর সার্ভে রিপোর্টে। ত্রিশটি দেশের প্রায় চারশো গবেষক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন—বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র কিভাবে শিশু ও কিশোর মনে জীবন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর ধারণার সৃষ্টি করে এবং শেষপর্যন্ত তাদের ঠেলে দেয় ব্যর্থতাবোধের মধ্যে। বলা বাহুল্য, ভারতের বাণিজ্যিক ছবি এই জাতীয় চরিত্রের তথা চরিত্রহীনতার দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। অশিক্ষিত লোকেদের হাতে শিল্প যখন বাণিজ্যের রূপ নেয়, তার ফল হয় ভয়াবহ। জার্থী তেপ্লিজের প্রতিবেদনে সেই ভয়ংকর রূপটি চমৎকার বিবৃত হয়েছে। দেশে দেশে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন স্বত গড়ে উঠেছে ভালোতর চলচ্চিত্রের দাবি নিয়ে। তাতে বাণিজ্য বন্ধ করা যায় নি বটে, তবে ছবিও যে শিল্প, সে-তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। ভারতে এর সূচনা ১৯৪৭-এ, চেতন আনন্দের 'নীচা নগর' দিয়ে। তার পরের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। যার মধ্যে পুণার ছাত্রদের তৈরি ছবি গণনীয়—'ইয়ং সিনেমা'র, বস্তুত, আরম্ভই এখানে। তারই পরিণতি —সরকারের সচেতনতা, এফ. এফ. সি-র নতুন ভূমিকা। এবং নতুনতর ছবির ও ছবি-করিয়েদের আবির্ভাব। যারা সিরীয়াস ও কমিটেড, যারা দর্শকের দর্শন-ক্ষমতাকে নতুন আকার দিতে আগ্রহী। সত্যজিৎ রায় এদের 'নবতরঙ্গ' বলতে নারাজ। তা এরা অবশ্যই নয়। কিন্তু কমার্শিয়াল ছবির বাইরে একটা নতুন-কিছু, উত্তেজক-কিছু, শিল্পমণ্ডিত-কিছু তো বটেই! এবং ভারতীয়ানা তো অবশ্যই। যার সামনে বসে দর্শকের শিল্পবোধ ও জীবনবোধ শাণিত হয়ে ওঠে। শিল্পের তো এটাই কাজ, দায় ও দায়িত্ব—স্থিতাবস্থা থেকে কেবলই বেরিয়ে আসা। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই এটা ঘটে, বারবার ঘটে,

তদ্দ্বারাই শিল্পের রূপ-রীতি নির্ধারিত হয় এবং তার জাতীয় চরিত্র ফুটে ওঠে। ফলত, 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র'ই 'জাতীয় চলচ্চত্র' হবার ক্ষমতা রাখে। যেখানে পৌঁছে সে জোনাস্ মেকাসের মতো বলতে পারে: "সূর্যই আমাদের লক্ষ্য··· অর্থ না, সাফল্য না, আরাম না, নিরাপত্তা না, এমনকি নিজেদের সুখও না, আমাদের সকলের সুখ।" এই বিন্দুতে পৌঁছতে গেলে পদক্ষেপও হিসেবী হওয়া দরকার। ইণ্ডাস্ট্রি চলচ্চিত্রকে বাণিজ্য দ্রব্য বানিয়ে তুলেছে, যা আসলে মূলত 'আর্ট' (থোরো ডিকিনসনের বিভাজন স্মরণীয়)। তার মধ্যে প্রবেশ করা দুরূহ, করলেও বিপদ আছে। 'সমান্তরাল চলচ্চিত্র'র তাই চাই সমান্তরাল বাজার। আর্ট থিয়েটার এবং টি. ভি. নতুন বাজার। ১৬ মিমি-এর সংস্করণও জরুরী। তাছাড়াও তিনটি অস্পৃষ্ট ক্ষেত্র আছে। একটি, "মিউনিসিপ্যাল থিয়েটার"—জেলায় জেলায় ভাড়া-করা বাড়িতে ছবি দেখানো যেতে পারে, প্রজেকটর-অপারেটর আসবে স্থানীয় সরকারী দফতর থেকে। দ্বিতীয়ত, ফিল্ম-সোসাইটিগুলিকে পরিবেষণের ভার দেওয়া যায়। তৃতীয়ত, শিক্ষায়তনে ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বিদেশের বাজারেও চাহিদা সৃষ্টি করতে হবে, যেখানে ভারতীয় কমার্শিয়াল ছবি পা রাখতেও ভয় পায়। তার জন্যে চাই ধারাল সংগঠন-ব্যবস্থা, বিজ্ঞানসম্মত কর্মপন্থা এবং 'ইউনিফ্রান্স' ইত্যাদির মতো বুলেটিন। শেষত, দশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টার তন্বী কাহিনীচিত্র তৈরিতে উৎসাহ দিতে হবে। এবং শেষত, 'চলচ্চিত্র সংস্কৃতি'র স্বার্থে একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তার জন্যে চলচ্চিত্র শিক্ষাদানের প্রয়োজন আশু জরুরী। এছাড়া, দর্শক-রুচির মান-উন্নয়নের নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

৩. আলোচনা-চক্র

স্থান: জাতীয় জাদুঘরের প্রেক্ষাগৃহ; কাল: সকাল দশটা থেকে দ্বিপ্রহর; মাঝে বারোটা নাগাদ চা/কফি ব্রেক। প্রথম দিন লুমিয়ের কয়েকটা ছবি দেখানো হল, তাঁরই মেশিনে, লুমিয়ের কর্মস্থল লিওনের চলচ্চিত্র জাদুঘরের সভাপতি ডঃ জেনার্ডের তত্ত্বাবধানে। সেই সব বিখ্যাত দৃশ্যাবলী।

উদ্বোধন করলেন শ্রীইন্দ্রকুমার গুজরাল: "ভারতে সমান্তরাল চলচ্চিত্রের সাফল্য নির্ভর করে তার সমাজ-ঘনিষ্ঠতার, তাকে বদলে দেওয়ার কর্মসূচীর ওপর। আভিজাতিক স্বাতন্ত্র্যে থাকলে চলবে না। আমাদের শিক্ষাসংস্কারের

নানা দিক, চলচ্চিত্রের সার্বিকতা বিষয়ে নজর রাখতে হবে। আশা করি, এই আলোচনা থেকে নতুন চিন্তার খোরাক পাওয়া যাবে।" এর পর শুরু হয় আলোচনা। প্রথমদিন পরিচালনা করেন ব্রিটেনের ডেভিড রবিনসন ; দ্বিতীয় দিন বি. আর. চোপরা এবং কো-চেয়ারম্যান নিউইয়র্ক চলচ্চিত্র উৎসবের ডিরেকটর সুসান চ্যারিটি। সূচনায়-সমাপ্তিতে-মধ্যভাগে শ্রীরবিনসন জানান : "প্রকৃতির দর্পণ নয়, চলচ্চিত্রকে হতে হবে হাতুড়ি, যা দিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজকে নতুন রূপ দেওয়া যায়। 'স চ'-র অর্থ যদি হয় নিরীক্ষামূলক ছবি, তাহলে ছবিকাররা যেন দর্শকদের কথা না ভোলেন। কারণ, গ্রীয়রসনই বলেছেন, দর্শক-বিহীন ছবি যেন ছায়া-বিহীন মানুষ।"

আলোচনার উদ্বোধন করে বি. কে. করনজিয়া 'স চ'-র জন্মকাহিনী বিবৃত করেন। বলেন, "সত্যজিৎ রায় থেকেই এর সূচনা। তবে, যতক্ষণ না এই নব্য-ধারার চিত্রকররা একত্রিত সংগঠন করে স্ব-পক্ষে লড়ছেন, ততক্ষণ 'স. চ.' জোরদার হবে না। ইণ্টারন্যাশনাল ফোরাম অফ ইয়ং সিনেমার ডিরেকটর উল্‌রিচ গ্রেগর জানান : পাঁচ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত এই ফোরাম, শুধু জার্মানি নয়, দুনিয়ার তাবৎ দেশের নবীন চিত্রকরদের সাহায্য দেয়, প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে, সংগ্রহালয় গড়ে তুলছে। সবই ১৬ মিমি-এর ছবি। যেহেতু, নিরীক্ষার পক্ষে এটাই সর্বোত্তম।" বাঙলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন নিগমের পরিচালক এস. এন. হাশিম : "আমাদের দেশে নতুন ধরনের ছবি হচ্ছে, যাকে বলা হয় 'ব্যতিক্রমধর্মী ছবি', যার অন্যতম লক্ষ্য সাম্প্রদায়িকতা দূর করা।" ব্রিটেনের চার্লস কুপার : "শুধু ভালো ছবি হলেই হবে না, চাই দৃঢ় সংগঠন, যারা ভালো ছবি বাছাই করবে বিদেশের জন্যে। ভারতে এরকম কোনো সংগঠন নেই। ফলে, পাশ্চাত্য দর্শকের জন্যে উপযুক্ত ছবি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।" পোল্যাণ্ডের কে. যানুসী : "আমাদের দেশে কমার্শিয়াল ছবি নেই, সমান্তরাল চলচ্চিত্রও না। তবে, নিরীক্ষামূলক ছবি নিশ্চয়ই হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশে চলচ্চিত্র সাংস্কৃতিক সামগ্রী, বাণিজ্য-ব্যাপার নয়। তার জন্যে নানারকম পন্থা ও প্রক্রিয়া বিদ্যমান।" মিশরের শাদা আবদেল সলাম : "সমান্তরাল চলচ্চিত্র বিষয়ে কিছু বলার অধিকার আমার নেই। নিজে ছবি করি, ফাঁকি দি না, যা সত্য বলে মনে করি, তাই ফুটিয়ে তুলি। অনেক কষ্টে ও খেটে ছবি করেছি, দেশের লোক এখনও দেখে নি আমার শেষ ছবি। জানি না, এর-পরে আর কোনো ছবি করতে পারব কিনা।" অন্যতম বিচারক

মাইকেল র‍্যালফ: "বাণিজিক ছবি এবং নতুন ছবির মধ্যে একটা সমন্বয় থাকা দরকার, যেটা উপকারীই হবে।" মারী সীটন: "চাই সত্যিকার ভারতীয় ছবি এবং একটা আন্দোলন, যা এইসব ছবির বিদেশে পরিবেশনের সহায়ক হবে।" সুসান চ্যারিটী নতুন সিনেমা প্রসঙ্গে আমেরিকানদের ধারণার কথা ব্যক্ত করেন; সেই সঙ্গে, এইসব ছবির হলিউডের ওপর প্রভাব বিস্তারের ইতিবৃত্তও; এবং আশা করেন, ভারতেও তাই হবে।

দুদিনের বিতর্কে অনেকে অংশ গ্রহণ করেন। বাসু চ্যাটার্জি আর্ট থিয়েটার গড়ে তোলার ওপর জোর দেন। চিদানন্দ দাশগুপ্ত টি.-ভি-র সঙ্গে প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। শ্যাম বেনেগাল, রাজন নারায়ণ, মনি কাউল, কুমার শাহানী 'স.চ.'-র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে তাদের প্রদর্শনী-ব্যবস্থার জন্যে দাবি জানান। 'স.চ.'-র সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ভিন্নমত জানিয়ে সুখদেব বলেন: "এখানে যে সিসটেম চালু, তাতে নতুনদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ নেই, তাই সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন দরকার।" আদুর গোপালকৃষ্ণণের অভিমত: "বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের বাইরে 'স.চ.'-কে রাখলে চলবে না, প্রথমটার মধ্যে থেকেই দ্বিতীয়টার বিকাশ ঘটাতে হবে।" শ্রীমূর্থী বিনোদনের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে নতুন জাতের ছবির ভূমিকা নির্ধারণ করেন। রমেশচন্দ্র: "সমান্তরাল ছবি দিয়ে কোনো কাজ হবে না, চাই বিপ্লবী ছবি, যা চলচ্চিত্রের তাবৎ স্তরে বিস্ফোরণ ঘটাবে।" এস. কৃষ্ণস্বামী: "মূল উৎসবে যে অব্যবস্থা, আলোচনার ক্ষেত্রেও তার ছায়া পড়েছে। আশাকরি, আগামীবার এর সংশোধন হবে।" জগমোহন: "সরকার যাঁদের নিয়ে উৎসব-ডিরেকটরেট গড়েছেন, তাঁদের চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষা নেওয়া দরকার। পুণা ফিল্ম ইনসটিটিউটে এঁদের পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। নইলে, এখানে তো আমরা রয়েছি, আমরাও এঁদের শেখানোর ভার নিতে পারি।" বি. আর. চোপরা প্রবন্ধ পড়েন ও বলেন: "সমালোচকরা কমার্শিয়াল ছবির রীতি-নীতির সমালোচনা করেন তার বিপথগামিতার জন্যে। 'স.চ.'-ও সমালোচনার অপেক্ষা রাখে। আমি এর বিপক্ষে নই। কিন্তু অ্যাবসট্র্যাক্ট ফিল্মের বিপক্ষে আমি—যে ছবি তৈরি করেন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা, আরামকেদারায় সমাসীন শিল্প-সমালোচকরা যার গুণগান করেন, এবং সরকার যাদের পোষণ-পালন-রাখোয়ালী করেন, যাদের দর্শক আকর্ষণের কোনো ক্ষমতা

নেই। আজ চাই ভালো ছবি, দর্শকের কাছে যার আবেদন আছে।”
গুরুদাস ভট্টাচার্য : “গতকাল থেকে বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে দিয়ে ‘স.চ.’-র একটা সর্বজনসম্মত সংজ্ঞার হদিশ পাব প্রত্যাশা করছিলাম। তাতো পাইই নি, উল্টে শ্রীচোপরার বিবৃতি শুনে আরও বিভ্রান্ত বোধ করছি। ভারতে কি কোনো বিমূর্ত ছবি আজ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে? সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক এঁরা কি কমার্শিয়াল ছবি করেন, না তার বিপরীত কিছু? এসব জটের মধ্যে না গিয়ে সোজাসুজি বলা যাক—সম্প্রতি কয়েকটা নতুন ধরনের ছবি হয়েছে, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে ‘সমান্তরাল চলচ্চিত্র’। এরা যদি বাণিজ্য-রেখার সমান্তরাল হয়, তবে এদের জন্যে চাই সমান্তরাল দর্শক, সমান্তরাল বাজার। আর্ট থিয়েটার ও টি.ভি.র কথা অনেকে বলেছেন। তার সঙ্গে আরও তিনটে আমি যোগ করতে চাই : জেলাভিত্তিক মফঃস্বল থিয়েটার, ফিল্ম-সোসাইটি, এবং শিক্ষায়তন। ছবি হবে ১৬ এবং ৮ মিমি-এরও; এবং ছোট ছোট কাহিনীচিত্রে উৎসাহ দিতে হবে, যেমন করে পুণার ছাত্রসমাজ। কিছুদিন আগে মিঃ করঞ্জিয়া দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চিঠি দিয়েছেন এফ. এফ. সি-র ছবি দেখানোর জন্যে; সেই সঙ্গে ছাত্র সমাজের চিত্রবোধ সংবর্ধনের। এ-প্রশ্ন আজ উঠত না, যদি সরকার স্টুডেন্টস ফিল্ম কাউন্সিল না তুলে দিতেন, যদি খোসলা-কমিটি এদিকেও নজর দিতেন। তাহলে, বিশ্ববিদ্যালয় ফিল্ম-ক্লাবগুলো এভাবে মরে যেত না। তাহলে, বিরক্তিকর তথ্যচিত্র দেখিয়ে তারা টিঁকে থাকার চেষ্টা করত না। নতুন ঘরানার ছবির দর্শক তৈরি করতে হবে; ছবি দেখাতে হবে এবং শেখাতে হবে বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। একটা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা ফিল্ম ক্লাব আছে, আছে দেড় হাজার আসনের অতি-আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ, ওয়াইড স্ক্রীন, দুটো আর. সি. এ. ৩৫ মিমি. প্রজেক্টর, সিনেমাস্কোপ লেন্স, একাধিক ১৬ মিমি প্রজেক্টর, মুভী ক্যামেরা, এডিটিং মেশিন—কিন্তু কিছু করার নেই। ফীচার দেখানো নিষেধ। সরকার যদি হাত বাড়ান, এই আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ফিল্ম ক্লাব থেকেই একটা নতুন আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে, যা সমস্ত দেশকে নতুন আবেগে ও উদ্দীপনায় উজ্জীবিত করতে পারবে। ধন্যবাদ।”

৪. সমান্তরাল আলোচনাচক্র

দ্বিতীয় দিনের প্রথমেই বি. আর. চোপরা প্রবন্ধ পড়েন এবং বিমূর্ত ছবির বকলমে 'স. চ.'-কে আক্রমণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করেন কুমার শাহানী ও মণি কাউল। রাজন নারায়ণ এবং দিলীপ পাডগাঁওকর (টাইমস অফ ইণ্ডিয়া) শ্রীচোপরার সভাপতিত্বের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন: "মূলত যিনি বাণিজ্যিক ছবির প্রতিভূ এবং 'স. চ.'-র বিরোধী, তিনি 'স. চ.'-বিষয়ক আলোচনাচক্রের সভাপতি হতে পারেন না।" শ্রীচোপরা: "আপনারা আমাকে সভাপতি করেন নি।" প্রতিবাদের প্রতিবাদ করেন সুখদেব, জগমোহন, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক পিল্লে (ডি. এ. ভি. পি): "শ্রীচোপরাকে উদ্যোক্তারা সভা পরিচালনার ভার দিয়েছেন, সুতরাং উনিই সভাপতি।" কথা কাটাকাটি। সভা চলতে থাকে। আলোচনা। চা বিরতির পর শুরুতেই দিলীপ পাডগাঁওকর ঘোষণা করেন: "আমরা বিশ্বাস করি, যে-আলোচনা-সভার সভাপতি মিষ্টার চোপরা, সে-সভার দ্বারা কোনো কাজের কাজই হবে না। সুতরাং আমরা এ-সভা ছেড়ে চলে যাচ্ছি এবং বাইরে লনে একটা সভা করছি। আপনারা যাঁরা আমাদের সঙ্গে আসতে চান, চলে আসুন।" মঞ্চ থেকে এবং প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেশ কিছু ব্যক্তি বাইরে চলে যান। আলোচনা চলতে থাকে। সময়ের শেষ প্রান্তে দিলীপ পাডগাঁওকর ফিরে আসেন, বলেন: "আমরা বাইরে একটা সমান্তরাল আলোচনাচক্রে বসেছিলাম, একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে—"। দর্শকমণ্ডলী থেকে: "এই সভায় প্রস্তাবটি পড়া হোক··· আপনারা সবাই আসুন।" জাতীয় জাদুঘর-প্রেক্ষাগৃহ আবার পরিপূর্ণ। মঞ্চে এসে বসলেন ঋত্বিক কুমার ঘটকও—'সমান্তরাল চলচ্চিত্রের সমান্তরাল আলোচনা-চক্রের সমান্তরাল সভাপতি' —পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। ওদিকে চেয়ারম্যান, কো-চেয়ারম্যান, এদিকে প্যারালেল চেয়ারম্যান। তাঁর নির্দেশে প্রস্তাব পড়া হল: "সমান্তরাল চলচ্চিত্রের এই সমান্তরাল সভা প্রস্তাব রাখছে যে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সমান্তরাল চিত্রকাররা তাঁদের ছবির উৎপাদন ও পরিবেশনের জন্যে একটি সংস্থা গড়ে তুলবেন। প্রযোজকদের নিয়ে একটি কো-অপারেটিভ সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, যার কাজ হবে অর্থসংগ্রহ, পরিবেশক ও প্রদর্শকদের সঙ্গে সরাসরি যোগ স্থাপন; এবং বাণিজ্যিক ছবির অস্তিত্বের বিরোধী আমরা নই।" শ্রীচোপরা: "আমি তো বলেইছি, আমি অ্যাবসট্র্যাকট ফিল্মের বিরোধী, সমান্তরাল ছবির নয়। 'রজনীগন্ধা,' 'অংকুর' তো ভালো ব্যবসা করছে।

এই রকম ছবিই আমি চাই।" সুন্দরলাল নাহাটা, (ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া): "সমান্তরাল ছবির বিরোধী আমরা কেউই নই। ইণ্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে কথা দিচ্ছি, নতুন চলচ্চিত্র তৈরির জন্যে এই সংস্থাকে সবরকম সহযোগিতা আমরা দেব।" প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে ও সানন্দে গৃহীত হয়। অতঃপর কো-চেয়ারম্যান মিস্ চ্যারিটি দুদিনের আলোচনার সারসংক্ষেপ করেন ছটি সূচকে: "বিদেশে ভালো ছবির ব্যবসার জন্যে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে; ১৬ মিমি ছবি তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয় ও ফিল্ম সোসাইটিগুলির মাধ্যমে দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে; বিশ্ববিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে; সমান্তরাল চলচ্চিত্রের কর কমাতে হবে; সরকারী আমলাদের পুণার ফিল্ম-স্কুলে শিক্ষা নিতে হবে ফ্রেশার কোর্সে; পুরস্কারপ্রাপ্ত বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতীয় ছবির সাবটাইটেলের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে, দেশের ও বিদেশের জন্যে। এবং প্যারালেল চেয়ারম্যান ঋত্বিক ঘটক জানান: "আগামীকাল সকালে আমরা, কমার্শিয়াল ও প্যারালেল সিনেমার সবাই মিলে একটা সভায় বসছি —উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করছি স্থানের ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে—আপনারা যাঁরা আসতে চান, সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।" ধন্যবাদ-জ্ঞাপন। সভা শেষ। অল'স ওয়েল দ্যাট এনডস ওয়েল।

৫. উপসংহৃতি

কিন্তু সেই শেষ তো এই চক্রবৎ আলোচনার অন্তে নয়। এতো সবে শুরু। শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায়, তারই ওপর নব্য সিনেমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সমান্তরাল দর্শক সৃষ্টির এবং তাদের সাহায্যে সমান্তরাল বাজার সৃষ্টির কঠিন অথচ সুনিশ্চিত পথে না গিয়ে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই যে যৌথ উদ্যোগের প্রস্তাব নিলেন সমান্তরাল চলচ্চিত্রকারেরা, এর শেষ ফলশ্রুতি কী দাঁড়াবে? শুভ না অশুভ? আমার কিন্তু বারংবার মনে পড়ছিল মূলটনের বলা সেই গল্প, সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ঘনিষ্ঠতা প্রসঙ্গে: একদা এক মহিলা ছিলেন আর একটি বাঘ ছিল; মহিলাটি বাঘের পিঠে চড়লেন এবং বনের মধ্যে গেলেন; বাঘটি বন থেকে বেরিয়ে এল মহিলাটিকে নিয়ে—উদরের মধ্যে!!

কলকাতা ঃ অক্টোবর ১৯৭৪

বিতোষ আচার্য

ধ্বসে পড়ছে সমস্ত দেয়াল, ভিত্ত
বেনোজল থইথই থইথই
মজবুত খিলান ভাঙছে—
অস্তিত্বের মই
ভেসে যাচ্ছে, কী প্রাণান্ত টান
কেবলি শীত শীত···
ক্লীবতার অন্ধকারে
পরিত্যক্ত শপথের চকচকে ফলকে
জন্মেছে উদ্ভিদ।

নিদারুণ চলচ্চিত্র
গ্রাম-গ্রামান্তর ভেঙে আসছে তো আসছেই ঃ
যত্রতত্র
ছন্নছাড়া দুমড়ানো মানুষ
মুখ থুবড়ে
শূন্য সানকি ঊর্ধ্বে তুলে
কী প্রাণান্ত প্রয়াস উঠবার···
পঞ্চাশের পদধ্বনি এ শহরে আবার, আবার

—অথচ আকাশ
স্বচ্ছ নীল,
উজ্জ্বল আলোর ভোরে আগমনী গান বাজছে
ফোটা শিউলি, গুচ্ছ গুচ্ছ কাশ
ল্যাণ্ডিং-এ, জানলায়
প্রাচুর্যের ম্যাজিক পরদায়

আহা, কি সুন্দর দিন
জীবন দোল খায় :
এখানে কলকাতা হাসে, যেমন চিরটা কাল হয়

এখন আশ্চর্য স্থিত যন্ত্রণার মানচিত্র, যদিও
পথে পথে শুষ্ক তুলছে
সোচ্চার দাপটে মৃত্যু, চাবকাচ্ছে সময়
তবু, শব্দ পাচ্ছি
নেপথ্যে কোথাও
ফিসফাস আওয়াজে কারা
কাজ করছে
লক্ষ হাতে বাঁধ বাঁধছে
বিনিদ্র প্রহর—
একবার হয়ত তারা, হয়ত তারা…

এখানে কলকাতা বাঁচে, যেমন বেঁচেছে চিরকাল ॥

আজও এই প্রত্যাশী বাঙলায়

অমিতাভ দাশগুপ্ত

তোমার ভুরুর নিচে
কঠিন কব্জির তলে
জেগে ওঠে পোড়া মাটি, নষ্ট নীড়, ফাটল ও দাহ।
বিসর্জন শেষে ম্লান খড়ের প্রতিমা
অসহায় ভেসে যায় বারুণী নদীর কলরবে।
ঘোর যুযুৎসবে
ফিরিচে শোণিত ভাসে, জেগে ওঠে ত্রস্ত কোলাহল,
নিক্ষেপকারীর বুকে অস্ত্র ঘুরে আসে—
কচি মুণ্ড ঝুলে থাকে যামিনীর নখরে ও দাঁতে।

দক্ষিণের ছাতিফাটা মাঠে
বেলা যায়—কেঁদে ফেরে বিভাস ও বিষণ্ণ পূরবী,
জন্মান্ধের কাছে কেন ভিক্ষা চাও ?
তুমি জয় চেয়েছিলে—কার জয় ?
'বিশ্বাস' শব্দটি শুধু অভিধান আলো করে,
সেও কি অলীক মেঘমায়া ?

অথচ বর্ষণ নেই।
গাছ শুধু কাঁটা গাছ,
পাখি শুধু উড্ডীন শকুন,
শান্তি মানে ক-জনের ভালোভাবে খাওয়া-পরা
শিশ্নোদর জীবনযাপন,
তুমি এই গোরস্তান—প্রেতচ্ছায়া—শান্তি চেয়েছিলে ?

কারকুন, মুৎসুদ্দির হাত থেকে হাতে
ঘষা পয়সার মতো বার বার ফিরে আসে পঁচিশে বৈশাখ।
বুক কেসে কীট আর যক্ষ্মা বুকে বসে থাকে
তোমার প্রতিভা।
না, রবীন্দ্রনাথ নয়,
কর্মের, মর্মের নয়,
অন্যতম ঠাকুরের মতো
তোমারও আরতি চলে ঢাক-ঢোল-কাঁসর বাজিয়ে।
পোড়া মাটি হা স্বদেশ
ভরাট গর্ভের মতো কেঁপে ওঠে বৃষ্টির আশায়,
ঈশানী মেঘের ছায়া দীর্ঘ তমালের বনে,
বেলা যায়, শুধু বেলা যায়,
অশ্রু-ঘাম-রক্তে ভেজা
আজও এই বাঁজা, ফাঁকা অথচ কি প্রত্যাশী বাঙলায়।

পাত্র-পাত্রী সংবাদ

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে
চশমার কাচ মুছতে মুছতে
পাত্র বলেছিল, 'পাত্রী না দেখে বিয়ে করব না।'
দাঁত দিয়ে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখ কাটতে কাটতে
পাত্রী জানিয়েছিল, 'ফোটোতে ঠিক বোঝা যায় না।'

ফলে, এক রবিবার বিকেলে
নতুন ফুল-ফোটানো টেবিল-ঢাকার উপর
গাল-ফুলো গরম লুচি, অহংকারী পটলের দোরমা,
কিশমিশ উঁকি-দেয়া ঘন ছোলার ডাল, আর
শুকতারার মতো নলেন গুড়ের সন্দেশ সাজিয়ে
ছ-পয়েন্টে-ঘোরা পাখার নিচে
পাত্রী পাত্রকে দেখল এবং
পাত্র পাত্রীকে।

কিন্তু কেউ কাউকে পছন্দ করল না।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে যেতে পারত,
হল না, কারণ—
পাত্রের ছোট ভাই এবং পাত্রীর ছোট ভাই ঠিক সেই সময়
প্রেসিডেন্সি জেলের একটা দমবন্ধ অন্ধকার-ভর্তি ঘরে
পাশাপাশি ব'সে গরাদের বাইরে
তিন ফুট আকাশের দিকে তাকিয়েছিল।
মিসা।

সামনের পুকুরের জলে তখন গাছের ছায়া পড়েছে,
আর ঢেউয়ের ছায়ায় ছায়ায় আড়চোখে
লুকোচুরি খেলছে অজস্র আমেরিকান কই।

দুপুরে একদল ছিনতাই পার্টিকে দিয়ে
বেধড়ক থ্যাঁতলানো হয়েছে বন্দীদের,
দুজনেরই চোখমুখ ফোলা,
ঠোঁটের কোণায় আর কবজিতে শুকনো রক্ত লেগে আছে,
আশেপাশের ঘরগুলো থেকে
চাপা গোঙানি ভেসে আসছে।

তারপর জেলের ভিতরে এবং বাইরে অনেক ছায়ার নড়াচড়া,
রোদের ডিগবাজি, অনেক ঢাকঢাক-গুড়গুড়,
পাগলা ঘন্টির এলোপাথাড়ি চীৎকার,
গুলির শব্দ,
জালে-ঘেরা কালো গাড়ির ঘন ঘন যাতায়াত ইত্যাদিতে
মুখে রক্ত তুলতে তুলতে গড়িয়ে গেল
দিন, মাস, বছর।

কোমরে পিস্তল-গোঁজা বড় কর্তারা
নর্দমায় মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে চোখ টিপে দিল,
আর অমনি একদল এসে বালতি বালতি বিদেশি
আলকাতরা এনে ফুটফুটে দিনগুলোর মুখে মাখিয়ে দিল,
আর একদল কোনোরকম চোখ টেপাটেপি ছাড়াই
মেরুদণ্ড সোজা ক'রে সমস্ত পুকুর নদীর জল মহাসমুদ্র
তোলপাড় ক'রে সেই চুনকালি ধুয়ে মুছে
মুঠো মুঠো আবীর ছড়িয়ে দিল আকাশে,
খোলামেলা হাসি চোখের জল আর ভালোবাসায়
ভ'রে উঠল দিন, মাস, বছর।

ফলে একদিন দেখা গেল
সেই পাত্র এবং সেই পাত্রী হাত ধরাধরি ক'রে
শহরের ফুটপাত ধ'রে এগিয়ে যাচ্ছে।

এবং তাদের ভাই দুটি
কবজি থেকে রক্ত ধুয়ে মুছে
একটা ঝকঝকে দুপুরে
ফোলা মুখের চামড়া টান টান ক'রে
পলাশের পতাকা-ওড়ানো গাঁয়ের
আল ধ'রে হাঁটছে,
একজনের হাতে একটা অতসীর ভাঙা ডাল,
সে গুন গুন ক'রে সুকান্তের একটা পংক্তি
গাইছে, অন্যজনের হাতে একটা ভারি লোহার ডাণ্ডা।

আরও কিছুদিন পরে
গায়ে ঘামেভেজা পাঞ্জাবী লেপটে
দশদিনের না-কামানো দাড়ি মুখে নিয়ে
পাত্রটি বেতের জিনিসপত্র-সাজানো একটা দোকানে ঢুকে
একটা ঝোলানো দোলনার দিকে আঙুল তুলে বলল—
'ওটা কতো ?'

দূর সমুদ্র থেকে দল বেঁধে ঠাণ্ডা বাতাস বেড়াতে এসেছে
এই প্রথম, স্বাধীন শহরে।
যদিও তখনো দেয়ালে দেয়ালে গুলির দাগ, রক্তের ছোপ,
রাস্তায় রাস্তায় আধপোড়া দলিলপত্র, ফাঁসানো টায়ার, ভাঙা কাচ,
তবুও রান্নাঘরের পাশে এক চিলতে বারান্দায়
দোলনাটা দুলছে। তাতে
তোয়ালে জড়িয়ে
দিব্যি মোটাসোটা নরম তুলতুলে দু'হাত উপরের দিকে তুলে
শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে
পাড়া মাত ক'রে চ্যাচাচ্ছে—

ভা র ত ব র্ষ।

ধন্যবাদ—তোমাকে

রত্নেশ্বর হাজরা

ধন্য তোমার আকন্দকে
লাল করেছ ডালিম—
ধন্য তোমার মেঘের বিষাদ
বৃষ্টি করলে ভাদর—
গভীর রাত্রে চেনালে পুব, ভোরবেলা পশ্চিম
ধন্য তোমার প্রচণ্ড তাপ
উষ্ণ করলে আদর।
ধন্য তোমার অহংকারকে
আনন্দ ও বিষাদ
ধন্য তোমার অভিমানকে
অনেক ধন্যবাদ—।

অপরাধী নও ?

তুলসী মুখোপাধ্যায়

অপরাধী নও ?
উজ্জ্বল ধানের ক্ষেত হুস ক'রে উড়ে যায়
দশদিকে ধুন্ধুমার দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে ঃ
সেটা কার তুরুপের তাস—
তুমি জানো !
জেনে, নিরবধি বোবা হয়ে আছ।
অপরাধ নয় ?
কার অঙ্গুলি হেলনে পৃথিবীর সমুদয় ফ্যাট ও প্রটিন
লুট হয় প্রকাশ্য রাস্তায়

প্রভাতফেরির গানে হিসি করে চ'লে যায়
কোন কোন প্রসিদ্ধ বাদুড়—
তুমি চেনো !
চিনে, নীরব দর্শক হয়ে আছ।
অপরাধ নয় ?
উলঙ্গ শিশুর কাছে শীতের সূর্য কেন গুম খুন হয়
সাতটা ঘাতক এসে কী দুরন্ত দাপটে
ছিঁড়ে খায় যৌবনের তীব্রতম দ্রোহ—
তুমি বোঝো !
বুঝে, উদয়াস্ত শামুকের খোলে ডুবে আছ।
অথচ তুখোর উদ্ধৃতি সহ মানুষ ও মনুষ্যত্ব নিয়ে
তুমি রোজ দশ লক্ষ বাক্য ছেটাও
মহাপুরুষ এনে দেয়াল সাজাও বিমুগ্ধ গোলাপে—
অপরাধী নও ?

তোমার ফাঁসির দড়ি দোল খাচ্ছে কিছু দূরে, বাঁকের আড়ালে।

আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

তোমাদের এই নিরহঙ্কার উত্তেজনা
আমাকে উৎসাহিত করে
আমি ভেবে পাই না
শিশির না মরতে মরতে
সূর্যের তাপ এতো প্রখর হয় কি ক'রে
বাঁশের বাঁশিতে কি ক'রে রণবাদ্য বাজে !

তোমাদের এই সহজ প্রজ্ঞা
আমাকে বিস্মিত করে
কতোদিন যে অনায়াস সরলতায়
কথা বলি নি !
কতো সহজে তোমরা ঝড়ের সঙ্কেত দাও
দণ্ড পল মিলিয়ে ছুটে আসে ঝড়
রাখাল বালকের নিস্পৃহতায়
তর্জনী নির্দেশ করো
দাবানলের সাজঘরের দিকে,
জ্বলে ওঠে আগুন।

তোমরা যতো বেশি সহজ ততো অবিশ্বাস
যতো বেশি অভ্রান্ত ততো অবহেলা।
আমি তো জানি
এই সব স্তূপাকার আত্মহননের মধ্যে
বিষবাষ্প জমে
দপ ক'রে জ্বলে ওঠে আলেয়া
চাঁদের আলো নিষ্প্রভ হতে হতে
আর ছায়া পড়ে না
মাঠ জুড়ে অশরীরীরা হামাগুড়ি দেয়
তোমরা কতো সহজে তখন
ধ্রুবতারা দেখে পথ চলতে শেখাও।
শেষ রাতে
যখন হঠাৎ অন্ধকার গাঢ় হয়ে যায়
আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি
হেমন্তের শিশিরে স্নান ক'রে
ধানের বুকে দুধ ঘন হয়ে উঠছে
আমার জানলার বাইরে
টুপটাপ শিউলি ঝরছে।

অন্ধকারের বিরুদ্ধে

শুভ বসু

মাঝরাতে রাক্ষসের চোয়ালের মতো ঘন গাঢ় অন্ধকার, তার
হিংস্র উদ্যত দুই থাবা মেলে রাখে।

রোমাল উড়িয়ে উড়িয়ে চলে যাওয়া প্রত্যেকটি দিন,
তার নোনা আকর্ষণে কুরিয়ে কুরিয়ে যাওয়া যৌবন,
মৃত্যুর কুনকো থেকে অঞ্জলি ভরে ভরে নেওয়া
বিন্দু বিন্দু মুহূর্ত, আকণ্ঠ উজাড় ক'রে
রমণীর হাত থেকে প্রেম ও অপ্রেম, এইসব—
আমাকে ক্রমশ সেই চোয়ালের দিকে ঠেলে দেয়।

আমার স্মৃতিতে তবু ঝলমলায় প্রথম দিনের
সূর্যোদয় দর্শনের স্মৃতি, তীব্র কুঁকড়োর আওয়াজ।

রাস্তায় বেরোলে দেখি প্রতি চৌমাথার মোড়ে
কান-এঁটো-করা- হাসি দু পাশে ঝুলিয়ে, দিনরাত
প্রায় মনুর ভঙ্গীতে বসে থাকে মস্তানরা,
তারাই আগলায় শব, আর
তাদের কৃতার্থ রাখতে বশম্বদ হেসে যান দুঁদে ডক্টরেট।

আমার অন্তর থেকে ঘৃণা উঠে আসে
সরীসৃপের মতো চেটে নেয় অস্তিত্বের যা-কিছু এষণা।

তবু কি আশ্চর্য রোজ নিবিড় সন্ধ্যায় কিম্বা পড়ন্ত বিকেলে
সমুদ্রের বুক থেকে উঠে আসে তন্ময় বাতাস,
আমার চুলের মধ্যে নরম দু হাতে
ঠাণ্ডা, ধীর বিলি কেটে যায়, ফের
পরদিন আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

আমার স্মৃতিতে তবু ঝলমলায় প্রথম দিনের
সূর্যোদয় দর্শনের স্মৃতি, তীব্র কুঁকড়োর আওয়াজ।

প্রবল সমুদ্রের মতো প্রখর উচ্ছ্বাসে
জেগে ওঠো প্রস্তুত কলকাতা!
আমার ভালোবাসা তোমার অঙ্গে, প্রতি অঙ্গে
সঞ্চার করুক সংগম মুহূর্তের উষ্ণ আলোড়ন,
তোমার ময়দানময় কৃষ্ণচূড়া তার—
গাঢ়, লাল, রক্তাম্বর সর্বনাশা শিখা
নিয়ে তীব্র ছুটে যাক সারা কলকাতায়ঃ
এ্যাসেম্বলি, পার্ক স্ট্রিট আর বড়বাজারের
হাইকোর্ট, মেট্রো আর ডালহৌসির পাপ
প্রবল পোড়াক তার প্রচণ্ড দাপটে, যাতে রাতে

ব্যাদিত চোয়ালে সেই অন্ধকার আর
আমাকে না ভয় দেখায় রোজ, তার
নিরস্ত্র অস্তিত্ব গ্রাস করার দাপটে।

মে দিন

লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ

সময়, সময়ের আশ্চর্য মুহূর্তেরা এইভাবে আসে
　　　　　　　　আর এক খণ্ডিত সময়ের কাছে,
　　　　মরা নদী, খরা মাঠ পার হয়ে
মানুষের বুকের ভেতর, হৃদয়ের কাছে,
　　　　আশ্চর্য অসুখে জীর্ণ মৃতপ্রায় পৃথিবীর কাছে।

শীত শেষ হয়। বসন্ত নিঃশব্দে আসে—
অরণ্যে,
জীবনে, পাখির জগতে।
বৃক্ষে ফুল ফোটে, নতুন পাতায়, সবুজে বৃক্ষে ভরে ওঠে।
পাখিরা ডানা মেলে,
কণ্ঠে কণ্ঠে বসন্তের গান।
শান্তির পারাবত মুক্ত পক্ষ রৌদ্রের আকাশে
ভেসে যায়,
সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় ছায়া ফেলে,
এক দেশ থেকে আরেক দেশে,
এক প্রাণ থেকে আরেক প্রাণে
বসন্তের সোনালী বার্তা পৌঁছে দেয় রৌদ্রের ধারায়,
মানুষেরা মুখ দেখে রৌদ্রের আকাশে, আকাশের নীলিমায়;
বুক ভরে বাতাস নেয়,
দু-চোখে রৌদ্রের আনন্দ,
আনন্দের গান মেখে
হে-মার্কেট থেকে রক্তের পতাকা নিয়ে.
পতাকা হয়ে ছুটে যায়
বসন্তের উজ্জ্বল আলোয়, শুশ্রূষার মতো অমল বাতাসে
শীতের জীর্ণতা ঝেড়ে
খোঁড়া পৃথিবীটা আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

এইভাবে সময়ের আশ্চর্য মুহূর্তেরা এইভাবে আসে
মানুষের কাছে, মানুষের বুকের ভেতর,
এক হৃদয় থেকে আরেক হৃদয়ে।

মেয়ে গেছে সাধের বাগানে

দীপ্তেন্দু দে

জানালায় ডোরাকাটা বাঘ,
জতুগৃহে একা আমি
মেয়ে গেছে সাধের বাগানে
শ্লেটে শুয়ে অবিনাশী বর্ণমালা
মাঝে মাঝে জেগে ওঠে গানে।

আলনায় সোহাগী মেয়ের ফ্রক
টেপে তার দুষ্টুমির রঙ
চিত্রিত করেছে ঘর, কাজলের সঙ।

প্রশান্ত-হৃদয় আজ স্মৃতিচিহ্ন আঁকে
গাঢ় হয়ে নেমে আসে বিকেলের রং,
কন্যার জননী কি একই স্বর ভাঁজে,
যেখানে বাজে না ঘণ্টা, ছুটি ঢং ঢং।

পুস্তক-পরিচয়

রাখাল বালকের সাথে। দীপেন রায়। সীমান্ত প্রকাশনী, কলকাতা। তিন টাকা।

"পা ডুবে আছে অন্ধকারে মাথা তুলে আছি আলোয়"—এক কথায়, এই হলেন দীপেন রায় এবং এই-ই তাঁর কবিতা।

'রাখাল বালকের সাথে' দীপেন রায়ের প্রথম কবিতার বই। আশার কথা এই যে দীপেন রায় আত্মপ্রচারে না মেতেও নিজেকে যথেষ্ট স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরতে দ্বিধান্বিত নন উৎসাহী পাঠকের কাছে। নিজেকে ঘিরে অস্বচ্ছতার কুয়াশা রচনা করেন না। আবার, নিজেকে নিয়ে আসেন না নায়কের আসনে। অর্থাৎ, কবিতা রচনায় পাকাপাকি ভাবে মন দেবার আগে দীপেন রায় যেন জেনে গিয়েছেন তাঁর ভূমিকা। তাই যে গুণটি সহজেই চোখে পড়ে তা হল স্থিরতা। তীব্রতা আছে, আলোড়ন আছে, নিজেকে ভেঙে আবার নতুন করে নির্মাণ করার প্রবণতাও আছে। কিন্তু তার জন্য অশোভন দ্রুততা নেই, নাটকোচিত অভিনয় নেই। সমস্ত টানা-পোড়েন তিনি সহ্য করতে পারেন। পারে ওঠার জন্য মরীয়া আকুলতার অভাব সম্ভবত তাঁর ভবিষ্যত রচনা সম্পর্কে পাঠকদের কৌতূহলী করে রাখবে।

দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে দীপেন রায় মেনে নিয়েছেন ইতিহাসকে, যে তাঁর "সমুদ্র জননী" তাঁর "আনন্দ"। নজরটা এই ভাবে শিক্ষিত বলে দীপেন রায় অবিচলিত ভাবে চলাফেরা করেন বাইরের ঘটনা থেকে মনের গহনে। 'বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ' বা 'ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলন ও আমার উত্তর'-এ যে কবিকে দেখা যায়, ঠিক সেই কবিকে আমরা খুঁজে পাই 'ভালবাসো এবং ভালবাসো' বা 'শূন্যতায়'। চলনের তফাৎ দেখা যায়, কিন্তু ব্যক্তিত্ব থাকে একই। এই থেকে মনে হয় অনুশীলন, অভিজ্ঞতা এবং দহনে পরিশুদ্ধ হলে দীপেন রায় হয়তো কবিতায় সেই সংহত ব্যক্তিত্বের কিছুটা প্রকাশ ঘটাতে পারবেন যার অনুপস্থিতি আমাদের মানসলোককে বঞ্চিত করে রেখেছে।

বাক্‌রীতির দিক থেকে দীপেন রায় সেই ভঙ্গিকে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন

যা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সর্বাংশে পরিপূরক না হলেও অন্তত বিরোধী নয়। কিছুটা আড়ষ্টতা ও অপরিচ্ছন্নতা থাকা সত্ত্বেও দীনতা ও মালিন্য নজরে পড়ে না। আন্তরিকতা হয়তো সব দুর্বলতা ঢেকে দেয়। কিন্তু যেহেতু এই আন্তরিকতা ধরা পড়ে আন্তরিক ও অনুভূতিসম্পন্ন পাঠকের কাছে, তাই বিপদের ঝুঁকি কিছুটা থেকেই যায়। তাই যা কাম্য তা হল এমন একটি কণ্ঠস্বর যা তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকেই উৎসারিত। কণ্ঠস্বর বলতে আমি ভঙ্গি, বিশেষ কোনো ঘরনা বা চাল, কয়েকটি জুৎসই শব্দের তাক লাগানো ব্যবহার—এই সব বলতে চাই না। কণ্ঠস্বর বলতে আমি সেই বাক্প্রতিমাকেই বুঝি যার মধ্যে কবির অনন্যতা দৃপ্ত হবে তার আবেগ বচন অন্বেষণের রূপময় সাংগীতিক সংগঠনে। কিন্তু ক-জনেরই বা ভাগ্যে সেই বিরল আশীর্বাদ জোটে ?

তবু প্রত্যাশা করার মতো বেশ কিছু আছে এঁর কবিতায়। জীবনের সঙ্গে, তার জটিল ও রক্তাক্ত পদ্ধতির সঙ্গে কবিতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করার সাহসিক প্রচেষ্টায় যতি পড়ে নি স্থূল প্রত্যক্ষে এসে। প্রত্যক্ষকে অতিক্রম করে তার অন্তর্লীন বাস্তবতাকে অনুভূতি দিয়ে গ্রহণ করার প্রবণতা, আমার মনে হয়, দীপেন রায়ের কবিতার উজ্জ্বলতম বৈশিষ্ট্য।

বিশেষ কোনো কবিতার সার্থকতা বা ব্যর্থতা নয়, সামগ্রিক ভাবে কবির জীবন-অন্বেষা, তার সার্থকতা ও ব্যর্থতা নিয়েও, অন্ধকারে পা রেখে আলোর দিকে মাথা তোলার স্পর্ধিত প্রয়াস, আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। কারণ, জমি দেখেই তো আমরা বুঝব বীজটা বাঁচবে কি মরবে। এই দিক থেকে মনে হয় সবল ও ঋজু বৃক্ষের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছেন দীপেন রায়।

রাম বসু

তামিল ছোটগল্প সঞ্চয়ন। অনুবাদ : বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য ॥ কর্ণাটকের ছোটগল্প। অনুবাদ : বি. জি. রাও ও অমিয়া রাও॥ সাহিত্য অকাদেমি। আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা ও পাঁচ টাকা।

ইয়োরোপীয় ভাষাশৈলিতে সাম্প্রতিক সাহিত্যকর্ম বিষয়ে আমাদের এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা যতখানি কৌতূহলী, ভারতের প্রতিবেশী ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহ তাঁদের ততখানি দেখা যায় না। অথচ ভারতীয় সাহিত্য

বিষয়ে সম্যক বোধ না জন্মালে সর্বভারতীয় ভাবঐক্য বিষয়েও দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট অপরিণত রয়ে যায়। ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-আর্থনীতিক পরিবেশ নিয়ে রাজনীতিক ও বিদ্বানেরা নিরন্তর প্রশ্ন তোলেন, কিন্তু ভারতীয় ভাব-আকাশ কোন বর্গীয় রয়ে গেছে এ বিষয়ে তেমন আলোচনা দেখি না। সাহিত্য অকাদেমি নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যকে পরিচিত করার কিছু দায়িত্ব নিয়েছেন। অবশ্য এই সেদিনই লোকসভায় একটি বক্তৃতায় জানা গেল বহু টাকার বইপত্র তার অবিক্রিতই রয়ে গেছে। এক কথায় বলা যায়, আমরা নিজেদের বিষয়ে ততখানি সজ্ঞান নই।

সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত এ দুটি গল্প সঙ্কলন পড়তে পড়তে তামিল ও কন্নাড় ভাষার সাহিত্য-বিশিষ্টতা বিষয়ে অনেকখানি জানা যায়। পাঠক হিসাবে আপ্লুতও হওয়া যায়। শুধু তাই নয়, সামন্ততান্ত্রিক সাংস্কৃতিক পরিবেশভিত্তিক কুসংস্কার কূপমণ্ডুকতা সমাজজীবনের কতটা গভীরে প্রবেশ করেছে তার সমালোচনী এই গল্প সংকলন দুটির অধিকাংশ কাহিনীগুলিতেই মিলবে। ধর্ম, বর্ণসমস্যা, জাতিপাঁতি, জীবনকে এক শ্বাসরোধী পরিবেশে বন্দী করে ফেলেছে। তারই বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখীন এই কাহিনীগুলি। ভণ্ডতা ও প্রথাসিদ্ধ প্রশ্নহীন জীবনচারণা কিভাবে মানবিক দিকগুলিকে খণ্ডিত করে পঙ্কিলতার অতলে নিয়ে যায়—তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ রয়েছে গল্পগুলিতে। বলা বাহুল্য, এই পশ্চাদপদতাই আমাদের দেশে নানা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের বাহন। এই গল্প সঙ্কলন দুটির অধিকাংশ কাহিনী পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধেই মানবিক আবেদন তুলে ধরেছে।

তামিল গল্প সঙ্কলনের লেখকদের সঙ্গে আছেন সি. রাজাগোপালাচারী, কলকি, পুতুমৈপ্‌পিত্তন, কু প রাজগোপালন, অখিলন্‌, জীবা, মায়াবী, পি এস রামৈয়া, দেবন, ত না কুমারস্বামী, সোমু, কি বা জগন্নাথন, তি. জ. র, স্বথী, এল এস রামামৃতম, ন পিচ্চমূর্তি, রাজম কৃষ্ণন, ডি জানকীরামন, তুরৈবন প্রমুখ বিশ জন লেখক। এদের মধ্যে প্রবীণতম আর কনিষ্ঠতমের জন্মসাল যথাক্রমে ১৮৭৯ ও ১৯২৫।

কর্ণাটক গল্প সঙ্কলনে আছে শ্রীনিবাস, কে গোপালকৃষ্ণ রাও, শ্রীপতি, এম. ভি. সীতারামাইয়া, আনন্দ কন্দ, ত্রিবেনী, বসব রজকট্টীমণি, আনন্দ, চতুরঙ্গ ও সদাশিব প্রভৃতি দশজন কর্ণাটক লেখকের গল্প।

তামিল ভাষা ভারতের অতি সুপ্রাচীন ভাষা। সাহিত্যও তার বহু

দিনের। তামিল গল্পসঙ্কলনের ভূমিকায় সম্পাদক শ্রী এ চিদম্বরনাথ চেট্টিয়ার একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকায় তামিল গল্প সম্পর্কে পরিচিতি দিয়েছেন। কর্ণাটকের গল্প সঙ্কলনটির পরিচিতিতে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "বাঙলা অনুবাদেও আধুনিক কর্ণাটকের এই গল্পগুচ্ছ পড়েও দেখা গেল, কেবল দেশ বা পাত্রের নামগুলি ভুলে যেতে পারলে, মনে হয়; ভারতের যে কোন অঞ্চল নিয়ে এ রকম গল্প রচিত হতে পারে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় —ভূগোল, ঐতিহ্য ও ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও ভারতের এই ভারতীয়ত্ব এখনো পর্য্যন্ত সর্বত্র টিঁকে আছে।"

অনুবাদ অত্যন্ত ঝরঝরে। প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই ভালো। প্রগতিশীল পাঠকদের বইদুটি আমরা পাঠ করতে বলব।

তরুণ সান্যাল

বিবিধ প্রসঙ্গ

মানবসভ্যতার অবিস্মরণীয় অধ্যায়

ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচিত হল আমাদের যুগে—এই সত্তরের দশকে। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ গত কিছুদিন যাবৎ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছিলেন—চরম মুহূর্তের আর কত দেরি! অবশেষে সেই চরম লগ্ন ঘনিয়ে এল। গত ১৭ এপ্রিল কাম্বোডিয়ায় ও ৩০ এপ্রিল দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সমর্থনপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায় ঘোষিত হল।

দীর্ঘ পাঁচ বছর আগে ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক বিদেশ সফরে গেলে সমরনায়ক লন নল কাম্বোডিয়ার ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। লন নল সরকারের চক্রান্তের পিছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছিল। তারপর দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে মেকং নদী বিধৌত কাম্বোডিয়ায় তীব্র সংগ্রাম চলেছে। লন নল-এর তাঁবেদার সরকারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই সময়কালে প্রচুর সমরসম্ভার সরবরাহ করেছে। কিন্তু দেশের অগণিত জনগণের সমর্থনে বলীয়ান খেমের রাজবাহিনীর বীরত্ব, সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের সক্রিয় সহযোগিতা এবং বিশ্ব-জনমতের চাপ কাম্বোডিয়ার সংগ্রামকে অনিবার্য জয়ের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। তারই পরিণামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিপুল সামরিক ও অর্থ সাহায্যে বলীয়ান লন নল সরকারকে চূড়ান্তভাবে বিধ্বস্ত করে খেমের রাজবাহিনী কাম্বোডিয়ায় মুক্তির জয়পতাকা উড্ডীন করেছে।

কাম্বোডিয়ায় বিজয়ের রেশ মিটতে না মিটতেই দক্ষিণ ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট তাঁবেদার সরকারের আত্মসমর্পণের ফলে দীর্ঘ তিরিশ বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হল। ক্ষুদ্র অথচ অকুতোভয় একটি জাতির সুদৃঢ় প্রতিরোধের মুখে প্রবল পরাক্রান্ত মার্কিন বাহিনীকে ইতিহাসের সবচেয়ে গ্লানিকর পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম বর্বর ধ্বংসলীলা চালিয়েছে সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র বি-৫২ বোমারু বিমান, নাপাম বোমা, আর অসীম শক্তিধর

সপ্তম নৌবহরকে যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করে।

১৯৭৩ সালের প্যারিস শান্তি চুক্তির পর অনেকেরই আশা ছিল যে যুদ্ধক্ষত ভিয়েতনামে শান্তি পুনঃস্থাপিত হবে, শুরু হবে ভিয়েতনাম পুনরেকীকরণের কাজ। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় তাঁবেদার থিউ চক্র প্রলয়ংকর যুদ্ধের খেলায় মেতে উঠল। প্রায় ১৫ হাজার কোটি ডলার সমগ্র ইন্দোচীনের যুদ্ধে খরচ করা হয়েছে এবং ৫ লক্ষ ৫০ হাজার মার্কিন সৈন্য এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে, এর মধ্যে ৫৫ হাজার সৈন্য মারা গেছে। ১৯৬০-৭৩ সালের মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধে প্রায় ৫ লক্ষ অসামরিক লোক নিহত হয়েছে, ৮ লক্ষ শিশু অনাথ হয়েছে এবং বিধবা হয়েছে অগণিত নারী। ১৯৬০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫৫ লক্ষ লোক গৃহহারা হয়েছে। সেই সঙ্গে আমেরিকান সৈন্যদের উচ্ছৃঙ্খলতা রাজধানী সায়গন শহরকে প্রায় গণিকালয়ে পরিণত করে। লক্ষাধিক জারজ শিশু দক্ষিণ ভিয়েতনামে জন্মগ্রহণ করেছে। স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের বেনাম-দারেরা গত দশ-বারো বছরে দক্ষিণ ভিয়েতনামকে এমন এক বিপর্যস্ত অবস্থায় নিয়ে গেছে ইতিহাসে যার তুলনা মেলা ভার।

কিন্তু বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের মধ্যমণি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল চক্রান্তকে প্রতিহত করে অকুতোভয় জাতীয় মুক্তিবাহিনী দেশের একটির পর একটি অঞ্চলে নিজেদের জয়পতাকা উড্ডীন করেছে। সর্বশেষে জনগণের বিপুল উল্লাস ও সহর্ষ অভিনন্দনের মধ্যে মুক্তিবাহিনী খোদ সায়গন শহরে প্রবেশ করে এবং তাঁবেদার সায়গন প্রশাসনের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এই শতাব্দীর সর্বাধিক ঘটনাবহুল নাটকের যবনিকা পতন ঘটে।

কাম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে মুক্তিসংগ্রামের এই অভূতপূর্ব জয় সারা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উপনিবেশবাদবিরোধী জনগণের মধ্যে অপরিসীম আশা ও আনন্দ সঞ্চার করেছে। এই সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অকৃত্রিম সাহায্য এবং নিরলস সহযোগিতা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছে পৃথিবীর জনগণের কে মিত্র, শত্রুই বা কে! এই সূত্রে মাওবাদী চীনের প্রসঙ্গ আসা স্বাভাবিক। কারণ, মাওবাদী চীন মুখে প্রতিনিয়ত বিপ্লবের অগ্নিবাণী ছড়ালেও কার্যত বিপ্লববিরোধী শক্তির সঙ্গেই নিজেদের সহমর্মিতা প্রকাশ করে চলেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে

সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাহায্য প্রেরণে বারবার বাধাদান ও মাল যাতায়াতের জন্য মাশুল দাবি চীনের কদর্য মনোভাবেরই আর এক পরিচয় প্রকাশ করেছে।

কাম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে মুক্তিসংগ্রামের এই বিপুল বিজয় মার্কিন যুদ্ধবাজ পররাষ্ট্রনীতির উপর আর-একটি কঠিন আঘাত। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকে "এশিয়াবাসীর বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীকে যুদ্ধে লাগানো" মার্কিন যুদ্ধবাজ পররাষ্ট্রনীতির অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। কাম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদের শোচনীয় পরাজয় তার এই বোম্বেটেনীতির সমাধি রচিত করল। লাওস ও থাইল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এরই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে।

বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী মহল থেকে জোরালো ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে, দক্ষিণ ভিয়েতনামে বিশেষ করে সায়গনে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হবে। কিন্তু সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান করে খোদ সায়গন শহরে বিপ্লবী সরকারের শাসনে আশ্চর্য শান্তি বিরাজ করছে। সকল পতিতালয় ও প্রতি-বিপ্লবী পত্র-পত্রিকাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, আর বিপ্লবী সরকার সায়গন শহরের নামকরণ করেছেন হো-চি-মিনের নামে।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৩০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে এশিয়া ভূখণ্ডে সাম্রাজ্যবাদের এই শোচনীয় পরাজয় পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উপনিবেশবাদবিরোধী জনগণের কাছে, বিশেষ করে কলকাতাবাসীর কাছে, অপরিসীম আনন্দময় ঘটনা ও পরম গৌরবের বার্তা। এই কলকাতা শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—প্রবলের যাবতীয় অন্যায়-অবিচার এবং ফ্যাসিবাদের পাশবিকতার বিরুদ্ধে কম্বুকণ্ঠে যার প্রতিবাদ বারবার ধ্বনিত হয়েছে। আর এই কলকাতা শহরেই ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বুকের রক্ত ঢেলেছিলেন এক নবীন যুবক—কলকাতা সফরকালে বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ হো-চি-মিন অশ্রুসজল কণ্ঠে একথা স্মরণ করে কলকাতার চিরকালীন বিপ্লবী ঐতিহ্যকেই স্বীকৃতি জানিয়ে গেছেন।

আজ, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে, কলকাতা মহানগরীর অধিবাসীমাত্রই সারা ভারতবাসীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কাম্বোডিয়া-ভিয়েতনামের বীর জন-গণের প্রতি রক্তিম অভিবাদ জানাবেন। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিধ্বস্ত সে দেশের পুনর্গঠনের দায়িত্বও বিস্মৃত হবেন না, এ প্রত্যাশা করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত নয়।

কমল সমাজদ্দার

অগ্নিযুগের অগ্নিদিন

সম্প্রতি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও তার পরবর্তী অগ্নিযুগের অগ্নিদিনগুলির (১৮-২২ এপ্রিল) স্মরণে বাঙলাদেশ ও ভারতের সূর্যসেন স্মৃতিরক্ষা সমিতির যৌথ প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামে যে অনুষ্ঠানটি হল—বহুদিক দিয়েই তা তাৎপর্যপূর্ণ। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবের ইতিহাসে মাস্টারদা সূর্যসেনের নাম চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে। ৪৫ বৎসর পূর্বে ১৯৩০ সালে এই অঞ্চলটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীকে কয়েকদিনের জন্য হলেও পর্যুদস্ত করেছিলেন চট্টগ্রামের বীর যুবক দল, ৺সূর্যসেনের নেতৃত্বে। এই অকুতোভয়, আপাত দৃষ্টিতে নিরীহ, দেখতে ছোটখাট মানুষটিকে ১৯৩৪ সালে অসুস্থ অবস্থায় কারাগারের মধ্যে ১২ই জানুয়ারি মধ্যরাত্রে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে বৃটিশশক্তি তার পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। মাস্টারদাকে শুধু ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়েই তারা নিশ্চিন্ত হয় নি, তার মৃতদেহও এখানে সমাধিস্থ করতে সাহস পায় নি। একটি যুদ্ধ জাহাজ তখন সিঙ্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেই জাহাজে মৃতদেহ তুলে দিয়ে সমুদ্রের জলে তাঁকে ভাসিয়ে দেবার আদেশ হয়—মাস্টারদার একজন সহকর্মী সুধীন দাশের লেখা থেকে এ খবর জানা গেছে। ৺তারকেশ্বর দস্তিদারেরও ঐ দিনই ফাঁসি হয়।

স্বাধীনতার বেদীমূলে বীরের এই যে আত্মদান, তা বিফলে যায় নি, অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম শহরে ৺যতীন্দ্রমোহন হলের প্রাঙ্গণে তাঁর মূর্তির পাশেই যখন মাস্টারদার আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল তখন এই কথাই বার বার মনে পড়ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যাবার সময়েও মরণ-কামড় দিতে ভোলে নি। দেশ বিভাগ করে হিন্দু-মুসলমান ভাইদের মধ্যে সে বিভেদের বীজ বুনে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালেই পাকিস্তানী ফৌজের সশস্ত্র আক্রমণের সামনে দাঁড়িয়েছে এখানকার সূর্যসেন ব্রিগেড। মাস্টারদার জন্মস্থান নয়া পাড়াতে গেরিলা বাহিনীর প্রয়াত নেতা কামালের বাড়িতে তাঁর মায়ের শোকোচ্ছ্বাসের সামনে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করা গেল সত্যিই "নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।" কামাল ছিলেন এ অঞ্চলের গুপ্ত প্রতিরোধবাহিনীর নেতা—তাঁর মৃতদেহ খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁর গ্রামের এক ঝোপে। এখানকার অতীত বিপ্লবী ঐতিহ্য থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তিনি বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে

সূর্যসেন ব্রিগেড তৈরি করেন। দাসত্বের শৃঙ্খল মোচন করবার চেষ্টায় শহীদ কামাল প্রাণ দিলেন। তাই বলি, বীরের আত্মদান কখনোই বিফলে যায় না। ৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামের সময়, দেশ বিভাগের ২৫ বছর পরও, বীর চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক ঐতিহ্য অনুসারে শহরে গ্রামে গঞ্জে গড়ে উঠেছিল তরুণদের নিয়ে নতুন গেরিলা বাহিনী। ৺সূর্যসেনের জন্মস্থান রাউজান থানার নয়াপাড়ায় এবং ৺অম্বিকা চক্রবর্তী ও নির্মল সেনের জন্মস্থান কোয়েপাড়ায় গ্রামীন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ জনতার বিশাল জনসভাগুলিতে বসে এই সব কথাই মনকে বার বার আন্দোলিত করে তুলেছিল। মাস্টারদার কর্মস্থল ও যেখান থেকে তিনি ধরা পড়েন সেই গৈরলা গ্রাম, কেলিশহর ও ধলঘাট···সমস্ত স্থানেই অভূতপূর্ব জনসমাবেশ হয়। অতীতের বৈপ্লবিক কাহিনী শুনবার জন্য, মাস্টারদার সহযোগী কল্পনা দত্ত গণেশ ঘোষ প্রভৃতিদের দেখবার জন্য স্থানীয় গ্রামবাসীরা দলে দলে আসেন—সারাদিন অতিথিদের আপ্যায়ন করে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। বিশেষ করে বীরকন্যা কল্পনাকে তাঁরা ঘরের মেয়ের মতোই আদরে গ্রহণ করেন। মুসলমান মায়েরা কিভাবে মাস্টারদাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সে সব কথা এঁরাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করলেন।

এবারকার পাঁচ দিনের (১৮-২২ এপ্রিল) অনুষ্ঠানটির রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ৪৫ বছর কেটে গেছে। তথাপি স্থানীয় জনসাধারণ, বিশেষ করে যুবকবৃন্দ—ঐ সময়ে যাঁরা জন্ম গ্রহণও করেন নি—আলোচ্য অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে কতখানি উদ্দীপ্ত হয়েছে তা না দেখলে বোঝা যাবে না। বাঙলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হলেও মনে রাখতে হবে এর জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশ মূর্তি পূজায় অবিশ্বাসী মুসলমান এবং মোল্লারা এখনও গ্রামাঞ্চলে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেন। তা সত্ত্বেও কোনও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি তো হয়ই নি, বরঞ্চ অকুণ্ঠ সহযোগিতা এসেছে সব দিক থেকেই—সরকারী ও বে-সরকারী সংস্থা নির্বিশেষে। স্থানীয় পত্রিকার একটি উদ্ধৃতি তুলে দিলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধহয়: "এই উপমহাদেশের বুকে সেদিন চট্টগ্রামের যুব শক্তি যে বৈপ্লবিক তৎপরতা সূচিত করে তা এই দেশ ও জাতির ইতিহাসে চির-অম্লান, সেই দিনের সেই যুব শক্তিকে যিনি সংগঠিত ও নেতৃত্ব দান করেন, তাঁর নামও জাতির স্মৃতিতে অবিস্মরণীয়। ···তাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্বের আলোকে শুচিস্নাত আজকের বাংলাদেশে মাস্টারদার স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য এত তৎপরতা।···· এই উপলক্ষ্যে আমাদের

বক্তব্য হচ্ছে মাস্টারদার পুণ্য স্মৃতি রক্ষার দায়িত্ব নির্বাহ প্রসঙ্গে আমাদেরকে সার্বজনীন মনোভঙ্গীর অনুশীলন করতে হবে। কোনরকমেই যেন কোনও রূপ গোষ্ঠীভিত্তিক সঙ্কীর্ণতা এখানে ঠাঁই না পায়।" (এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ঐখানকার পত্রপত্রিকাগুলি প্রাসঙ্গিক সমস্ত খবর ছাপলেও, ভারতের পত্রিকাগুলি এ বিষয়ে একেবারেই নীরব ছিলেন।)

সবচেয়ে বেশি প্রশংসার পাত্র বোধহয় বাঙলাদেশের 'সূর্য সেন স্মৃতিরক্ষা সংসদ', যাঁদের উদ্যোগে এই সুন্দর ও বৈপ্লবিক স্মৃতিজড়িত অনুষ্ঠানটি অতি সাফল্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হতে পেরেছে এবং তা জাতির জীবনে রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে। বাঙলাদেশের সর্বস্তরের মতামতকে, সরকারী বে-সরকারী সমস্ত ধরনের সহযোগিতাকে, তাঁরা এই উপলক্ষে একত্র করতে পেরেছেন। রাষ্ট্রপতি মুজিবর রহমান নিজে ৺মাস্টারদার অনুরাগী, তিনি তো এঁদের সর্ব প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেনই, সরকারী ভাবে যতটা সম্ভব সাহায্যও দেওয়া হয়েছে। ব্রোঞ্জের আবক্ষ মূর্তির জন্য ব্যয় হয়েছে ১৫ হাজার টাকা, তার মধ্যে ১০ হাজার টাকাই বাঙলাদেশ সরকার দিয়েছেন। স্মৃতিরক্ষা সংসদের সভাপতি ছিলেন শিল্প-প্রতিমন্ত্রী নুরুল ইসলাম চৌধুরী। শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ মুজাফফর আহমদ চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে জে. এম. সেনগুপ্ত হলের প্রাঙ্গণে ৺সূর্য সেনের আবক্ষমূর্তি উন্মোচন করেন। ১৮ই এপ্রিল বিকালে মিউনিসিপ্যাল স্কুলের প্রাঙ্গণে যে মহতী সভা হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন শ্রমিকনেতা আবদুল মান্নান। দীর্ঘ সময়ব্যাপী সেই সভা খুব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন তিনি। তাছাড়া বাকশাল নেতারা, স্থানীয় এম. পি.-রা— যেমন যশোরের জনাব রওশন আলী, জিল্লুর রহমান, স্বয়ম্ভর অর্থ নৈতিক উদ্যোগের একজন প্রধান উদ্যোক্তা সাহাবুদ্দিন আহমেদ, সমবায় মন্ত্রী ফণিভূষণ মজুমদার প্রমুখ—সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে সমস্ত অনুষ্ঠানসূচীকে সাফল্য-মণ্ডিত করে তোলেন। এ ছাড়াও বাকশালের বহু সদস্য ও এম. পি. স্মৃতিরক্ষা সংসদের পৃষ্ঠপোষক ও পরোক্ষভাবে সহযোগী ছিলেন। যশোর, ঢাকা ও চট্টগ্রামের সমস্ত অনুষ্ঠানগুলিতেই এঁরা ছিলেন। এমনকি দূর টাঙ্গাইলের এম. পি. বাঘা সিদ্দিকীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও সেখানকার অন্যান্য নেতারা অনুষ্ঠান-গুলিতে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া সরকারীভাবে পরিবহন, ট্রেনের কনসেসন প্রভৃতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে বলা দরকার যে স্থানীয় জনসাধারণ, বিশেষ করে

তরুণদের ও ছাত্রসমাজের উৎসাহ এবং উদ্দীপনার কোনো অন্ত ছিল না। পেট্রাপোল সীমান্ত ও হরিদাসপুর সীমান্ত পার হয়ে বাঙলার মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় যুবসমাজ আর গ্রামবাসীরা এগিয়ে এলেন 'তীর্থযাত্রী' ৺সূর্য সেনের সহকর্মী ও অন্যান্য বিপ্লবীদের অভ্যর্থনা জানাতে। এমনিতেই শেষ বসন্তের কৃষ্ণচূড়ার লাল রঙে আকাশ লাল হয়ে আছে, তার ওপর শিরীষের সুগন্ধে চারিদিক ভরপুর। প্রীতিলতা তোরণ, শহীদ সূর্য সেন তোরণের মধ্য দিয়ে যাবার সময় রক্তিম পুষ্পবৃষ্টি, লাল শার্ট ও লাল "অগ্নিযুগের অগ্নিদিন" ব্যাচ পরা স্বেচ্ছাসেবকদের 'লাল সেলাম', "ভারত বাংলা মৈত্রী স্বাগতম" (এখনও জিন্দাবাদ কথাটি ওদেশে তত চালু হয় নি) ধ্বনি···সমস্ত মিলে তাদের অন্তরের অকৃত্রিম অনুরাগ ও বৈপ্লবিক চেতনার অনাবিল স্পর্শ আমাদেরও প্রেরণা যোগাচ্ছিল। ঢাকা পর্যন্ত পৌছানোর দীর্ঘ পথে ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোরে আরিচা, মাণিকগঞ্জে বাস থামিয়ে স্বাগত জানাতে এসেছিলেন শত শত সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তরুণের দল। পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে গণেশ ঘোষ ও কল্পনাকে অনেকবারেই ভাষণ দিতে হয়েছে। সবাইকে তাঁরা মিষ্টিমুখ করিয়ে মানপত্র দিয়েছেন। যশোরের কলেজ প্রাঙ্গণে গভীর রাত পর্যন্ত সভা ও পরিচয়ের আদানপ্রদান যে ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করছিল তা ভোলবার নয়। এদের সাংস্কৃতিক দলগুলি বেশ উচ্চমানের। চট্টগ্রামের উদীচি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ৺সূর্য সেনের জীবনের শেষ অধ্যায় নিয়ে যে গীতিনাট্য রচনা ও পরিবেশনা করেছিলেন তা সত্যিই খুবই উঁচুদরের। অনেক রাত পর্যন্ত ৺মাস্টারদাদের বীরকাহিনী নিয়ে কবিগান হল। ঢাকাতে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী বিপ্লবের জয় গান গেয়ে শোনালেন, যশোরে শুনলাম জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের নবজীবনের গানগুলি; সমস্ত প্রয়াসের মধ্যেই আছে বৈপ্লবিক ঐতিহ্য ও নতুন জীবনকে বুঝবার প্রয়াস। সেইটাই আমাদের সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে। ৪৫ বছর পরেও স্থানীয় জনসাধারণ ও যুবকবৃন্দ, যাঁরা হয়তো ঐ সময়ে জন্মগ্রহণও করেন নি, চট্টগ্রামের বীরস্মৃতি তাঁদের কতখানি উদ্দীপিত করেছে তা না দেখলে বোঝা কঠিন। শুধু উৎসাহই নয়—সমস্ত স্মৃতিকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা দেখা গেল মন্ত্রী নুরুল ইসলাম চৌধুরীর ঘোষণায়। নয়া পাড়ায় ৺সূর্য সেনের নবনির্মিত সমাধিস্থলে যে সভা হয় তাতে তিনি ঘোষণা করলেন যে মাস্টারদার গৃহের ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে তোলা হবে গ্রামের পাঠাগার ও রিডিং ক্লাব—যেখানে গ্রামবাসীরা এসে মিলতে পারবেন।

৺সূর্য সেনের প্রাক্তন সহযোগীদের কেউ কেউ এ দেশে রয়ে গেছেন—তাঁদের মধ্যে আছেন বিনোদ চৌধুরী, কালীপদ চক্রবর্তী, ব্রজেন দাস, আবদুস সত্তার, মণীন্দ্র দাসবর্মণ, পুলিন দে প্রভৃতি। এঁদের মিলিত চেষ্টায় সংসদের পক্ষ থেকে যে স্মারকগ্রন্থ বার করা হয়েছে তাতে মাস্টারদার মৃত্যুকালীন ঘটনা ও অন্যান্য সহযোগীদের সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা গেল। তার মধ্যে অখ্যাত 'তারিণী মাঝি' প্রবন্ধটি সত্যই উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে এপার বাঙলা ও ওপার বাঙলার অনেক প্রাক্তন বিপ্লবীদের পুনর্মিলন হল। ওপার বাঙলার অধুনা লুপ্ত কমিউনিস্ট পার্টির মণি সিং, অনিল মুখার্জি, জ্ঞান চক্রবর্তী, রবি নিয়োগী, কালী চক্রবর্তী, আবদুস সত্তার বিভিন্ন সভাতে ভাষণ দিয়েছেন। ভারতের ছিলেন কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার মন্মথ গুপ্ত, কানপুর ষড়যন্ত্রের ভি শুক্লা, আন্দামান-ফেরৎ বিজয় ব্যানার্জি, বঙ্গেশ্বর রায়, ধরণী গোস্বামী প্রমুখ ও মাস্টারদার সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা জীবিত আছেন তাঁরা প্রায় ৫০ জন। আর-একজনের কথা না বলে এ পরিচিতি শেষ করা যায় না, তিনি হলেন কৌতুক-অভিনেতা শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজে তিনি ঢাকার ছেলে, ভারতের উদ্যোক্তারা নিমন্ত্রণ করতেই তিনি প্রাণের টানে এসেছেন এখানে—তাঁর অনেক দিনের অভিলাষ চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। বিমানভ্রমণে স্বাচ্ছন্দ্যের মায়া ছেড়ে তিনি ট্রেনের দীর্ঘযাত্রায় সহযাত্রী হলেন বিপ্লবীদের। ফলে চট্টগ্রামের জনসভাতে তাঁর কৌতুক-অভিনয় জমল না বিশেষ—বড় বেশি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পর ভাবাবেগের প্রাবল্য গেছে, তারপরে এসেছে ভারত-বিদ্বেষের কাল। এখন সে সবই কেটে গেছে। বাঙলাদেশের মানুষ কঠিন অবস্থার বাস্তব ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে কে তাঁদের সত্যিকার বন্ধু কেই বা শত্রু—তাই দেখছে। কিভাবে বর্তমান দুর্দিনের কঠোর দিনগুলি পার হওয়া যায়, তারই উপায় সন্ধানে তাঁরা রত। তাই মাস্টারদার শেষ চিঠির সেই লাইনটি "শহীদের স্মৃতির মধ্যেই রয়েছে বিপ্লবের বীজ" এত মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। স্মৃতিচারণ তখনই সফল—যখন সে পাঠককে নতুন জীবনের নতুন পথে যাবার সন্ধান দেয়, উৎসাহ দেয়। সেই দিক থেকে এই স্মৃতিচারণা স্থায়ীভাবে সফল হবে—এই আশা রইল।

কমলা মুখোপাধ্যায়

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

বছর ছয়েক আগের কথা। ছড়িয়ে পড়ল শোকাবহ সংবাদ। রাহুল সাংকৃত্যায়ন আর নেই। বিশ্বাস করতে মন চায় নি। বার বার শুনেও তাই অবিশ্বাসের ঘোর। কিন্তু বাতাসে ছিল কান্না-ভেজা স্বর। নাই, নাই, সে পথিক নাই।

বয়স হয়েছিল তখন সত্তর বছর। সেটা ১৯৬৩-র ১৪ এপ্রিল।

মস্কো থেকে ফিরে শরীরটা বরং তাজাই লাগছিল। মোড় নিচ্ছিল ভালোর দিকে। অথচ এটা যে প্রদীপ নিভে যাবার আগে জ্বলে ওঠা তা ঠাহর করতে পারেন নি তাঁর আপনজনও। কি করেই বা সম্ভব? আগে চিনতে পারতেন পরিচিত মুখগুলি। আলোয় উজ্জ্বল হত চোখের মণিদুটো। ভালোবাসার টান যে ছিল তাঁর অনন্ত অগাধ।

অসম্ভব পরিশ্রমী এই মানুষটি তাঁর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছিলেন এক কঠিন জিজ্ঞাসা। তাই, 'শাসন শব্দকোষ' তৈরির সময় যিনি বলেছিলেন, "সেকেণ্ডের হিসাব দিতে পারব না বটে, তবে মিনিটের হিসাব দিতে পারি",— সেই প্রাজ্ঞ মানুষটিকে শেষ পর্যন্ত ভারত-ছাড়া হতে হয়েছিল একসময়। অসুস্থ শরীর নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হন সিংহলে।

অবশ্য রাহুলজী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দার্জিলিঙে। আর সেই দিনে গোটা দার্জিলিঙে নেমে আসে শোকের ছায়া। কম করেও ছ-সাত হাজার দার্জিলিঙবাসী মিলিত হয়েছিলেন রাহুলজীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা জানাতে। তাঁদের সঙ্গে সামিল হয়েছিলেন পশ্চিম বাঙলার তদানীন্তন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু।

রাহুলজী আরো একটি প্রশ্ন তুলে ধরেন মৃত্যুর আগে। তখন তাঁর অবস্থা সঙীন। পাঞ্জা কষে চলেছেন মৃত্যুর সঙ্গে। এমন সময় রুটিন মাফিক ঘোষিত হল সরকারী খেতাবের তালিকা। সরকার পিণ্ডদান করলেন রাহুলজীরও। বোম্বাইর বিভিন্ন সম্মানিত চিত্র-প্রযোজক আর তারকাদের সঙ্গে এক কোণে তাঁর নামটি দেওয়া হল জুড়ে। জুটল পদ্মভূষণের খেতাব।

বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী রাহুল সাংকৃত্যায়ন একালের এক পরম জিজ্ঞাসা। তাই কখনো তাঁকে দেখা গেছে বার্ন কোম্পানির কারখানায় কালি-ঝুলি মাখা শ্রমিকের চেহারায়, আবার বৌদ্ধ ভিক্ষুকের বেশে হেঁটে চলেছেন তিব্বতে, ঘুরে বেড়াচ্ছেন পুরনো পুঁথির সন্ধানে।

জন্মেছিলেন তিনি উত্তর প্রদেশের আজমগড় জেলার পন্দহা গ্রামে। সেটা ১৮৯৩র ৯ এপ্রিল। ছেলেবেলার নাম ছিল কেদারনাথ। এসময়েই দেখেন তিনি বিশ্বভ্রমণের স্বপ্ন। আলোড়ন তুলত :

"সৈর কর দুনিয়া কী গাফিল জিন্দগানী ফির কহাঁ,
জিন্দগানী গব কুছ রহী তো নৌজয়ানী ফির কহাঁ?"

স্থির করলেন তিনিও দুনিয়ার 'সৈর' করবেন। বেরিয়েও পড়লেন। বয়স তখন চোদ্দর মণিকোঠায়। কিন্তু ফিরতে হল, সৈর হল না। অবশ্য দমলেন না এতে। সুযোগ এল আবার। কলকাতার পথে পাড়ি জমালেন। একা।

বদরীনাথ, বেনারসও ঘুরেছেন। মাঝে মাঝে চলেছে সংস্কৃত চর্চা। অনন্ত তৃষ্ণা। এখানে তাঁর নামান্তর ঘটল। রামউদার। এরপর গেলেন মাদ্রাজে। সেখান থেকে অযোধ্যা আবার। সঙ্গী তাঁর পুরনো পুঁথি, বিরাট বিরাট সংস্কৃত গ্রন্থ, বেদ-বেদান্ত। দেখতে দেখতে প্রথম মহাযুদ্ধ। সত্যসন্ধী পণ্ডিতের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেল এসময়। রুশ বিপ্লব তাঁকে নাড়া দিল। মানবসভ্যতার এমন ক্রান্তিকারী ঘটনা তাঁকে দেখাল নতুন স্বপ্ন, আলোর প্রতিশ্রুতি। ১৯২০-তে ঢুকলেন সক্রিয় রাজনীতিতে। কংগ্রেসে। হলেন ছাপরা জেলা কমিটির সম্পাদক। জেলেও যান এসময়। কারান্তরালেই সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতি তাঁর আগ্রহ তুঙ্গে উঠল, কল্পনা করলেন সে বৈপ্লবিক সমাজের চেহারা। এর প্রকাশ ঘটল 'দ্বাবিংশ শতাব্দী'-তে। সংস্কৃতে লেখা এই কবিতার বইটির হিন্দী সংস্করণও বেরোয়। বাঈসবী সদী। সুযোগ-সুবিধে মতো পালি ভাষা ও সাহিত্য, গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে সময় কাটালেন। বহু ভাষাবিদ রাজনীতিক কর্মী হিসেবে তাঁর খ্যাতি তখন ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ১৯২৭-এ যান সিংহলে। সংস্কৃত শিক্ষকের চাকরি নিয়ে। এখানেই করেন পুরাতত্ত্ব বিষয়ে পঠন-পাঠন। সেখান থেকে আবার একসময় যান তিব্বতে। ভিখিরির ছদ্মবেশে। কাটালেন পনেরো মাস। ঘুরলেন মঠে মঠে, ডুব দিলেন জ্ঞানের গভীরে। ফিরলেন দেশে আবার। সঙ্গে মুদ্রিত তঞ্জুর-কঞ্জুর, নানা পুঁথিপত্র, ও দুষ্প্রাপ্য চিত্রপট। বলাবাহুল্য, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেবার পরেই তাঁর নামান্তর হয়। রাহুল সাংকৃত্যায়ন। সেটা ১৯৩০ সালের কথা।

রাজনীতি জগতের নানা কার্যকলাপ এসময় তাঁর মনে সংশয় এনে দিল। চলল টানাপোড়েন। গান্ধীবাদে বিশ্বাস হারালেন রাহুলজী। সরে দাঁড়াবার

চেষ্টা করলেন রাজনীতি থেকে। ঘুরতে গেলেন ইয়োরোপ, মহাবোধি সোসাইটির প্রতিনিধি হিসেবে। বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের সংস্পর্শে এসময় তিনি আসেন। সোভিয়েত রাশিয়া জানাল এই মানুষটিকে আমন্ত্রণ। এলেন স্বপ্নের কর্মক্ষেত্রে। দীর্ঘকালের ইচ্ছা এবার সফল হল। চাকরি নিলেন তিনি। ইণ্ডো-টিবেটিয়ান বিভাগে যোগ দিলেন। পেলেন তিনি মুক্তির স্বাদ। ব্যক্তি-জীবনেও বসন্তের হাওয়া লাগল। প্রেমে পড়লেন লোলার। বিয়ে করলেন এই রুশ যুবতীকে। রাহুলজীর বয়স তখন চুয়াল্লিশ।

কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি তিনি নিজের সংহতি জানালেন। যোগ দিলেন পার্টিতে। তিন বছর ছিলেন বিহারে কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে। জঙ্গী নেতা হিসেবে ছিলেন জনপ্রিয়। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে, বিশেষ করে বিহার কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক হিসেবে, তিনি নিয়েছিলেন নির্ভীক সংগ্রামীর ভূমিকা।

ভারতীয় ইতিহাসের বহু ঘুমন্ত-অধ্যায় তাঁর জীয়নকাঠির স্পর্শে আলোকিত হলেও শেষ বয়সে তিনি সংকটের মুখে পড়েন। সংস্কৃত, পালি, রুশ, ফারসি, আরবি, বাঙলা, হিন্দি, উর্দুতে সমান পণ্ডিত এই মানুষটির উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থাও ভারতবর্ষে হয় নি। সোভিয়েত রাশিয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে যেতে হয় সেখানকার সরকারের আমন্ত্রণে। কিন্তু রক্ষা পেলেন না তিনি। বিদায়ের ঘণ্টা বেজে উঠল।

সাহিত্য আকাদেমি এঁকে পুরস্কৃত করেন দু-খণ্ডে লেখা মধ্য এশিয়ার ইতিহাসের জন্যে।

রাহুলজীর কথা এই এপ্রিলে খুব মনে পড়ছে। আমরা কি তাঁকেও ভুলে যাব?

মহাবীর চাচান

পি. জি. হাসপাতালের নাম বিক্রির পটভূমি

পূর্ববঙ্গে একটা প্রবাদ আছে—"পরের চাল পরের কলা; ব্রত করে চন্দ্রকলা।" কিন্তু এমনি একটা ঘটনা হল—সরকারী প্রেসিডেন্সি জেনারেল (পি. জি.) হাসপাতালের নাম শেঠ সুখলাল কারনানী মেমোরিয়াল হাসপাতাল। নামটা অবশ্য এমনি এমনি হয় নি; কিনে নেওয়া হয়েছে।

দশ কোটি টাকা সম্পদ সম্পন্ন পি. জি. হাসপাতালের নাম মাত্র ১২ লক্ষ টাকায় ১৯৫৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর শেঠ সুখলাল কারনানী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কাছে বিক্রি হয়েছে। কথা ছিল নাম-বদলের দাম দেওয়া হবে সতের লক্ষ টাকা, কিন্তু ঐ সতের লক্ষ টাকা বাবদে যে সম্পদ দেওয়া হল তা ভাঙ্গিয়ে পাওয়া গেল মাত্র বার লক্ষ টাকা। পি. জি. হাসপাতালের বয়স এখন দু'শ পাঁচ বছর। এই সুদীর্ঘ কাল হাসপাতালটি গৌরবে উজ্জ্বল। পি. জি. হাসপাতালে অবিভক্ত বাঙলার প্রথম মেডিকেল কলেজ ও স্বাধীন ভারতে প্রথম স্নাতকোত্তর মেডিকেল কলেজ যোগ্যতায় সুখ্যাত। কিন্তু আজ তার নাম অন্যায্য দামে বিক্রি হয়ে গেছে।

বহু স্মৃতি-বিজড়িত অতীত গৌরব

সে অনেকদিন আগের কথা। ইউরোপীয়রা কলকাতার আশেপাশে বসবাস শুরু করায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭০৭ কি ১৭০৮ সালে বর্তমান বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে স্বদেশবাসীর চিকিৎসার জন্য। ক্রমে লোকজন বেড়ে যাওয়ায় ১৭৬৪ সালের ১৫ অক্টোবর কাউন্সিল একটু বড় সড় জায়গায় হাসপাতাল সরিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে রেভারেণ্ড জন জ্যাকারিয়ানের কাছ থেকে ৯৮৯০ আর্কট টাকায় হাসপাতালের জন্য তাঁর বাগান বাড়িটি কেনা হয়। কোম্পানী ১৭৬৯ এর ২০ জুন প্রথম জায়গাটির দখল নেয় এবং ১৭৭০ এর ২২ এপ্রিল প্রথম রোগী ভর্তি হয়। এই হল ভারতে প্রথম আবাসিক হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা। বলা বাহুল্য, শুধু ইউরোপীয় রোগীদের জন্য সংরক্ষিত এই হাসপাতালে রোগী ডাক্তার ও কর্মী সবই সাদা চামড়ার লোক ছিল। নতুন নতুন ভাঙা-গড়া চলতে থাকে। বর্তমান বাড়িগুলির মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো বাড়ি হল সেন বিল্ডিংটি। এটি তৈরি হয় ১৯০১-১৯০২ সালে।

এর পরে এল সেই শুভদিন। ১৮৩৮-এ এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙলার প্রথম মেডিকেল কলেজ। ১৯৩৮ এর ৩০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় প্রথম ডাক্তারী পরীক্ষা। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হবার অল্পকাল পর থেকেই এখানে গবেষণার কাজও শুরু হয়। প্রথম গবেষক ডাঃ এডোয়ার্ড হেয়ার (১৮১২) উইঞ্চেষ্টার ও লণ্ডনে শিক্ষা শেষ করে ১৮৩৯ এর জুলাই মাসে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী নিয়ে কলকাতায় আসেন। নিজ যোগ্যতায় কুইনিন নিয়ে

গবেষণার সুযোগ পান। এখানেই তিনি ১৮৪৯ সালে ১২৯ জন জ্বরের রোগীর উপর কুইনিন প্রয়োগ করে কুইনিনের কার্যকারিতা প্রমাণ করেন। এই ১২৯ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন মারা যান। তখন থেকে শুরু হল সিঙ্কোনার চাষ এবং কুইনিন দিয়ে জ্বরের নির্ভরশীল চিকিৎসা।

পরবর্তীকালে স্যার লিওনার্ড রজার্স, টি. আর. লুইস ও স্যার রোনাল্ড রস প্রমুখ এখানে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেন। বিশ্ব চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যতম দিকপাল—নোবেল পুরস্কার বিজয়ী স্যার রোনাণ্ড রস জীবনের সফল বছরগুলি এখানেই কাজ করেছিলেন। তাঁর জীবন ও কাজ নিয়ে আলোচনা না করলে বিষয়গুলি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল ক্লে-গ্র্যান্ট রস এর ছেলে রোনাণ্ড রস ১৮৫৭ এর ১৩ মে আলমোড়া জেলার কুমায়ন পাহাড়ে এক স্কট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কবি, সঙ্গীতকার ও গাণিতিক স্যার রস শিক্ষালাভ করেন ইংল্যাণ্ডে এবং চিকিৎসক হিসাবে চাকুরী নেন মাদ্রাজে (১৮৮১)। ব্রহ্মদেশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি জায়গায় কাজ করে, আবার ১৮৮৯ সালে তিনি মাদ্রাজ ফিরে আসেন।

এর আগেই জানা গিয়েছিল যে মশা ফাইলেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করে। সন্দেহ করা হয়েছিল মশা ম্যালেরিয়া জীবাণু বহন করে। রসকে এই সম্পর্কে গবেষণার জন্য লণ্ডন যেতে বলা হল। কিন্তু তখনকার প্রশাসন গবেষণার জন্যও তাঁকে ছুটি দেয়নি। ছুটি দিল অন্য একজনকে ইংল্যাণ্ডে ঘোড়দৌড় দেখতে যাবার জন্য। দক্ষিণ ভারতে কাজ করার সময়ই তিনি এক নতুন ধরনের মশা—এ্যানোফিলিস দেখতে পান। এখানে রস সেই ধরনের এক হাজার মশার পাকস্থলি পরীক্ষা করে ম্যালেরিয়া জীবাণু নির্দিষ্ট করেন। সে দিনটি ছিল ২০ আগষ্ট ১৮৯৭, আর স্থান ছিল পি. জি. হাসপাতালের উত্তরদিককার একটি ছোট্ট গবেষণাগার, যে ঘটনার কথা উত্তরদিককার দেয়ালের একটি পিতলের ফলকে এখনও লেখা আছে। ফলকটি বসানো হয়েছিল ১৯২৭ এর জানুয়ারী মাসে। ঐ সময় রস ইংল্যাণ্ডে থাকতেন এবং ১৯২৭ এ কলকাতা বেড়াতে আসেন। তাঁর উপস্থিতিতেই এক অনুষ্ঠানে ফলকটি বসানো হয়। তাঁর গবেষণা সম্পর্কে তিনি ব্রিটিশ মেডিকেল জার্ণালে ১৮৯৭ এর ১৮ ডিসেম্বর সংখ্যায় লেখেন। তাঁর এই গবেষণার জন্য তাঁকে ১৯০২-এ নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। আমরা এমন মহান ব্যক্তি ও গবেষকের স্মৃতির

জন্য কিছুই করিনি। তখন তিনি শুধু এ দেশের একটা মহামারী সৃষ্টিকারী রোগের জীবাণু আবিষ্কার করলেন না, এখানকার হাসপাতালকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্থান করে দিলেন। ১৯শ শতাব্দীর শেষদিকে এই হাসপাতালে প্রথম ভারতীয় রোগী হিসাবে ভর্তি হয়েছিলেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। প্রথমে শুধুমাত্র ইংরেজদের এবং পরে প্রধানত ইংরেজদের চিকিৎসার হাসপাতাল—পি. জি. হাসপাতালে আমূল পট পরিবর্তিত হয়ে সাধারণ ভারতীয়দের জন্য এর দ্বার খুলে গেল ১৯৪৭ এর ১৫ আগষ্টে, ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে।

১৯৫৪-এ কোন রহস্যাবৃত কারণে কারনানী ষ্ট্রীটের কাছ থেকে ঐ বার লক্ষ টাকা নিয়ে এর নাম করে দেওয়া হ'ল শেঠ সুখলাল কারনানী হাসপাতাল। অমূল্য গবেষণার জন্য রোনাল্ড রস রইলেন সেই উত্তর দিকের দেয়ালে, আর সামান্য অর্থদানকারী, যাঁর নামের স্থান হওয়ার কথা একটি ফলকে তাঁর নামে হল হাসপাতালের পরিচয়।

এর পরের বছর থেকেই সরকার বিপুল অর্থ ব্যয় করে ঐ হাসপাতালের উন্নতি সাধনে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। নতুন নতুন বাড়ি, গবেষণাগার, যন্ত্রপাতি নিয়ে এর সর্বমোট মূল্য হবে অন্তত দশ কোটি টাকা।

১৯৫৬-এ ভারতের প্রথম স্নাতকোত্তর মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইন্‌ষ্টিট্যুট অব পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন ও রিসার্চকে এই হাসপাতালে সংহত করা হল। ১৯৭৫-এর এপ্রিলে এখানে রাজ্যের প্রথম নার্সিং শিক্ষায় স্নাতক পাঠক্রম এর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল।

১৯৫৬ এর পর থেকে হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ বছরের পর বছর উন্নতির দিকে যাচ্ছে। এখন কুড়িটিরও বেশি বিভাগ, যার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। ১৯৭৫-এ এই হাসপাতালের বহির্বিভাগে ৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৮০৪ জন রোগী চিকিৎসিত হয়েছে আর ইন্‌ডোরে ভর্তি হয়ে চিকিৎসিত হয়েছিল ১৬ হাজার ৭শ ২ জন রোগী। ঐ বছর হাসপাতালে ব্যয় হয়েছে ৭৯ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯৩০ টাকা। কারনানীর দান হাসপাতালের দু-মাসের খরচও দেয়নি।

এখানকার কর্মীসংখ্যা (১৯৭১) ডাক্তার-১৭৬, নার্স-৩৩৪, কর্মী ৮৭৬ জন ৩৫ টি ওয়ার্ড, ৬২ টি কেবিন, ১৯ টি বহির্বিভাগ, ১২ টি বিশেষ ইউনিট ও অপারেশন থিয়েটার (বড়-৫টি, ছোট-২১ টি)। এখানেই আছে ফিজিওথেরাপী

লেবরেটরি, রেডিওগ্রাফী ট্রেনিং সেণ্টার এবং বিভিন্ন বিভাগে গবেষণার ব্যবস্থা। এই প্রতিষ্ঠানটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি কলেজ অব মেডিকেলের সঙ্গে যুক্ত।

কয়েকটি বিভাগ বিশেষ সফিসটিকেটেড চিকিৎসার ব্যবস্থা-সমন্বিত, যা ভারতের অন্য কোনো সরকারী হাসপাতালে নেই বললেই চলে।

জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত (বছরে ৮০ লক্ষ টাকা) এই হাসপাতালের নাম দেশের প্রথম গ্রাজুয়েট কলেজ হিসাবে পি. জি. হাসপাতাল করার প্রস্তাব বিভিন্ন মহল থেকে অনেক আগেই করা হয়েছে। ঐ সংক্রান্ত ফাইল-পত্র নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যদপ্তরে রয়েছে। সর্বোপরি পৃথিবীর কোনো দেশেই এই ভাবে সামান্য টাকার বিনিময়ে সরকারী সংস্থার নাম বিক্রির নজির নেই। আছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দাতাদের নাম সম্বলিত ফলক। আর এই ভাবে একজন দাতার নামে জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হওয়ায় অন্য দাতারা সেই সংস্থায় দান করতে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে অনাগ্রহী হয়ে পড়েন। এই ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না।

বিশেষভাবে আর একটি বিষয়ে বিবেচিত হওয়া উচিত—তা হল অর্থের বা দানের বিনিময়ে নামকরণ করতে হলে, যাঁরা বেশি অর্থ দিচ্ছেন, সেই জনসাধারণের নামে এই হাসপাতালের নাম হওয়া উচিত পিপ্‌ল্‌স জেনারেল হসপিটাল (পি. জি. হাসপাতাল)। ভারতেও সরকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থার নাম বিশিষ্ট গবেষকদের নামে যে হয়ে থাকে তার নজির রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে ভাবা এ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টার, হপ্‌কিন্‌স্ ইনষ্টিট্যুট, পাস্তর ইনষ্টিট্যুট প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়।

১৯৭০-৭১ সালে এস. এস. কে. এম নামে একটি ওয়ার্ড চিহ্নিত করে হাসপাতালের নাম পি. জি. (পোষ্ট গ্রাজুয়েট) করার উদ্যোগ অনেকদূর এগোয়। কিন্তু পরবর্তী রাজ্যপাল এস. এস. ধাওয়ানের শাসন (রাষ্ট্রপতি শাসন) কালে তাঁর কাছে চূড়ান্ত বিবেচনার জন্য যায়, কিন্তু তিনি প্রস্তাবটি বাতিল করে দেন।

[সূত্র: 1. Your Health, Vol. 19, Number 223, July 1970.

2. Report of Institution of Post-Graduate Medical Education and Research and S. S. K. M. Hospital, Calcutta. Year 1975.]

অতীন সরকার

ফ্যাসিস্টবিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার নয়া-ফ্যাসিস্ট চক্রান্তের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে একটি আবেদন প্রচার করেন। একমাত্র দৈনিক 'কালান্তর' সেটি পত্রস্থ করে। বৃহৎ পত্রিকাগুলি, যার কর্তৃপক্ষ স্থানীয় অনেকেই সেই আবেদন-পত্রের স্বাক্ষরদাতা, বিবৃতিটি প্রকাশ করেন না। অবশ্য, ইশতেহার আকারে সেই আবেদন হাজারে হাজারে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়। বিবৃতিটি নিম্নরূপ :

শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের আবেদন

আমরা উদ্বেগ বোধ করছি। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির সংহতি ও সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করার আয়োজন, এই ঐতিহ্যবান রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক অর্জনগুলিকে বিনষ্ট করার উদ্যোগ আমাদের অস্থির করে তুলেছে।

বিদ্রোহ করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে ডাক দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ও প্রশাসনকে বলা হচ্ছে অচল অবস্থা সৃষ্টি করতে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের শিক্ষায়তন বর্জনে প্ররোচিত করা হচ্ছে। যে-অর্থ নৈতিক সংকট ভারতের বুকে পাষাণভারের মতো চেপে বসেছে—ইতিবাচকভাবে তা অপসারণের আয়োজন না করে জনগণ- তথা গোটা দেশকেই ঠেলে দেয়া হচ্ছে অনিশ্চিত অস্থিরতার দিকে। এবং তা করা হচ্ছে তথাকথিত দলহীন গণতন্ত্র ও সার্বিক বিপ্লবের নামে। কেউ বা একে বলেছেন "দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম"।

আমরা ভুলতে পারি না, ত্রিশের যুগে প্রায় অনুরূপ এক সংকটলগ্নে সাধারণ মানুষের হতাশা এবং জাতীয় অবমাননাবোধকে ব্যবহার করে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ ক্ষমতা দখল করেছিল।

আন্তর্জাতিক ইতিহাসের নিতান্ত প্রাথমিক ছাত্রও জানেন—একটা দেশে গণতান্ত্রিক কাঠামো ভাঙে তখনই, যখন অধিকাংশ রাজনৈতিক দল সম্পূর্ণ নীতিহীন অবস্থান গ্রহণ করে এবং পরস্পরের মধ্যে অবাস্তব ও সুবিধাবাদী মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলে। জনসাধারণের স্বার্থের সঙ্গে প্রকৃত যোগসূত্রহীন তাদের এ-জাতীয় কার্যকলাপের দরুণই পরিণামে তারা দেশবাসীর আস্থা হারায়। জনমনে এই হতাশা এক ধরনের ঔদাসীন্য বা নিষ্ফল ক্রোধের জন্ম দেয় যা শুধু ভাঙে, শুধু আত্মহনন করে, কিছু গড়ে না। এর হলাহল ধ্বংস

করে সেইসব মূল্যবোধকে, সেইসব অর্জনকে—একটি জাতির যা বহু সাধনা বহু আরাধনার ধন। তারপর এই আস্থাহীনতার শূন্যতাকে ধীরে ধীরে এসে পূরণ করে একনায়কতন্ত্র কিংবা সামরিক জুন্টার শাসন। ভারতে আজ উগ্র বাম ও দক্ষিণপন্থী কতগুলি দল এবং কতগুলি কুখ্যাত ব্যক্তির অবিশ্বাস্য মোর্চা দেশে সে-রকম একটা পটভূমিকা তৈরির কাজকেই ত্বরান্বিত করছে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই সমস্ত বিশৃঙ্খলাকারী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের নেতৃত্বভার গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ। গান্ধীজীর অনুগামী আজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের রক্তাক্ত হাতে হাত মেলাতে দ্বিধা করেন নি। গান্ধীজীর হত্যাকারী যে ঐ কুখ্যাত সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল—তা কি কোনোদিন ভোলা যায়! জয়প্রকাশজী আজ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছেন যে একথাও তিনি সগৌরবে উচ্চারণ করছেন: "জনসংঘ যদি ফ্যাসিস্ট হয় তাহলে আমিও ফ্যাসিস্ট।"

যাঁরা আজ এই অপরিণামদর্শী পথ গ্রহণ করেছেন, ভারতের জন্য তাঁরা ডেকে আনছেন এক অশুভ অমঙ্গল। প্রাক্তন রেলমন্ত্রী ললিতনারায়ণ মিশ্রের মৃত্যু, প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষ্যদানস্থলে পিস্তলধারী যুবকের আবির্ভাব কিংবা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির গাড়িতে গ্রেনেড নিক্ষেপ বুঝিয়ে দিচ্ছে মারণমন্ত্রের পূজারীরা আমাদের জন্য কোন ভবিষ্যৎকে আহ্বান করছে।

মানবাত্মার কারিগর শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী আমরা এই দুঃসময়ে নীরব থাকতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মানবিক ঐতিহ্যের মহান উত্তরাধিকার বহনকারী আমরা কিছুতেই পারি না জাতিকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার দায় এড়াতে।

কি ভাবে সংকটমোচন করা যায়, কি ভাবে গণতন্ত্রে যোগ করা যায় নতুন সারবস্তু, কি ভাবে দুর্নীতিমুক্ত সুষ্ঠু প্রশাসন গড়ে তোলা সম্ভব ইত্যাদি বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করে একটা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে পৌঁছবার জন্য আগামী ২৬ এপ্রিল শনিবার ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট হল-এ সন্ধ্যা ৬টায় আমরা পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের একটি সম্মেলন আহ্বান করছি। আমরা আশা করি দলমত নির্বিশেষে সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী এই সম্মেলনে যোগ দেবেন এবং তাঁদের সুনিশ্চিত মতামত ব্যক্ত করে দেশ ও জাতির সংকটত্রাণে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

নিবেদক

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনাথ সেন রমা চৌধুরী প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী চিন্তামণি কর তিমিরবরণ শম্ভু মিত্র সুচিত্রা মিত্র বিষ্ণু দে সুশোভন সরকার গিরিজাপতি ভট্টাচার্য হিরণকুমার সান্যাল গোপাল হালদার অরুণ মিত্র বিমলচন্দ্র ঘোষ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমথনাথ বিশী অমলেন্দু বসু অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ধরণী গোস্বামী সুকুমার মিত্র চিন্মোহন সেহানবীশ সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় মনোজ বসু সুবোধ ঘোষ দিনেশ দাস বিজন ভট্টাচার্য মন্মথ রায় দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গজেন্দ্রকুমার মিত্র সুমথনাথ ঘোষ আশাপূর্ণা দেবী প্রতিভা বসু গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় হরপ্রসাদ মিত্র সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ফুলরেণু গুহ কল্যাণ দত্ত সুনীল সেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বিমলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নরেন্দ্রনাথ মিত্র সুশীল জানা বিমল মিত্র সন্তোষকুমার ঘোষ রণজিৎকুমার সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস মণীন্দ্র রায় চিত্ত ঘোষ রাম বসু সমরেশ বসু বিমল কর চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রদ্যোৎ গুহ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় দক্ষিণারঞ্জন বসু জ্যোতি দাশগুপ্ত নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ('সপ্তাহ') রণেন মুখোপাধ্যায় প্রফুল্ল রায়চৌধুরী জ্যোতির্ময় গুপ্ত অমল চট্টোপাধ্যায় ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার নরহরি কবিরাজ জগদীশ দাশগুপ্ত দিলীপ বসু শিপ্রা সরকার অশোক সেন বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় সুনীল মুন্সী বিদ্যা মুন্সী গৌতম চট্টোপাধ্যায় মঞ্জু চট্টোপাধ্যায় নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় রণজিৎ দাশগুপ্ত ছায়া দাশগুপ্ত প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য সুতপা ভট্টাচার্য অবন্তীকুমার সান্যাল রবীন্দ্র মজুমদার কানাই পাকড়াশী সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় আশীষ বর্মণ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণ ধর সতীন্দ্রনাথ মৈত্র সিদ্ধেশ্বর সেন ধনঞ্জয় দাস চিত্তরঞ্জন ঘোষ শঙ্খ ঘোষ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় মতি নন্দী শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় প্রফুল্ল রায় ('যুগান্তর') বীরেন্দ্র নিয়োগী জীবন দে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তরুণ সান্যাল দেবেশ রায় অমিতাভ দাশগুপ্ত সৌরী ঘটক তুষার চট্টোপাধ্যায় শিবশম্ভু পাল প্রসূন বসু শঙ্কর চক্রবর্তী যজ্ঞেশ্বর রায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বার্ণিক রায় জিষ্ণু দে অরুণ সেন শান্তা সেন আশীষ মজুমদার সুনীল ঘোষ পিনাকী মুখোপাধ্যায় সমর দে জাফরুল আলম শামিন আনোয়ার এ. হালিম সামাস আরভি শহীদ হোসেন শহীদ সায়েদ মোহামেদ মীর্জা এইচ. আজনুল হাসমানি হাসমি আবদুল

ওয়াহিদ মহিদ মুর্শিদ আজিমা বাদি মাজহার আনসারি অলকনারায়ণ গোপালজী মনমোহন ঠাকুর এস. কে. কুরেশি পীতাম্বর পাঠক সত্যদেও সিং অন্যের হরিহর তেওয়ারি বোম্মানা বিশ্বনাথম অমিয় দাশগুপ্ত শ্যামল চক্রবর্তী নির্মাল্য বাগচী দিলীপ ভাদুড়ী শান্তিময় রায় শিবপ্রসাদ সিংহ নিত্যানন্দ দে সৌগত রায় অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় মৃন্ময় ভট্টাচার্য জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় বনদেব মুখোপাধ্যায় পত্রলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় অজয় গুপ্ত (অধ্যাপক) অব্যয় দাশগুপ্ত নিত্য দাশ অরবিন্দ বসু (অধ্যাপক) দীপিকা বসু সুলেখা মল্লিক শিশির মিত্র দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় দিলীপ মুখোপাধ্যায় কমলেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় কেশব চৌধুরী সত্যব্রত দত্ত মিহির গুহ মণি রায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সুবীর মুখোপাধ্যায় বিজন গোস্বামী সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় অসিতকুমার রায় দিলীপ মিত্র শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য সচ্চিদানন্দ সরকার কিশোরীমোহন ভট্টাচার্য বীণা চৌধুরী সুধাংশু পাল দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় সুনীল বসু দিলীপকুমার সিংহ কৃপাসিন্ধু চৌধুরী আশীষকুমার পাল নারায়ণ চক্রবর্তী ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায় হরিশঙ্কর চক্রবর্তী রমণী নাথ গোবিন্দ মণ্ডল সন্ধ্যা ঘোষ শোভেন রায় বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী যতীন সরকার মো. শেখ আলী জ্যোতীষ চৌধুরী দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায় নলিনী মজুমদার রাধারমণ বসু মহ. সিরাজুল ইসমাইল পীযূষকান্তি রায় প্রকাশ হালদার নন্দ বসু মোবারক হোসেন ভানুকান্ত দাশ প্রবীর নিয়োগী রাজু লাহিড়ী মুকুল মজুমদার চন্দ্রা মৈত্র মায়া ঘোষদস্তিদার নমিতা বসু মো. শাজাহান আলী বিদ্যুৎলতা মণ্ডল সাধনা দত্ত রত্না চক্রবর্তী ললিতমোহন নস্কর শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তিমির সরকার মুরারি ভট্টাচার্য রাখহরি মণ্ডল শিখা চক্রবর্তী অজয়কুমার মাহাত অসিতকুমার দাস বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহম্মদ জয়নাল আবেদিন অনিলকুমার মণ্ডল ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সুশীল দাস খাঁ অতীন্দ্র ভট্টাচার্য আর. এল. দাস সমর রায় জি. মজুমদার পবিত্র মুখোপাধ্যায় রত্নেশ্বর হাজরা মণিভূষণ ভট্টাচার্য গণেশ বসু জ্যোৎস্নাময় ঘোষ নবারুণ ভট্টাচার্য অসিত ঘোষ চণ্ডী মণ্ডল বিশ্বনাথ বসু সত্য গুহ প্রভাত চৌধুরী রবীন সুর অনন্ত দাশ অরুণাভ দাশগুপ্ত রুদ্রেন্দু সরকার মুকুল রায় গোবিন্দ ভট্টাচার্য সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় কার্তিক ভদ্র দিব্যজ্যোতি মজুমদার পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অমিয় ধর দীপেন রায় শুভ বসু রণজিৎ মুখোপাধ্যায় মণীন্দ্র চক্রবর্তী অমল আচার্য অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় পরিমল চক্রবর্তী দুলাল ঘোষ রত্নেশ্বর বর্মণ দিলীপ সেনগুপ্ত কেশব দাশ

প্রশান্ত রায় ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় প্রফুল্ল রায় বিশু চৌধুরী অজয় গুপ্ত শুভাশিস গোস্বামী জ্যোতিপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় নীহারকান্তি ঘোষদস্তিদার সুদর্শন সেনশর্মা দেবব্রত রাহা অনুপ গঙ্গোপাধ্যায় অজয় চট্টোপাধ্যায় স্বপন সাহা দিলীপ সেন গৌরীশঙ্কর দত্ত দেবব্রত মল্লিক শিবনাথ চক্রবর্তী অনিলকুমার বিশ্বাস শক্তি হাজরা অচিন্ত্য বিশ্বাস পঙ্কজ সিংহ বিমান চট্টোপাধ্যায় বিপ্লব মাজী অশোক মিশ্র সীমা মিশ্র পিনাকীনন্দন চৌধুরী রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ অজিত সিংহ নির্মল চৌধুরী সমরেশ রায় অসিতবরণ হাজরা অমিয় মুখোপাধ্যায় বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য যশোদা সাহা চিত্ত রায় কমল সমাজদার পঞ্চানন সাহা ভানুদেব দত্ত পার্থ সেনগুপ্ত সুধীর চট্টোপাধ্যায় স্বপ্না দেব কমলা মুখোপাধ্যায় তিলোত্তমা ভট্টাচার্য মুক্তি মিত্র মালবিকা চট্টোপাধ্যায় রণধীর দাশগুপ্ত জ্যোতির্ময় নন্দী অনিল ভঞ্জ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় চিত্তপ্রিয় রায় মধু বন্দ্যোপাধ্যায় আশু দত্ত পবিত্র সরকার রতন চক্রবর্তী রণেন মোদক অলোক ঘোষাল ধূর্জটি সান্যাল বিপুল বিশ্বাস তৃপ্তি গুহ দিলীপ চক্রবর্তী ('কালান্তর') দীপ্তেন্দু দে অতীন সরকার সুভাষ দত্ত অমর ভট্টাচার্য অমিত সর্বাধিকারী দিলীপ সরকার মান্থু ঘোষ নিতাই দাস অজিত রায় নীলমাধব দত্ত বিপ্লব ঘোষ নির্মল মুখোপাধ্যায় সুনীলবরণ কানুনগো নির্মল মজুমদার হৃষিকেশ ঘোষ সন্তোষ মিত্র দিলীপ ঘোষচৌধুরী মলয় দাশগুপ্ত বিমান বসু পরিমল মুখোপাধ্যায় রঞ্জিত রায়চৌধুরী সমীরণ দাশগুপ্ত হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় সমীরকান্তি বিশ্বাস দেবীপ্রসাদ মৈত্র শচীন দাশ অঞ্জন ভট্টাচার্য অমর মিত্র হরিজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় গৌতম চৌধুরী সৌম্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় বাণী সমাদ্দার কৃষ্ণজীবন ভট্টাচার্য উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় অনীতা সুর সুনন্দা মৈত্র অতনু চট্টোপাধ্যায় অমিতকুমার বিশ্বাস ভাস্কর মিত্র অলক গঙ্গোপাধ্যায় চন্দনসুবাস পাল নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত মানব ভট্টাচার্য অতীশ বন্দ্যোপাধ্যায় সনৎ দে আলোক সোম শান্তি সিংহরায় জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অরুণকুমার বসু (অধ্যক্ষ) ফণীন্দ্র ভট্টাচার্য অরবিন্দ পাণ্ডা কপিল ভট্টাচার্য হরিদাস নন্দী অজিতকুমার দত্ত (য়্যাডভোকেট) কৃষ্ণবিনোদ রায় রমেন বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রভাত মুখোপাধ্যায় গৌর চক্রবর্তী মুকুলকুমার বসু কানাইলাল ভট্টাচার্য রেবতীমোহন সরকার প্রণব বিশ্বাস কে. সি. ব্রহ্ম সমর রায়চৌধুরী অসিত ঘোষ (ডা.) অঞ্জলিভূষণ রায়চৌধুরী জ্যোতির্ময় গুপ্ত (ডা.) রথীন মৈত্র অনিলবরণ সাহা বাধন দাস উমানাথ ভট্টাচার্য কানাই বসু চণ্ডী

মুখোপাধ্যায় নিখিল সেন বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় পান্নু পাল মোহিত আইচ দেবনাথ চক্রবর্তী অহীন ভৌমিক যতন বসুমজুমদার দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় অলোক বাগচী সাধন দাশগুপ্ত অজিত পাণ্ডে দীপা মুখোপাধ্যায় প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় মায়া সেন কাকলি রায় নির্মলেন্দু চৌধুরী রুমা গুহঠাকুরতা দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মনুজেন্দ্র ভঞ্জ প্রণব রায় অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় জহর রায় ঠাকুরদাস মিত্র জয়শ্রী সেন বঙ্কিম ঘোষ সুব্রত সেন রবি ঘোষ হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় গীতা দে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় কুমার রায় দেবতোষ বসু অশোক মুখোপাধ্যায় (থিয়েটার ওয়ার্কশপ) রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত কেয়া চক্রবর্তী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বাক্ষরদাতাদের এই বৃহৎ তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জাতীয় দুর্বিপাকে প্রতিষ্ঠা বয়স গোষ্ঠী ও মতামত নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকরা একত্র হয়েছেন। একত্র হয়েছেন সমস্ত শিল্পমাধ্যমের শিল্পীরা। তাছাড়া, প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যগণ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক, কলেজের অধ্যক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং জাতীয় অধ্যাপকের সঙ্গে একযোগে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে আছেন ডাক্তার এনজিনিয়ার আইনজীবী ও সাংবাদিক।

আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে লেখকের সঙ্গে চিত্রকরের কোনো সাধারণ মিলনভূমি নেই, ধ্রুপদী সঙ্গীত-শিল্পীর সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত বা গণসঙ্গীত শিল্পীর নেই ভাববিনিময়ের কোনো প্রশস্ত অঙ্গন। পেশাদার রঙ্গমঞ্চের কাছে গ্রুপ থিয়েটারের শিল্পীরা তো প্রায় বিদেশী। তদুপরি আছে ব্যক্তিগত গোষ্ঠীগত দলগত ভাগবিভাগ।

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা নিশ্চিতভাবে প্রগতি বা প্রতিক্রিয়ার পক্ষে। কিন্তু সংখ্যাধিক্য তাঁরাই যাঁরা নানা কারণে 'রাজনীতি'কে এড়িয়ে থাকতে চান। আবার দেখা গেল দেশের সার্বভৌমত্ব ও সাংবিধানিক গণতন্ত্র এবং জাতির মূল্যবোধগুলি যদি বিপন্ন হয় তাহলে এই শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরাই ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্ন তুচ্ছ করে বা মানসিক সংকট-সংশয় উত্তীর্ণ হয়ে যথোচিত অবস্থান গ্রহণ করেন। নিকট-অতীতে বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বা ভিয়েতনামের পক্ষে এমনই ঐক্যবদ্ধ অবস্থান তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

তাই, বৃহৎ পত্রিকাগুলির গণতন্ত্রবিরোধী অসহযোগিতা সত্ত্বেও ২৬ এপ্রিল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনসটিট্যুট হল মানুষের ভীড়ে উপচে পড়ল। মুখে মুখে খবর রটেছিল। তাছাড়া উদ্যোক্তারা কলকাতার কয়েকটি জনবহুল মোড়ে কাপড়ের ফেস্টুন টাঙিয়েছিলেন। একটি সুদৃশ্য মুদ্রিত পোস্টার লাগানো হয়েছিল শহরের অলিতে গলিতে। কয়েকজন লেখক ও বুদ্ধিজীবী একদিন কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে পথসভা করে শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের এই সভায় জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানান।

ফলে, এই বিরাট ও ঐতিহাসিক উদ্যোগের কণ্ঠরোধ করা মনোপলি প্রেসের পক্ষে সম্ভব হয় নি। ইউনিভার্সিটি ইনসটিট্যুটের প্রশস্ত হল বা দোতলার কোনো আসনই বুঝি খালি ছিল না। দরজার মুখে, করিডোরে, বাইরে অনেককেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রারম্ভিক ছোট্ট বক্তৃতায় তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির একটি রূপরেখা দিয়ে বলেন কাম্বোডিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ জয়লাভ করেছে, ভিয়েতনামেও মানুষের চূড়ান্ত জয় আসন্ন। আর মাত্র কয়েকদিন পরে, নয়ই মে, সারা পৃথিবী জুড়ে ফ্যাসিবাদের ওপর মানবজাতির বিজয়ের ত্রিশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হবে। সেই সঙ্গে ঐ দিন আমরা পালন করব রবীন্দ্রজন্মোৎসব। এ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। দিন-তারিখের এই যোগাযোগটিও কম ঐতিহাসিক নয়।

তিনি বলেন, আজ এই মহতী জনসভায় দাঁড়িয়ে মনে পড়ছে চল্লিশের দশকের কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই টালমাটাল দিনে এবং সোমেন চন্দের হত্যার পটভূমিতে সেদিন এই ইউনিভার্সিটি ইনসটিট্যুটেই বাঙলাদেশের সাহিত্যিকরা প্রতিষ্ঠা বয়স ও দলমত নির্বিশেষে সমবেত হয়ে ফ্যাসিস্টবিরোধী সংঘ গড়েছিলেন। সেই সংঘ বাঙলা তথা ভারতের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় সেদিন সে-সংঘ গড়ার কাজে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ এবং 'নবজীবনের গান'-এর স্রষ্টা শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র আজ এই সভায় উপস্থিত আছেন। এই যোগাযোগ মোটেই আকস্মিক নয়। চল্লিশের দশকেব সেই মহান-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করেই আজ পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপকতম অংশ

এই সভায় সমবেত হয়েছেন।

এরপর তিনি দীর্ঘ প্রস্তাবটি পাঠ করেন ও শেষে প্রস্তাবের কোনো কোনো অংশ কিছুটা ব্যাখ্যা করেন। বাঙলাদেশ এবং ইন্দোচীনে পরাজয়ের পর পাক-ভারত উপমহাদেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে-মরীয়া আক্রমণ চালাতে থাকবে তার বিপদ সম্পর্কে তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে নিরন্তর সজাগ থাকতে অনুরোধ করেন। প্রসঙ্গত তিনি চিলির উদাহরণ সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন। যদিচ, তিনি বলেন, পর্তুগালই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ।

প্রস্তাব সমর্থন করে অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর বক্তৃতায় বলেন "জয়প্রকাশের সার্বিক বিপ্লবের সহযোগী যারা তারা ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর বিরুদ্ধে এবং খানিকটা মার্কিন ঘেঁষা।" ভারতের অগ্রগতির জন্য তিনি এই অন্ধকারের শক্তিকে পরাস্ত করার আবেগ মণ্ডিত আহ্বান জানান।

এরপর বলেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘ ও অবিস্মরণীয় সেই বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। হীরেন্দ্রনাথ বলেন, "সাম্রাজ্যবাদ আপনা আপনি ধ্বংস হয় না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মীকে টেনে আনতে হবে।" তিনি "পৃথিবীর মুক্তি আন্দোলন এবং অগ্রগতির চিত্র এঁকে বলেন, অপ্রদীপ নিরানন্দ হতাশার বাহক জয়প্রকাশের দিকে আমরা যেতে পারি না।···এই উপমহাদেশের শান্তি, স্থায়িত্ব এবং অগ্রগতির ধারাকে, যা নিঃসন্দেহে দুর্বল, তাকে ধ্বংস করতে চাইছে এদেশে জয়প্রকাশের নেতৃত্বাধীন আন্দোলন।" প্রসঙ্গত তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর বিপুল করতালিধ্বনির মধ্যে ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল ত্যাগ ও বীরত্ব কিভাবে এক নতুন পৃথিবীর আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করেছে—আবেগরুদ্ধ স্বরে তার বর্ণনা দেন। পরিশেষে হীরেন্দ্রনাথ চল্লিশের দশকে বাঙলাদেশে লেখকদের ফ্যাসিস্টবিরোধী কর্মকাণ্ডের কথা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেন এবং এ যুগের লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের সেই মহান ঐতিহ্যের মশাল বহন করে উদয়াচলের পথিক হতে আহ্বান জানান।

ছোট্ট কিন্তু চমৎকার বক্তৃতা করেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। অননুকরণীয় ভাষায় তিনি বলেন, "এটা ঠিক রাষ্ট্রদেহ পীড়িত। কিন্তু একে সুস্থ করার পরিবর্তে একে ধ্বংস করার জন্য যে ফ্যাসিবাদ আসছে তাকে রুখতে হবে।"

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেন বলেন হীরেন্দ্রনাথ আমাদের সকলেরই মনের কথা বলেছেন। তাঁর বক্তৃতার পর সমস্ত কথাই বাহুল্য মাত্র। "গণতন্ত্র

এবং সাম্যবাদের পক্ষে আমরা। ফ্যাসিবাদকে রুখতেই হবে। একে আমরা সমর্থন করতে পারি না।”

শারীরিক অসুস্থতার জন্য বিষ্ণু দে সভায় আসতে পারেন নি। সভার উদ্দেশে তিনি চিঠি সহ একটি কবিতা পাঠিয়ে দেন। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র বিষ্ণুবাবুর কবিতাটি পাঠ করেন, তারপর নিজের একটি দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেন।

এই সভার আহ্বায়ক হিসেবে যে নামগুলি শেষপর্যন্ত পাওয়া গেছে, যেগুলি ইতিপূর্বে প্রচারিত আবেদনপত্রে ছাপা যায় নি—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই নামগুলি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের আবৃত্তির পর একে একে পাঠ করেন। তারপর অধ্যাপক সৌগত রায় বলতে ওঠেন। কেন তিনি 'দলবিহীন গণতন্ত্র'র প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে, কেনই বা বহু সীমাবদ্ধতা এবং ব্যর্থতা থাকা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারেরই দিকে সে কথাটি সৌগত রায় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন গণতন্ত্রের পক্ষে সর্বসাধারণের মিলিত সংগ্রাম পরিণামে এই সরকারকেও আরো গণতন্ত্রী ও দায়িত্ববান হতে বাধ্য করবে।

পরের বক্তা ছিলেন অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত। তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণ ও তাঁর কয়েকজন সহযোগীর পুরনো ইতিহাস তুলে ধরেন। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি বুঝিয়ে বলেন জয়প্রকাশকে কেন্দ্র করে জনসংঘর মতো ফ্যাসিস্ট সংগঠন, সিণ্ডিকেট কংগ্রেসের মতো চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী দল এবং সি পি. এমের মতো হঠকারী বামপন্থী পার্টির সুবিধাবাদী নীতিহীন ঐক্য কখনোই দেশের মঙ্গল করতে পারে না। ' তাছাড়া দেশীবিদেশী প্রতিক্রিয়া যে এই মোর্চাকে নানাভাবে মদত দিচ্ছে—সে খবরও গোপন নেই। অশুভ শক্তি জোট বেঁধেছে। তার বিরুদ্ধে শুভ শক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা শুধু এই রাজ্যকে নয় গোটা ভারত-কেই পথ দেখালেন। আশা করা যায়, প্রস্তাবিত ফ্যাসিস্টবিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি দৃঢ়তার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হবে।

তারপর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা পাঠ করেন।

ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেনের অনুপস্থিতিতে তখন সভার কাজ পরিচালনা করছিলেন শিল্পী রথীন্দ্রনাথ মৈত্র। এইবার তিনি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে শ্রোতৃমণ্ডলীর মতামত গ্রহণ করেন। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভাপতি প্রস্তাব করেন: আজকের এই সভার আহ্বায়ক মাত্রেই সদ্যগঠিত ফ্যাসিস্টবিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিক-

বুদ্ধিজীবী সমিতির সভ্য হলেন। এবং সমিতির আহ্বায়ক হলেন : দক্ষিণারঞ্জন বসু, সমরেশ বসু, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায় এবং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতির এই প্রস্তাবও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তারপর সমাপ্তি ভাষণ দেন রথীন্দ্রনাথ মৈত্র। একজন শিল্পী কেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তিনি তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন : লেখক এবং বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে শিল্পীরাও সদ্যগৃহীত প্রস্তাব অনুসারে "সৃজনশীল ভাবে এবং প্রত্যক্ষ কর্মের মধ্য দিয়ে" এই সংগ্রামের শরিক হবে।

সভার রিপোর্ট করতে বসে সভাস্থলে সেদিন একটি টেপরেকর্ডার ছিল না ভেবে আজ আপশোস হচ্ছে। আমার পক্ষে অন্য বক্তাদের বক্তৃতার নোট নেওয়াও সেদিন সম্ভব হয় নি। কিছুটা দৈনিক 'কালান্তর'-এ প্রকাশিত রিপোর্টের সাহায্য নিয়ে, কিছুটা বা স্মৃতি থেকে আমি বিভিন্ন বক্তার বক্তব্য যতদূর সম্ভব পেশ করলাম। কিন্তু প্রায় সকলের বক্তৃতাই এবং বিশেষভাবে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের বক্তৃতা আরো বিস্তৃতভাবে দেওয়া গেলে ভালো হত। পাঠকদের কাছে এজন্য আমি করজোড়ে মার্জনা চাইছি।

যথাবিহিত আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও 'স্টেটসম্যান' ছাড়া কোনো বৃহৎ পত্রিকাই সভায় রিপোর্টার পাঠায় নি। সভাশেষেও রিপোর্ট পাঠানো সত্ত্বেও একটি বৃহৎ পত্রিকায় এই ঐতিহাসিক সভার কোনো উল্লেখই দেখা যায় নি, অপরটি নামমাত্র খবর ছেপেছে। 'স্টেটসম্যান'-এর খবর পড়লে বোঝা যায় না, এটি ছিল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহৎ সমাবেশ। মঞ্চে উপরোক্ত বক্তারা ছাড়াও বসেছিলেন মনোজ বসু, হিরণকুমার সান্যাল, কপিল ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়। ছিলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রণজিৎকুমার সেন, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ।

উদ্যোক্তারা জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলন সম্পর্কে ইনসটিট্যুটেরই বারান্দায় একটি চমৎকার পোস্টার-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। এই উচ্চমানের প্রদর্শনীটি নানা জায়গায় দেখানো দরকার।

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতির ঘোষণা

[ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনসটিট্যুট হল-এ ২৬ এপ্রিল ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সম্মেলনের গৃহীত মূল প্রস্তাবের পূর্ণ পাঠ]

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের এই সভা ভারতভূমির বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্য বা নিছক মূঢ়তার বশে যাঁরা বলেন স্বাধীনতার পর গত সাতাশ বছরে দেশ আসলে পেছন দিকে চলেছে, তাঁদের আমরা ধিক্কার দিই। যাঁরা বলেন, সমস্ত সংকট সৃষ্টি হয়েছে গত তিন বছরে, আসলে তাঁরা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর, তাঁদের অর্বাচীন বক্তব্যগুলিও আমরা প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু সেই সঙ্গে গভীর মর্মযন্ত্রণা ও ক্ষোভের সঙ্গে আমরা একথা না বলে পারি না যে এই সময়কালে ভারতরাষ্ট্রের অগ্রগমন কতখানি হওয়া উচিত ছিল, তা হয় নি।

শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী আমরা অনেকেই কোনো প্রাত্যহিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে জড়িত নই।

কিন্তু ক্ষুধার্তের নিরবচ্ছিন্ন আর্তনাদ আমাদের স্বক্ষেত্রে স্থির থাকতে দেয় না। আমরা দেখি নিরাশ্রয় শতসহস্র পরিবার রাজপথে যত্রতত্র পশুর জীবন যাপন করছে। আমরা শুনি একমুঠো অন্নের জন্য মা তার শিশু সন্তানকে বিক্রি করছে, কখনো বা নিজেকে। আর, অনাহার-মৃত্যু তো এদেশে আজ নৈমিত্তিক ঘটনা।

অথচ, পাশাপাশি আমরা দেখতে পাই, কয়েকটি একচেটিয়া পুঁজিপতি পরিবার দিনে দিনে তার সম্পদ অবিশ্বাস্য হারে বৃদ্ধি করেছে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও সরকারী আইনের তোয়াক্কা না করে, এমনকি পুলিশ-প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তায় বা নিষ্ক্রিয়তার পরোক্ষ সুযোগে পুঁজির যারা মালিক তারা আজ খাদ্য বস্ত্র ও সর্ববিধ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে তাদের ভয়ঙ্কর মারণ-ব্যবসা অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। মুমূর্ষুর ওষুধ থেকে শিশুর দুধ পর্যন্ত এদেশে ভেজাল তাই সর্বব্যাপী।

জাতীয় অর্থনীতির এই অভূতপূর্ব সংকটে শুধু জনজীবন নয়, আমরাও বিপর্যস্ত। আমাদের শিল্প সাহিত্য শিক্ষা তথা গোটা সংস্কৃতিই আজ বিপন্ন।

ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে আমরা লক্ষ্য না করে পারি না মজুতদার চোরাকারবারীর দল, ভেজালদাতা এই সমাজদ্রোহী মানবদ্রোহী সরিসৃপগুলি, প্রকাশ্য দিবালোকে অবাধে বিচরণ করছে, করতে পারছে। অথচ, ভ্রান্ত ও সর্বনাশা পথের পথিক হলেও আসলে রাজনৈতিক কর্মী এমন শত-সহস্র যুবক বছরের পর বছর বিনা-বিচারে জেলখানায় সাধারণ কয়েদীর দুঃসহ জীবন যাপন করছে।

গোটা জাতির অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ফাটকা খেলে কিছু লোকের কালো-টাকার পাহাড় যখন দিনে দিনে গগনস্পর্শী হয়, তখন সেই অসম্ভব পরিবেশ

ও পরিস্থিতিতে কোনো দেশের যৌবনই স্থির থাকতে পারে না। বিশেষত যে-যৌবনকে নষ্ট ও বিভ্রান্ত করার জন্য চারিদিকে শত আয়োজন, যে-যুবশক্তি দেশের জন্য সমাজের জন্য পরিবারের জন্য নিজের জন্য সৃজনশীলভাবে কিছু করার পথ পায় না বা সুযোগ, ভুল শিক্ষাব্যবস্থা ও বেকার জীবনের গ্লানি তাদের ক্রমে ক্রমে সর্ববিধ মানবিক মূল্যবোধ সম্পর্কে অনীহ করে তুলবেই। গত কয়েক বছরে বিপ্লবী যুবশক্তির অপচয় ও অপব্যবহার আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক আবহাওয়াকে নিদারুণভাবে কলুষিত করেছে। আজও করছে। সম্পদের সমবণ্টন, উচিত মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিয়মিত সরবরাহ, ল্যাণ্ড সিলিং আইনকে কার্যকরী করা, ওষুধ প্রভৃতি শিল্পের জাতীয়করণ, উপযুক্ত কর্মসংস্থান, সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা, জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি অধিকতর মনোযোগ ব্যতিরেকে এই প্রচণ্ড সংকটের মোকাবেলা সম্ভব নয়। সন্দেহ নেই যে নির্বাচিত সরকার এক্ষেত্রে জনমনের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন নি, বরং দিনে দিনে আর্থনীতিক সংকট বাড়তে দিয়েছেন।

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির, বিশেষত মার্কিন মাল্টিন্যাশনাল করপোরেশনের শোষণ আমাদের এই ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকট শুধু বাড়াচ্ছেই না, আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বকেও বিপন্ন করছে। কে না জানে এই ম্যাল্টিন্যাশনাল করপোরেশন জাতীয় ছিদ্রপথেই কুখ্যাত সি আই এ বহু দেশের বৈধ সরকারের পতন ঘটিয়ে প্রতিবিপ্লব রপ্তানি করেছে।

ভিয়েতনাম-কাম্বোডিয়ার পরাজয়ের পর মরিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারত-পাক উপমহাদেশে তার পা রাখবার জায়গা খুঁজছে। উদ্বেগের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি, সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তজাল সপ্তরথীর মতো ভারতকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে চাইছে। তার পায়ের কাছে দিয়েগো গার্সিয়ায় স্থাপিত হচ্ছে হিরোসিমা ও নাগাসাকির জহ্লাদ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পারমাণবিক যুদ্ধঘাঁটি, ডান কাঁধের কাছে পাকিস্তানকে নতুন করে অস্ত্র-সজ্জিত করা হচ্ছে, আর বাঁ কাঁধের কাছে নাগাল্যাণ্ড মিজোরাম-এ বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে অস্ত্র যোগাচ্ছে, ইন্ধন যোগাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও তার মিত্র মাওবাদী চীন। মাথার কাছে নেপালে সিকিমে ভুটানে সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণবাদী শক্তিরা নানা চক্রান্তে লিপ্ত। বহুদিনের বহু আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত ভারতের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমতার এতবড় বিপদ বোধ করি ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা দেয় নি।

আমরা আরও উদ্বেগ বোধ করি এই কারণে যে, এই সমূহ বিপদের দিনে জনমনের হতাশা এবং ক্রোধকে ব্যবহার করে নানা দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জোট বাঁধবার চেষ্টা করছে। বিগত সাধারণ নির্বাচনে যে তথাকথিত মহাজোটকে ভারতের জনসাধারণ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই এখন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি সভাগুলির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। এ ছাড়া তারা যেসব কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে, তার আর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

ত্রিশের যুগে প্রায় অনুরূপ এক সংকটলগ্নে সাধারণ মানুষের হতাশা এবং জাতীয় অবমাননাবোধকে ব্যবহার করে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদ ক্ষমতা দখল করেছিল। মানবসভ্যতাকে তার মাশুল আজও গুণতে হয়।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে এই অশুভ শক্তির বর্তমান কার্যকলাপে তাই আমরা শঙ্কা বোধ না করে পারি না। প্রায় সে দিনের মতোই এরাও আজ বলছে, সমাজ এবং রাষ্ট্রযন্ত্রে যেসব দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে, তাকে নির্মূল করাই নাকি তাদের লক্ষ্য।

নির্বাচিত প্রতিনিধিসভাগুলি ভেঙে দিলেই কিভাবে দুর্নীতি দূর হবে তা আমরা বুঝতে পারি না। তাছাড়া যারা দুর্নীতি-বিরোধী জেহাদে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই সব ব্যক্তি ও দলের রেকর্ডই বা কি? গত পঁচিশ বছরের ইতিহাস তো কিছুই আমরা ভুলি নি।

আসলে দুর্নীতি দূর করা নয়, দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাই এদের লক্ষ্য। সেই কারণেই এরা নির্বাচিত প্রতিনিধিসভাগুলি গায়ের জোরে ভেঙে দিতে চায়, ছাত্রদের স্কুল-কলেজ বর্জন করতে বলে, কর বন্ধের ডাক দেয়, পুলিস প্রশাসনকে সব কিছু অচল করে দেওয়ার পরামর্শ দান করে, এমনকি পরোক্ষে সৈন্যবাহিনীকে বিদ্রোহ করার আহ্বান জানায়। যে সময় বাইরে থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা ভারতের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে তাদের চক্রান্তজাল বিস্তার করেছে, ঠিক সেই সময় সারা ভারত জুড়ে এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস নিছক সমপাতন নয়। সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এইভাবে সারা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেই তো গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদ করে চিলির সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় ফ্যাসিস্তপন্থী সামরিক জুণ্টার অমানবিক শাসন। সে দেশে আজ রক্তের গঙ্গা বইছে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত জনসাধারণের দুর্ভোগের কোনো

সীমা-পরিসীমা নেই। যেন ভুলে না যাই সেদিন চিলিতেও শোনা গিয়েছিল তথাকথিত সার্বিক বিপ্লবের মোহসঞ্চারী নানা কথা।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই সমস্ত বিশৃঙ্খলাকারী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি-সমূহের নেতৃত্বভার গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছেন শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ। গান্ধীজীর অনুগামী আজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের রক্তাক্ত হাতে হাত মেলাতে দ্বিধা করেন নি। গান্ধীজীর হত্যাকারী যে এক কুখ্যাত সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল— তা কি কোনদিন ভোলা যায়। জয়প্রকাশজী আজ এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছেন যে একথাও তিনি সগৌরবে উচ্চারণ করেছেন: "জনসংঘ যদি ফ্যাসিস্ট হয় তাহলে আমিও ফ্যাসিস্ট"।

এই অপরিণামদর্শী পথ নিঃসন্দেহে ভারতকে সর্বনাশের কিনারে নিয়ে যাবে। তার নানা লক্ষণ দেখাও যাচ্ছে। দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধ হিংসার আবহাওয়া। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির গাড়িতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করাকে যদি প্রতীক ঘটনা হিসেবে ধরি, তাহলে নিঃসন্দেহে বোঝা যাবে, মারণমন্ত্রের পূজারীরা আমাদের জন্য কোন ভবিষ্যতকে আহ্বান করছে।

সরকার যদি অর্থনীতিক্ষেত্রে দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর না হন, যদি গণতান্ত্রিক আচরণবিধিকে সর্বতোভাবে মান্য না করেন, জনমনের ক্রমবর্ধমান হতাশা ও ক্রোধ তাহলে অজ্ঞাতে এই প্রতিক্রিয়াপন্থীদের হাতকেই শক্তিশালী করবে। তার অর্থ অন্ধকারকেই ত্বরান্বিত করা।

মানবাত্মার কারিগর শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী আমরা এই দুঃসময়ে নীরব থাকতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মানবিক ঐতিহ্যের মহান উত্তরাধিকার বহনকারী আমরা কিছুতেই পারিনা জাতিকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার দায় এড়াতে। সাম্রাজ্যবাদী বহিরাক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার নয়াফ্যাসিস্ত চক্রান্তের বিপদ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করার কর্তব্য আমাদের দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতেই হবে।

তাই আমরা সংগঠিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফ্যাসিস্ট-বিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি গঠন করছি।

সৃজনশীলভাবে এবং প্রত্যক্ষ কর্মের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালনের প্রতিশ্রুতি নিলাম।

আমরা আশা করি ইতিহাসের এই সন্ধিলগ্নে সদ্যগঠিত ফ্যাসিস্টবিরোধী শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমিতি ওপরে উদ্ধৃত ঘোষণার মর্যাদা রাখবেন।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

7 JUL 1976